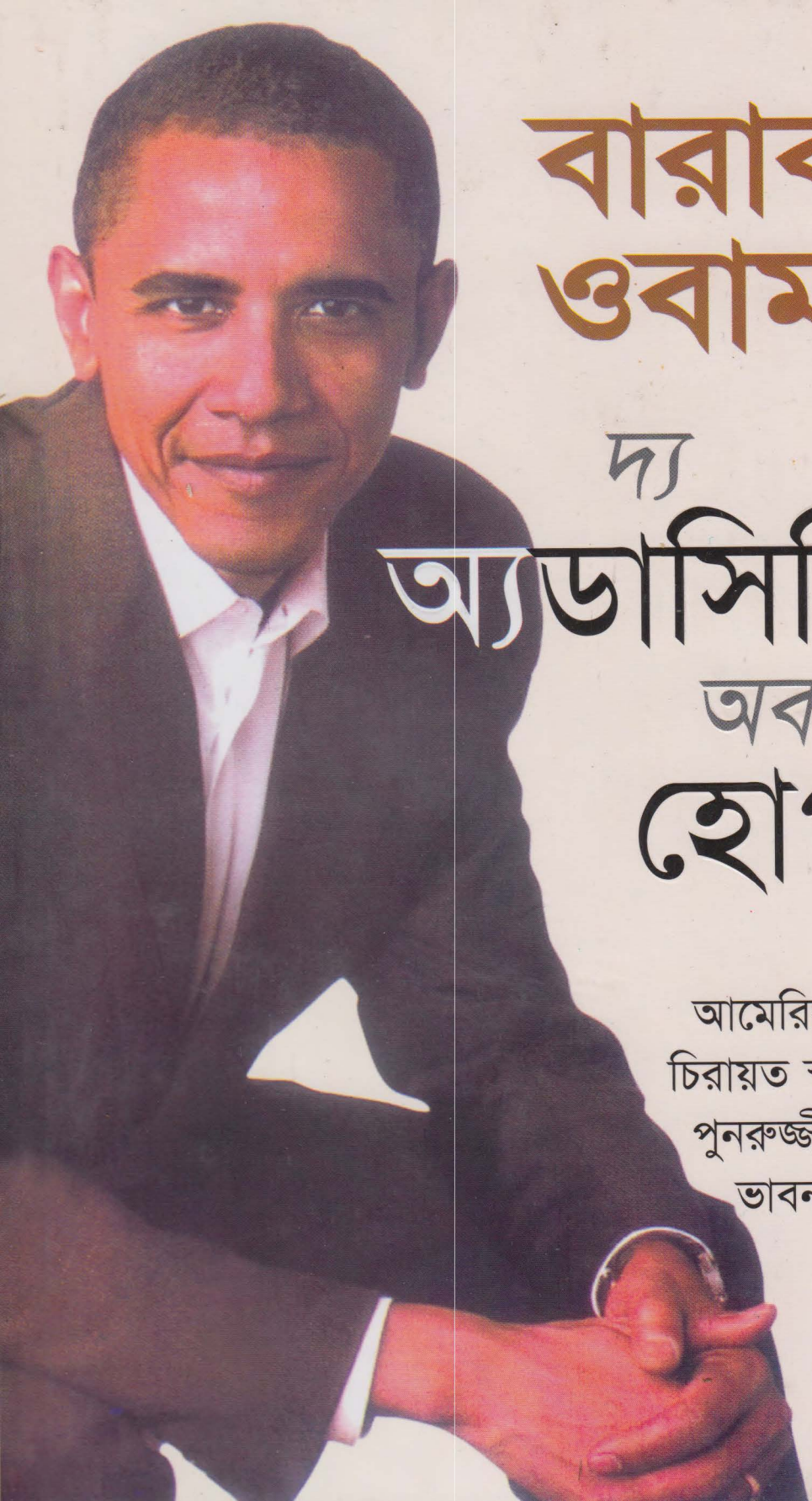

বারাক ওবামা

দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ

আমেরিকার
চিরায়ত স্বপ্নের
পুনরুজ্জীবন
ভাবনা

বারাক ওবামা

দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ

www.pathagar.com

দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ

আমেরিকার চিরায়ত স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন ভাবনা

বারাক ওবামা

www.amarboi.org

অঙ্কুর প্রকাশনী

www.pathagar.com

অনুবাদ
মাসুমুর রহমান খলিলী
মাসুম বিল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৬, বারাক ওবামা
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব © অঙ্কুর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬, ক্রাউন পাবলিশিং গ্রুপ, র‍্যানডম হাউস
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ: ২০০৮, অঙ্কুর প্রকাশনী
দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০১৩

ডিজাইন : লরেন ডং

প্রকাশক : অঙ্কুর প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯
web : www.ankur-prakashani.com

মুদ্রণ : ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস, ২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

THE AUDACITY OF HOPE by BARACK OBAMA

Copyright © 2006 by Barack Obama
Bengali version copyright © Ankur Prakashani, Bangladesh
Published by Crown Publishing Group, Random House
Design by Lauren Dong

ISBN : 984 464 223 X

মূল্য : ৪৪০.০০ টাকা

www.pathagar.com

বেড়ে উঠতে উঠতে আমি পেয়েছি দুই করুণাময়ীকে

মাতামহী টুটু, মহাশক্তিময়ী
আমার জীবনে সুস্থিত অবস্থা সম্ভব করেছেন তিনি।

আর, আমার মা
তার ভালবাসা ও মমতা
আমার সকল শক্তি ও স্বপ্নের উৎস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৯

অধ্যায় এক : রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট ১৮

অধ্যায় দুই : মূল্যবোধ ৪০

অধ্যায় তিন : আমাদের সংবিধান ৫৮

অধ্যায় চার : রাজনীতি ৮৩

অধ্যায় পাঁচ : সুযোগ ১১৩

অধ্যায় ছয় : বিশ্বাস ১৫৫

অধ্যায় সাত : বর্ণ ১৮১

অধ্যায় আট : আমাদের সীমানার বাইরের বিশ্ব ২১৩

অধ্যায় নয় : পরিবার ২৫৮

উপসংহার ২৮২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২৯১

বারাক ওবামা ও দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ ২৯৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

আমি প্রথম নির্বাচনে অংশ নেয়ার পর প্রায় দশটি বছর পেরিয়ে গেছে। সে সময় আমার বয়স ছিল পয়ত্রিশ বছর। ল' স্কুল ছেড়েছি চার বছর আগে। অল্প দিন আগে বিয়ে করেছি। তাই জীবন নিয়েও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি কিছুটা। এসময় ইলিনয় রাজ্যসভায় একটি আসন শূন্য হয়। বেশ ক'জন বন্ধু আমাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেয়। একজন নাগরিক অধিকার আইনজীবী হিসেবে আমার কাজ এবং কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে জনগণের সাথে আমার যোগাযোগের কথা ভেবে এই পরামর্শ দেয় তারা। আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নেমে পড়ি নির্বাচনে। একজন নতুন প্রার্থী প্রথম যা করে আমিও সেসব কাজ শুরু করি। শ্রোতা পেলেই তাকে শোনাই আমার নির্বাচনে দাঁড়ানোর কারণ। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাবের বৈঠক ও চার্চের সামাজিক অনুষ্ঠানে যাই। বিউটিশপ থেকে শুরু করে বারবারশপ পর্যন্ত– কোন কিছুই বাদ থাকে না আমার গন্তব্যের তালিকা থেকে। রাস্তার ওপারেও যদি দু'ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে দেখি, তখনই গিয়ে তাদের হাতে ধরিয়ে দেই আমার প্রচারপত্র। আমি যেখানেই গিয়েছি, নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে।

'তোমার এই মজার নামটি কোথায় পেলে?'। আর অন্য প্রশ্নটি হলো, 'তোমাকে বেশ ভালো মানুষ মনে হয়। তুমি কেন রাজনীতির মতো নোংরা ও জঘন্য কিছুর সাথে জড়িয়েছো?'

এই প্রশ্নগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম আমি। কয়েক বছর আগে প্রথম আমি যখন শিকাগোর গরীব মানুষগুলোর সাথে কাজ করতে আসি তখনও একই ধরনের প্রশ্ন করা হতো আমাকে। কেবল রাজনীতি নয়, রাজনীতিবিদদের সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মনে এক ধরনের হতাশা ফুটে উঠে এসব প্রশ্নের মধ্যে। এই হতাশা রয়েছে অন্তত শহরের দক্ষিণ অংশের মানুষের মনে– যে অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করার প্রচেষ্টায় নেমেছি আমি। এসব প্রশ্নে জবাবে আমি হাসি মুখে তাদেরকে সম্মান জানাই মাথা নুইয়ে। আর বলি, রাজনীতির এই নৈরাশ্যকর দিক সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু

www.pathagar.com

রাজনীতির একটি ঐতিহ্যও রয়েছে। এ দেশের জন্মলগ্ন থেকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের গৌরব পর্যন্ত বিস্তৃত এ ঐতিহ্য। পরস্পরের প্রতি আমাদের দায় রয়েছে– এই সাধারণ চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সে ঐতিহ্য। যা আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে রেখেছে ঐক্যবদ্ধ। বেশীরভাগ মানুষ এই চেতনায় বিশ্বাসী। এই চেতনা মনে লালন করে কাজ করলেও হয়তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, কিন্তু অর্থবহ কিছু অবশ্যই করতে সক্ষম হবো আমরা।

মানুষকে বোঝাতে, এই কথা বেশ কাজ দেয় বলে আমি ভাবি। তবে আমার কথা শুনে সবাই যেভাবে মুগ্ধ হচ্ছে; ইলিনয় রাজ্যসভায় গিয়েও আমার এরকম সচেতন ও তারুণ্যদীপ্ত বক্তব্য দেয়া উচিত বলে তারা মনে করে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

ছয় বছর পর আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট নির্বাচনের প্রচারণায় নামি তখন কিন্তু জয়ের ব্যাপারে ততটা নিশ্চিত ছিলাম না। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আমার ক্যারিয়ার নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আমার দুই মেয়াদের মধ্যেই ডেমোক্র্যাটরা রাজ্য সিনেটের নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে আমি অনেকগুলো বিল পাস করাই। ইলিনয়ের মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থার সংস্কার থেকে শুরু করে শিশুদের জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসুচির সম্প্রসারণ পর্যন্ত ছিল এসব বিলের মধ্যে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজও চালিয়ে যাই আমি। এই কাজটি আমি বেশ উপভোগ করি। বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণও পেতাম প্রচুর। আমার স্বকীয়তা, আমার ভালো নাম এবং আমার দাম্পত্য জীবন– এগুলো আমি রক্ষা করে চলেছি। তবে সত্যিকার অর্থে বলতে কি আমার ক্যাপিটল হিলে পা রাখা, এর সবকিছুকেই ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়।

এই বছরগুলোতে কিছু মূল্যও দিতে হয় আমাকে। এর মধ্যে আছে বয়স বেড়ে যাওয়ার মতো স্বাভাবিক কিছু বিষয়। আপনি সচেতন থাকলেও আপনার শারীরিক সমস্যাগুলো ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকবে; চোখের জ্যোতি কমে আসবে; স্মৃতিভ্রম দেখা দেবে– সময়ের সাথে সাথে সমস্যাগুলো আরো তীব্র হতে থাকবে। আমি যে সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছি তা হলো ক্রমাগত বিশ্রামহীন জীবন। আর, কোন জিনিস যতই ভালো হোক, তার প্রশংসা করতে না পারা। এটা আধুনিক জীবনের একটি রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আমেরিকান চরিত্রেরও একটি রোগ। যদিও রাজনীতি ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে এই রোগের প্রকাশ ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। রাজনীতি একে উৎসাহিত করে; নাকি যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়– এটা স্পষ্ট নয়। বলা হয়, প্রত্যেক পুরুষ হয় তার পিতার প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টা করে, নতুবা পিতার ভুলগুলো শুধরানোর চেষ্টা চালায়। এই প্রবাদ দিয়ে আমার কিছু বাতিক অথবা চরিত্রের কিছু দিক ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে করি আমি।

আমার এই বিশ্রামহীন স্বভাবের কারণে ২০০০ সালের নির্বাচনী মওসুমে আমি

www.pathagar.com

কংগ্রেসের একটি আসনে আমার এক ডেমোক্র্যাট সহকর্মীকেই চ্যালেঞ্জ করে বসি। ওই সহকর্মী তখন ওই আসনের বিদায়ী সদস্য। আমার ওই সিদ্ধান্তটি সুবিবেচকের মতো হয়নি। ফলে অত্যন্ত খারাপভাবে হেরে যাই আমি। এরপর আমার জীবন যেন আর পরিকল্পনা মতো চলছিলো না। এ ঘটনা থেকে সে শিক্ষা পাই আমি। পরের দেড় বছরে এই পরাজয়ের ক্ষত অনেকটাই শুকিয়ে আসে। এরই মাঝে একদিন এক মিডিয়া কনসালটেন্টের সঙ্গে দুপুরের খাবার গ্রহণ করি আমি। একসময় আমাকে রাজ্যসভায় নির্বাচনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই লোক। ওটা ছিল, ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কোন একদিনের ঘটনা।

'রাজনীতির গতি যে বদলে গেছে, তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?' মুখে খাবার নিতে নিতে আমাকে বললেন তিনি।

'মানে?' তিনি কি বলতে চান তা জেনেও আমি প্রশ্ন করি। আমরা দুজনেই তাকাই তার পাশে রাখা পত্রিকাটির দিকে। এর প্রথম পাতায় ছাপানো ওসামা বিন লাদেনের বড় একটি ছবি।

'গোল্লায় যাক, সে।' মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে বললেন। 'সত্যিই দুর্ভাগ্য। আপনার নামটি বদলাতে পারবেন না আপনি। ভোটাররা এখন এরকম কিছু হলেই সন্দিহান হয়ে ওঠে। তবে আপনি যদি সবে মাত্র ক্যারিয়ার শুরু করতেন, তাহলে হয়তো নতুন কোন ডাক নাম বা এমন কিছু নিয়ে শুরু করা যেতো। কিন্তু এখন...' তার গলা থেমে যায়।

আমার মনে হলো ঠিক কথাই বলেছেন তিনি। এই উপলব্ধি আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। আমি যেখানে ব্যর্থ সেখানে তরুণ রাজনীতিকরা সাফল্যের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে দেখে এই প্রথম কিছুটা হিংসা অনুভব করি মনে। সাধারণ কাজের ভীড়ে রাজনীতির আনন্দটি ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে আসছিল। আমার বেছে নেয়া পথটিতে আবার ফিরবো কিনা তা নিয়েই একসময় সন্দিহান হয়ে উঠি আমি।

প্রত্যাখ্যান, ক্ষোভ, হতাশা– এর সবগুলো স্তর পার হয়েছি কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও একসময় আমি আমার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেই। মৃত্যুকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, এটাও ঠিক তেমনি। আমি রাজ্য সিনেটে আমার কাজগুলোর দিকে তাকাই। সেখানে আমার অবস্থান থেকে যে সংস্কার ও উদ্যোগগুলো আমি নিয়েছিলাম তাতে সন্তুষ্ট হই। নির্বাচনে হারার পর আরো বেশী সময় বাড়িতে কাটাতে থাকি। মেয়েদের বেড়ে ওঠা ও স্ত্রীর আকাঙ্খাগুলো পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আমার দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক বাধ্যবাধকতা নিয়েও ভাবতে থাকি। ব্যায়াম করে, বই পড়ে অনেকটা অলসভাবে কেটে যায় আমার সময়। কিন্তু এই নিরুদ্বিগ্ন জীবনের ফাঁকেও যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি আমি। মনে মনে কৌশল গুছিয়ে একদিন আমার পরিকল্পনার কথা যখন স্ত্রীকে বললাম, সে যতটা না আশ্বস্ত হলো তার চেয়ে বেশী করুণার দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। শেষ বারের মতো আমাকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুমতি দিতে রাজি হলেও জানিয়ে দিলো আমাদের পরিবারের জন্য

www.pathagar.com

একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনই তার পছন্দ। আর, আমি যেন তার ভোটটি আমার ভাগে না ধরি।

নির্বাচনে আমার যেসব অসুবিধা রয়েছে সেগুলো বলি তাকে। আমার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী পিটার ফিটজেরাল্ড আগেরবার নির্বাচনে এক কোটি ৯০ লাখ ডলারের ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করেন। তিনি সিনেটর ক্যারল মোসলি ব্রাউনকে হারান। পিটার তেমন জনপ্রিয় নন। রাজনীতিও তেমন উপভোগ করেন না তিনি। তবে এরপরও তার পরিবারের হাতে খরচ করার মতো অঢেল অর্থ রয়ে গেছে। আর তার সত্যিকার সততার জন্যও ভোটাররা তাকে সম্মান করে।

ক্যারল নিউজিল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কয়েক বছর কাটিয়ে এ সময় দেশে ফিরেছেন। তিনিও নিজের পুরনো আসনটি পুনরুদ্ধারের কথা ভাবতে পারেন। তার সম্ভাব্য প্রার্থীতার কথা মাথায় রেখে আমি নতুন করে পরিকল্পনা সাজাই। ক্যারল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন বলে জানানোর পর তার দিক থেকে সবার নজর ঘুরে যায়। এরই মধ্যে ফিটজেরাল্ডও জানিয়ে দেন তিনি আর নির্বাচন করবেন না। তাই আমি এবার তাকালাম প্রাইমারিতে আমার ৬ প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। এখনো দায়িত্বে থাকা স্টেট কম্পট্রোলার রয়েছেন এদের মধ্যে। এই লোকটি একজন ব্যবসায়ী এবং শত কোটি ডলারের মালিক। আরো আছেন শিকাগোর মেয়র রিচার্ড ডালির সাবেক চিফ অফ স্টাফ এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ডাক্তার। প্রাইমারিতে আমার প্রথম স্থানটি দখল করার যাও সম্ভাবনা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারের কারণে কালো ভোট ভাগ হয়ে গেলে সে সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি কাউকে আমল দিলাম না। বেশ কিছু দিক থেকে সমর্থন পাওয়ায় আমার প্রত্যয় অনেক বেড়ে যায় এবং আমি নতুন উদ্যম ও শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ি। আগে ভেবেছিলাম এই উদ্যমটুকু আমি হারিয়ে ফেলেছি। চারজন স্টাফ নিয়োগ করি আমি। এরা সবাই স্মার্ট এবং বয়স বিশ থেকে ত্রিশ এর মধ্যে। এদের পেছনে আমার খরচ তেমন বেশি ছিল না। আমরা টেলিফোন, কমপিউটারের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে একটি অফিসও সাজাই। ডেমোক্র্যাট দলের বড় বড় ডোনারদের সাথে সাক্ষাতের পেছনে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ব্যয় করতে শুরু করি আমি। এসব সাক্ষাত থেকে যেন ফল পাওয়া যায় সে চেষ্টা চলিয়ে যাই। আমি সংবাদ সমম্মেলনের আয়োজন করি। কিন্তু, তাতে কেউ আসলো না। আমরা বার্ষিক 'সেন্ট প্যাট্রিকস ডে প্যারেডে' অংশ নেয়ার জন্য নাম লেখাই এবং স্থান পাই প্যারেডের একেবারে শেষ ভাগে। ফলে দশজন স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে আমরা যখন প্যারেডে যোগ দেই তখন আমাদের পেছনে ছিল কেবল শহরের পরিচ্ছন্নতা গাড়ি। দর্শকদের প্রায় সবাই বাড়ির পথ ধরেছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মীরাও রাস্তা পরিস্কার করতে লেগে গিয়েছে ইতোমধ্যে।

নির্বাচনী প্রচারণার বেশীর ভাগ আমি একাই চালিয়ে যাই। শিকাগোর ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে একাই যাওয়া আসা শুরু করি। এরপর এক কাউন্টি থেকে অন্য কাউন্টি, এক শহর থেকে অন্য শহর, রাজ্যের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত মাইলের পর মাইল

www.pathagar.com

শস্যক্ষেত এবং বন্ধুর এলাকা চষে বেড়াই। নির্বাচনী প্রচারণার দক্ষ কোন কৌশল নয় এটা। রাজ্য ডেমোক্র্যাট দলের কার্যকর কোন সহায়তা, চিঠি পাঠানোর জন্য ভোটারদের কোন তালিকা বা ইন্টারনেট অপারেশন ছাড়াই প্রচারণা চালাতে থাকি আমি। এ জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে বন্ধু বা স্বল্প পরিচিত লোকজনের ওপর। তাদের বাড়িতে আশপাশের লোকজনকে নিয়ে বৈঠক করা অথবা তাদের গীর্জা, ইউনিয়ন হল, খেলার কোন দল, রোটারি ক্লাব– এসব জায়গায় সমাবেশ আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হয় আমাকে। এমনও হয়েছে, কোন সমাবেশে কথা বলার আশায় বেশ কয়েক ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে গিয়ে দেখি খাবার টেবিলে তিন-চার জন লোক আমার অপেক্ষায় বসে আছে। এরপরও মেজবানকে আমার বলতে হয়েছে, উপস্থিতি বেশ ভালই। তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আপ্যায়নে যোগ দেয়া ছাড়া আমার আর করার কিছু করার ছিল না। কখনো কোন গীর্জার সমাবেশে কথা বলবো বলে বসে আছি, কিন্তু পাদ্রী আমার কথা সমবেতদের বলতে ভুলেই গেলেন। আবার এমনও হয়েছে যে, স্থানীয় কোন ইউনিয়ন নেতা এমন এক সময় আমাকে কথা বলার সুযোগ দিলেন, যখন আমার বক্তব্যের পরপরই আরেক প্রার্থীর প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু, আমি যেখানেই মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছি, তারা দু'জনই হোক বা হোক পঞ্চাশ জন; ধনীর কোন প্রাসাদ হোক অথবা গরিবের কোন কুটির; মানুষগুলো বন্ধুভাবাপন্ন বা উদাসীন যাই হোন না কেন, এমনকি শত্রুভাবাপন্ন হলেও আমি নিজের মুখ বন্ধ রেখে কেবল তাদের কথা শোনার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। আমি মানুষের চাকরির কথা শুনেছি, শুনেছি প্রেসিডেন্ট বুশ বা ডেমোক্র্যাটদের প্রতি তাদের ক্ষোভের কথা। আমাকে শুনতে হয়েছে অনেকের পোষা কুকুরের কাহিনী, যুদ্ধে যাওয়ার কথা, এমনকি তাদের মনে পড়ে যাওয়া ছোটবেলার কোন গল্প। তাদের অনেকেই শিল্পখাতে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে আসা বা স্বাস্থ্যসেবার অত্যদিক ব্যয় নিয়ে নিজ নিজ তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। অনেকে আবার কোন কবিতা আবৃত্তি করেও শুনিয়েছেন। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই নিজের কাজ বা তাদের সন্তানদের নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে রাজনীতির প্রতি মনযোগ দেয়ার সময় তাদের নেই। এর বদলে তারা নিজেদের আশপাশের কোন ঘটনার কথা বলতেই বেশী আগ্রহী। কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়া, কোন প্রমোশনের বিষয়, উচ্চ হারের কোন বিল, নার্সিং হোমে কারো ভর্তি হওয়া, অথবা কোন শিশু প্রথম হাটতে শিখেছে এসব।

মাসের পর মাস এসব কথা বার্তা থেকে সুনির্দিষ্ট কোন উপলব্ধি হয়নি আমার। তবে একটি জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম। আর তাহলো, মানুষগুলোর স্বপ্নের সীমানা কতটা ক্ষুদ্র। বর্ণ, অঞ্চল, ধর্ম ও শ্রেণী– সবক্ষেত্রেই তাদের একই রকম বিশ্বাসের ব্যাপ্তি। তাদের সবার বিশ্বাস, কেউ কাজ করতে চাইলে নিশ্চিতভাবেই সে জীবন ধারণের মতো পর্যাপ্ত অর্থ লাভের মতো কাজ খুঁজে নিতে পারে। প্রতিটি শিশুর সত্যিকার সুশিক্ষা পাওয়া উচিত বলে মনে করে তারা। তারা মনে করে পিতা-মাতার সাধ্য নেই

www.pathagar.com

বলে কোন সন্তানের কলেজে যাওয়া ঠেকে থাকা উচিত নয়। তারা অপরাধী ও সন্ত্রাসী থেকে নিরাপদে থাকতে চান। শুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ পানি এবং নিজের সন্তানদের সাথে আরো বেশী করে সময় কাটাতে চান তারা। আর চান, যখন বুড়িয়ে যাবেন তখন যেন মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সাথে অবসর জীবনটি তারা কাটাতে পারেন।

তাদের এই চাওয়ার বিস্তৃতি কিন্তু বেশী নয়। তারা জানেন নিজের চেষ্টাতেই জীবনের অর্জনটুকু আদায় করে নিতে হবে তাদেরকে। সরকার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, এটা তারা আশা করেন না। পাশাপাশি, তাদের করের টাকা সরকার অপচয় করুক এটাও তারা চায় না।

আমি তাদের বলেছি যে, তাদের কথাই ঠিক : সরকার সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে না। কিন্তু, আমরা যদি অগ্রাধিকার ঠিক করার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতে পারি, তাহলে হয়তো প্রতিটি শিশু জীবনে গড়ে ওঠার জন্য আরো বেশী সুযোগ পাবে। ফলে এই জাতির চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার মতো যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে সেই শিশু। আমার এই কথার সাথে দ্বিমত করে না তাদের কেউ। বরং এ কাজে তারা কিভাবে অংশ নেবেন, সে কথা জানতে চান। এসব কথা বলে আমি আবার গড়িতে চড়ে বসেছি– চলেছি আমার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে। ওই অঞ্চলের একটি খোলা মানচিত্র আমার কোলের ওপর। আমাকে কেন রাজনীতিতে জড়াতে হবে, আমি আবার জানলাম।

আমি এমন পরিশ্রম শুরু করি, যা জীবনে কখনো করিনি।

আমার নির্বাচনী প্রচারণাকালে মানুষের সাথে কথোপকথন থেকেই এই বইটি লেখার চিন্তা মাথায় আসে। ভোটারদের সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে আমেরিকান জনগণের মৌলিক শিষ্টাচারের পরিচয় আমি পেয়েছি। পাশাপাশি তারা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকান অভিজ্ঞতার মূলে আছে একগুচ্ছ আদর্শ। যা আমাদের সম্মিলিত সচেতনতাকে লালন করে চলেছে; নানা মতভেদ সত্ত্বেও একগুচ্ছ মূল্যবোধ আমাদেরকে বেধে রেখেছে একটি বন্ধনে; গণতন্ত্র নিয়ে অভাবনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও একটি আশার স্রোত বহমান আমাদের মধ্যে। সুবিশাল পাহাড়ের মার্বেল মসৃণ গা দেখে অথবা ইতিহাসের বই পড়ে এই মূল্যবোধ ও আদর্শের সাক্ষাত পাওয়া যায় না। আমেরিকানদের হৃদয়-মনেই বেঁচে আছে এই আদর্শ ও মূল্যবোধ– এটাই আত্মতৃপ্তি লাভ, দায়িত্ব এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের।

এভাবে বলা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়, এটা আমি স্বীকার করি। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির অশল্পনীয় দ্রুত পরিবর্তন, গলাকাটা রাজনীতি এবং অবিরাম সাংস্কৃতিক যুদ্ধের মধ্যে এমন কোন অভিন্ন ভাষা আমাদের কাছে নেই, যার মাধ্যমে এই আদর্শগুলো আলোচনা করা যায়। এই আদর্শ বাস্তবায়নে আমারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো, এমন একটি ঐক্যমত্যে পৌছার মতো উপকরণ আমাদের হাতে আছে আরো কম। বিজ্ঞাপন

www.pathagar.com

নির্মাতা, জরিপকারী, বক্তৃতা লেখক ও পন্ডিতদের সম্পর্কে আমরা বেশ ভালোভাবেই অবহিত। কাউকে নেতিবাচক রূপে চিহ্নিত করতে কিভাবে তীব্র বাক্যবান ছুড়তে হয়, তা আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি। ক্ষমতা, কায়েমী স্বার্থ, লোভ বা অসহিষ্ণুতা কিভাবে কোন সদিচ্ছাকে দমিয়ে দেয়, সেটাও জানি আমরা। এমনকি হাইস্কুলের একটি ইতিহাস বই পড়লেও বুঝা যায়, বর্তমান আমেরিকান জীবন তার আদি ঐতিহ্য থেকে কতটা দূরে সরে গেছে। আজকের পরিবেশে আদর্শের বিনিময় ও অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর জোর দেয়াকে অর্বাচীনের কাজ বলেও মনে হতে পারে।

আমরা যা বলতে চাই তা হলো, আমাদের কোন পছন্দ নেই। মৃত্যুপুরিতে পরিণত হওয়া বর্তমান রাজনীতি নিয়ে রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাট, স্বতন্ত্র নির্বিশেষে অধিকাংশ আমেরিকান যে ক্লান্ত, তা বোঝার জন্য কোন জরিপ চালানোর প্রয়োজন নেই। যেখানে, সুবিধা আদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ। যেখানে নিরংকুশ সত্যের নিজস্ব সংস্করণ চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত আদর্শবাদী সংখ্যালঘুরা। ধর্মভীরু কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ, কালো, সাদা বা বাদামী– আমরা সত্যিকারভাবেই মনে করি, জাতির সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জটি উপেক্ষা করা হচ্ছে আজ। আমরা শীঘ্রই আমাদের চলার দিক না বদলালে হয়তো ভবিষ্যতের একটি দুর্বল ও পঙ্গু আমেরিকা সৃষ্টির পথে আমরাই হবো প্রথম প্রজন্ম। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে কোন সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে, আমাদের একটি নতুন ধারার রাজনীতি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। এটা হবে সেই রাজনীতি যা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং আমেরিকান হিসেবে আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে টেনে নিয়ে যাবে সামনের দিকে।

এই হলো এই বইয়ের বিষয়বস্তু : আমরা কিভাবে আমাদের রাজনীতি ও আমাদের নাগরিক জীবনের এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটাতে পারি। আমি বলছি না যে, ঠিক কিভাবে এটা শুরু করতে হবে তা আমি জানি। আমি তা জানি না। কিন্তু প্রতিটি অধ্যায়েই আমি সেসব নীতি চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যা সবেচেয়ে বেশী পীড়ন দিচ্ছে আমাদের। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য যে পথটি অনুসরণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে তার একটি বৃহৎ রূপরেখা তুলে ধরেছি আমি। এসব ইস্যুতে আমার বক্তব্য আংশিক ও অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে। আমেরিকান সরকারের ব্যাপারে আমি কোন সামগ্রিক তত্ত্ব হাজির করিনি। ছক ও লেখচিত্রে ভরা, সময়সীমা বেধে দিয়ে ও দশ দফা পরিকল্পনার মতো কোন কর্মসূচির ইশতেহারও নয় এই বই।

এর বদলে আমি কেবল নিজের ওপর সেসব মূল্যবোধ ও আদর্শের যে প্রতিফলন ঘটেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যা আমাকে রাজনীতির ময়দানে টেনে এনেছে। আমি বলার চেষ্টা করেছি, আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে আমাদের বিভক্ত করে ফেলছে। একজন সিনেটর ও আইনজীবী, একজন স্বামী ও পিতা, ধর্মবিশ্বাসী এবং সংশয়বাদী হিসেবে আমার নিজস্ব সর্বোত্তম মূল্যায়ন হলো, একটি অভিন্ন কল্যাণের জন্য আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করতে হবে।

এই বইটি কিভাবে সাজিয়েছি, সে সম্পর্কে আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলছি। প্রথম

www.pathagar.com

অধ্যায়ে আমাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি এবং আজকের তিক্ত দলাদলির সূত্রপাত কোথা থেকে– তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি সেসব অভিন্ন মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করেছি, যা একটি নতুন ঐকমত্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, আমাদের সংবিধান কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের একটি উৎস নয়, এটা আমাদের সম্মিলিত ভবিষ্যতকে ঘিরে একটি গণতান্ত্রিক আলোচনা সংগঠনের উপায়ও বটে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, অর্থ, সংবাদ মাধ্যম, ইন্টারেস্ট গ্রুপ এবং আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মতো কিছু প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সবচেয়ে আন্তরিক রাজনীতিবিদকেও দমিয়ে রাখে। এর পরের পাঁচটি অধ্যায়ে আমাদের গুরুতর সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলার জন্য আমরা আমাদের বিভক্তিগুলো কিভাবে কটিয়ে উঠতে পারি তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বহু আমেরিকান পরিবারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা, রাষ্ট্রের মধ্যে বর্ণবাদি ও ধর্মীয় উত্তেজনা এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে শুরু করে রোগের প্রাদুর্ভাব পর্যন্ত আন্ত:জাতীয় হুমকি– যেগুলো কড়া নাড়ছে আমাদের দেশের দোরগোড়ায়।

আমার সন্দেহ, এসব ইস্যুতে আমার বক্তব্যের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব রয়েছে বলে ভাবতে পারেন কিছু পাঠক। এই অভিযোগ উঠলে আমি নিজেকে দোষী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে প্রস্তুত। আমি একজন ডেমোক্র্যাট। তাই আমার বক্তব্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের চেয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় লেখার সাথে অনেক বেশী মিলবে। সাধারণ আমেরিকানের চেয়ে ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষগুলোকে অব্যাহতভাবে তোষণ করে চলেছে এমন রাজনীতির প্রতি আমি বিক্ষুব্ধ। সুযোগ সবার জন্য অবারিত করার জন্য সরকারের যে একটি ভূমিকা রয়েছে তার ওপর আমি জোর দেই। উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং বৈশ্বিক উষ্ণতায় বিশ্বাস করি আমি। রাজনৈতিকভাবে ঠিক হোক বা না হোক আমি বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কারো ধর্মীয় বিশ্বাস, এমনকি আমার নিজেরটি হলেও তা অবিশ্বাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য সরকারকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমি। সর্বোপরি আমি নিজের জীবনী দ্বারা অবরুদ্ধ। তাই আমি, একটি মিশ্র ঐতিহ্য লালনকারী কালো মানুষের চোখ দিয়ে আমেরিকান অভিজ্ঞতাকে না দেখে পারি না।

আমি আরো মনে করি যে, আমার দলটি মাঝে মধ্যে আত্মতৃপ্ত, নির্লিপ্ত এবং অযৌক্তিক হয়ে যায়। আমি মুক্তবাজার, প্রতিযোগিতা, উদ্যোগ গ্রহণে বিশ্বাস করি। ক্ষুদ্র কোন সরকারি কর্মসূচিও যেমনটা প্রচার করা হয় তেমন কাজ করে বলে আমি মনে করি না। আমি চাই কম আইনজীবী এবং অধিকসংখ্যক প্রকৌশলীর দেশ হোক এটা। আমেরিকা এই বিশ্বের জন্য যতটা না ক্ষতিকর, তারচেয়ে বেশী শুভ শক্তি হবে কামনা করি আমি। আমাদের শত্রুর ব্যাপারে তেমন কোন মোহ নেই আমার। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাহস ও যোগ্যতার প্রতি আমার যথেষ্ঠ শ্রদ্ধা রয়েছে। বর্ণ পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, যৌন কেন্দ্রিক রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করি আমি। আমি মনে করি, কালোদের

www.pathagar.com

এলাকাগুলো যে কারণে অসুস্থ হয়ে আছে তার পেছনে বড় কারণ সাংস্কৃতিক ভাঙ্গন। কেবল অর্থ দিয়ে এই অসুস্থতা নিরাময় সম্ভব নয়। আমাদের মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক জীবন, আমাদের স্থূল দেশজ উৎপাদন–জিডিপি'র মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

নি:সন্দেহে, এসব দৃষ্টিভঙ্গী কতকগুলো সমস্যায় ফেলবে আমাকে। জাতীয় রাজনীতির দৃশ্যপটে আমি অনেকটাই নবীন। আমি একটি দৃশ্যহীন পর্দার মতো, নানা মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ এবং তাদের নিজস্ব অভিমতের প্রতিফলন ঘটিয়েছি এখানে। তাই, সব না হলেও তাদের কাউকে কাউকে হতাশ করবো আমি। যা এই বইয়ের দ্বিতীয় এবং অধিকতর ইংগিতপূর্ণ বিষয়। যেমন, আমি বা রাজনৈতিক অঙ্গনে আমার মতো অন্য কোন মানুষ কিভাবে খ্যাতির বিড়ম্বনা, পরিতুষ্ট হওয়ার মোহ, কিছু হারানোর ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে এবং এর ফলে প্রত্যেকের অন্তর থেকে উৎসরিত যে আহবান আমাদের গভীরতম অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেয় সত্যের সেই মর্মটি ধরে রাখতে পারে।

সম্প্রতি, আমি অফিসে যাওয়ার সময় ক্যাপিটল হিলের একজন রিপোর্টার আমার পথ আগলে দাঁড়ান। তিনি জানান, আমার প্রথম বইটি নাকি তার বেশ ভালো লেগেছে। তিনি বলেন, 'আমি বেশ অবাক হয়েছি।' 'পরের যে বইটা আপনি লিখছেন সেটাও যেন আগেরটার মতো ভালো হয়।' তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হলো, আপনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর। এবার দেখি কতটা সৎ থাকতে পারেন আপনি।

মাঝে মধ্যে অবাক হই আমিও। এই বই সেসব প্রশ্নের জবাব দেবে বলে আমার আশা।

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট

www.amarboi.org

বেশিরভাগ দিন আমি ক্যাপিটলে (ক্যাপিটল হিল) প্রবেশ করি ভূগর্ভস্থ পথে। হার্ট ভবনে আমার অফিস। সেখান থেকে একটি ছোট্ট পাতাল রেল আমাকে পৌঁছে দেয় ক্যাপিটল ভবনে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের পতাকা ও রাজ্যপ্রতীক দিয়ে সাজানো পাতাল রেলপথের দু'ধার। ট্রেন থেকে নেমে খানিকটা পথ হাঁটতেও হয়। এখানে কর্মব্যস্ত সরকারি কর্মচারী, রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী এবং দর্শনার্থীদের পেরিয়ে আমাকে পৌঁছাতে হয় পুরনো আমলের এলিভেটরের সামনে। ভবনের তৃতীয় তলায় এলিভেটর থেকে নামলেই বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার এক দল সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান চোখে পড়বে। তাদের প্রায়ই এখানে আড্ডা দিতে দেখা যায়। সৌজন্য বিনিময় হয় কারো কারো সাথে। অবশেষে ক্যাপিটল পুলিশের সৌজন্যের জবাব দিয়ে একজোড়া দৃষ্টিনন্দন ফটক পেরিয়ে পা রাখি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট ভবনের মেঝেতে।

ক্যাপিটলে সিনেট কক্ষটি সবচেয়ে সুন্দর জায়গা এমন কথা কেউ বলবে না। কিন্তু এখানে আসা প্রতিটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় এর লুকায়িত সৌন্দর্যে। রেশমের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা নীল রঙের কাপড়ে মোড়া প্যানেল বসানো পিঙ্গল বর্ণের দেয়াল। নিখুঁতভাবে পলিশ করা মার্বেলের কলাম। মাথার ওপর ঝুলে আছে 'ক্রিম-হোয়াইট' বর্ণের ডিম্বাকার ছাদ। এক কোণায় উৎকীর্ণ আমেরিকান ঈগলের একটি ছবি। দর্শনার্থী গ্যালারির ওপরে সাজানো দেশটির প্রথম বিশজন ভাইস প্রেসিডেন্টের আবক্ষ মূর্তি কক্ষের ভাবগাম্ভীর্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভবনের দেয়াল থেকে শুরু করে ঘোড়ার খুরের আকৃতিতে চারটি সারিতে সিনেটরদের ডেস্কগুলো সাজানো। মেহগনি কাঠের তৈরি এসব ডেস্কের অনেকগুলোই সেই ১৮১৯ সাল থেকে আছে এখানে। প্রতিটি ডেস্কের কোণায় একসময় কালির

www.pathagar.com

দোয়াত ও পালকের কলম রাখা হতো। সেই জায়গাটুকু এখনো পরিপাটি করে সাজানো। প্রতিটি ডেস্কের দেরাজের গায়ে লেখা আছে সিনেটরদের নাম– টাফট ও লং, স্টেনিস ও কেনেডি– যারা একসময় ব্যবহার করেছিলেন এই দেরাজ। এসব নাম দেরাজ ব্যবহারকারী সিনেটরের নিজ হাতে লেখা। এখানে দাঁড়িয়ে আমি কল্পনায় শুনতে পাই, এসব দেরাজ ব্যবহারকারী পল ডগলাস বা হুবার্ট হামফ্রে যেন সেই দরাজ কণ্ঠে আবার নাগরিক অধিকার আইন প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছেন; অথবা কয়েকটি ডেস্কের ওপারে যেন সিনেটরদের নামের তালিকার ওপর দিয়ে চলছে জো ম্যাকার্থির হাতের আঙুল; অথবা লিন্ডন বেইনস জনসন, কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে না যায় সে জন্য গায়ের পোশাক হাতে ধরে ছুটোছুটি করে সিনেটরদের ভোট সংগ্রহ করছেন। একসময় ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার বসতেন, সেই ডেস্কের সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াই কখনো কখনো। ঘরভরতি দর্শক ও সিনেটরদের সামনে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ও ইউনিয়নের পক্ষে তার জ্বালাময়ী কণ্ঠের বক্তৃতা আজো আমি কল্পনায় শুনতে পাই।

কিন্তু এসব মুহূর্ত দ্রুত বিবর্ণ হয়ে আসে। এখন ভোট দেয়ার জন্য কয়েক মিনিট ছাড়া আমি ও আমার সহকর্মীরা খুব বেশি সময় আর সিনেট কক্ষে কাটাই না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, সংশি-ষ্ট কমিটির চেয়ারম্যান, তাদের স্টাফ এবং তাদের ডেমোক্র্যাট প্রতিপক্ষ মিলে আগেভাগেই ঠিক করে ফেলেন কোন বিল উত্থাপন করা হবে, কখন উত্থাপন হবে, বিরোধী পক্ষের সংশোধনীগুলো সামলানো হবে কিভাবে, বেয়াড়া সিনেটরদের কিভাবে পক্ষে আনা যাবে– এসব। তাই আমরা যখন সিনেট কক্ষে পৌঁছাই তখন ক্লার্ক নাম ডাকতে শুরু করেন ভোট দেয়ার জন্য। নিজ স্টাফ, ককাস নেতা, পছন্দের লবিস্ট, ইন্টারেস্ট গ্রুপ, নির্বাচনী এলাকা থেকে পাওয়া পরামর্শ এবং আদর্শিক চেতনা থেকে সিনেটররা আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন বিলটিতে কী অবস্থান হবে তার।

পদ্ধতিটি বেশ সুবিধাজনক বলে সদস্যরাও এর বেশ প্রশংসা করেন। প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা অকল্পনীয় কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হয় সিনেটরদের। তারা কাজ করেন অনেকটা ম্যাজিকের মতো। অফিসে যাওয়া-আসা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিনই নির্বাচনী এলাকা থেকে আসা লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ, ফোনকলের জবাব দেয়া, কাছের কোনো হোটেলে গিয়ে ডোনারদের (নির্বাচনী তহবিলদাতা) সাথে আলোচনা অথবা রেডিও বা টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় তাদের। তাই সিনেট কক্ষ থেকে কোনো সিনেটর বেরিয়ে যাওয়ার পর সেখানে আপনি কেবল আর একজন সিনেটরকেই তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। তিনি হয়তো দাঁড়িয়ে সভাপতির অনুমতি চাইছেন একটি বিবৃতি দেয়ার জন্য। এটা হয়তো তার আনা কোনো বিলের ব্যাখ্যা, অথবা বিরাজমান কোন জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে কিছু বক্তব্য। স্পিকার নমনীয় কণ্ঠে তাকে অনুমতি দিলেন। এবার সেই সিনেটর দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচি হ্রাস, বিচার বিভাগে নিয়োগ নিয়ে আপত্তি, জ্বালানি স্বনির্ভরতা অর্জন– এসব বিষয়ে কথা বললেন। শুনতে বেশ ভালোই মনে হবে। কিন্তু একজন প্রিজাইডিং

www.pathagar.com

অফিসার, কিছু কর্মচারী, কিছু রিপোর্টার এবং একটি-দু'টি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা ছাড়া প্রায় জনমানবহীন একটি কক্ষে বক্তব্য রাখলেন এই বক্তা। এবার নীল-পোশাকধারী স্টাফরা নীরবে অফিসিয়াল রেকর্ডের জন্য জড় করে নিলেন বক্তৃতার কপিগুলো। প্রথম জন বিদায় নিলে হয়তো কক্ষে প্রবেশ করলেন আরেকজন সিনেটর। তিনিও নিজের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে স্পিকারের অনুমতি নিয়ে আরেকটি বিবৃতি দিলেন। আচার-অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি ঘটল আরো একবার।

এই হলো বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী আইনসভার দৃশ্যপট– কথা শোনার কেউ নেই সেখানে।

২০০৫ সালের ৪ জানুয়ারি। কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু সুন্দর। সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের একজন হিসেবে সেদিন আমিও ১০৯তম মার্কিন কংগ্রেসে শপথ নিয়েছিলাম। রৌদ্রোজ্জ্বল সুন্দর দিন। তবে মৌসুমের তুলনায় কিছুটা গরম হাওয়া বইছিল। ইলিনয়, হাওয়াই, লন্ডন ও কেনিয়া থেকে আমার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা এসেছেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে। সিনেটের দর্শনার্থী গ্যালারিতে তারা বসে আছেন। সবার মতো আমিও মার্বেলের তৈরি ডায়াসের পেছনে দাঁড়িয়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিই শপথ নেয়ার জন্য। সিনেটর হিসেবে শপথ নেয়ার পর কিছু উৎসব-আনুষ্ঠানিকতার জন্য আমরা সবাই যাই পুরনো সিনেটর কক্ষে। আমার স্ত্রী মিশেল এবং দু'মেয়েও অপেক্ষা করছিল সেখানে। একসাথে ছবি তোলার জন্য আমরা যাই ভাইস প্রেডিডেন্ট ডিক চেনির কাছে। এ সময় ছয় বছরের মালিয়া চেনির সাথে হাত মেলালেও তিন বছরের সাশা স্থির হয়ে দাঁড়ানোর আগে ক্যামেরাম্যানদের চার পাশে ঘুরে আসে একবার। ছবি তোলা শেষে মালিয়া-সাশা যেতে শুরু করে ক্যাপিটলের পূর্ব দিকের সিঁড়ির দিকে। আমি দেখি তাদের গোলাপী ও লাল পোশাক উড়ছে মৃদু বাতাসে। সুপ্রিমকোর্ট ভবনের শুভ্র কলামগুলো শান্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পেছনে। আমি ও মিশেল গিয়ে তাদের হাত দু'টি ধরি। আমরা হাঁটতে থাকি লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের দিকে। আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে সেখানে জড়ো হয়েছেন আমার শতাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাদের সাথে হাত মেলানো, কোলাকুলি, ছবি তোলা, অটোগ্রাফ দেয়া আর কুশল বিনিময়ে কেটে যায় পরের কয়েক ঘণ্টা।

ক্যাপিটলে সমবেত হওয়া দর্শনার্থীদের কাছে মনে হতে পারে দিনটি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের; অনুষ্ঠান ও উৎসবের। কিন্তু এই দিনে ওয়াশিংটনের সবচেয়ে ভালো আচরণ যদি কিছু থাকে তা হলো– আমাদের গণতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস। সবার চোখেমুখে ফুটে ওঠা সচেতন ভাব স্থির হয়ে থাকে এ দিনের বাতাসে। কিন্তু এই মনোভাব স্থায়ী হয় না দীর্ঘ সময়। পরিবার ও বন্ধুজনরা একসময় বিদায় নেয়। শেষ হয় সংবর্ধনার পালা। শীতের ধূসর পর্দার ওপাশে ঢলে পড়ে সূর্য। শহরের ওপর মাত্র একটি জিনিসের প্রভাব অপরিবর্তনীয় সত্যের মতো দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে– তা হলো, দেশটি ভাগ হয়ে গেছে। তাই ওয়াশিংটনও বিভক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

www.pathagar.com

যেকোনো সময়ের চেয়ে এই বিভক্তি এখন সবচেয়ে প্রকট।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানে এই বিভক্তির প্রতিফলন' দেখি আমরা। ইরাক যুদ্ধ, কর, গর্ভপাত, বন্দুক, সমবিয়ে, অভিবাসন, বাণিজ্য, শিক্ষানীতি, পরিবেশ আইন, সরকারের আকার, আদালতের ভূমিকা, এমনকি বাইবেলের টেন কম্যান্ডমেন্টসের ব্যাপারেও আজ মার্কিনিরা দ্বিধাবিভক্ত। আমরা শুধু বিরোধিতা করেই থেমে থাকছি না, আমাদের মতবিরোধ এতটাই প্রবল যে, আমরা দলীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ পর্যন্ত করছি। আমাদের মতবিরোধ কতটুকু, মতবিরোধের প্রকৃতি, এর কারণ, এসব নিয়েও মতবিরোধ আছে আমাদের মধ্যে। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণ বা এর ফল; অথবা বাজেট ঘাটতির পরিমাণ বা এই ঘাটতির জন্য কাদের দায়ী করা হবে– এ নিয়েও আমাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আমার জন্য এর কোনোটিই নতুন নয়। ওয়াশিংটনে এই রাজনৈতিক যুদ্ধ তীব্র হয়ে ওঠার বিষয়টি একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবলোকন করেছি আমি। ইরান কন্ট্রা, ওলি নর্থ, বোরাক নমিনেশন এবং উইলি হরটন, ক্লারেন্স থমাস ও অনিতা হিল, ক্লিনটনের নির্বাচন ও গিংরিচ বিপ্লব, হোয়াইট ওয়াটার কেলেঙ্কারি ও স্টার তদন্ত, সরকার অচল হয়ে যাওয়া ও ইমপিচমেন্ট, বুশ বনাম গোর লড়াই দেখেছি আমি। সাধারণ একজন নাগরিকের মতো আমি দেখেছি নির্বাচনী প্রচারণার কদর্য রূপ। এটা যেন কাউকে হেয় বা অবজ্ঞা করার একটি শিল্প। এটা এক দিকে অন্তহীন, অন্য দিকে লাভজনক। ক্যাবল টেলিভিশন, রেডিও এবং নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার তালিকাতেও স্থান করে নিয়েছে প্রার্থীদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির এই সংস্কৃতি। ইলিনয় রাজ্যের বিধানসভায় আট বছর কাজ করে আমি বুঝেছি খেলা কিভাবে চলে। এরই মাঝে ১৯৯৭ সালে আমি স্প্রিংফিল্ড আসি। কংগ্রেসকে বশে রাখতে স্পিকার গিংরিচ যেসব আইনকানুন প্রয়োগ করে চলছিলেন, ইলিনয়ের রাজ্য সিনেটেও একই কৌশল অবলম্বন করছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা। কোনো বিলের একেবারে সাধারণ কোনো সংশোধনীও আনার ক্ষমতা ছিল না ডেমোক্র্যাটদের। তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি, তর্জন-গর্জন সব কিছুই ব্যর্থ হতো। তাদের অসহায় চোখের সামনে দিয়ে করপোরেট কোম্পানিগুলোকে বিশাল কর মওকুফ সুবিধা দিয়ে তার বোঝা শ্রমিকদের ওপর চাপানো অথবা সামাজিক সেবা কাটছাঁটের মতো বিলগুলো পাশ করিয়ে নিয়ে যেত রিপাবলিকানরা। এতে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমা হতে থাকে ডেমোক্র্যাটদের মনে। রিপাবলিকানদের প্রতিটি অবজ্ঞা, অন্যায় ও অপব্যবহারের রেকর্ড রাখে তারা। ছয় বছর পর ডেমোক্র্যাটরা আবার যখন সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়, রিপাবলিকানরাও একই ফল ভোগ করে। কিছু হবে না জেনেও অনেক প্রবীণ সিনেটর সেসব দিনের কথা স্মরণ করেন– যখন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানরা প্রায়ই মিলিত হতেন 'ডিনারের টেবিলে'। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ বা পোকার খেলার মাঝে আলাপচারিতায় অনেক বিষয়ে সমঝোতা হয়ে যেত তাদের মধ্যে। অথচ আজ এসব নমনীয় মনের সিনেটররাও বিরোধী পক্ষের অ্যাকটিভিস্টদের টার্গেট। অ্যাকটিভিস্টরা এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, এমনকি দুশ্চরিত্র হওয়ার মতো মিথ্যা

www.pathagar.com

অভিযোগে ভরা চিঠি পাঠিয়ে এদের মেইল-বক্স ভরে রাখে । ফলে সেই পুরনো সুখস্মৃতি এদের মনেও বেশি সময় স্থায়ী হয় না।

আমিও যে সব সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছি সে দাবি করব না। আমি জানি রাজনীতি হলো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি খেলা। কোনো ভুল গুটি যেন চালা হয়ে না যায় সে দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। রিপাবলিকানদের কটূক্তির বাণে জর্জরিত হতে হয়েছে আমাকেও। মাঝে মধ্যে আমি কোনো আইন তৈরি নিয়ে প্রতিপক্ষ দলের সবচেয়ে কট্টর সদস্যটির সাথেও কথা বলার চেষ্টা করেছি। একসাথে পোকার খেলা অথবা কাজের ফাঁকে হালকা নাশতা খাওয়ার টেবিলে একসাথে বসার চেষ্টা করেছি। স্প্রিংফিল্ডের বছরগুলোতে আমি গভীরভাবে অনুভব করতাম রাজনীতি ভিন্ন হতে পারে, ভোটারদের চাওয়াও ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু, প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও আসলে আমরা সবাই অভিন্ন। ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ভোটারদের। এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। এসব ভোটারের কাছে সরাসরি যেতে পারলে এবং আপনার ভাবনাটি আপনার মতো করে তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে, জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুঁজে নেবে সত্য ও সঠিক পথ। আমার বিশ্বাস, একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় তখন শুধু রাজনীতিই নয়, দেশের নীতিও বদলে যাবে।

২০০৪ সালে মার্কিন সিনেটের প্রার্থী পদের জন্য লড়তে গিয়ে এই বিশ্বাস আরো দৃঢ়মূল হয় আমার মনে। প্রচারের পুরোটা সময় আমার এই ভাবনাটুকু আমি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এতে কোনো অস্পষ্টতা রাখিনি। চেষ্টা করেছি, আমার ভাবনার সারবস্তুটুকু তুলে ধরতে। এরপর বিপুল ভোটে প্রাইমারি ও সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হই আমি। ফলে আমি আমার কথাগুলো ভোটারদের বুঝাতে পেরেছি–এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় আমার মনে।

আমার প্রচার এতটাই ভালো হয়েছিল, হঠাৎ পাওয়া কোনো সৌভাগ্য বলে মনে হয় একে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা হয়তো লক্ষ করেছেন, প্রাইমারিতে লড়া আমার সাত ডেমোক্র্যাট সহকর্মীর কেউই পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো নেতিবাচক বিজ্ঞাপন প্রচার করেননি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী প্রার্থী ছিলেন ৩০০ মিলিয়ন ডলারের মালিক এক সাবেক ব্যবসায়ী। বিজ্ঞাপন প্রচারে ২৮ মিলিয়ন ডলার খরচ করেন তিনি। তার সবগুলো বিজ্ঞাপনই ছিল ইতিবাচক। আমার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষও ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। একেবারে গোড়া থেকেই তিনি আমার বিভিন্ন কাজের বিরূপ সমালোচনায় ছিলেন মুখর। কিন্তু নির্বাচনী প্রচার জমে ওঠার আগেই বিয়েবিচ্ছেদের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এরপর সেই মাসে সবচেয়ে ভালো সময়গুলো পার করি আমি। নির্বিঘ্নে সফর করে বেড়াই গোটা রাজ্য। ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় কনভেনশনে মূল বক্তব্য উপস্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যও ডাক পাই সেই মাসে। জাতীয় টেলিভিশনে টানা ১৭ মিনিট সরাসরি সম্প্রচার হয় সেই বক্তব্য। এটা ছিল এক বিরল সৌভাগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইলিনয় রিপাবলিকানরা অজ্ঞাত কোনো কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী অ্যালান কেইসকে বেছে নেয় আমার প্রতিপক্ষ হিসেবে। অ্যালান

www.pathagar.com

কখনো এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে থাকেননি। অন্যদিকে তিনি এতটাই বদমেজাজী ও উদ্ধত ছিলেন যে রক্ষণশীল রিপাবলিকানরাও ভয় পেতো তাকে।

এসব ঘটনার পর সাংবাদিকরা দেশের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান রাজনীতিক হিসেবে ঘোষণা করেন আমাকে। এতে আমার ব্যক্তিগত সহকারীদের কেউ কেউ কিছুটা ক্ষোভও প্রকাশ করেন। আমাদের কঠোর পরিশ্রম ও আহ্বানে জনগণের আন্তরিক সাড়া দান, 'সৌভাগ্যে'র' মতো বায়বীয় কিছুর কাছে মূল্যহীন হয়ে যাবে– এটা মানতে তারা রাজি ছিলেন না। এরপরও আমার এই আকস্মিক সৌভাগ্যটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই জানুয়ারিতে যখন ওয়াশিংটনে আসি তখন কিছুটা অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতোই লাগছিল নিজেকে। যে কিনা দলের আহত ও কাদামাখা খেলোয়াড়দের কোনো দাগ না লাগা নিজের পোশাক দেখাচ্ছে। নতুন সিনেটর হিসেবে নানা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান ও ফটোসেশন নিয়ে বেশ খানিকটা সময় কাটাতে হয় আমাকে। এরপরও আমার মাথা ছিল উচ্চমার্গের চিন্তায় ভরপুর। ভাবতাম প্রেসিডেন্সি, সিনেট বা কংগ্রেস– সবখানে ডেমোক্র্যাটরা কোণঠাসা হয়ে থাকলেও যতটা সম্ভব দলীয় মনোভাবের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হবে আমাকে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চিন্তা। কিন্তু এই চেতনার সাথে একমত হতে পারলেন না আমার নতুন ডেমোক্র্যাট সহকর্মীরা। আমার জয়কেই আমার সমস্যাগুলোর একটি বলে মনে করতেন তারা। সিনেটের করিডোর কিংবা অধিবেশনের ফাঁকে আলাপচারিতায় তারা আমাকে বলতেন, সিনেটের জন্য আদর্শ প্রচার কেমন হয়।

তারা আমাকে সাউথ ডাকোটায় পরাজিত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী টম ড্যাশেলের কথা বলেন। এই লোকটির বিরুদ্ধে নেতিবাচক বিজ্ঞাপনের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ করা হয়। তিনি ভ্রূণ হত্যা ও সমলিঙ্গ বিয়ের সমর্থন করেন বলে দিনের পর দিন টিভি ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। ড্যাশেল নাকি তার প্রথম স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। যদিও তার স্ত্রীকে দেখা গেছে স্বামীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালাতে। সহকর্মীরা জর্জিয়ার নির্বাচনে হেরে যাওয়া যুদ্ধাহত ম্যাক্স ক্লিল্যান্ডের কথা বলেন। রিপাবলিকানরা তার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের ঘাটতি এবং ওসামা বিন লাদেনকে সমর্থন দেয়ার অভিযোগ আনেন। সুপরিকল্পিত বিজ্ঞাপনী প্রচার ও রক্ষণশীল মিডিয়ার কোরাস ধ্বনি কিভাবে একজন ভিয়েতনাম যুদ্ধের বীরকে দুর্বলচিত্ত মোসাহেব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে– এ ঘটনা তার প্রমাণ।

সন্দেহ নেই অনেক রিপাবলিকান প্রার্থীকেও প্রতিপক্ষের একই অস্ত্রে ঘায়েল হতে হয়েছে। তাই নতুন অধিবেশনের শুরুতে পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় উভয় পক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, নির্বাচনী কোন্দল ভুলে গিয়ে শত্রুতার অস্ত্রগুলো সিন্দুকে তুলে রেখে অন্তত দু'টি বছর যেন তারা মিলেমিশে কাজ করেন। যদি না আরেকটি নির্বাচন ঘনিয়ে আসত; যদি থেমে যেত ইরাক যুদ্ধ; যদি বন্ধ হতো নানা ফায়দা হাসিলের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ, দলীয় পণ্ডিত ও মিডিয়া গ্রুপগুলোর উসকানি– তাহলে হয়তো এই আহ্বানে সাড়া দেয়া যেত। নিরন্তর এ ঘটনাগুলো না

www.pathagar.com

ঘটলে হোয়াইট হাউসের চেহারা হতো ভিন্ন। এখান থেকে ছড়িয়ে পড়ত শান্তির বারতা। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ইচ্ছেমতো সব কিছু করার বদলে ৫১-৪৮ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতো বিনয় ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পেত সেখানে।

কিন্তু এই সমঝোতার মনোভাবের জন্য যে ধরনের প্রার্থী প্রয়োজন ২০০৫ সালে সেখানে তারা ছিলেন না। তাই ছাড় দেয়ার মনোভাব বা আন্তরিকতার কোনো প্রকাশও ছিল না কারো মধ্যে। নির্বাচিত হওয়ার দু-এক দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা করলেন, অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে এসে গেছে। এবার তিনি এই ক্ষমতা খাটাতে চান। একই দিন কট্টর রিপাবলিকান গ্রোভ নরকুইসের আরেকটি বক্তব্য সাধারণ সৌজন্যবোধকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি ডেমোক্র্যাটদের তুলনা করেন বেয়াড়া পশুর সাথে। তিনি বলেন, 'একজন কৃষক জানে বেয়াড়া পশুগুলোকে বেঁধে রাখলে এগুলো শান্ত থাকে।'

আমার শপথ নেয়ার দু'দিন পরের ঘটনা। ক্লিভল্যান্ডের স্টিফেনি টুবেস জোনস কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে ওহাইয়ো'র ভোটারদের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগ আনেন তিনি। এ সময় রিপাবলিকান সদস্যরা হইচই জুড়ে দেন জোনসের সমর্থনে। তাদের চোখে-মুখেও ফুটে ওঠে উদ্ধত ভাব। স্পিকার হাস্টার্ট ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ডিলেকে এ সময় ডায়াসের ওপর নির্বিকারচিত্তে বসে থাকতে দেখা যায়। ভাবখানা এমন, ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সভাপতির হাতুড়ি– দু'-ই যখন তাদের হাতে, তবে আর কারো কথা শোনার দরকার কী? ক্যালিফোর্নিয়ার সিনেটর বারবারা বক্সারও রাজি হয়ে যান এই চ্যালেঞ্জকে সমর্থন জানাতে। এরপর আমরা আবার যখন সিনেট কক্ষে ফিরি, তখন দেখি আমি নিজেও ভোট দিচ্ছি দ্বিতীয় মেয়াদে জর্জ বুশকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনুমোদনের জন্য। সেদিন ৭৪টি ভোট পড়েছিল প্রেসিডেন্ট বুশের পক্ষে।

এ ঘটনার পর প্রথম আমি সমালোচকদের কাছ থেকে প্রচুর টেলিফোন ও মেইল পাই। অনেক ক্ষুব্ধ ডেমোক্র্যাট সমর্থকের ফোনের জবাবও দেই আমি। তাদের আমি বলি, 'হ্যাঁ ওহাইয়োর ঘটনা আমি জানি এবং এটাও মনে করি একটি তদন্তও হওয়া দরকার।' আমি আরো মনে করি, জর্জ বুশ নির্বাচনে জিতেছেন। তবে মাত্র দু'দিন বয়সী সিনেটর হিসেবে তাকে ভোট দিয়ে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছি বলে আমি মনে করি না। একই সপ্তাহে আমি জর্জিয়ার প্রবীণ ও বিদায়ী ডেমোক্র্যাট সিনেটর এবং এনআরএ (ন্যাশনাল রিকভারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সদস্য জেল মিলারের সাথে সামান্য সময়ের জন্য কথা বলার সুযোগ পাই। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই সিনেটরও ভোট দিয়েছেন বুশকে। অথচ জাতীয় কনভেনশনে রিপাবলিকান নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেন এই সিনেটর। জন কেরির বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে দুর্বলতার অভিযোগ আনেন তিনি। সাক্ষাৎকালে আমাদের দু'জনের মনেই ভিড় করেছিল অনেক না বলা কথা। রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে যখন দক্ষিণের একজন প্রবীণ বিদায় নিচ্ছেন, তখনই সেখানে

www.pathagar.com

প্রবেশ ঘটছে উত্তরাঞ্চল থেকে আসা এক নবীনের। জাতীয় কনভেনশনে আমাদের দু'জনের বক্তব্যকে সংবাদমাধ্যমগুলো এভাবেই চিত্রিত করে। মিলার তার 'সৌজন্যতার ঘাটতি' নামক বইয়ে কনভেনশনে দেয়া আমার বক্তব্যকে তার শোনা এযাবৎকালের সেরা বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। তবে তার বই পড়ে কিছুটা কৌতূহলও জেগে ওঠে আমার মনে। নির্বাচনে জয়ী হতে না পারলে এই বক্তব্যের সার্থকতা হয়তো অনেকখানি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারত। অন্য কথায়, আমার পছন্দের লোক হেরে গেছেন, আর জেল মিলারের লোক জিতেছেন। এটাই হলো কঠিন ও নির্মম সত্য। আবেগের প্রাধান্য সবখানেই।

মিশেল বলে, আমি নাকি আশপাশে কী ঘটছে তার অনেক কিছুই বুঝি না। টিভি স্ক্রিনে আমি যখন অ্যান কল্টার বা সেন হ্যানিটির ছবি দেখি– তেমন গুরুত্ব দেইনি। আমি ভাবি, এগুলো হয়তোবা বইয়ের কাটতি বা রেটিং বাড়ানোর কোনো বিজ্ঞাপন। ভাবি, এসব বিজ্ঞাপন দেখে মূল্যবান সন্ধ্যাগুলো কাটানোর মতো এত সময়ই বা কার আছে? একইভাবে ডেমোক্র্যাট কর্মীরা যখন এসে আমাকে বলে, নিঃশব্দ ফ্যাসিবাদ ধীরে ধীরে আমাদের গলা চেপে ধরছে, তখন আমি তাদের বলি রুজভেল্টের আমলে মার্কিন বাহিনী নিয়ন্ত্রিত জাপানের কথা; বলি জন অ্যাডামসের তৈরি এলিয়েন ও সেডিশন আইনের কথা। অথবা বলি বিনা বিচারে ফাঁসি দেয়ার মতো আইন নিয়েও বহু সরকার ও যুগ পার হওয়ার কথা। এসব বলে কর্মীদের সান্ত্বনা দিই– এই দিনও থাকবে না। খাওয়ার টেবিলে কেউ যখন জানতে চায়, এত সব নেতিবাচক প্রচারণা আর ব্যক্তিগত আক্রমণ আমি কিভাবে সামলাব– আমি তাদের বলি নেলসন ম্যান্ডেলার কথা। বলি, আলেক্সান্ডার সোলজেনিৎসিন, মিসর বা চীনের অসংখ্য রাজবন্দীর কথা। বাস্তবতা হলো, গালি দিয়ে কাউকে হেয় করা যায় না।

এরপরও এসব মর্মযাতনা থেকে মুক্ত নই আমি। গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে যাচ্ছে দেখে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মতো মানসিক যন্ত্রণা লুকিয়ে রাখা আমার পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে। এটা শুধু একটি জাতি হিসেবে আমাদের ঘোষিত নীতি-আদর্শ এবং আমাদের চোখের সামনে দৈনন্দিন ঘটে চলা বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধানের কারণেই নয়, আমেরিকার জন্মলগ্ন থেকেই কোনো না কোনোভাবে এই ব্যবধানটি ছিল। যুদ্ধ হয়েছে, নতুন আইন হয়েছে, পদ্ধতির সংস্কার হয়েছে, পুনর্গঠিত হয়েছে ইউনিয়ন– এর পরও দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন থেমে থাকেনি।

কিন্তু এবারের সমস্যাটি হলো, আমাদের সামনে থাকা পর্বতপ্রমাণ চ্যালেঞ্জ এবং আমাদের রাজনীতির ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান। আমাদের রাজনীতি এখন সাধারণ ও সংকীর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না আমরা। যেকোনো বড় সমস্যা মোকাবেলার মতো জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার যোগ্যতা আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

www.pathagar.com

বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার কথা আমরা জানি। এর জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষক নিয়োগব্যবস্থা পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। জোর দিতে হবে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায়। স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুগুলোকে বাঁচাতে হবে নিরক্ষরতার কবল থেকে। অথচ আমরা এখন ব্যস্ত, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে দেয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক নিয়ে। বিতর্কে অংশ নেয়া একদল বলছেন, শিক্ষা খাতে বৈষম্য সৃষ্টির হাতিয়ার হতে পারবে না অর্থ। আরেক দল বলছেন উল্টো কথা। যদিও এ অর্থ ভালো কাজে ব্যয় হবে– এমন কোনো লক্ষণ নেই।

এটা সবাই জানে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা খাত প্রায় ভেঙে পড়েছে। এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, এখানে দক্ষতার ঘাটতি মারাত্মক এবং তা এমন এক অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে, যা কাউকে আজীবন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয় না। এটা এমন এক ব্যবস্থা যা আমেরিকার সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত নিরাপত্তাহীনতা ও আরো দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এর পরও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াই আদর্শবাদী আর রাজনীতির খেলায় চলে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

আমরা জানি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সশস্ত্র সঙ্ঘাতের পাশাপাশি একটি আদর্শিক দ্বন্দ্বও বটে। আমাদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য কেবল সামরিক শক্তির প্রদর্শনী ও অন্য দেশের সাথে সহযোগিতা বাড়িয়ে গেলেই চলবে না। জাতীয় স্বার্থে, বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য ও ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলোর সমস্যার দিকেও আমাদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এই সহযোগিতা, দাতব্য ধরনের হলে চলবে না। অথচ আমাদের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত বিতর্কগুলোর দিকে তাকালে দেখবেন আমাদের সামনে যেন মাত্র দু'টি পথ খোলা– যুদ্ধ অথবা বিচ্ছিন্নতা।

আমরা মনে করি বিশ্বাস হলো স্বস্তি ও সমঝোতার একটি উৎস। অথচ আমাদের এই বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটছে বিভক্তির মধ্যে। আমেরিকাজুড়ে সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘাত থাকলেও একটি সহনশীল জাতি হিসেবে নিজেদের মনে করি আমরা। এই উত্তেজনা নিরসন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা না করে রাজনীতিকরা একে আরো উসকে দিচ্ছেন, ফায়দা লুটছেন এর মাধ্যমে, আরো বিভক্তির পথে ঠেলে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। আমরা যে রাজনীতি করছি এবং যে রাজনীতি করা দরকার, তার মধ্যে ব্যবধানের কথা সবাই ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করেন। সংখ্যালঘু অবস্থানে থেকে ডেমোক্র্যাটরা কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না, এটা স্বাভাবিক কথা। রিপাবলিকানরা কংগ্রেস ও সিনেট দু'টি জায়গাই দখল করে আছে। ফলে তারা ডেমোক্র্যাটদের কোনো কথায় কান দেয়ারও প্রয়োজন অনুভব করে না।

প্রকাশ্যে আমাদের মধ্যে এই বিভক্তির কারণ খুঁজতে যাওয়া কঠিন। এমনকি এর জন্য সামান্যতম দায়বোধ স্বীকার করতেও কেউ রাজি নয়। এর বদলে আমরা যেন অন্যের সমালোচনা ও অপবাদ দেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে মাঠে নেমেছি। শুধু নির্বাচনী প্রচার নয়, পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতা, বুকস্ট্যান্ড এমনকি অকল্পনীয় আয়তনে বেড়ে চলা ইন্টারনেটের ব্লগ জগতেও আমরা একই জিনিস দেখছি ও শুনছি। নিজস্ব রুচির

www.pathagar.com

ওপর ভিত্তি করে কেউ রক্ষণশীল অথবা কেউ উদারমনা হয়। কোন গল্প কতটা সুন্দরভাবে বলা যাবে, তা নির্ভর করে এর সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এবং এর প্রামাণিক মানের ওপর। লেখকে লেখকেও পার্থক্য ঘটে। তবে আমি মনে করি ডান ও বামরা যে গল্পই বলুক না কেন, সেগুলোর একটা হলো অন্যটার আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি। একটা দুষ্ট শক্তি আমেরিকাকে ছিনতাই করে নিচ্ছে– এমন ষড়যন্ত্রের গল্পও প্রচলিত আছে আমেরিকার রাজনীতিতে। ভিন্ন মতের কাউকে নিজ মতে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে এসব গল্প ছড়ানো হয় না। এসব গল্প ছড়ানো হয় নিজের রাজনীতির ভিত্তি সক্রিয় রাখা এবং লড়াই চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা সমর্থকদের বুঝানোর জন্য। পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে দমানোর জন্য নতুন নতুন সমর্থকও যাতে দলে ভীড়ে, সে চেষ্টাও চলে।

পাশাপাশি আমেরিকার যে কোটি কোটি নাগরিক জীবন-জীবিকার জন্য লড়াই করে চলেছেন প্রতিদিন, তাদেরও বলার মতো একটি গল্প আছে। এদের কেউ কাজে আছেন অথবা কেউ কাজ খুঁজছেন, কেউ ব্যস্ত ব্যবসায় নিয়ে, সন্তানদের হোমওয়ার্কে সাহায্য করছেন কেউ, কেউ হয়তো গ্যাস বিলের বোঝা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বীমা বা অবসরভাতা নিয়ে লড়াই করছেন। এরা কখনো ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত, আবার কখনো আশাবাদী। বৈপরীত্ব আর অনিশ্চয়তায় পূর্ণ তাদের জীবন। রাজনীতিকরা এদের নিয়ে খুব সামান্যই মাথা ঘামান। এরাও বুঝে গেছেন, বর্তমান রাজনীতি কোনো মিশন নয়, এটি একটি ব্যবসা। কংগ্রেসের টেবিলে বিতর্কের জন্য যেসব বিল হাজির হচ্ছে সেগুলো প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছু নয়।

আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ এসব মানুষের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব এবং সত্যিকার কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের রাজনীতির প্রয়োজন। জনগণের জীবনযাত্রার সত্যিকার প্রতিফলন থাকতে হবে সেই রাজনীতিতে। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ঐতিহ্যের ওপর নির্মিত হতে হবে সেই রাজনীতি। বিবদমান জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতীয় বিদ্বেষপূর্ণ এই অঞ্চলটি কিভাবে আমরা পেয়েছি তা অনুধাবন করতে হবে আমাদের। সব রকম বিরোধের মধ্যেও অভিন্ন আশা, অভিন্ন স্বপ্ন এবং অটুট বন্ধন সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে আমাদের।

ওয়াশিংটনে আসার পর প্রথম যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি আমার মনোযোগ কাড়ে তার মধ্যে ছিল প্রবীণ সিনেটরদের হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ। জন ওয়ার্নার ও রবার্ট বেয়ার্ডের প্রতিটি সাক্ষাৎ ছিল অসাধারণ সৌজন্যবোধে পূর্ণ। রিপাবলিকান টেড স্টিভেন্স আর ডেমোক্র্যাট ড্যানিয়েল ইয়রির বন্ধুত্বের মধ্যেও কোনো খাঁদ ছিল না। বলা হতো, এসব ব্যক্তি কোনো গাছের লাল হয়ে যাওয়া প্রাচীন পাতার মতোই সিনেটের শোভা বাড়িয়ে চলেছেন। সিনেট তাদের ভালোবাসা। সম্পূর্ণ দু'টি শিবিরে বিভক্ত সিনেটে এরাই ঐক্যের প্রতীক। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলের নেতাকর্মীরা শুধু এই একটি বিষয়ের সত্যতাই স্বীকার করেন। তারা ওয়াশিংটনের সেই সোনালি যুগের বিলীয়মান চিহ্ন, যখন ক্ষমতায় যে দলই থাকুক না কেন– ভব্যতা ও সৌজন্যবোধ ছিল সবার

www.pathagar.com

ওপরে। সরকারের ওপরেও ছিল এসব মানবিক গুণাবলির অসাধারণ প্রভাব।

এমনই এক মানুষের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল এক সন্ধ্যার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ক্যাপিটল হিল ও আমেরিকান রাজনীতিতে এই লোকটির সদর্প বিচরণ। তার যৌবনকাল ও বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে তফাত কতটুকু– এ কথা আমি জানতে চেয়েছিলাম তার কাছে। কোনো রকম ইতস্তত ছাড়াই উত্তর পেয়েছিলাম, 'তফাত প্রজন্মের।' তিনি বলেন, তখন যারা ওয়াশিংটনের ক্ষমতায়, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লড়াকু সৈনিক। যেকোনো ইস্যুতে সাফল্যের জন্য জীবনপণ লড়েছি আমরা। আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে ছিল বিস্তর ফারাক। বিভিন্ন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী থেকে এসেছিলাম আমরা। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যেও ছিল অনেক অমিল। কিন্তু যুদ্ধের সময় একটি বিন্দুতে আমরা সবাই ছিলাম অভিন্ন। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আস্থা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে ওঠে।

আইজেনহাওয়ার, স্যাম রেবার্ন, ডিন একিসন ও ইভার্তি ড্রিকসেন সম্পর্কে এই বুড়ো মানুষটি যখন স্মৃতিচারণ করেন, তখন অতীতের সেই ছবিগুলো আমার কাছে যেন ঝাপসা মনে হয়। সেই সময় নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরাই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতেন। সে যুগে বর্তমানের মতো ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল ছিল না; তহবিল সংগ্রহের জন্য রাজনীতিকদের বিরামহীন ছুটে চলাও ছিল না তখন।

ফেলে আসা দিনগুলোর অনেক ঘটনা প্রবীণ এই সিনেটরের স্মৃতিতে আজো জ্বলজ্বল করছে। সিনেটে দাঁড়িয়ে কিভাবে প্রস্তাবিত নাগরিক আইনের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল সাউদার্ন ককাস; ম্যাকার্থিজমের ক্ষতিকর প্রভাব, মৃত্যুর আগে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ববি কেনেডির সংগ্রাম; ক্ষমতার কেন্দ্রে নারী ও সংখ্যালঘুদের অনুপস্থিতির কথা আজো স্মরণ করেন তিনি।

প্রবীণ এই সিনেটরের সাথে কথা বলে অতীতের সেই পরিবেশটি অনুভব করতে পারি আমি। দেশ পরিচালনার জন্য একটি স্থিতিশীল ও সমঝোতাপূর্ণ নীতি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল সেই অনন্য পরিবেশের কারণেই। সেখানে শুধু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না। স্নায়ুযুদ্ধ ও সোভিয়েত হুমকিও তাদের মতভেদ ভুলে ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হতে সাহায্য করেছিল। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন মার্কিন অর্থনীতি। জাপান ও ইউরোপ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জঞ্জাল সরাতে ব্যস্ত।

এর পরও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকান রাজনীতিতে দলবাজির প্রভাব ছিল সামান্যই। তখন পার্টিও সংশ্লিষ্টতা বলতে আজকের মতো কট্টর কিছু বোঝাত না। সেসব দিনের বেশিরভাগ সময় কংগ্রেস ছিল ডেমোক্র্যাট কোয়ালিশনের নিয়ন্ত্রণে। হুবার্ট হামফ্রের মতো উত্তরের উদারপন্থীর সাথে জেমস ইস্টল্যান্ডের মতো দক্ষিণের রক্ষণশীল ডেমোক্র্যাটের মিশ্রণ ছিল সেসব কোয়ালিশনে। মতবাদে যা-ই থাকুন না কেন, দেশের স্বার্থে তারা ছিলেন একাট্টা। কোয়ালিশনের বন্ধন

www.pathagar.com

অটুট রেখেছিল 'নিউ ডিল'-এর গণমুখী অর্থনীতি। ন্যায্য মজুরি ও সুবিধা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে তখন জীবনযাত্রার মানে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে তখন বিস্তার ঘটতে থাকে 'শুধু নিজেই বাঁচো' দর্শনের। এটা ছিল এমন এক দর্শন, যাতে দক্ষিণের জাতিগত নিপীড়নের বিস্তারের প্রতি জানানো হয় মৌন সম্মতি। এটা এমন এক দর্শন, যেখানে সামাজিক অনুশাসনগুলো ছিল মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। মানুষের নৈতিক জীবন কেমন হবে, মতামত প্রকাশ বা নারীর ভূমিকা সম্পর্কেও এই দর্শন ছিল নীরব।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রথমভাগে গ্রান্ড ওল্ড পার্টিও সব রকম দার্শনিক মতভেদের ব্যাপারে একেবারে নীরব ছিল। বেরি গোল্ডওয়াটারের ওয়েস্টার্ন লিবারালিজম এবং নেলসন রকফেলরের ইস্টার্ন প্যাটারনালিজম সম্পর্কে দলীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ছিল না। আব্রাহাম লিংকন ও টেডি রুজভেল্টের রিপাবলিক্যানিজম কিংবা অ্যাডমন্ড বার্কের করজারভেটিজমের অনুসারীদের মধ্যে বিরোধেও দলটি ছিল নির্লিপ্ত। নাগরিক অধিকার, ফেডারেল আইন-কানুন, এমনকি কর নিয়েও আঞ্চলিক ও আবেগধর্মী মতপার্থক্যগুলো খুব একটা প্রকট ও সুস্পষ্ট ছিল না। তবে ডেমোক্র্যাটদের মতো অর্থনৈতিক স্বার্থই ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছিল রিপাবলিকানদের। তখন মুক্তবাজার ও আর্থিক সাশ্রয়ের মতো আহ্বানই কেবল সড়কের পাশে মুদি দোকানদার থেকে শুরু করে অভিজাত করপোরেট ম্যানেজারদের আকৃষ্ট করতে পারত। পঞ্চাশের দশকে রিপাবলিকানরা কমিউনিজমের বিরুদ্ধেও তুমুল প্রচারণা চালায়।

ষাটের দশকে এসে চূড়ান্ত পরিণতি পায় রাজনীতির মেরুকরণ। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর সূচনা ঘটে। একেবারে শুরুতেই প্রতিষ্ঠিত সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে বসে এই আন্দোলন এবং পক্ষ বেছে নিতে বাধ্য করে আমেরিকানদের। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে লিন্ডন জনসন ডান পক্ষটি বেছে নেন। তবে দক্ষিণের সন্তান হিসেবে এই পক্ষ বেছে নেয়ার চরম মূল্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি। ১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার আইনে স্বাক্ষর দেয়ার সময় সহকারী বিল ময়ারকে তিনি বলেছিলেন, কলমের একটি খোঁচায় দক্ষিণে রিপাবলিকানদের প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন তিনি।

এরপর শুরু হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বলা হয়, আমেরিকা সবসময় সঠিক পথে চলে না। আমাদের পদক্ষেপ সর্বদা ন্যায়সঙ্গত নয়। প্রবীণদের নির্দেশিত পথে চলার মূল্য দেয়া বা তাদের ভুলের বোঝা বইতে পারবে না নতুন প্রজন্ম। এই আন্দোলনে আমেরিকান সমাজের স্থিতিশীলতার দেয়ালটি ধসে পড়ে। সেই পথে অনুপ্রবেশ শুরু হয় হু হু করে। ফেমিনিজম, ল্যাটিনো, হিপ্পি, প্যান্থার, ওয়েলফেয়ার মমস, গে'সহ বহু আন্দোলন নিজ নিজ অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নেমে পড়ে। সবাই স্বীকৃতি চায়, চায় টেবিলে বসার একটি আসন, চায় ক্ষমতার ভাগ।

যৌক্তিক পথে নিজ থেকেই এসব আন্দোলন স্থিমিত হয়ে আসতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। নিক্সনের দক্ষিণাঞ্চল কৌশল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নীরব ভোটারদের কাছে

www.pathagar.com

তার আহ্বান নির্বাচনে ইতিবাচক ফল বয়ে আনে। কিন্তু তার প্রশাসনিক কৌশল কোনো সুদৃঢ় মতাদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি। নিক্সনই প্রথম ফেডারেল অ্যাকশন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছিলেন। পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা গঠন করেন তিনি। তার হাত দিয়ে পাস হয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন আইন। অন্য দিকে জিমি কার্টার প্রমাণ করেছিলেন, অধিকতর রক্ষণশীল ডেমোক্র্যাটিক চেতনাকেও নাগরিক অধিকারের সাথে সমন্বয় ঘটানো যায়। সে সময় ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে দলচ্যুতির ঘটনা ঘটলেও দক্ষিণাঞ্চলের যেসব ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় অন্তত প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল।

কিন্তু এর পরই দেশের 'টেকটনিক প্লেটে' বিচ্যুতি ঘটে। রাজনীতি শুধু একটি কেতাবি বিষয় নয়। এটি একটি নৈতিক ইস্যুও। নৈতিক অপরিহার্যতা এবং নৈতিক সম্পূর্ণতার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এতে। রাজনীতি একান্তভাবে নিজস্বমুখী। সাদা ও কালো অথবা নারী ও পুরুষের প্রতিটি আন্তঃক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর নীরব অনুপ্রবেশ ঘটে। কর্তৃত্ব প্রয়োগ এবং প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও জড়িয়ে থাকে রাজনীতি।

তাই এই সময়ে উদারতাবাদ ও রক্ষণশীলতার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয় জনগণের কল্পনা দিয়ে। এতে শ্রেণীভেদ যতটা না জড়িত, তার চেয়ে বেশি জড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তারা সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতিমুখী হয়। ধর্মঘটের অধিকার ও করপোরেট ট্যাক্সেশন সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন শুধু এটাই কোনো বিষয় নয়; যৌনতা, মাদক, রক এন রোল, ল্যাটিনো উৎসব বা পশ্চিমা বিধিবিধান সম্পর্কে আপনার মনোভাবটিও দেখার বিষয়। উত্তরের শ্বেতাঙ্গ ভোটার ও দক্ষিণের সাধারণ শ্বেতাঙ্গদের কাছে এই নতুন উদারতাবাদ খুব সামান্যই অর্থ বহন করে। ষাটের দশকের টালমাটাল সময়ের মধ্যে সংগঠিত হয় অনেক হত্যাকাণ্ড, বিভিন্ন শহরে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন চলে, ভিয়েতনামে ঘটে তিক্ত পরাজয়, অর্থনীতির সম্প্রসারণে গ্যাস স্টেশনের লাইনও দীর্ঘ হয়, মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়, অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলে। ওপেকের তেলের দাম বাড়ানোর ফলে সৃষ্ট ক্ষত সেরে উঠতে না উঠতেই ইরানে আমেরিকাবিরোধী অভ্যুত্থান ছিল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো। এর ফলে 'নিউ ডিল'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কোয়ালিশন ভেঙে যায়। কোয়ালিশনের একটা বড় অংশই আরেকটি রাজনৈতিক আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

ষাটের দশকের সাথে সব সময় একটি উৎসুক সম্পর্ক অনুভব করি আমি। এক অর্থে আমি নিখাঁদ সে যুগেরই সন্তান। তখন যে সামাজিক অভ্যুত্থানটি ঘটেছিল তা না হলে হয়তো অসম বর্ণের দম্পতির ঘরে জন্ম নেয়া আমার জীবনটি হতো অন্য রকম। আমার সৌভাগ্যের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারত। যদিও তখনকার সেই পরিবর্তন পুরোপুরি অনুধাবনের বয়স আমার ছিল না। ছোটবেলার কয়েকটি বছর হাওয়াই ও ইন্দোনেশিয়ায় কাটানোর কারণে সেই সময়টিতে আমেরিকানদের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন সামনে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। ষাটের দশকের সেই পরিবর্তন

www.pathagar.com

আমি আত্মস্থ করেছি আমার মায়ের মাধ্যমে– অনেকটা পরিশোধিত রূপে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সনাতন উদারতাবাদের চেতনাটি ধারণ করে থাকতে পেরে আমার মা ছিলেন গর্বিত। নাগরিক অধিকার আন্দোলন বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছিল তাকে। তাই সুযোগ পেলেই সহিষ্ণুতা, সমতা, সুবিধাবঞ্চিতের পক্ষে দাঁড়ানোর মতো মূল্যবোধগুলো আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি।

ষাটের দশক সম্পর্কে আমার মায়ের উপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল সীমিত। এক দিকে মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে থাকা (১৯৬০ সালে হাওয়াই চলে যান মা) এবং অন্য দিকে তার অপরিবর্তনীয় ও মিষ্টি রোমান্টিক মন। বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের শক্তি বা গণতন্ত্রপন্থী ছাত্র আন্দোলন অথবা তার সেসব চুল কাটা বন্ধ করে দেয়া মেয়েবন্ধুদের বোঝার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দেশটিতে যে ক্ষোভ, প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙার স্পৃহা বিরাজ করছিল, তার মধ্যে সেই মনোভাবের অভাব ছিল। তার উদারতাবাদ সব সময় আবদ্ধ ছিল ১৯৬৭ সাল-পূর্ব সনাতনি চেতনায়। তার হৃদয় পূর্ণ ছিল মহাশূন্য কর্মসূচি, পিস কোর, ফ্রিডম রাইডস, মাহালিয়া জ্যাকসন ও জোয়ান বায়েজের প্রতিচ্ছবিতে।

আমার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমি ষাটের দশকের উত্তাল দিনগুলোর ঘটনাবলি প্রত্যক্ষদর্শীদের চেতনা উপলব্ধি করতে থাকি। আমার মনে হয়, তখনকার ঘটনাগুলো কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একের পর এক ঘটে গেছে। আমার নানা-নানীর মনের ভেতর জমাট বেধে থাকা ক্ষোভ থেকে এর কিছুটা উপলব্ধি করেছি আমি। দীর্ঘ দিনের ডেমোক্র্যাট হয়েও তারা ১৯৬৮ সালে ভোট দিয়েছিলেন রিচার্ড নিক্সনকে। তাদের এ কাজ কখনোই মেনে নিতে পারেননি আমার মা। ষাটের দশক সম্পর্কে আমার আসল উপলব্ধি ঘটে নিজস্ব খোঁজখবর নেয়া থেকে। কৈশোরে পা দেয়ার সাথে সাথে; ইতোমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বোঝার জন্য মনের ভেতর থেকেই তাগিদ অনুভব করি। তরুণ বয়সে 'ডাইউনিসিয়ান' মতবাদ প্রবলভাবে মুগ্ধ করে আমাকে। এটি সে যুগের সবকিছুকেই যেন গিলে ফেলছিল। বই, চলচ্চিত্র, মিউজিক সব কিছুর মধ্যে আমি ষাটের দশকের এমন এক ছবি দেখতাম যা ছিল আমার মায়ের দেয়া বর্ণনার সম্পূর্ণ উল্টো। যদিও সেই মুহূর্তে বিপ্লবের পেছনের ছোটার কোনো কারণ আমার কাছে ছিল না। কিন্তু এর পরও 'আচরণ ও মনোভাবে' নিজেকে একজন বিপ্লবী হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করি আমি।

কিন্তু আমার এই কর্তৃত্ববিরোধী মনোভাব হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। ইতোমধ্যে আমি কলেজে ভর্তি হই। প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেকোনো চ্যালেঞ্জ কিভাবে এর সাফল্যের সম্ভাবনা ও গোঁড়ামির মধ্যেই প্রশ্রয় পাচ্ছে, তা আমি বুঝতে শুরু করি তখন। এ সময় আমি আমার উপলব্ধিগুলোর পর্যালোচনা শুরু করি নতুন করে। মা ও নানা-নানীর শেখানো মূল্যবোধগুলো নতুন করে বোঝার চেষ্টা করি। সহপাঠীদের সাথে ডরমেটরির আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাসগুলো দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভের প্রক্রিয়াটি ধীরে এগিয়ে চলে। আগের চিন্তাগুলো থামিয়ে দিয়ে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করি। পুঁজিবাদের নিন্দা জানানো বা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের মতো

www.pathagar.com

বিষয়গুলো খুব সহজেই আমাদের আলোচনায় আসত। মূল্যবোধগুলো পুরোপুরি না বুঝেই আমরা 'মনোগ্যামির সীমাবদ্ধতা' বা 'ধর্মীয় বিধিবিধান থেকে মুক্তি' নিয়ে আলোচনা করতাম।

১৯৮০ সালে রোনাল্ড রিগ্যানের নির্বাচন আমাকে অনেক বিষয়ে বিব্রত করলেও তার আহ্বানে মুগ্ধ হই আমি। ছোটকালে হাওয়াইয়ে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোও একইভাবে মুগ্ধ করত আমাকে। পরিচ্ছন্ন সড়ক, ঝকঝকে-তকতকে যুদ্ধযানের বহর, কড়া ইস্ত্রি দেয়া সামরিক উর্দি এবং এর চেয়েও কড়া স্যালুট– আমার বালক মনে বিস্ময় জাগাত। তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কোনো বেসবল খেলা দেখার মতোই আনন্দদায়ক ছিল সেসব দৃশ্য। একটি সুশৃঙ্খল আমেরিকার ডাক দিলেন রিগ্যান। তিনি বললেন, আমরা অন্ধের মতো এগিয়ে যেতে পারি না; আমরা আমাদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক ভাগ্যটি গড়ে নিতে পারি। আর সে জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম, দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা, আশাবাদ ও বিশ্বাসের মতো গুণ এবং ঐতিহ্যগুলো নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে।

এই আহ্বান, রিগ্যানের বক্তৃতা দেয়ার দুর্দান্ত দক্ষতার কারণেই শুধু জনগণের মনে সাড়া জাগায়নি, এর মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্থবিরতার সেই সময়টিতে উদারপন্থী সরকারের ব্যর্থতাও ফুটে ওঠে। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোটাররা এই আহ্বানকে গ্রহণ করে নিজেদের সংগ্রাম হিসেবে। তখন সরকারের প্রতিটি পর্যায়েই চলছিল খামখেয়ালি। কোনো রকম চিন্তাভাবনা ছাড়াই ব্যয় হচ্ছিল করদাতাদের অর্থ। আমলারা নিজেদের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব সম্পর্কে প্রায়ই ছিলেন অসচেতন। রিগ্যান হয়তো কথিত কল্যাণ রাষ্ট্রের খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে বাড়িয়ে বলতেন। আবার, তার অভ্যন্তরীণ নীতিও ছিল ব্যাপক অর্থনীতি ঘেষা– লিবারেলদের এই অভিযোগও ঠিক ছিল। আশির দশকজুড়ে করপোরেট কোম্পানিগুলো দু'হাতে মুনাফা লুটেছে, ইউনিয়নগুলোকে ভেঙে দেয়া এবং সাধারণ শ্রমিকদের গড় আয় অনেক কমে আসা ইত্যাদি যেসব অভিযোগ ওঠে সেগুলোও অবশ্যই সত্য ছিল।

এরপরও যারা পরিশ্রম করেন, আইন মেনে চলেন, পরিবারের প্রতি যত্নশীল এবং নিজের দেশকে ভালোবাসেন এমন মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে আমেরিকাবাসীর মনে এক ধরনের অভিন্ন লক্ষ্যের চেতনা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন রিগ্যান। লিবারেলরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

প্রেসিডেন্ট রিগ্যান যে রাজনৈতিক ফর্মুলা হাজির করেন, তা আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয়নি। এর বদলে তার উদ্ভাবিত উপাখ্যানগুলো কত দিন টিকে থাকবে, তা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ৪০ বছরের ব্যবধান, ষাটের দশকের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমাদের রাজনৈতিক দর্শন বিনির্মাণে ক্রমাগত ভূমিকা রেখে চলেছে। এই দর্শনে আংশিক গুরুত্ব দেয়া হয়, ষাটের

www.pathagar.com

শুধু সাধারণ রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এর মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারটিও সক্রিয় ছিল। এই ব্যক্তিগত পছন্দই তাদের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় ও নৈতিক অবস্থান নিরূপণ করে দেয়।

আমি মনে করি ষাটের দশকের ফ্লাস-পয়েন্ট ইস্যুগুলো কখনোই পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয়নি। অপসংস্কৃতির উন্মত্ততার পরিণতি ছিল ভোক্তাবাদ, পছন্দের লাইফ স্টাইল ও সঙ্গীতের পেছনে ছোটা। এখানে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কোনো বালাই ছিল না। জাতিগত সঙ্ঘাত, যুদ্ধ, দারিদ্র্য এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের সমস্যা থেকেই যায়।

এর ব্যাখ্যা যা-ই দেয়া হোক না কেন, রিগ্যানের বিদায়ের পর রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট, উদারপন্থী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিভাজন রেখা টানা হয় মতাদর্শের ভিত্তিতে। পাশাপাশি এটাও সত্য– কার্যকর উদ্যোগ, অপরাধ, কল্যাণ, গুর্ভপাত ও স্কুল প্রেয়ারের মতো তীব্র বিতর্কিত বিষয়গুলো ছিল পুরনো সঙ্ঘাতের সম্প্রসারণ। অর্থনৈতিক নীতি শুধু উৎপাদশীলতার প্রতিযোগিতাপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন এবং ন্যায়সঙ্গত বিতরণ, সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদের ভাগ পাওয়ার মতো বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আপনাকে থাকতে হবে, কর কমানোর পক্ষে, না হয় এর বিপক্ষে। হয় থাকতে হবে ছোট সরকারে, না হয় বড় সরকারের পক্ষে। আধুনিক অর্থনীতির চাহিদার সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাব করে খরচ করার উপদেশ ভালো শোনায় না। তাই আপনাকে অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন, ড্রিলিং, স্ট্রিপ-মাইনিংকে সমর্থন করতে হবে; না হয় বেছে নিতে হবে গতিবিরুদ্ধ আমলাতন্ত্র ও লালফিতার দৌরাত্ম্যকে।

রিগ্যানের পরপরই যেসব রিপাবলিকান নেতা ক্ষমতায় আসেন তারা রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিলেন বলে আমার মনে হয়নি। সিনিয়র বুশ ও বব ডোলের মতো নেতাদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথা ও বিরক্তিপূর্ণ রাজনীতিকে আমার কাছে আরোপিত মনে হয়েছে। এটি ছিল ডেমোক্র্যাট শিবির থেকে ভোটার ভাগিয়ে নেয়ার একটি কৌশল। সুসাশনের কোনো রেসিপি তাদের হাতে ছিল না।

কিন্তু নুয়েট গিংরিচ, কার্ল রোভ, গ্রোভ নরকুইস্ট ও রালফ রিডের মতো তরুণ প্রজন্মের যেসব রক্ষণশীল কর্মী এরপরই ক্ষমতায় বসেন, তাদের উত্তেজনাপূর্ণ কথার ফুলঝুরি ছিল নির্বাচনী প্রচারণার চেয়ে বেশি কিছু। তারা যা বলতেন, তা বিশ্বাসও করতেন মনেপ্রাণে। 'নতুন কোনো কর নয়' অথবা 'আমরা একটি খ্রিষ্টান জাতি'– সবই ছিল তাদের মনের কথা। বস্তুত কট্টর মতবাদের অনুসারী এই নতুন রক্ষণশীল নেতৃত্ব, ষাটের দশকের কিছু নব্য বাম নেতার ভয়ঙ্কর আচরণের স্মৃতি মনে জাগিয়ে তোলে। বামপন্থীদের মতো রক্ষণশীলতার এই ধ্বজাধারীরা রাজনীতিকে দেখেন প্রতিযোগিতা হিসেবে। এই প্রতিযোগিতা শুধু নীতি-লক্ষ্য নিয়েই নয়; এই প্রতিযোগিতা ভালো ও মন্দের মধ্যেও। দু'দলের অ্যাক্টিভিস্টরা নিজেদের খাঁটিত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নেমে পড়েন। ফলে কোনো ডেমোক্র্যাট গর্ভপাত নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাকে একঘরে হতে হয়। যে রিপাবলিকান বন্দুক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন, তাকে যেতে হয় বনবাসে। এ সঙ্ঘাতে আপস মনোভাবকে দেখা হয় দুর্বলতা হিসেবে। এর জন্য রয়েছে শাস্তি বা শুদ্ধি ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

তুমি হয় আমার পক্ষে অথবা আমার বিপক্ষে। যেকোনো একটি পক্ষ বেছে নিতে হবে আমাকে।

মতাদর্শের এই অচলায়তন ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় একক অবদান ছিল বিল ক্লিনটনের। প্রথম নির্বাচনী প্রচারণায় রিগ্যানপন্থী বৈরি ডেমোক্র্যাটদের প্রতি তার সদিচ্ছাপূর্ণ মনোভাব, একই সাথে ঝাপসা ও স্বচ্ছ মনে হতে পারে অথবা মনে হতে পারে আতঙ্কজনক নিষ্ঠুর (যেমন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানসিক ভারসাম্যহীন বন্দীদের দণ্ড কার্যকর করার পক্ষে মত দেয়া)। প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম দু'বছরের মধ্যেই তিনি সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগের মতো মূল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পরিত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ এসব প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রবণতাগুলোকে চূড়ান্তভাবে বদলে দিতে পারত; যে প্রবণতা নতুন অর্থনীতিতেও শ্রমিক পরিবারগুলোকে উপেক্ষিত করে রেখেছে।

আমেরিকান জনগণের সামনে তুলে ধরা পছন্দগুলোর অসারতা তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন, ঠিকমতো সাজানো গেলে সরকারি ব্যয় ও আইনকানুনই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। কিভাবে বাজার ও আর্থিক শৃঙ্খলা সামাজিক ন্যায়বিচার উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে তা তিনি বুঝেছিলেন। তিনি স্বীকার করতেন, শুধু সামাজিক দায়িত্ব দিয়ে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এর ব্যক্তিগত দায়ভারও রয়েছে। দৈনন্দিন রাজনীতিতে না হলেও ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকান বিভক্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিল ক্লিনটনের এই তৃতীয় পন্থা। আমেরিকার বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক মতাদর্শবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মনে এটা স্থান করে নিতে পেরেছিল।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদের শেষ দিকে ক্লিনটনের নীতিগুলো ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তিনি ডেমোক্র্যাট দলকে অতিমাত্রায় নিংড়ে ফেলেছিলেন, যা দলটিকে আর নির্বাচনে জিততে দেয়নি। একটি গতিশীল অর্থনীতি নিয়েও জনপ্রিয় নীতিগুলো কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন তিনি। এর জন্য দায়ী নির্বাচনী এলাকাগুলোতে ডেমোক্র্যাট ভোটারের ভারসাম্য সমস্যা (বিশেষ করে দক্ষিণে রিপাবলিকান এলাকায় জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ছিল নির্ভেজাল)। পাশাপাশি, সিনেটে রিপাবলিকানদের কাঠামোগত সুবিধা। ইয়াওমিংয়ের মাত্র ৫ লাখ ভোটার দু'জন সিনেটর নির্বাচিত করলেও ক্যালিফোর্নিয়ায় ২ জন সিনেটর নির্বাচিত হন ৩ কোটি ৪ লাখ ভোটারের ভোটে।

আবার ডেমোক্র্যাটদের অনেক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় গিংরিচ, রোভ, নরকুয়েস্টসহ অন্যদের দক্ষতা। রক্ষণশীল আন্দোলনকে সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সক্ষম হন তারা। তারা করপোরেট স্পন্সর ও ধনাঢ্য দাতাদের কাছ থেকে বিপুল আর্থিক সহায়তা পান। এ অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা হয় থিংক ট্যাংক ও মিডিয়া মুখপত্রের বিশাল নেটওয়ার্ক। নিজেদের ঘাঁটিগুলো সুসংহত করতে তারা ব্যবহার করেন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। দলীয় শৃঙ্খলা জোরদার করতে তারা প্রতিনিধি পরিষদের ক্ষমতাও

www.pathagar.com

কেন্দ্রীভূত করেন।

রক্ষণশীলদের দীর্ঘমেয়াদি আধিপত্যের বিরুদ্ধে ক্লিনটন যে হুমকি রেখে গিয়েছিলেন, রিপাবলিকানরা তা বুঝতে পেরেছিলো। ক্লিনটনের বিদায়ের পর রক্ষণশীলদের উগ্রতা প্রদর্শনের কারণ এটিই। কেন তারা ক্লিনটনের নৈতিকতা নিয়ে হইচই করে এত সময় কাটিয়েছেন তার ব্যাখ্যাও এখানে পাওয়া যায়। ক্লিনটনের নীতি খুবই কট্টর বলে প্রচার করা হলেও তার জীবনী প্রমাণ করেছে এসব নীতি রক্ষণশীল প্রধান এলাকাতেই বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। চেষ্টা করলে ষাটের দশকের লিবারালিজমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো আবার ফিরিয়ে আনতে পারতেন ক্লিনটন, যা রক্ষণশীল আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে সহায়ক হয়েছিল। ক্লিনটন হয়তো এই আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে লড়াইও করেছিলেন। কিন্তু এখনকার আন্দোলন ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ফলে জুনিয়র বুশের প্রথম মেয়াদেই আমেরিকান সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে এই আন্দোলন।

আমার এ বক্তব্যে ঐতিহাসিক বিবরণের সূক্ষ্ম মান রক্ষা হয়নি– তা আমি জানি। এখানে বলা হয়নি, শিল্পোৎপাদনে মন্দা ও প্রেসিডেন্ট রিগ্যান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের বরখাস্ত করায় শুরু হওয়া শ্রমিক আন্দোলন কিভাবে আমেরিকার জন্য একটি গুরুতর জখম ছিল। এখানে বলা হয়নি, যে পদ্ধতিতে দক্ষিণে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু জেলা সৃষ্টি করা হয় এবং একই সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকতর প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে ওই এলাকায় ডেমোক্র্যাটদের আসন কমিয়ে ফেলা হয়– তার কথা। ক্লিনটনের প্রতি ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্যদের সহযোগিতারও অভাব ছিল। এসব কংগ্রেসম্যান শুধু মোটা হয়েছেন, আর ঢেকুর তুলেছেন পরিতৃপ্তির। চলমান লড়াইয়ের মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি তারা। রাজনৈতিক কূটকৌশল কংগ্রেসকে কতটা মেরুকরণের দিকে নিয়ে গেছে অথবা অর্থ ও নেতিবাচক টিভি বিজ্ঞাপন কতটা দক্ষতার সাথে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে– তাও তারা বুঝতে ব্যর্থ হন।

এখনো আমি যখন ওয়াশিংটনের সেই প্রবীণ সিনেটরের সাথে আলাপচারিতার কথা ভাবি, যখন জর্জ কেনান বা জর্জ মার্শালের লেখাগুলো বোঝার চেষ্টা করি অথবা ববি কেনেডি বা ইভার্তি ড্রিকসনের বক্তৃতাগুলো পড়ি– তখনই আমার মনে হয় আজকের রাজনীতি এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের হাতে বন্দী। আজ আমেরিকা যেসব ইস্যুর সম্মুখীন, তা বর্তমান রাজনীতিবিদদের কাছে কখনোই বিমূর্ত ছিল না। আবার তা সাধারণও ছিল না। যুদ্ধ অবশ্যই জঘন্য। আবার সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াই ঠিক কাজ। সর্বোত্তম পরিকল্পনা প্রণয়নের পরও অর্থনীতিতে ধস নামতে পারে। জীবনভর কঠোর পরিশ্রম করার পরও মানুষ হারিয়ে ফেলতে পারে সব কিছু।

তুলনামূলক স্বস্তির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের নেতৃত্বের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা জন্ম দেয় রাজনীতির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মনোভাবের। ক্লিনটন ও গিংরিচের মধ্যে টানাপড়েন

www.pathagar.com

এবং ২০০০ ও ২০০৪ সালের নির্বাচন দেখে আমার মনে হয়েছে, এ যেন 'বেবি বুম জেনারেশন'-এর মনস্তাত্ত্বিক লড়াই। কলেজ ক্যাম্পাসে যেমন দেখেছি কারো ভালো কাজের প্রশংসা না করা, অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের নানা ফন্দিফিকির– এখন জাতীয় রাজনীতির মঞ্চেও এসব নাটক চলছে। সংখ্যালঘু ও নারীদের জন্য পূর্ণ নাগরিকত্বের স্বীকৃতি আদায়, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে শক্তিশালী করা এবং কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের প্রজন্ম যে বিজয় অর্জন করেছিল, তা আমেরিকাকে জনগণের বসবাসের জন্য অনেক ভালো জায়গায় পরিণত করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যা হারিয়ে যায় তা হলো, ভাবের বিনিময়, বিশ্বাস স্থাপনের গুণ ও সহমর্মিতা। এসব গুণই আমেরিকান হিসেবে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল আমাদের। হারানো সেই গুণগুলো আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

এ পরিস্থিতি আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে? তাত্ত্বিকভাবে রিপাবলিকানরাও হয়তো একজন ক্লিনটন পেতে পারেন। ক্লিনটনের আর্থিক সংরক্ষণবাদ নীতির সমর্থক একজন মধ্য-ডানপন্থী নেতাও দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। যিনি আরো কড়া আমলাতন্ত্রের প্রসার ঘটানো এবং সামাজিক নীতির বাজার অথবা আস্থাভিত্তিক সমাধান নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারেন। কিন্তু সেরকম নেতার আগমন ঘটেনি আজো।

নির্বাচিত সব রিপাবলিকান নেতাও বর্তমান রক্ষণশীল আন্দোলনের সাথে একমত নন। সব রাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে এমন অনেকে আছেন যারা সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার মতো সনাতন রক্ষণশীল গুণগুলো আঁকড়ে আছেন এখনো। অনেকেই স্বীকার করেন, ধনীদের কর কমিয়ে ঋণের বোঝা বাড়ানো দায়িত্বহীন কাজ হয়েছে। ঘাটতি কমানোর বোঝা গরিবের পিঠে চাপানো যায় না, রাষ্ট্র থেকে গীর্জাকে আলাদা রাখা প্রয়োজন দু'টির সুরক্ষার জন্যই। আর পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত নিরেট তথ্যভিত্তিক। এটি মনে হয়েছে, তাই ওটা করা উচিত– এরকম নয়।

কিন্তু এসব রিপাবলিকানদের চিন্তাধারা বিগত বছরগুলোর বিতর্কে তেমন 'হালে পানি' পায়নি। এর বদলে, ২০০০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রেসিডেন্ট বুশ যে 'সহনশীল রক্ষণবাদের' অঙ্গীকার করেছিলেন এবং যা আজ রিপাবলিকানদের মূল আদর্শ– তা কোনো রক্ষণবাদ নয়; তা পুরোপুরি নিরঙ্কুশবাদ (এবসলিউটিজম)। এ আদর্শে মুক্তবাজারকেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ধনীদের জন্য কর নেই, আইন নেই, গরিবদের কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই– ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার দিকে নজর দেয়ার বাইরে সরকারের কোন কাজও নেই।

ধর্মীয় নিরঙ্কুশবাদের বিস্তার ঘটানো হয়েছে এখানে। ফলে গর্ভপাতের মতো জটিল ইস্যুতে বিতর্ক জমে ওঠার সুযোগ পায়। নিরঙ্কুশবাদের আন্দোলন শুধু খ্রিষ্টবাদকেই আমেরিকার একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস বলে দাবি করছে না– কট্টর এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সরকার পরিচালনার দাবি করছে, সমঝোতার বিকল্প কোনো উৎসকে গ্রাহ্যই করা হচ্ছে না। সেটি উদারপন্থী তাত্ত্বিকের কোনো লেখাই হোক, আর হোক ন্যাশনাল একাডেমি অব সাইন্সের কোনো আবিষ্কার। থমাস জেফারসনের কথাও এখানে মূল্যহীন।

www.pathagar.com

এখানে বিশ্বাসটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে যারা ক্ষমতা দখল করতে পেরেছেন তাদের কর্তৃত্ব। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের (আদালত, সংবিধান, সংবাদমাধ্যম, জেনেভা কনভেনশন, সিনেটের রীতিনীতি বা সরকারি প্রশাসনের অনুসৃত ঐতিহ্য) তেমন তোয়াক্কা করা হয় না। আর তাই এই নিরঙ্কুশবাদ নতুন জেরুসালেমের পথে আমাদের যাত্রার গতিও ধীর করে দিয়েছে।

অবশ্য ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেও রয়েছেন এমন আপসহীন মতের সমর্থক। তবে তারা একজন রোভ বা একজন ডিলের মতো ক্ষমতা লাভের জন্য এগিয়ে যাননি। তারা দলের ওপর নিজের ক্ষমতা জাহির করতে চাননি। তারা দলের অনুগত থেকেই নিজের কট্টর চিন্তাধারা আইনের আওতায় আনতে কাজ করে গেছেন। দলের মধ্যে আঞ্চলিক, জাতিগত ও অর্থনৈতিক মতপার্থক্য; নির্বাচনী এলাকার মানচিত্র ও সিনেটের কাঠামো, নির্বাচনী ব্যয়নির্বাহের জন্য ধনীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ– এসব কিছুই ডেমোক্র্যাটদের দলীয় আদর্শ ও নীতিচ্যুত হতে বাধা দিয়েছে। আমি এমন কয়েকজন নির্বাচিত ডেমোক্র্যাটকে জানি যাদের প্রকৃতি উদার মতবাদের সাথে খাপ খায় না। কংগ্রেসের ব্ল্যাক ককাসের প্রায় প্রতিটি সদস্য যেমন মনে করেন তার পাপের জন্য যিশুখৃষ্ট জীবন দিয়ে গেছেন, তেমনি আমেরিকান সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী জন কেরি এবং হিলারি ক্লিনটন আস্থাশীল পুঁজিবাদের প্রতি।

আমরা ডেমোক্র্যাটরা বেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন অনেকে আছেন যারা পুরনো রীতিনীতি মেনে চলছেন এখনো। সীমা লঙ্ঘন করে রিপাবলিকানদের নেয়া যেকোনো নতুন ব্যবস্থা এবং সামজিক কর্মসূচি সমর্থন করেন তারা। এরপরও লিবারেল ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলোর কাছে তারা শতভাগ আস্থাভাজন। কিন্তু ডেমোক্র্যাটদের দম এখন ফুরিয়ে এসেছে। তাই এখন বিশ্বায়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী নতুন চিন্তাধারা প্রয়োজন। জ্বালানি থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি পর্যন্ত– সবখানে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে হবে।

ডেমোক্র্যাট পার্টি যেন একটি প্রতিক্রিয়াশীল দলে পরিণত হয়েছে। অপরিকল্পিত একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমরা সব ধরনের সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে পড়েছি। বাজারই সব সমস্যার সমাধান বলে যারা দাবি করেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আমরা বিরাজমান সমস্যা মোকাবেলায় বাজারনীতি প্রয়োগের চেষ্টারও বিরোধিতা করছি। ধর্মের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে আমরা সহিষ্ণুতাকে সেক্যুলারিজমের সমর্থক করে ফেলেছি। আমরা নির্বাচনে হেরে আশা করে বসে আছি। আর ভাবি আদালত রিপাবলিকানদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবে। যখন আদালতেও হারলাম তখন হোয়াইট হাউসে কোনো কেলেঙ্কারি হয় কি না তার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা।

আমি ডেমোক্র্যাট অ্যাক্টিভিস্টদের এই মর্মবেদনা বুঝি। অপবাদের ছুরিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে বারবার নির্বাচনের জেতার রিপাবলিকান কৌশলটি বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এর বিপদটিও অনুভব করতে পারছি আমি। আমি জানি, বুশ

www.pathagar.com

প্রশাসনের এমন অনেক নীতি আছে যা অসদাচরণ ও অবিচারকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিপন্ন করে চলেছে।

তবে আমি মনে করি ডেমোক্র্যাটরা আরো কট্টর দলীয় ও আদর্শিক কৌশল অনুসরণ করতে থাকলে, আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তার আরো অবনতি ঘটবে। যখনই আমরা কোনো কিছু কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলব, আমাদের কারণগুলো অতি সরলীকরণ অথবা ফুলিয়ে ফাপিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করব, তখনই আমাদের পরাজয় ঘটবে– এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। রাজনৈতিক বিতর্কে নিশ্চুপ থাকলেও হেরে যাবো আমরা। খাঁটি আদর্শের অনুসারী হওয়া, গোঁড়ামি ও অসার রাজনৈতিক বিতর্ক আমাদের নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপায় অনুসন্ধান থেকে বিরত রাখছে। এগুলো আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে বিপরীতমুখী চিন্তায়। মতবাদের ফুলঝুড়ি ও দলীয় চিন্তার বাইরে যেতে না পারা আমেরিকাবাসীকে রাজনীতিবিমুখ করে তুলছে। এটি শুধু রক্ষণশীলদেরই সমস্যা নয়, অথবা এমন কারো সমস্যা নয় যিনি বিতর্কের নোংরা ভাষা, অসৎ অপবাদ শুনে দু'দলকেই সহজে ছুড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা, আমেরিকাবাসীর জন্য সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নে সরকারের একটি ভূমিকা আছে বলে বিশ্বাস করি, তাদের কাছে কট্টর দলীয় ভোটার কোনো ভালো জিনিস নয়।

এ পরিবর্তনের জন্য, শুধু ডেমক্র্যাটিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলেই চলবে না; লাগবে ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান ও স্বতন্ত্র নির্বিশেষে সবার সদিচ্ছা– যারা জাতীয় পুনর্গঠনে সম্মিলিতভাবে অংশে নেবেন। নিজের স্বার্থটির সাথে অন্যের স্বার্থও জড়িয়ে আছে– এ বোধও থাকতে হবে তাদের।

এ রকম কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ সহজে পাওয়া যাবে বলেও আমি মনে করি না। কিন্তু এটি পাওয়া ছাড়াও আমাদের কোনো উপায় নেই। কারণ আমেরিকার সমস্যাগুলোর সমাধান করা সত্যিই কঠিন। এ জন্য নিতে হবে কঠিন সিদ্ধান্ত– করতে হবে সবরকম আত্মত্যাগ। রাজনৈতিক নেতাদের স্বাগত জানাতে হবে নতুন ধ্যান-ধারণাকে।

২০০৫ সালে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নিয়োগের পক্ষে ভোট দেয়ায় আমার অনেক সহকর্মীকে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ও অ্যাক্টিভিস্টদের তীব্র সমালোচনা সইতে হয়। আমি রবার্টসের বিরুদ্ধে ভোট দেয়ায় আমার অফিস স্টাফদের অনেকেই বিচলিত বোধ করেন। তারা ভেবেছিলেন ডেমোক্র্যাট দলের ওই সরব অংশটিকে উসকে দেয়ার কোনো কারণ আমার ছিল না। অনেকে আমার কাজকে সমর্থনও জানান। আবার অনেকে আমাকে ভেবেছেন অতিমাত্রায় আদর্শবাদী হিসেবে। তাদের মতে, আমি যে ধরনের রাজনীতির কথা বলছি; তা রিপাবলিকানদের গণসংযোগ মেশিনারির সামনে টিকতে পারবে না।

হয়তোবা সমালোচকদের কথাই ঠিক। হয়তোবা আমাদের এ রাজনৈতিক মহাবিভাজন দূর করার কোনো উপায় নেই। সেনাবাহিনীর বিরতিহীন এই যুদ্ধ চলবে

www.pathagar.com

হয়তোবা সমালোচকদের কথাই ঠিক। হয়তোবা আমাদের এ রাজনৈতিক মহাবিভাজন দূর করার কোনো উপায় নেই। সেনাবাহিনীর বিরতিহীন এই যুদ্ধ চলবে এবং এ পরিস্থিতি বদলানোর যেকোনো চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হয়তো রাজনীতির এই সঙ্ঘাত এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে যেখান থেকে ফেরার আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমি নিজের কথা ভাবি। ভাবি সেসব সাধারণ মানুষের কথা, যারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। যারা অন্তত নিজের জীবনের জন্য এবং প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বসবাসের জন্য হলেও একটি পথ খুঁজে পেতে চায়; আমি মনে করি, তারা এমন এক পরিণত রাজনীতি চায় যেখানে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে থাকবে ভারসাম্য। তারা সবসময় ডান ও বামপন্থী, রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের যুক্তিতর্ক বোঝার চেষ্টা করবেন না; কিন্তু গোঁড়ামি ও সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য, দায়িত্বশীল ও দায়িত্বহীনতা এবং টেকসই ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসটি ঠিকই চিনে নিতে পারবেন তারা ।

পথে বেরিয়ে পড়েছেন তারা, অপেক্ষায় আছেন ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকানদের জন্য ।

www.amarboi.org

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

মূল্যবোধ

www.amarboi.org

১৯৮৪ সালে আমি প্রথম হোয়াইট হাউস দেখি। কলেজ থেকে সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েশন করে বেরিয়েছি। কাজ করছি নিউইয়র্কের সিটি কলেজের হার্লেম ক্যাম্পাসের কাছে, একজন কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে। সে সময় প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ছাত্রদের বেশ কিছু সুবিধা বিলোপের প্রস্তাব করেন। তাই, আরো কিছু ছাত্রনেতার সাথে আমিও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি পিটিশন নিয়ে নিউইয়র্কের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে জমা দিতে ওয়াশিংটন যাই।

আমার সফরটি ছিল সংক্ষিপ্ত। রেবার্ন ভবনের অগণিত করিডোর পার হতে ব্যয় হয় সফরের বেশিরভাগ সময়। ক্যাপিটল হিলের কর্মচারীরা দায়সারা গোছের হলেও আমাদের সাথে নম্র ব্যবহার করেন। এদের অধিকাংশের বয়স আমার চেয়ে বেশি ছিল না। দিনের শেষভাগটি আমরা রেখেছিলাম ক্যাপিটল ভবনের মলে হাঁটা এবং ওয়াশিংটন মনুমেন্ট দেখার জন্য। সেই সাথে হোয়াইট হাউসের রূপটিও একনজর দেখে নেবো বলে ঠিক করি। আমি দাঁড়িয়েছিলাম পেনসিলভানিয়া এভিনিউতে। হোয়াইট হাউসের প্রধান প্রবেশপথে। মেরিন প্রহরীদের স্টেশন থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। আমার পাশ দিয়ে অনেক পথচারী হেঁটে যাচ্ছিল। পেছন থেকে শোনা যাচ্ছিল ছুটে চলা গাড়ির হু হু শব্দ। কিন্তু হোয়াইট হাউসের দৃষ্টিনন্দন রাজকীয় ভঙ্গি আমাকে ততটা মুগ্ধ করতে পারেনি, যতটা মুগ্ধ হয়েছি সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অবারিত সুযোগ দেখে। একেবারে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখার সুযোগ দেয়া হয় আমাদের। এরপর ঘুরে ভবনের পেছন দিকে যাই রোজ গার্ডেন ও প্রেসিডেন্টের আবাসস্থল দেখার জন্য। হোয়াইট হাউসের এই অনাবৃত রূপ আমার কাছে গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকাবাসীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়েছে। মনে

www.pathagar.com

হয়েছে, আমাদের নেতারা আমাদের চেয়ে ভিন্ন কোনো মানুষ নন। হোয়াইট হাউসের উদারতা তারই চিহ্ন বহন করছে।

কিন্তু বিশ বছর পর আবার যখন আমি সেখানে যাই, সেই সাধারণ হোয়াইট হাউসকে আর খুঁজে পেলাম না। চেক পয়েন্ট, বর্ম পরিহিত প্রহরী, পুলিশভ্যান, শিকারি কুকুর আর স্থায়ীভাবে বসানো ব্যারিকেড হোয়াইট হাউসের চারপাশে দুই ব্লক এলাকা পুরোপুরি সিল করে দিয়েছে। অনুমতিবিহীন কোনো গাড়ি এখন আর পেনসিলভানিয়া এভিনিউতে চলে না। সিনেটে শপথ নেয়ার ঠিক এক দিন আগে জানুয়ারির এক শীতল সন্ধ্যায় আমার গাড়িটি যখন হোয়াইট হাউসের গেট দিয়ে ঢুকছিল, তখন তাকিয়ে দেখি লাফায়েত্তি পার্কটি একেবারে জনশূন্য। কী হারিয়েছি– সে কথা মনে করে হঠাৎ বেদনায় ভরে ওঠে আমার মন।

টিভি'র ছবিতে যেমনটা দেখি, হোয়াইট হাউসের ভেতরটা কিন্তু ততটা বর্ণাঢ্য নয়। পরিপাটি করে সাজানো, তবে এর গায়ে বয়সের ছাপ পড়েছে। শীতের রাতে পুরনো কোনো বাড়ির বিশাল কোনো কক্ষে দাঁড়ালে যে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়, এখানেও তেমনি। হোয়াইট হাউসের প্রবেশকক্ষে কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে দৃষ্টি বুলালাম করিডোরের দিকে। এই স্থানটিতে সৃষ্টি হওয়া ইতিহাসগুলো একে একে উঁকি দিতে থাকে মনের পর্দায়। কিউবান মিসাইল সঙ্কট নিয়ে পরামর্শে ব্যস্ত জন ও ববি কেনেডি; শেষ মুহূর্তে রেডিও'র ভাষণে পরিবর্তন আনছেন রুজভেল্ট; লিংকন হাল ধরে আছেন– একাকী কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন জাতির বোঝা– ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়।

হোয়াইট হাউসের লেজিসলেটিভ স্টাফ এসে স্বাগত জানান আমাকে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যান গোল্ড রুমে। সেখানে অনেক নবনির্বাচিত হাউস ও সিনেট সদস্য জড়ো হয়েছেন ইতোমধ্যে। ঘড়ির কাঁটা ঠিক চারটার ঘর ছোঁয়া মাত্র নাম ঘোষণা করা হয় প্রেসিডেন্ট বুশের। বক্তব্য রাখার জন্য সামনে মঞ্চের দিকে হেঁটে গেলেন তিনি। এ সময় প্রেসিডেন্টকে বেশ তেজস্বী ও উপযুক্ত মনে হচ্ছিল। সুদৃঢ় পদক্ষেপ প্রমাণ করে দিচ্ছিল তিনি সময়সূচি মেনে চলতে অভ্যস্ত। দশ মিনিট বা এ রকম কিছু সময় তিনি কথা বলেন। কৌতুকও করেন কিছু। হোয়াইট হাউসের আরেক পাশে আপ্যায়ন ও ফটোসেশনে যাওয়ার আগে দেশকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তখন আমি কিছুটা ক্ষুধার্ত ছিলাম। তাই অন্যরা যখন প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডির সাথে ছবি তোলার জন্য লাইন দিচ্ছিলেন, আমি পা বাড়ালাম খাবার টেবিলের দিকে। মুখে খাবার পুরে আশপাশের দু-একজনের সাথে টুকরো কথার ফাঁকে আমার মনে পড়ে যায় এর আগে আরো দু'বার প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলার স্মৃতি। নির্বাচনে জেতার পর প্রথম অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে কল করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসের এক প্রাতঃরাশ অনুষ্ঠানে। সিনেটে প্রথমবার নির্বাচিত সদস্যদের সম্মানে আয়োজন করা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান। দু'বারই তাকে পছন্দ করার মতো লোক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সুশৃঙ্খল হওয়ার পাশাপাশি সোজাসাপটা আচরণই দু-দু'বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছে তাকে। এমন

www.pathagar.com

এক মানুষ হিসেবে তাকে কল্পনা করা যায়, যিনি যেকোনো আলোচনাতেই হতে পারেন একজন ভালো সঙ্গী।

প্রাতঃরাশের সাক্ষাৎটি আমার মনে পড়ে। কেউ খাচ্ছিলেন, টুকটাক কথা বলছিলেন কেউ। প্রেসিডেন্ট এ সময় আলোচনা শুরু করেন তার দ্বিতীয় মেয়াদের কর্মসূচি নিয়ে। এর বেশিরভাগ ছিল তার নির্বাচনী পয়েন্টগুলোর পুনরুল্লেখ। ইরাকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্যাট্রিয়ট আইনের নবায়ন, সোশ্যাল সিকিউরিটি রিফর্মের প্রয়োজনীয়তা, কর-কাঠামো ঢেলে সাজানো ইত্যাদি। হঠাৎ মনে হয়, পেছনের রুমে কেউ সজোরে কোনো কিছুর সুইচ টিপেছে। প্রেসিডেন্টের চোখ স্থির হয়ে যায়, গলার স্বরে ফুটে উঠে রাগের আভাস। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নেন তিনি। আমি আমার রিপাবলিকান সিনেট কলিগদের দিকে তাকালাম। যারা প্রেসিডেন্টের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলেন। আমার মনে পড়ে যায় ক্ষমতা কিভাবে মানুষকে বিপজ্জনক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশের প্রতিষ্ঠাতারা যে বিচক্ষণ ব্যবস্থা করে গেছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

হঠাৎ 'সিনেটর' ডাকে আমি সম্বিত ফিরে পাই। চোখ ফিরিয়ে দেখি হোয়াইট হাউসের গুটি কতক কৃষ্ণাঙ্গ স্টাফদের একজন এক প্লেট খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার জন্যই প্লেটটি নিয়ে এসেছেন একজন স্টাফ। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্লেট হাতে নিই। চিকেন বা এ ধরনের কিছু মুখে পুরে তাকিয়ে দেখি প্রেসিডেন্টের চার পাশের ভিড়টি একদম হাওয়া। তাই এবার মেজবানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে তার রুমের দিকে আমি পা বাড়াই। দরজায় দাঁড়ানো এক তরুণ মেরিন আমাকে জানায়, ফটোশেসন শেষ হওয়ায় এবার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রতি মনোযোগ দেবেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমি ফিরতি পথে পা বাড়ানোর আগেই দোরগোড়ায় উদয় হলেন প্রেসিডেন্ট। আর, ডাক দিলেন আমাকে।

আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ওবামা, এদিকে এসো। লরা আছে এখানে। ফার্স্ট লেডির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন আমার। এরপর প্রেসিডেন্ট ঘরের এক কোণায় টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে। নিচু স্বরে বললেন, 'তোমাকে একটা উপদেশ দিলে কিছু মনে করবে না নিশ্চয়ই।' অবশ্যই না, মিস্টার প্রেসিডেন্ট– বললাম আমি। মাথা নাড়লেন তিনি। বললেন, তোমার সামনে খুবই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। এখানে সবাই আরেকজনের পদস্খলনের সুযোগ নেয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে– এ কথা বললেন আমাকে। আরো বললেন, তার সাথে নাকি কিছু বিষয়ের মিল আছে আমার। কী সেটা, জানতে চাইলাম আমি। আমাদের দু'জনকেই অ্যালান কিজকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে হয়েছে। আমি হাসলাম এবং করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকে বললাম, আমার নির্বাচনী প্রচারণার কিছু কাহিনী। কিন্তু রুম থেকে তার চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, কথার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য আমার হাতটি তার কাঁধে উঠে গিয়েছিল। এটা হয়েছিল আমার অসচেতনতায়, অভ্যাসের কারণে। আমার ধারণা, এতে রুমের সিক্রেট সার্ভিস

www.pathagar.com

এজেন্টদের কথা না হয় বাদই দিলাম, আমার অনেক বন্ধুকেও ফেলে দিয়েছিলাম এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে।

সিনেটে যোগ দেয়ার পর আমি বুশ প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করি। ধনীদের জন্য কর মওকুফের বিষয়টি যেমন ছিল দায়িত্বহীন, নৈতিকভাবে তেমনি সমস্যার কারণ। অর্থবহ স্বাস্থ্যসেবা নীতির অনুপস্থিতি, কার্যকর জ্বালানি নীতির অভাব এবং আমেরিকাকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করার কোনো কৌশল না থাকার জন্য প্রশাসনের সমালোচনা করি। ২০০২ সালে সিনেটে আমার প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণার ঠিক আগে শিকাগোর এক যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম– ইরাকের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে কী প্রমাণ আছে? পাশাপাশি এটাও বলি, ইরাকে হামলার জন্য মার্কিনিদের অনেক বড় মূল্য দিতে হবে। বাগদাদ বা মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখন যেসব খবর আসছে, তা প্রমাণ করে আমার অনুমান মিথ্যা ছিল না।

তাই যখন আমি বলি, বুশ খুব একটা খারাপ মানুষ নন, তখন আমার অনেক ডেমোক্র্যাট সহকর্মীও বেশ বিস্ময়বোধ করেন। আমি মনে করি, আসলে দেশের জন্য যা ভালো হবে বলে বুশ ও তার প্রশাসন মনে করছে, তারাতো সেটাই করছেন।

বুশের প্রতি আমার এই মনোভাব ক্ষমতার কোনো প্রলোভনে নয়। হোয়াইট হাউসের আমন্ত্রণকে আমি সাধারণ কোনো রাজনৈতিক সৌজন্যতার বেশি কিছু দেখি না। বুশ প্রশাসনের কোনো এজেন্ডা যখন প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন তখন কিভাবে সেই বিরোধিতা নস্যাতের জন্য বেরিয়ে এসেছে লম্বা ছুরি– সেটাও আমি দেখেছি। ইরাকে প্রিয়জনকে হারিয়েছে এমন কাউকে আমি যখন চিঠি লিখি, অথবা ছাত্রসহায়তা কেটে দেয়ায় কলেজ থেকে ঝরে পড়া কারো বাবা-মায়ের পাঠানো ই-মেইল পড়ি; তখনই ভাবি ক্ষমতার এই দাপটের ভয়াবহ পরিণতির কথা। অথচ যারা এর জন্য দায়ী, এর মূল্য কখনোই তাদের পরিশোধ করতে হবে না।

সিনেট অফিসে বসার পর দেখি প্রেসিডেন্ট এবং তার চার পাশের সবাই অন্যদের মতোই সাধারণ মানুষ। তারাও ভালো-মন্দ মিশিয়ে, তারাও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং তাদের মনেও চাপা দেয়া আছে দীর্ঘদিনের ক্ষত। তাদের রাজনীতি কতটা ভুল এবং এর পরিণতির জন্য তাদের কতটা দায়ভার নিতে হবে এসব নিয়ে যতই চিৎকার করি না কেন, আমি এখনো মনে করি এসব মানুষের সাথে কথা বলা যায়। তাদের উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করা যায়। আমি যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, তাদের কাছ থেকে এর স্বীকৃতিও আদায় করা যায়।

তবে ওয়াশিংটনে এই মনোভাব নিয়ে চলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ক্যাপিটল হিলে নীতিনির্ধারণী বিতর্কগুলোতে ঝুঁকি অনেক বেশি। আমাদের তরুণ ছেলেমেয়েদের যুদ্ধে পাঠাব কি না অথবা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া হবে

www.pathagar.com

কি না– এসব বিতর্কে সামান্যতম মতপার্থক্যও বিশাল অর্থবহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। দলীয় আনুগত্যের দাবি, নির্বাচনী প্রচারের দিকে খেয়াল রাখা এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর সজ্ঞাত উসকে দেয়ার চেষ্টা– এ সবকিছুই এক সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। ওয়াশিংটনে কাজ করা বেশিরভাগ মানুষ হয় আইনজীবী, না হয় রাজনৈতিক কর্মী। তাদের কাজই হলো লাভ দেখানো অথবা বিতর্কে জেতার মতো যুক্তি হাজির করা। সমস্যার সমাধান নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। ওয়াশিংটনে আমি এমন কাউকে পাইনি, যে কিনা মূল্যবোধের মৌলিক পার্থক্যের কারণে দ্বিমত করেছে আমার সাথে। তার এই বিরোধিতার পেছনে আছে কিছু খারাপ বিশ্বাস, আছে কিছু খারাপ মানুষ।

ওয়াশিংটনের বাইরে আমেরিকাকে ততটা বিভক্ত মনে হবে না। ইলিনয়ের কথাই ধরা যাক। এক দশক আগের চেয়ে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত হয়েছে এটি। এটি হয়েছে অংশত নগরায়নের কারণে, আর অংশত লিংকনের এই জন্মভূমিতে রিপাবলিকানদের বর্তমান কট্টর রক্ষণশীলতা প্রভাব ফেলতে না পারায়। ইলিনয় এখনো প্রতিনিধিত্ব করছে পুরনো আমেরিকার। নিউইয়র্ক বা লস এঞ্জেলসের মতো বড় বড় শহরের সব বৈশিষ্ট্য হয়তো শিকাগোতে পাওয়া যাবে কিন্তু ইলিনয়ের দক্ষিণ প্রান্তটি ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে লিটল রক বা লুইসভিলের অনেক কাছাকাছি। রাজ্যের বিস্তীর্ণ তৃণভূমিও বিবেচনার যোগ্য। আধুনিক রাজনীতির পরিভাষায় যাকে 'লালের একটি গভীর ছায়া' নামে অভিহিত করা হয়।

ইলিনয়ের দক্ষিণাঞ্চলে আমি প্রথম সফরে যাই ১৯৯৭ সালে। রাজ্য সিনেটে সেটা আমার প্রথম মেয়াদ। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল এবং মিশেল ও আমি মা-বাবা হইনি তখনো। সিনেট মুলতবি; মিশেলও তার ল' স্কুল নিয়ে ব্যস্ত। তাই সিনেট সহকারী ড্যান সুমনকে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আমি বেরিয়ে পড়ি। ড্যান ছিল ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টার। পাশাপাশি সে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় বেশ কিছু সমাবেশ আয়োজনে সাহায্য করেছে আমাকে। ফলে এই ভূখণ্ড তার ভালোই চেনা। যেসব এলাকায় যাব বলে ভেবেছি, সেখানকার মানুষ আমাকে কিভাবে নেবে তা ভেবে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ড্যান আমাকে পোশাকের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। লিনেন বা সিল্কের কোনো ফেন্সি পোশাক পরা চলবে না, সাধারণ খাঁকি প্যান্ট আর পোলো শার্ট পরেই চলতে হবে।

আমাদের সফর শুরু হলো। প্রচণ্ড গরমে হাঁফিয়ে উঠলে দিনে একবার থামি গলফ খেলার জন্য। তা না হলে ড্রাইভিং সিটে বসেই পেরিয়ে যাই মাইলের পর মাইল। কখনো বিস্তীর্ণ শষ্যক্ষেত, কখনো ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় অনেক শহর পেরিয়ে যাই আমরা। দেখি বিচিত্র সব মানুষ। বিচিত্র তাদের জীবনযাত্রা। শিকাগোয় বসে যা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

চেস্টার শহরে যাওয়ার পর হালকা কিছু খাওয়ার জন্য সেখানকার মেয়রের সাথে একটি কফি শপে ঢুকি আমরা। এই শহরের তরুণ প্রজন্ম পাড়ি জমাচ্ছে বড় শহরগুলোর দিকে। এখানকার নির্মাণ শিল্প বা কয়লাখনিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানলাম, স্থানীয়

www.pathagar.com

হাইস্কুলের ফুটবল টিমের দুর্দান্ত নৈপুণ্যের কথা। আসছে মৌসুমে বড় রকমের সাফল্য লাভের আশা করছে তারা। জানলাম, এখানকার প্রবীণ কল্যাণ অফিসটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বয়স্ক মানুষদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য শহর থেকে এই সুবিধা নিয়ে আসতে হচ্ছে। কেনিয়ায় মিশনারির কাজ করেছে এমন এক মহিলা 'সোহাইলি' ভাষায় আমাকে অভিবাদন জানাল। দেখলাম ট্রাক্টরের পিঠে চড়ার আগে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পাতায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন এক কৃষক। ডু কুইন শহরে ডেমোক্র্যাট পার্টি অফিসের ছোট খাবার টেবিলে আমার কথা হয় স্থানীয় অ্যাটর্নির সাথে। জানতে চাইলাম, প্রধানত গ্রাম ও শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত তার এলাকায় অপরাধপ্রবণতার কথা। ভেবেছিলাম তিনি বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছেন– এমন জবাব পাবো।

উত্তর পেলাম, 'গ্যাংস্টারদের চ্যালাদের উৎপাতে চোখে ঘুম নেই। এখানে ছেলেমেয়েরা বেকার। তারা মাদক বিক্রি করছে। দিন দিন বেড়েই চলেছে এই বাহিনী।'

সপ্তাহান্তে ঘরে ফিরতে আমার বেশ কষ্ট হলো। এই কয়েক দিনে আমার অনেক নতুন বন্ধু তৈরি হয়েছে এটা সে কারণে নয়। এর কারণ ছিল, যেসব নারী ও পুরুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি তাদের সবার মধ্যেই আমি নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেছি। আমার নানার উদারতা; সত্যের প্রতি আমার নানীর অবিচল আস্থা এবং আমার মায়ের দয়ালু মন আমি এদের মাঝে খুঁজে পেয়েছিলাম। এখানকার সব কিছুই অতি পরিচিত বলে মনে হয়েছে আমার।

ইলিনয়ের যেখানেই গিয়েছি সেখানেই এই পরিচিতি আমার মনে দাগ কেটেছে। শিকাগোর পশ্চিম প্রান্তে কোনো ডিনার টেবিলে কিংবা পিলসেনের কোনো পার্কে সকার খেলায় কোনো ল্যাটিনো বাবা-মাকে যখন সন্তানকে উৎসাহ দিতে দেখি, তখন এটা অনুভব করেছি আমি। শিকাগোর উত্তর উপকণ্ঠে এক ইন্ডিয়ান বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েও এ অনুভূতি হয়েছে আমার।

শুধু ইলিনয় নয়, আমেরিকাজুড়েই জাতিগোষ্ঠীর স্বভাব-সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে চলেছে অব্যাহতভাবে। এই মিশ্রণ কোনো শৃঙ্খলা না মানলেও সাধারণত তা শান্তিপূর্ণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পরিচিতির জড়াজড়ির মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে সহাবস্থান। আমেরিকানদের সাথে কথা বলে কিছু সময় কাটালেই বোঝা যায়, ধর্মপরায়ণ মানুষগুলো অনেক বেশি সহনশীল। সবচেয়ে সেকুলার মানুষটিও সবচেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক। অথচ মিডিয়া আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে দিতে চায় না। বেশিরভাগ ধনী চান প্রতিবেশী গরিবটিও সফল হোক। বেশিরভাগ গরিব অনেক বেশি আত্মসমালোচক। তাদের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ সবচেয়ে বেশি। রিপাবলিকান প্রধান এলাকাগুলোর ৪০ শতাংশ মানুষই ডেমোক্র্যাট। এর উল্টোটাও ঠিক। সাধারণ মানুষের কাজে উদারপন্থী বা রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই আমেরিকানদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধটি অভিন্ন– সেই প্রশ্ন সামনে

www.pathagar.com

এসেছে এখন। ২০০৪ সালের নির্বাচনের পরপরই দেশজুড়ে চালানো এক 'এক্সিট পোল' বা জনমত সমীক্ষার ফল প্রকাশ পায়। এতে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বলেন, ভোট দেয়ার সময় তাদের চিন্তায় সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে নৈতিক মূল্যবোধ। তাই ডেমোক্র্যাটদের পরাজয় দেখে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা দ্রুত মত দিয়ে ফেলেন, সমবিয়ের মতো সামাজিক ইসুগুলো কাজ করেছে এর পেছনে। কিন্তু পরে যখন আবার নির্বাচনী ফল নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তখন দেখা যায়, ভোটাররা নির্বাচনে 'জাতীয় নিরাপত্তা'কেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যদিও ভোট দানের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ বিবেচনাটি সব সময় তাদের মধ্যে ছিল।

মূল্যবোধ নিয়ে বিতর্ক থেকে ডেমোক্র্যাটদের পালিয়ে যাওয়াকে ভুল বলে মনে করি আমি। যেমন ভুল মনে করি, ডেমোক্র্যাট ঘাঁটি থেকে ভোটার ছুটিয়ে নিতে মূল্যবোধ ইসুটি কাজে লাগানোকেও। বেশিরভাগ আমেরিকান সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তাদের জীবনের মান ও নীতিকে। আর আমাদের রাজনীতির প্রাণও এটাই হওয়া উচিত। আমাদের বাজেট বা প্রকল্প, আইন ও নীতি– জনগণকে ঘিরেই আবর্তিত হতে হবে।

'আত্মোপলব্ধির জন্য আমরা এসব সত্যকে ধারণ করে আছি– সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট, সৃষ্টিকর্তা কিছু অনপনেয় অধিকার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাদের। এগুলো হলো– জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের অনুসন্ধান।'

আমেরিকান হিসেবে এ সাধারণ কথাগুলো আমাদের যাত্রার সূচনাবিন্দু। এতে শুধু আমাদের সরকারের ভিত্তিটিই বর্ণনা করা হয়নি; এটিই আমাদের অভিন্ন বিশ্বাসেরও সারমর্ম। আমেরিকানরা হয়তো ওপরের কথাগুলো মুখে আওড়াতে পারেন। কিন্তু, জিজ্ঞেস করা হলে তাদের খুব কম জনই পারবেন, অষ্টাদশ শতকে লিবারেল ও রিপাবলিকান চিন্তাধারায় 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র মূলবিন্দুটি খুঁজে বের করতে। এ ঘোষণার পেছনে যে মৌলিক ধারণাটি কাজ করেছে তা হলো– এ বিশ্বে আমরা জন্ম নিয়েছি মুক্তভাবে। আমাদের সবাই এসেছি একগুচ্ছ অধিকার নিয়ে, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে তা পারি এবং ক্ষমতাবানরা যা চায় আমাদের জীবনকেও সে রকম বানাতে পারে– এখনকার আমেরিকানরা এটিই বোঝেন। এটি আমাদের বিন্যস্ত করছে, নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

আসলে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যবোধ এতটা গভীরভাবে আমাদের মধ্যে প্রোথিত যে, একে আমরা নিশ্চয়তা হিসেবে পেতে চাই। তাই জাতির প্রতিষ্ঠালগ্নে এই চেতনাটির কট্টর বাস্তবায়ন সহজেই ভুলে যাওয়া যায়। এই বাস্তবায়ন ছিল গীর্জার দরজায় মার্টিন লুথার কিংয়ের পোস্টিংয়ের মতোই কট্টর। এখনো বিশ্বের একাংশ এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। তার চেয়েও বড় অংশের মানবতা, তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রত্যক্ষ করছে এর ক্ষীণ উপস্থিতি।

www.pathagar.com

আমার শিশুকালের কিছুটা সময় ইন্দোনেশিয়ায় কাটানো এবং এখনো কেনিয়ায় রয়ে যাওয়া আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে 'বিল অব রাইটস' সম্পর্কে এই উপলব্ধি হয়েছে আমার। এসব দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা এখনো আর্মির জেনারেলদের নিয়ন্ত্রণে অথবা দুর্নীতিবাজ আমলাদের মর্জির হাতে বন্দী। বিয়ের ঠিক আগে মিশেলকে নিয়ে কেনিয়ায় বেড়াতে যাওয়ার কথা আমার মনে আছে। আফ্রিকান-আমেরিকান হিসেবে পূর্বপুরুষদের মহাদেশে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে মিশেলের মধ্যে উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না। নাইরোবির রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে, সেরেঙ্গেতিতে ক্যাম্পিং করে, ল্যামু দ্বীপে মাছ ধরে আমাদের চমৎকার সময় কাটে। কিন্তু এ সফরে আমরা যে জিনিসটি বুঝতে পারি তা হলো– দেশটির বেশিরভাগ মানুষের ভাগ্য তাদের নিজেদের হাতে নয়। ঘুষ ছাড়া কাজ পাওয়া বা কোনো ব্যবসা শুরু করতে পারাটা কত যে কঠিন, তা বলেছিল আমার চাচাতো ভাইয়েরা। সরকারের কোনো নীতির সমালোচনা করলেই নিশ্চিত ঠিকানা কারাগার। এমনকি আমার পরিবারের মধ্যেও, পারিবারিক বন্ধন ও সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বস্ততা কতটা শ্বাসরুদ্ধকর হতে পারে, মিশেল তা দেখেছে। এসব দেখে মিশেলের মন আমেরিকায় ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমেরিকান হিসেবে নিজেকে আমি কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি কতটা মুক্ত আর কতটা স্বাধীনতা ভোগ করছি তা অনুভব করতে পারিনি।'

প্রাথমিকভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বলতে বুঝি কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা অধিকারে বিশ্বাস করি; থাকতে চাই নিজস্ব পরিমণ্ডলে; সে বড় ভাই হোক অথবা হোক কোনো প্রতিবেশী– কেউ আমাদের কাজে নাক গলাতে চাইলে তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি। পাশাপাশি ইতিবাচকভাবেও আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে বুঝতে পারি। সুযোগ ও সম্পূরক মূল্যবোধের ধারণা; 'পুয়র রিচার্ডস আলমানক'-এর মাধ্যমে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম, যেসব সাদামাটা ও সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক গুণগুলো জনপ্রিয় করেছিলেন, তা পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে ক্রমাগতভাবে উদ্বুদ্ধ করে গেছে। আত্মনির্ভরশীলতা, আত্ম-উন্নতি ও ঝুঁকি গ্রহণের মতো মূল্যবোধ ছিল এগুলো। সামনে এগিয়ে চলা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মূল্যবোধ এগুলো। এগুলো মিতব্যয়িতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের মূল্যবোধ।

জীবন সম্পর্কে প্রাথমিক আশাবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত আছে এসব মূল্যবোধ। প্রতিটি নারী ও পুরুষ অবাধে তার স্বার্থ হাসিলের জন্য ছুটতে পারবেন, সামগ্রিকভাবে সমাজে সমৃদ্ধি আসবে– আমাদের মূল্যবোধগুলো এই বৃহৎ আস্থাও তুলে ধরে। বেশিরভাগ আমেরিকান লালন করেন এসব মূল্যবোধ। আমাদের আত্মশাসনের ব্যবস্থা ও মুক্তবাজার অর্থনীতি এরই ওপর নির্ভরশীল। এসব মূল্যবোধ কতটা লালন করা যাচ্ছে তার ওপর নির্ভরশীল আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের সরকারের বৈধতা। আর এ কারণেই সমান সুযোগ ও বৈষম্যহীনতার মূল্যবোধ আমাদের স্বাধীনতার পথে বাধা সৃষ্টির বদলে পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আমেরিকানরা হৃদয়ের দিক দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হই এবং ক্রমাগত

www.pathagar.com

অতীতের উপজাতি গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্টতা, ঐতিহ্য, প্রথা ও রীতিনীতি মুছে ফেলতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাই– তারপরও আমাদের মূল্যবোধগুলো টিকে থাকবে বলে ভাবাটা হবে ভুল। আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদটি কিছু সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধে পরিবেষ্টিত। এটি এমন এক আঠা, যার ওপর নির্ভর করে প্রতিটি সুস্থ সমাজ। পরিবারের প্রতি কর্তব্য এবং পরিবারের মধ্যে যেসব আন্তঃপ্রজন্মগত বাধ্যবাধকতা থাকে সেগুলোকে আমরা মূল্য দেই। কমিউনিটি বা প্রতিবেশীদের মূল্য দেই আমরা। জাতির প্রতি দায়িত্ব ও আত্মত্যাগের চেতনায় দেশপ্রেম ও নাগরিকদের বাধ্যবাধকতাকে মূল্য দেই। আমরা মূল্য দেই ধর্ম বা নৈতিকতার মতো বিশ্বাসের। সততা, ন্যায্যতা, লজ্জা, দয়া, ভদ্রতা ও ধৈর্যের মতো গুণগুলো আমাদের আচার-আচরণে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি এবং এসব গুণেরও মূল্য দেই।

প্রতিটি সমাজ ও মানুষের মধ্যে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়, স্বায়ত্তশাসন ও সংহতি– এই দ্বৈত চেতনার টানাপড়েন চলে। এটি আমেরিকার জন্য আশীর্বাদের মতো– যে পরিস্থিতিতে এ জাতির জন্ম হয়েছে তা আমাদের এই টানাপড়েন নিয়ে দেনদরবারের সবচেয়ে বেশি সুযোগ করে দিয়েছে। সামন্তবাদী অতীত থেকে মুক্তি পেতে ইউরোপকে যে সহিংস অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল আমেরিকাকে তা হয়নি। মহাদেশের বিশালায়তনের কারণে কৃষি থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে উত্তরণ হয়েছে অনেকটা সহজে। বিস্তীর্ণ ভূমি ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে অভিবাসীরা ভাগ্য গড়ার সুযোগ পেয়েছে এখানে।

কিন্তু, এই টানাপড়েনকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা যায় না। একেকজনের হাতে পড়ে এই মূল্যবোধগুলোর বিকৃতি ঘটে। তাই আমরা মূল্যবোধের মধ্যে সঙ্ঘাত দেখি। এতে আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতা রূপ নিতে পারে কার্পণ্য ও অবাধ্যতায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিণত হতে পারে লোভে এবং স্বাভাবিক ইচ্ছা পরিণত হতে পারে যেকোনো মূল্যে সফল হওয়ার উদগ্র বাসনায়। আমাদের ইতিহাসেও একাধিকবার আমরা দেখেছি, দেশাত্মবোধ কিভাবে যুদ্ধংদেহি দেশপ্রেম, বিদেশী ভীতি ও ভিন্নমত মেনে নিতে অস্বীকৃতিতে রূপ নিয়েছে। আর এ জন্যই, নদীতে বিষাক্ত দ্রব্য ফেলার ব্যাপারে কোনো কোম্পানির সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি হিসেবে আমরা দেখি স্বাধীনতার উল্লেখ; কারো বাড়ি ভেঙে সেখানে আধুনিক শপিং মল গড়ার মধ্যে দেখি সম্মিলিত স্বার্থ।

এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা তুলনামূলক সহজ হয় কখনো। যেমন– আমরা সবাই এ কথা জানি, যখন কারো ব্যক্তিস্বাধীনতা অন্যের জন্য ক্ষতিকর, তখন তাকে দমন করার অধিকার সমাজের রয়েছে। সংবিধানের প্রথম সংশোধনী কাউকে জনাকীর্ণ থিয়েটারে আগুন লাগানোর অধিকার দেয়নি। আপনার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, অন্যের আত্মত্যাগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আবার, আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে রাষ্ট্রের এমন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারেও আমরা একমত। আমরা কী খাই– সরকার তার ওপর নজর রাখবে, তাতে কোনো আমেরিকানই স্বস্তিবোধ করবে

www.pathagar.com

না। মুটিয়ে যাওয়ার কারণে কতজন মারা যাচ্ছে আর চিকিৎসা ব্যয় কতটা বাড়ছে তা নিয়ে আমরা ভাবি না।

মূল্যবোধগুলোর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া প্রায়ই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভুল পথে যাচ্ছি, এ জন্য আমাদের মধ্যে টানাপড়েন সৃষ্টি হয় না। এটি হচ্ছে একান্ত জটিল ও পরস্পরবিরোধী বিশ্বে বাস করার কারণে। যেমন– আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দ্রুত এগিয়েছি আমরা; এতে সাংবিধানিক ন্যায়নীতিগুলো আমরা শিথিল করে ফেলেছি। আমি এটাও স্বীকার করব, নাগরিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার পাশাপাশি সম্মিলিত নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণ করতে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে জ্ঞানী প্রেসিডেন্ট ও সবচেয়ে জনপ্রিয় কংগ্রেসকেও সংগ্রাম করতে হতো। আবার, শিল্প খাতে শ্রমিকদের কর্মচ্যুতি, শিল্পনগরগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঠেকানোর কাজে আমাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা কমই মনোযোগ দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার যে একান্ত দাবি, তাকেও আমি দূরে ঠেলে দিতে পারি না।

দুঃখজনক হলেও আমাদের জাতীয় বিতর্কগুলোতে এমন কোনো জায়গা থাকে না যেখানে গিয়ে দু'পক্ষই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। কোনো নীতি পছন্দ না হলে আমরা বলি আমাদের মূল্যবোধের ওপর আঘাত হানবে এগুলো। আবার যখন দেখি আমার পছন্দের নীতিগুলোই মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক, তখন নির্বোধের মতো চুপ করে থাকি। বাজারব্যবস্থা অথবা অস্ত্র বহনের অধিকারে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে দেখলে রক্ষণশীলদের আচরণে ঘৃণা প্রকাশ পেতে শুরু করে। আবার সরকার যখন ওয়ারেন্ট ছাড়াই কারো বিরুদ্ধে 'অ্যায়ারট্যাপিং' বা আড়িপাতা শুরু করে বা জনগণের যৌন অভ্যাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়, তখন এসব রক্ষণশীলের মধ্যে কোনো উদ্বেগ দেখা যায় না। সরকার, প্রেস বা নারীর প্রজনন স্বাধীনতা খর্ব করছে দেখে বেশিরভাগ লিবারেল বা উদারপন্থীই সহজে রেগে যেতে পারেন। আবার আপনি যদি এসব লিবারেলের কাছে গিয়ে কোনো আইনের জন্য একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে সম্ভাব্য কী মূল্য দিতে হবে, তা নিয়ে কথা বলেন তখন দেখবেন উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তারা।

আমাদের মতো বৈচিত্র্যময় মানুষের দেশে সরকারের কোনো উদ্যোগের ব্যাপারে কথা এলে আমরা যুক্তির রেখাটি কিভাবে টানব তা নিয়েও আবেগপূর্ণ বিতর্ক হতে পারে। এভাবেই কাজ করছে আমাদের গণতন্ত্র। কিন্তু এই গণতন্ত্রটি আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারত যদি আমরা পরস্পরের মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখাতে পারতাম। যেমন, লিবারেলরা স্বীকার করবেন, শিকারির কাছে বন্দুকটি তার বাড়ির লাইব্রেরির বইয়ের মতোই প্রিয়। আবার ধর্মপ্রাণ মানুষ তার প্রার্থনার অধিকারকে যেমনটা ভাবেন তেমনি প্রজনন স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ নারীর অনুভূতি যে একই রকম এ কথাও স্বীকার করবেন কনজারভেটিভরা।

এ ধরনের কিছু করতে চাইলে তার ফল বিস্ময়কর হতে পারে। ইলিনয়ের রাজ্য সিনেটে যেবার ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল সেবার গুরুতর অপরাধীদের

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসাবাদ ও স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রক্রিয়াটি ভিডিও টেপ করার জন্য একটি বিল আনি আমি। মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমনে তেমন সহায়ক হয় না বলে প্রমাণ থাকলেও আমি মনে করি গণহত্যা, শিশু ধর্ষণ ও হত্যার জন্য এই শাস্তি জনগণকে অন্তত অপরাধটির বিরুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেয়। অন্য দিকে ইলিনয়ে বড় ধরনের অপরাধের মামলাগুলোর বিচার প্রক্রিয়া এতটাই ত্রুটিপূর্ণ, পুলিশের তদন্ত কৌশল এতটাই প্রশ্নসাপেক্ষ ও বর্ণঘেঁষা এবং আইনজীবীদের পারফরম্যান্স এতটাই বাজে যে, মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো ১৩ জন আসামিই খালাস পেয়ে যায়। এরপর রিপাবলিকান গভর্নর সব মৃত্যুদণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ফলে এই দণ্ডের আইনটি সংস্কার প্রয়োজন হলেও আমার বিলের পক্ষে কিন্তু বেশি মানুষকে পাইনি। প্রথমেই স্টেট প্রসিকিউটর ও পুলিশ বিভাগ প্রবল আপত্তি জানায়। মৃত্যুদণ্ড বিলোপের পক্ষে আন্দোলনকারীরাও এর বিরোধিতা শুরু করে। আমার বিল তাদের বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে বাধা তৈরি করতে পারে বলে ভাবে তারা। আমার সহকর্মীদেরও মনে হলো তারা অপরাধ আইনের ব্যাপারে বেশ নমনীয়। নবনিযুক্ত ডেমোক্র্যাট গভর্নর তো ঘোষণাই করলেন, নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি নাকি জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও টেপ বিলের বিরোধিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রতিদিনই প্রসিকিউটর, পাবলিক ডিফেন্ডার, পুলিশ বিভাগ ও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতাকারীদের সাথে বৈঠকে বসি আমি। সেখানে মতপার্থক্যগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে আমি কেবল সেসব মূল্যবোধের কথা বলি, যেগুলো আমরা সবাই লালন করি। এর মোদ্দাকথা হলো– কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়; আবার মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো কোনো অপরাধীও যেন মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে না আসে। পুলিশ প্রতিনিধিদের আপত্তি– এতে তাদের তদন্ত বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে আমরা বিলটি নতুন করে সাজাই। আবার বলা হয়, কেবল স্বীকারোক্তি নেয়ার সময় যেন ভিডিও টেপ করা হয়। এবার কিন্তু আমরা কঠোর হই। কারণ বিলটি করা হয়েছে জোরজবরদস্তি ছাড়াই লোকটি স্বীকারোক্তি দিয়েছে– এ ব্যাপারে জনগণের মনে আস্থা জন্মানোর জন্য। শেষ পর্যন্ত সবার সমর্থন আদায় করা গিয়েছিল এই বিলে এবং এটি আইনে পরিণত হয়।

নীতি প্রণয়নে সব সময় এই কৌশল নাও খাটতে পারে। অনেক সময় বৃহত্তর আদর্শিক স্বার্থ হাসিলের জন্য রাজনীতিক ও ইন্টারেস্ট গ্রুপগুলো বিরোধিতা জিইয়ে রাখে।

কখনো কখনো দলীয় আদর্শের অবস্থানে আমরা এতটাই অনড় হয়ে থাকি যে, স্পষ্ট বিষয় দেখতে গিয়েও আমরা সমস্যায় পড়ি। ইলিনয় সিনেটে থাকাকালে একবার আমার এক রিপাবলিকান সহকর্মী স্কুলে শিশুদের নাশতা দেয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করেন। এই পরিকল্পনা নাকি শিশুদের আত্মনির্ভরশীল হতে দেবে না। পাঁচ বছর বয়সী কোনো আত্মনির্ভরশীল মানুষ আছে কি না তা আমার জানা নেই। কিন্তু গড়ে ওঠার মুহূর্তটিতে যে শিশু ক্ষুধার্ত থাকবে, সে এর জন্য অবশ্যই দায়ী করবে রাষ্ট্রকে।

www.pathagar.com

আমার বিরোধিতার কারণে সেই বিলটি পাস হতে পারেনি। শিশুরাও আপাতত 'খাবারবঞ্চিত' হওয়া থেকে রক্ষা পায়। এটা আমার সাথে প্রতিপক্ষের বক্তব্য, আদর্শ ও মূল্যবোধের পার্থক্যটি স্পষ্ট করে দিতে পেরেছে। বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয় মূল্যবোধ। অন্য দিকে, বাস্তবতা যাই থাক, দলীয় আদর্শ তাকে কমই তোয়াক্কা করে।

* * *

রাজনীতি ও সরকার একই জিনিস– রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণা থেকে মূল্যবোধ নিয়ে বিতর্কের সন্দেহগুলো তৈরি হয়। মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও কেউ একে আইনে অথবা একটি এজেন্সিতে পরিণত করার কথা বলে না। আবার মূল্যবোধ আইন নয় বলে এটা সরকারের আলোচনার কোনো বিষয় নয়– তাও হতে পারে না।

যেমন, আমি সুন্দর আচরণ পছন্দ করি। যখন কোনো শিশুর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি, সে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে কথা বলছে, 'ইয়েস স্যার', 'থ্যাংক ইউ', 'প্লিজ', 'এক্সিউজ মি' শব্দগুলো ব্যবহার করছে– দেশের ব্যাপারে তখন অনেক আশাবাদী হয়ে উঠি আমি। আমার মতো আরো অনেকেই এমনটা ভাবেন। কিন্তু, ভালো আচরণগুলো আইনে পরিণত করতে পারি না আমরা। কিন্তু, একদল তরুণের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঠিকই ভালো আচরণের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করা যায়। যোগ্যতার ব্যাপারেও একই কথা খাটে। এরকম একটি মানুষের সাথে কাজ করে আমি যে আনন্দ পাই, অন্য কিছুতে তা পাই না। কিন্তু আমরা যারা সরকারে আছি, তাদের যেন নিজের ব্যাপারগুলো ছাড়া আর কোনো বিষয়ে মাথাব্যথা নেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টেলিভিশনে যৌনতা দ্বিগুণ বেড়েছে বলে এক গবেষণা রিপোর্টে প্রকাশ করে কাইজার ফ্যামিলি ফাউন্ডেশন। এরপর সেখানে এক বক্তৃতায় অংশ নিই আমি। এইচবিও চ্যানেলটি আমিও বেশ উপভোগ করি। ব্যক্তিগতভাবে কে 'অ্যাডাল্ট প্রোগ্রাম' দেখছে– তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শিশুদের বেলায় কী হবে? তারা টেলিভিশনে কী দেখছে তার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব বাবা-মায়ের। বক্তৃতায় আমি বলেছি, টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে সন্তানের সাথে কোন বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেও দেখবেন অনেক ইতিবাচক ফল পাওয়া যাচ্ছে।

পাশাপাশি আমি এটাও বলেছি, মেয়েকে পাশে নিয়ে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখার সময় ১৫ মিনিট পরপর 'গোপনাঙ্গ সতেজ করার' বিজ্ঞাপন কতটা সুখকর হতে পারে? তরুণদের কাছে প্রিয় কিছু অনুষ্ঠান কিভাবে প্রজন্মটিকে মদ্যপ বা বিবস্ত্র হয়ে বাথটাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করছে– এগুলো নিয়েও গবেষণা হওয়া দরকার। বাড়িতে সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, এমনভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য টিভি ও ক্যাবল কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই আমি।

আমার এই বক্তৃতার পর একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, বাক-স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সরকারের কোনো কাজ নেই। আসলে আমি এরকম নিয়ন্ত্রণের কোনো

www.pathagar.com

কথা বলিনি। কিছু সমর্থকের কাছ থেকেও চিঠি পাই। তারা লিখে, 'বুশের এজেন্ডাগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য আপনাকে ভোট দিয়েছি। ঘরের মধ্যে ফ্যাসাদ বাধানোর জন্য নয়।'

লিবারেল বা কনজারভেটিভ, সব বাবা-মাকেই সংস্কৃতির এই অমার্জিত দিকটি নিয়ে অভিযোগ করতে দেখা যায়। বস্তুবাদের সহজ বিস্তার ঘটছে এখানে, বাসনা চরিতার্থ করা যায় যখন-তখন, প্রেম-ভালোবাসার জায়গা দখল করে নিচ্ছে অবাধ যৌনতা। মানুষ এসবের বিরুদ্ধে সরকারের সেন্সরশিপ চায় না ঠিকই; কিন্তু চায় তার উদ্বেগের স্বীকৃতি। চায়, সরকারও তাদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হোক। অথচ প্রগতিবাদী রাজনীতিকরা সমস্যাগুলোর অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না।

সংস্কৃতির সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার সময় কিছু বিষয় না দেখার ভান করে কনজারভেটিভরা। নির্বাহীদের বেতনের কথাই ধরা যাক। ১৯৮০ সালের একজন সিইও'র ঘণ্টাপ্রতি গড় আয় ছিল সাধারণ আমেরিকান শ্রমিকের আয়ের অন্তত বিয়াল্লিশ গুণ। ২০০৫ সালে এই অনুপাত এসে দাঁড়ায় ২৬২:১-এ। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের মতো কনজারভেটিভদের মুখপত্রও এই অকল্পনীয় উচ্চ বেতনের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলে, করপোরেট নেতারা সুখে থেকে মোটা হলেও অর্থনীতি নাকি বেশ ভালোই এগিয়েছে। সিইও'দের বেতনের গতি ঊর্ধ্ব হলেও তাদের যোগ্যতা সে হারে বাড়ায়নি। সত্যিকার অর্থে গত কয়েক দশকে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বেতনধারী সিইওরা কেবল বসে বসে সাধারণ মানুষের আয়ের নিম্নগতি, শেয়ারের দরপতন, ব্যাপক কর্মচ্যুতি এবং শ্রমিকদের পেনশন তহবিলগুলোর শূন্য হয়ে যাওয়া দেখেছে।

সিইও'র বেতন পরিবর্তনের বিষয়টি বাজার দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এটা সাংস্কৃতিক প্রবণতা। শ্রমিকদের আয়ে যখন বলতে গেলে তেমন কোনো প্রবৃদ্ধি নেই, তখন মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কোনো লজ্জাবোধ দেখা যায় না সিইওদের মধ্যে। আমাদের জাতীয় জীবনে লোভ বর্জনের যে মূল্যবোধটি ছিল তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্বাহীদের বেতন কাঠামো ঠিক করে দেয়া সরকারের উচিত হবে না বলে কনজারভেটিভদের যুক্তি হয়তো ঠিক। কিন্তু করপোরেট বোর্ডরুমগুলো জাতির সাথে যে আচরণ করে, সে ব্যাপারে অন্তত কথা বলা উচিত তাদের।

অবশ্য ক্ষমতা প্রয়োগেরও সীমাবদ্ধতা আছে। কখনো কখনো কেবল আইনই আমাদের মূল্যবোধের যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে পারে। বিশেষ করে আমাদের সমাজের ক্ষমতাহীনদের অধিকার ও সুযোগগুলো সঙ্কটের সম্মুখীন হয় যখন। জাতিগত বৈষম্য নিরসনে আমাদের প্রচেষ্টার ব্যাপারেও বিষয়টি সত্যি। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের যুগে সাদা আমেরিকানদের হৃদয়-মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নৈতিক অনুপ্রেরণাটি যেভাবে কাজ করেছে; যা শেষ পর্যন্ত জিম ক্রোর মাজা ভেঙে দিয়েছিল; যার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটে; যার পরিণতি ছিল নাগরিক অধিকার আইন ১৯৬৪, ভোটাধিকার আইন ১৯৬৫ ইত্যাদি। এই আইনগুলো তৈরির সময় যুক্তি দিয়ে বলা হয়– সুশীল সমাজের কাজে নাক গলাতে পারবে না সরকার। এর

www.pathagar.com

অর্থ কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বাধ্য করা হয় এমন কোনো আইন করা যাবে না। এর জবাবে মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, আইন করে কারো কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করা যায় না ঠিকই কিন্তু, তার নিপীড়ন থেকে আইন আমাকে বাঁচাতে পারে। আর এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যে সমাজ চাই তা গড়তে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন ও সরকারের পদক্ষেপ এবং মূল্যবোধ পরিবর্তন ও নীতি বদল– দুটোই প্রয়োজন। আমরা আমাদের স্কুলগুলোর দিকে তাকালেই বুঝব, সব টাকা সেখানে ঢালা হলেও একটি শিশুর মনে কঠোর পরিশ্রমের মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দেয়া যাবে না। এর সাথে যুক্ত হতে হবে বাড়িতে তার বাবা-মায়ের প্রচেষ্টা। আর এখানেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছি নিজেদের মূল্যবোধের সাথে।

এই একটি জিনিসই আমাকে ডেমোক্র্যাট বানিয়েছে। আমাদের সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সংহতির যে চেতনা, তা কেবল গীর্জা বা মসজিদে গিয়ে আওড়ালে হবে না; কেবল বাসা, কর্মক্ষেত্র অথবা আমাদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না– এই চেতনা কাজ করতে হবে সরকারের মধ্যেও। অনেক কনজারভেটিভের মতো আমিও ব্যক্তিগত সাফল্য ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংস্কৃতির শক্তিতে বিশ্বাসী। পাশাপাশি এটাও বিশ্বাস করি, এই বিপজ্জনক সময়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতির উপাদানগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছি। সংস্কৃতির ভালো-মন্দ রূপায়ণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও বিশ্বাস আছে আমার।

রাজনীতিবিদরা যখন মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলেন, সেগুলো খুব হিসেবি বা মিথ্যে বলে আমার মনে হয়। এটা কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। এটা অংশত, রাজনীতি করতে গিয়ে তারা এতটাই কাঠখোট্টা হয়ে যান এবং নিজেদের বিশ্বাসটিকে বড় করে দেখানোর জন্য তাদের আকুতির কারণেই কোনটা তার সৎ চিন্তা আর কোনটা রাজনৈতিক চাতুরী– এর মধ্যে পার্থক্য করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। আবার এটাও সত্যি যে, আধুনিক রাজনীতির চর্চা এমনভাবে করা হয় যেন এখানে মূল্যবোধের কোন স্থান নেই। সাধারণত ঘটনার বিকৃতি, স্পষ্ট অর্থকে উল্টে দেয়া, অন্যকে উপহাস বা তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা, তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে ঘাঁটাঘাঁটির মতো যেসব আচরণকে আমরা ন্যাক্কারজনক বলে মনে করি, রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা তা কেবল অনুমোদনই করছেন না পুরস্কৃতও করছেন। জাতীয় সিনেটের নির্বাচনী প্রচারণাকালে এমন এক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

আমার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ এক তরুণকে নিয়োগ করে আমি কোথায় যাই, কী করি– সব কিছু মনিটর করার জন্য। একটি ক্যামেরা নিয়ে এ তরুণ ঘুরতে থাকে আমার পেছনে। তার এই অনুসরণ ছিল উসকানির মতো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে থাকে আঠার মতো। ৫ বা ১০ ফুট দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করত

www.pathagar.com

সে। আমি লিফটে চড়ছি অথবা বের হচ্ছি রেস্টরুম থেকে– এসবের ছবি তোলায়ও তার বিরাম নেই। আমি যখন সেলফোনে বা স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কথা বলছি তারও ছবি তুলছে সে।

প্রথম প্রথম আমি তাকে স্বাভাবিকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। তার নাম জিজ্ঞেস করি, কী করছে জানতে চাই। আমার একান্ত আলাপ তার কানে না পৌঁছায়– তাকে এমন দূরত্ব বজায় রেখে চলার অনুরোধ জানাই আমি। সে তার নাম বলে জাস্টিন। এ ছাড়া আমার আর কোনো কথার জবাব সে দেয় না। এভাবে দু-তিন দিন যায়। আমি ভাবি যথেষ্ট হয়েছে। একদিন দুপুরবেলা ঢুকে পড়ি রাজ্যের ক্যাপিটল ভবনের প্রেস অফিসে। ছেলেটিও আছে আমার পেছনে। উপস্থিত রিপোর্টারদের উদ্দেশ করে বললাম– এই যে, আমি আপনাদেরকে এই ছেলেটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ও হলো জাস্টিন। আমি কী করছি, কোথায় যাচ্ছি সব কিছু মনিটর করতে আমার প্রতিপক্ষ তাকে আমার পেছনে লাগিয়েছে।

আমার এই কথা বলার সময়ও জাস্টিনের ছবি তোলা চলছিল। এবার রিপোর্টাররা তার দিকে ফিরল। প্রস্তুতি নিলো প্রশ্ন করার।

'তুমি কি তাকে রেস্টরুমেও ফলো করো?'

'তখনো কি এতটাই কাছাকাছি থাকো?'

কিছু ক্যামেরাম্যান উঠে দাঁড়ায় ছবি তোলায় ব্যস্ত জাস্টিনের ছবি তুলতে। এবার হুশ হয় ছেলেটির। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে গরগর করে বলে যেতে থাকে তার নাম, পদবী, তার প্রার্থীর সদর দফতরের টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি। সন্ধ্যা ৬-টার মধ্যে স্থানীয় সবগুলো মিডিয়ায় প্রচার হয়ে যায় 'জাস্টিন কাহিনী'। পরের সপ্তাহজুড়ে কার্টুন, সম্পাদকীয় পাতা, স্পোর্টস রেডিও জকির কণ্ঠে ফিরতে থাকে এই কাহিনী। ব্যাখ্যা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চাপের কাছে নতি স্বীকার করে আমার প্রতিপক্ষ। জাস্টিনকে তো সরিয়ে নেয়া হলোই, ক্ষমাও চাইতে বলা হলো তাকে। ইতোমধ্যে প্রতিপক্ষের প্রচারণায় যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। জনগণ চিকিৎসাসেবা বা মধ্যপ্রাচ্য কূটনীতিতে আমাদের দু'প্রার্থীর মধ্যে কী বিরোধ, তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারা মাথা ঘামিয়েছে, আমার প্রতিপক্ষ একটি মূল্যবোধ; নাগরিক আচরণ লঙ্ঘন করেছেন, তা নিয়ে। আর সেটাই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিদিনের আচরণে আমরা যে মূল্যবোধের লালন করি, আর নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে ভিন্ন কিছু করছি কি না, তার মাধ্যমে একজন রাজনীতিবিদের মূল্যবোধের পরীক্ষা হয়ে যায়। রাজনীতিবিদের মতো আর কোনো পেশার বিষয়ে মাথা ঘামাতে হয় না এত। তাদের ভাবতে হয় নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, ভাবতে হয় নিজ এলাকার স্বার্থের পাশাপাশি রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে; দলীয় আনুগত্যের পাশাপাশি নিজের স্বাধীনতার চেতনাটিও জাগিয়ে রাখতে হয়। ভাবতে হয় জনসেবার মূল্যবোধের পাশাপাশি পরিবারের প্রতি বাধ্যবাধকতা নিয়ে। প্রতি মুহূর্তে বিপদ তার সামনে।

www.pathagar.com

কোনো রাজনীতিক একবার মনোবল হারিয়ে ফেললে জনমতের ঘূর্ণিস্রোতে তাকেও পুরোপুরি হারিয়ে যেতে হয়।

সম্ভবত এ কারণেই আমরা আমাদের নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্মৃতিপ্রবণ এ গুণগুলো দেখতে আগ্রহী। আমার পরলোকগত বন্ধু সিনেটর পল সাইমনের ছিল এসব গুণ। নিজের মূল্যবোধগুলো শুধু কথায় নয়, কাজেও পরিণত করে দেখিয়েছিলেন তিনি। জনগণ তাকে সৎ বলে জানত। আরো জানত, এই লোকটি যা বিশ্বাস করেন তা থেকে তাকে এক চুলও নাড়ানো যাবে না। পলের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যের অনুভূতির সাথে একাত্ম হতে পারার ক্ষমতা।

আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার এই গুণটি আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। আমার নৈতিক আচরণের মূলে আছে এটি। এর মধ্য দিয়ে আমি সেই 'সোনালি বিধি' অনুধাবন করেছি। এটা শুধু সহানুভূতি বা দাতব্যের আহ্বান নয়– এর আবেদন আরো অনেক বড়। এটা হলো অন্যের পায়ের ওপর আপনার দাঁড়ানো। এটা হলো অন্যের চোখ দিয়ে আপনার দেখা।

অন্যের অনুভূতির সাথে একাত্ম হওয়ার এ গুণটি আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। যেকোনো ধরনের নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞতা বা ক্ষমতার অপব্যবহার– তা সে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামিই হোক বা হোক স্কুলের মারামারি অথবা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না পাওয়া– সব কিছুই ঘৃণা করতেন তিনি। এরকম কোনো আচরণ আমার মধ্যে দেখলে, সাথে সাথেই শাসন করতেন এ জন্য।

কিন্তু অন্যের অনুভূতির সাথে একাত্ম হওয়ার পুরো অর্থটি আমি প্রথম উপলব্ধি করি আমার নানার সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। হাইস্কুল জীবনের বেশিরভাগ সময় আমার নানা-নানীর সাথে কেটেছে। কাজের তাগিদে মা থাকতেন বিদেশে। তাই বাবাহীন বাড়িতে আমার কৈশোরের দুরন্তপনার সব অত্যাচার নানাকেই সইতে হয়েছিল। তার সাথে চলা সব সময় সহজ ছিল না। তার হৃদয়টা যেমন মমতায় ভর্তি ছিল, তেমনি হঠাৎ রেগে যেতেন তিনি। আমার বয়স যখন ষোল, গাড়ির ট্যাংকে গ্যাসভরা অথবা মিল্ক কার্টন গার্বেজে ফেলার আগে হালকাভাবে ধুয়ে নেয়া– এমন অহেতুক অনেক বিষয় নিয়ে তার সাথে খুনসুটি লেগেই থাকত।

নানার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের সময় যুক্তিতে আমার সাথে তিনি পারতেন না। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তর্কের এই বিজয়ে তেমন কোনো মজা পেতাম না আমি। তখন আমি ভাবতাম লোকটির জীবন সংগ্রাম ও হতাশার কথা। তখন থেকে আমি তার কাজে সম্মান দেখাতে শুরু করি। তিনি যেন ঘরে নিজেকে সম্মানিত মনে করেন, সে চেষ্টা চালাই। আমি বুঝতে পারি তার নিয়মগুলো মেনে চললে আমার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার এই মেনে চলাটা বরং তাকে সুখি করবে। কখনো কখনো তার কাজে ও কথায় সত্যিই অনেক যুক্তি থাকত।

ছোটবেলায় কারো সাথে খারাপ আচরণ করলেই মা রেগে বলতেন, 'এটা করে তুমি

www.pathagar.com

কি খুব আনন্দ পেয়েছো?' তার এই কথাটি রাজনীতিতেও আমার দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করেছে। এই প্রশ্ন শুধু নিজেকে করাই যথেষ্ট নয়। আমি ভাবি, আমার দেশটাই আজ সহানুভূতি জানানোর গুণটি হারিয়ে ফেলছে। স্কুলগুলোতে আমার সন্তানের মতোই ছেলেমেয়েরা পড়ে– এ কথা ভাবতে পারলে সেখানকার শিক্ষাস্বল্পতা, শিক্ষকস্বল্পতা, তহবিলস্বল্পতা, উদ্বুদ্ধ করার পরিবেশহীনতা– এসব আমরা মেনে নিতে পারতাম না। সাম্যের সামান্যতম অনুভূতি থাকলেও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা কমিয়ে কোম্পানির সিইও'রা লাখ লাখ ডলার বোনাস নিতে পারত না। নিজের সন্তানকে ক্ষতির পথে ঠেলে দিচ্ছি– এ কথা ভাবলে, যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া ক্ষমতাসীনদের জন্য অনেক বেশি কঠিন হতো।

অন্যের প্রতি সহানুভূতি জানানোর চেতনা আমাদের মধ্যে শক্তভাবে কাজ করলে বর্তমান রাজনীতির ভারসাম্য সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষে ঝুঁকে যেত। তারা যদি আমাদের মতোই হয়, তাহলে তাদের সংগ্রামটিও আমাদের নিজেদের। আমরা যদি সহানুভূতি প্রকাশে ব্যর্থ হই, তাহলে নিজেদেরকেই বিলোপের পথে এগিয়ে দেবো আমরা।

তবে সংগ্রামী মানুষ আর আমরা যারা সংগ্রামী মানুষের জন্য লড়াই করছি, তাদেরও অনুধাবন করতে হবে স্বচ্ছল মানুষের দিকটি। কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের যেমন বুঝতে হবে শ্বেতাঙ্গদের আতঙ্কের কারণ, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব মালিকদের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে তা উপলব্ধি করতে হবে শ্রমিকদের। অথচ আমাকে জর্জ বুশের দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমার ভিন্নমতের গুরুত্ব নেই এখানে। আমরা আমাদের পরিতৃপ্তিগুলো দুর্বল করে ফেলছি। আমাদের 'ভিশন'-এর বাইরে গিয়েও কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে ।

সহানুভূতি আমাদের 'অভিন্ন ক্ষেত্র' খুঁজে বের করার আহ্বান জানায়। কেউই এই আহ্বান থেকে মুক্ত নয়। পারস্পরিক সমঝোতাই শেষ কথা নয়। যেকোনো মূল্যবোধের মতোই কাজ করতে হবে সহানুভূতিকে। আশির দশকে আমি যখন কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ করতাম তখন প্রায়ই স্থানীয় নেতাদের চ্যালেঞ্জ করে বসতাম। জানতে চাইতাম তাদের অর্থ, সময় ও শক্তি কোন কাজে ব্যয় করছেন তারা। তাদের বলতাম, এটাই হলো আমাদের মূল্যবোধের আসল পরীক্ষা। আমরা যদি এসব চেতনার মূল্য না দিই, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য আত্মত্যাগে রাজি না হই– তাহলে এসবে সত্যিই আমাদের বিশ্বাস আছে কি না, সে প্রশ্নটি নিজেদের করতে হবে।

আজকের আমেরিকানদের দেখে মনে হয় ধনী হওয়া, মেদ কমিয়ে তারুণ্য ধরে রাখা, বিখ্যাত হওয়া, নিরাপদ থাকা আর আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া তাদের আর কোনো মূল্যবোধ নেই। আমরা মুখে বলি, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ঐতিহ্য রেখে যাওয়ার মূল্যবোধে বিশ্বাস করি আমরা। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পর্বতপ্রমাণ ঋণ ছাড়া কিছু রেখে যাচ্ছি না। বলি, 'সুযোগের সমতায়' বিশ্বাসী; কিন্তু লাখ লাখ আমেরিকান শিশুকে দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে দেখেও নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। পারিবারিক

www.pathagar.com

মূল্যবোধ লালনের দাবি করি আমরা। কিন্তু অর্থনীতিকে এমনভাবে তৈরি করেছি, যেখানে পরিবারের জন্য সময় বের করাটাই দুরূহ হয়ে উঠেছে আমাদের জন্য।

আমাদের মূল্যবোধগুলো বিলুপ্তির পথে হলেও আমরা এগুলো নিয়ে গর্ববোধ করতে ভালোবাসি। অথচ মূল্যবোধগুলো অনুসরণের বদলে সেগুলোর সাথে প্রতারণা করে চলেছি। এই মূল্যবোধের অনুসরণই এই জাতিটিকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

আমাদের সংবিধান

www.amarboi.org

একটি প্রবাদ আছে, ক্যাপিটল হিলের প্রথম বছরটা কিভাবে কেটেছে এই প্রশ্নের জবাবে সিনেটররা প্রায়ই বলে থাকেন 'এটি দমকলের পাইপ থেকে পানি পানের মতো।'

সিনেটে প্রথম ক'মাসের অভিজ্ঞতায় এ বর্ণনা আমার কাছে ঠিকই মনে হয়েছিল। সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার পর আমি ওয়াশিংটন ও ইলিয়নয়ে অফিস নিই এবং জনবল নিয়োগ করি। আমার দায়িত্ব ছিল নেগোশিয়েট কমিটির এবং আমি চেষ্টা করি কমিটিতে বিবেচনাধীন ইস্যুগুলোকে তুলে এনে নিষ্পত্তি করতে। আমার নির্বাচনী এলাকা থেকে আসা প্রায় ১০ হাজার চিঠির স্তূপ জমে যায় এবং প্রতি সপ্তাহে তিন শ'র মতো বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসে। আধ ঘন্টার বিরতিতে আমাকে সিনেট কক্ষ, বিভিন্ন কমিটির রুম, হোটেল লবি ও রেডিও স্টেশন পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে হতো। এজন্য আমাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো সাম্প্রতিক সময়ে নিয়োগ দেয়া ২০ থেকে ৩০ জন স্টাফের ওপর। সব কর্মসূচি যেন ঠিকভাবে আমি সামলাতে পারি, তারা সেদিকে নজর রাখতো। তারা আমাকে ব্রিফিংয়ের বই হাতে তুলে দিত, মনে করিয়ে দিত কার কার সাথে আমার দেখা করার কথা। কাছাকাছি প্রক্ষালন কক্ষটিও দেখিয়ে দিত তারা।

রাতে আমাকে কাটাতে হতো নিঃসঙ্গ, একাকী। স্ত্রী মিশেল ও আমি, আমাদের পরিবারকে শিকাগোতেই রাখব বলেই সিদ্ধান্ত নেই। এর কিছুটা কারণ ছিল, আমরা চাচ্ছিলাম আমাদের মেয়েরা ওয়াশিংটনের জটিল পরিবেশের বাইরে বেড়ে উঠুক। তাছাড়া মিশেল তার মা, ভাই, পরিবারের অন্য সদস্য ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে একটি বলয় গড়ে তুলেছিল– যেখান থেকে আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পেত সে। সপ্তাহে মোটামুটি তিন রাত আমাকে ওয়াশিংটনে কাটাতে হয়। আর এজন্য ক্যাপিটল হিল ও শহরতলির মাঝামাঝি জর্জ টাউন ল' স্কুলের পাশে বহুতল ভবনে

www.pathagar.com

একটি শয়নকক্ষের ছোট্ট এক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করি আমি।

প্রথমে আমি চেষ্টা করি নতুন এই নিঃসঙ্গতাকে উপভোগ করার। ব্যাচেলর জীবনের আনন্দকে আমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা চালাই। আশপাশের জনপ্রিয় সব রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করি। গভীর রাত পর্যন্ত বাস্কেট বল খেলা উপভোগ অথবা বইয়ের গভীরে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাই। মধ্য রাতে জিমে গিয়ে নানা কসরতে নিজেকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করি। সিঙ্কে এঁটো বাসনপত্র ফেলে, আর বিছানা অগোছাল রেখে মজা পেতে চাই। কিন্তু ১৩ বছর সংসার জীবন কাটিয়ে ব্যাচেলর হওয়ার মজা পাওয়ার সব চেষ্টাই যেন আমার বিফলে যায়। আমি যেন ঘরের কাছে পুরোপুরি পোষ মেনে গেছি। এক অসহায় ও অকর্মণ্য একজন পুরুষ মনে হতে থাকে নিজেকে। ওয়াশিংটনের প্রথম সকালে আমি শাওয়ারের পর্দা কিনতে ভুলে যাই। আর গোসলের সময় বাথরুমের ফ্লোরে পানি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে গিয়ে শাওয়ার দেয়ালের সাথে সজোরে আঘাত পাই। পরের রাতে একটি বিয়ার হাতে খেলা দেখতে বসে অর্ধেক না দেখেই ঘুমিয়ে পড়ি। আবার দু' ঘণ্টা পরই জেগে উঠি ঘাড়ের প্রচণ্ড ব্যাথায়। এরপর খেতে বসে খাবারের আর কোনো স্বাদই পেলাম না। আমাকে তখন ঘিরে ধরছিল নীরবতা। শুধু মেয়ের কণ্ঠটা শোনার জন্য বাড়ি যেন আমাকে টানছে। আমার মেয়েদের গায়ের মিষ্টি গন্ধ, আর তাদের আলিঙ্গনের জন্য আমি উন্মুখ হয়ে উঠি।

'হাই, সুইটি'

'হাই ড্যাডি'

'কী হচ্ছে'

'তুমি কি আগেও ফোন করেছিলে'

'হ্যাঁ'

'কিছু না, তুমি কি আম্মুর সাথে কথা বলতে চাও?'

কম বয়সী পরিবার রয়েছে এমন সিনেটরের সংখ্যা ছিল গুটিকতক। দেখাসাক্ষাৎ হলে আমরা ওয়াশিংটনে আমাদের অভিজ্ঞতার তুলনা করতাম। পাশাপাশি অতি উৎসাহী স্টাফদের কাছ থেকে পরিবারের জন্য সময় কিভাবে বের করে নেয়া যায় আলোচনা করতাম তা নিয়েও। তবে সিনেটে আমার নতুন সহকর্মীদের বেশিরভাগই বেশ প্রবীণ– তাদের গড় বয়স ষাটের মতো হবে। আমি তাদের অফিসে যাই এবং সিনেটের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের পরামর্শ নেয়ার চেষ্টা করি। তারা বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রমের সুবিধা ব্যাখ্যা করে আমার কাছে এবং বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যানদের মেজাজমর্জি সম্পর্কে অবহিত করে আমাকে। স্টাফদের সামলানো, অফিসের জন্য বাড়তি জায়গা দরকার হলে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, নির্বাচনী এলাকার অনুরোধগুলো সামলাতে হবে কিভাবে– আমাকে এসব পরামর্শ দেয় তারা। যদিও কখনো কখনো পরামর্শগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী, কিন্তু অধিকাংশই আমার বেশ কাজে

www.pathagar.com

লেগেছে। তবে ডেমোক্র্যাটদের সাথে আমার সাক্ষাত একটি সাধারণ পরামর্শ দিয়েই শেষ হতো। তারা আমাকে বলত, আমি যেন অবশ্যই সিনেটর বির্ডের সাথে দেখা করি। শুধু সিনেটের সৌজন্যের কারণেই নয়, এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটিতে সিনেটর বির্ডের উর্ধ্বতন পদ এবং সিনেটের সাধারণ কাঠামোর কারণে তিনি ছিলেন বেশ ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব।

৮৭ বছর বয়সী সিনেটর রবার্ট সি বির্ড শুধু সিনেটের ডিনই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সিনেটের এক মূর্ত প্রকাশ। ইতিহাসের জীবন্ত স্বাক্ষী। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার কয়লাখনি সমৃদ্ধ শহরে চাচা-চাচীর হাতে বেড়ে ওঠেন তিনি। তার ছিল তীক্ষ্ণ মেধা। স্মৃতি থেকে কবিতার দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে পারতেন তিনি। কথা বলে সবাইকে মুগ্ধ করে দিতে পারতেন তিনি। কলেজের ফি দিতে না পেরে লেখাপড়া ছেড়ে বির্ড কসাইয়ের দোকানে কাজ নেন। সেলসম্যান হিসেবে কাজ করেছেন কিছু দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধজাহাজে ঢালাই শ্রমিক হিসেবেও কাজ করেন। যুদ্ধশেষে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় ফেরার পর রাজ্যসভায় নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। এরপর ১৯৫২ সালে নির্বাচিত হন কংগ্রেস সদস্য হিসেবে।

১৯৫৮ সালে তিনি সিনেট সদস্য হন। এরপর বলতে গেলে আর সিনেটের বাইরে থাকেননি কখনো। ৪৭ বছর সময়ে সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে ছয় বছর এবং সংখ্যালঘু দলের নেতা হিসেবেও ছয় বছর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। সিনেটের প্রায় সব পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা আছে এই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের। সব ক্ষেত্রে সবাইকে প্রেরণা দিতেন তিনি। সবাইকে যোগাতেন প্রণোদনা। তার বক্তব্য ও আইনি ব্যাখ্যা থেকে অনেক কিছু শিখে ঘরে ফিরতেন সবাই। খনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সড়ক, ভবন ও বিদ্যুতায়ন প্রকল্প তারই অবদান। ১০ বছর কংগ্রেস সদস্য থাকাকালে নৈশকালীন কোর্স করে তিনি আইনের ওপরও ডিগ্রি নেন। সিনেট রুল সম্পর্কে তার ব্যাখ্যা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। সিনেটের ইতিহাসের ওপর চার খণ্ডের এক ইতিহাস লিখেছেন তিনি। যাতে শুধু তার পাণ্ডিত্য এবং সিনেটের রীতিনীতি নিয়ে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানই প্রকাশ পায়নি, একই সাথে এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তার বিস্ময়কর ভালোবাসার প্রকাশও পেয়েছে। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে এই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। বলা হয়, সিনেটের জন্য বির্ডের প্রেমকে কেবল একজনই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন– আর সেই ভাগ্যবান মানুষটি ছিলেন তার ৬৮ বছর বয়সী অসুস্থ স্ত্রী। যিনি এখন আর বেঁচে নেই। সংবিধানের প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণে এর একটি পকেট সংস্করণ, যেখানেই যেতেন বির্ড সাথে রাখতেন। বিতর্কের সময় এটা হাতে উঁচিয়ে নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দেখাতেন।

সিনেটর বির্ডের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ চেয়ে আমি তার অফিসে একটি বার্তা পাঠাই। আর বলি, এসময় যেন আমাদের মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। সিনেটর হিসেবে শপথ গ্রহণের দিন আমরা সবাই মিলিত হই পুরনো সিনেট চেম্বারে। এর চার দিকের আধো অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে গাম্ভীর্য। সভাপতির আসনে পেছনে ডানা

www.pathagar.com

বিস্তার করে আছে অতিকায় ঈগলমূর্তি। রক্তরঙা ভেলভেটের অলঙ্কৃত চাঁদোয়া যেন তৈরি করেছে এক এক অপার্থিব শোকাবহ অবস্থা। ডেমোক্র্যাট ককাস আয়োজিত এই নিরানন্দ অনুষ্ঠানের সাথে হয়তো কক্ষটির পরিবেশের একটি সম্পর্ক ছিল। সেবারের নির্বাচন ছিল ডেমোক্র্যাটদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক এবং এতে তারা তাদের নেতাকে হারিয়েছে। সংখ্যালঘু দলের নতুন নেতা হ্যারি রেইড দায়িত্ব গ্রহণে পর সিনেটর বির্ডকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান। সিনেটর বির্ড ধীরেসুস্থে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়ান। ঘন তুষারশুভ্র চুল, স্বচ্ছ নীল চোখ এবং টিকালো নাকের অধিকারী হালকা-পাতলা গড়নের সিনেটর বির্ড যেন নীরব ও স্থির হয়ে থাকলেন মুহূর্তের জন্য। এরপর ওপরের দিকে মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকেন আরো কয়েকটি মুহূর্ত– তারপর শুরু করেন কথা বলা। আধো অন্ধকারে তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠের বক্তৃতা যেন এক অন্যরকম এক আবহ ছড়াচ্ছিল।

তার বক্তব্যের কথাগুলো কী ছিল, তা আমি হুবহু মনে করতে পারছি না এখন। তবে তার বক্তব্যের মর্মকথা এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। শেক্সপিয়রের রিদমে তার কথাগুলো পুরনো সিনেট চেম্বারের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তৈরী করে ফিরছিল। তিনি সংবিধান প্রণয়ন ও এর বিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলছিলেন এবং সিনেটকে বর্ণনা করছিলেন সেই সনদের প্রধান রক্ষক হিসেবে। দরাজ কণ্ঠে তিনি বলেন, সিনেটের অমূল্য স্বাধীনতার ওপর নির্বাহী বিভাগ বছরের পর বছর ধরে বিপজ্জনকভাবে হস্তক্ষেপ করেছে। প্রত্যেক সিনেটরের উচিত আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালীন দলিলগুলো নতুন করে পড়া। যাতে আমরা প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত অর্থের প্রতি অবিচল ও বিশ্বস্ত থাকতে পারি। বির্ডের বক্তব্য, উচ্চারণ ধীরে ধীরে জোরালো হতে থাকে, তার আঙুলগুলো উচ্চকিত হয় আকাশের দিকে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন কক্ষটির সব মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ। সিনেটের অতীত ঐতিহ্য, প্রায় ৫০ বছর নিজের সিনেট জীবন এবং এর আগের ৫০ বছর এবং তারও আগের ৫০ বছরের ঐতিহ্য তুলে ধরেন তিনি। বির্ড সে সময়ে ফিরে যান, যখন জেফারসন, অ্যাডামস ও ম্যাডিসন বিচরণ করতেন এই ক্যাপিটলে; যখন জনহীন ঊষর তেপান্তর ছিল এই শহর; যখন এলাকাজুড়ে ছিল কৃষিক্ষেত্র ও জলাভূমি। এমন একসময়ে ফিরে যান যখন, আমি অথবা আমার মতো দেখতে আরো যারা আছেন, এ দেয়ালের মধ্যে বসার সুযোগ তারা পেতেন না।

সিনেটর বির্ডের বক্তৃতা শুনে এই নতুন জায়গা, এর মার্বেলের মূর্তি, এর সুপ্ত ঐতিহ্য এবং এর স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ অসঙ্গতিগুলো গভীরভাবে অনুভব করি আমি। আমি ভাবি, সিনেটর বির্ডের আত্মজীবনী অনুযায়ী বিশ বছর বয়সকালেই বর্ণবিদ্বেষী সংগঠন 'ক্লু ক্লাক্স ক্লান'-এর রালিহ কাউন্টির সদস্য হিসেবে প্রথম নেতৃত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল তাকে। অনেক আগেই সংগঠনটি পরিত্যাগ করেন তিনি। তিনি যে সময় ও স্থানে বেড়ে উঠেছিলেন এটি তার একটি ভুল ছিল বলে তিনি স্বীকারও করে নিয়েছেন। কিন্তু এই ভুলের দায় তাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। আরাকানসাসের জে উইলিয়াম ফুলব্রাইট এবং জর্জিয়ার রিচার্ড রাসেলের মতো জাঁদরেল সিনেটরদের

www.pathagar.com

সাথে নাগরিক অধিকার আইন প্রতিরোধে দক্ষিণের প্রচেষ্টার সাথে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন, সেকথা ভাবি আমি। যেসব লিবারেল আজ ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতার জন্য সিনেটর বির্ডকে সিংহহৃদয় বানাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে যদি এটি ঘটতো তাহলে তারা কি করতেন, সেকথা অবাক হয়ে ভাবি আমি। রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির উত্তরাধিকার হিসেবে অনেক তুচ্ছ বিষয়ের পেছনে সিনেটর তার ক্যারিয়ারের বহু সময় ব্যয় করেছেন।

আমাদের অনেকের মতো সিনেটর বির্ডের জীবনও যুদ্ধ উন্মাদনা এবং আলো-আঁধারির সংগ্রাম। এটা আসলেই সত্যি কিনা, অবাক হয়ে ভাবতাম আমি। আমি উপলব্ধি করি সত্যিকার অর্থেই তিনি সিনেটের জন্য একজন প্রতীকতুল্য ব্যক্তিত্ব। যার কাজ ও কৌশলে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লগ্নের স্মরণীয় সমঝোতার প্রতিফলন। উত্তরাঞ্চলীয় ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলোর দরকষাকষির সেই উন্মাদনাপূর্ণ সময়ে সিনেটের ভূমিকা ছিল অভিভাবকসুলভ; সিনেট ছিল সংখ্যালঘুদের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের রক্ষক। একই সাথে তা ছিল বিক্ষুব্ধদের হাত থেকে ধনীদের রক্ষাকর্তা। দাসমালিকদের অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ না করারও নিশ্চয়তা দেয়া হয় এখান থেকে। সিনেটের জেনেটিক কোডের মধ্যে, এর প্রতিটি চরিত্র বিন্যাসে খোদাই করা আছে ক্ষমতা ও নীতির মধ্যে একই প্রতিযোগিতা। যা সামগ্রিকভাবে আমেরিকাকে বৈশিষ্টমন্ডিত করেছে। সেই গুটিকতক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের মহান বিতর্কের স্থায়ী অভিব্যক্তি ফুটে উঠে বির্ডের কণ্ঠে। যা এমন এক অনন্য সরকারের জন্ম দিয়েছিল– যা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে এখনো।

এসব বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্যের ইতি টানেন বির্ড। অসাধারণ বক্তৃতার জন্য ভক্ত সিনেটররা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান সিনেটর বির্ডকে। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তার সাথে পরিচিত হই। তিনি উষ্ণভাবে করমর্দন করেন আমার সাথে। আর বলেন, আমার সাথে বসার অপেক্ষায় আছেন তিনি। অফিসে ফিরে আমি আমার পুরনো সাংবিধানিক আইনের বইগুলোকে প্যাকেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিই এবং সে রাতেই ওগুলো নতুন করে পড়তে শুরু করি। সিনেটর বির্ড বলেছেন, ২০০৫ সালে ওয়াশিংটনে যা ঘটছে তা উপলব্ধির জন্য, আমার নতুন দায়িত্ব এবং সিনেটর বির্ডকে বোঝার জন্য আমাকে আমেরিকার শুরুর দিকের বিতর্ক এবং প্রতিষ্ঠাকালীন দলিলগুলো নতুন করে অনুধাবন করতে হবে। এ দেশের প্রতিষ্ঠাতারা কিভাবে সময়ের সীমানা পেরিয়ে ভূমিকা ও রাখেন এবং পরবর্তী ইতিহাসের আলোকে সিদ্ধান্তগুলো নিতে পেরেছিলেন, তা বুঝতে হবে।

আমার আট বছরের মেয়েকে যদি কেউ প্রশ্ন করে আমার পেশা কী, তাহলে সে জবাবে হয়তো বলবে– আমি আইন বানাই। ওয়াশিংটনের একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো, এখানে সময়ের একটি বড় অংশ চলে যায় আইন কী ধরনের হওয়া উচিত তার বদলে আইনটি আসলে কী– এ নিয়ে বিতর্কের মধ্য দিয়ে। যেমন ধরুন বলা হলো, কোম্পানিকে তার ঘণ্টাভিত্তিক কর্মচারীদের বাথরুম সারার জন্য বিরতি দিতে হবে। এ

www.pathagar.com

বিষয়েও ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে। ব্যাখ্যা নির্ভর করবে কার সাথে আপনি কথা বলছেন তার ওপর। যে কংগ্রেসম্যান এই বিলটি আনলেন, যে স্টাফ এর মুসাবিদা তৈরি করছেন, যে বিভাগ এটি বাস্তবায়ন করবে তার প্রধান, আইনজীবীর যে মক্কেলরা এটা মেনে নিতে চাইবেন না এবং যে বিচারকের ওপর আইনটি কার্যকর করার দায়িত্ব বর্তাবে– সবাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারেন।

এ অবস্থার কিছুটা হয়েছে সরকারের রূপরেখার কারণে। ভারসাম্য রক্ষার জটিল ব্যাবস্থার ফল এটা। ফেডারেল ও রাজ্য সরকারসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আনতে গিয়ে কোনো আইনই চূড়ান্ত বলে গণ্য হতে পারে না। আইনকে আরো সুসংহত বা নমনীয় করার সুযোগ থেকে যায় সব সময়ই। কোনো আইনকে শিথিল করা অথবা এর বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা, বাজেট সঙ্কোচন করে কোনো সংস্থার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অথবা শূন্যতা রয়েছে এমন কোন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ জব্দ করা– এসব কারণে কোনো বিরোধই নিস্পত্তি হয় না সত্যিকারভাবে।

এটা একান্তভাবে আইনের প্রকৃতির কারণে হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে সাদামাটাভাবে। অথচ জীবনে নতুন নতুন সঙ্কট দেখা দেয়। আর আইনজীবী, কর্মকর্তা এবং নাগরিকরা এমন সব পরিভাষা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন যেগুলো এক বছর বা কয়েক মাস আগেও একেবারে সুস্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত আইন হয়ে দাঁড়ায় একটি পৃষ্ঠায় কিছু শব্দের মধ্যে সীমিত– যে শব্দগুলো কখনো নমনীয় আবার কখনো অস্পষ্ট মনে হয়। এটা নির্ভর করে বিষয় ও বিশ্বাসের ওপর। এসব শব্দের অর্থ হয় ক্ষণস্থায়ী, কখনো চোখের পলকেও তা বদলে যায়।

২০০৫ সালে ওয়াশিংটনে যে আইনি বিতর্ক শুরু হয় তা আইনের স্বাভাবিক ব্যাখ্যার গ্রহনীয় মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। আইনের ব্যাখ্যার বদলে ক্ষমতাসীনরা কোনো আইনের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কি না সে প্রশ্ন ওঠে।

যেমন, নয়-এগারোর পর জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠলে হোয়াইট হাউস প্রথমেই কংগ্রেস বা কোর্টের কাছে জবাবদিহি করার যেকোনো পরামর্শের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে কন্ডোলিসা রাইসের নিয়োগ নিশ্চিত করার শুনানির সময় এ যুক্তি সব বিতর্ককে ছাড়িয়ে যায়। নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা ইরাক যুদ্ধে তাদের শপথ অনুযায়ী কাজ করছে কি না তা যাচাই করার কংগ্রেসের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আলবার্তো গনজালিসের নিয়োগ নিশ্চিত করার ইস্যুটিকে ঘিরে এ বিতর্ক চলে। আমি এসময় অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের একটি খসড়া ম্যামো পর্যালোচনা করছিলাম। তাতে বলা হয়েছিল, অন্তরীণ ব্যক্তিকে নির্ঘুম রাখা অথবা বারবার দম বন্ধ করা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতন বলে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তা এমন মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক পর্যায়ে পৌঁছে যে– এর ফলে তার কোনো অঙ্গহানি ঘটে পঙ্গু হয়ে যায় অথবা তার শারীরিক কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ে অথবা সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খসড়ায় বলা হয়, আফগানিস্তানের যুদ্ধে বন্দী 'শত্রু যোদ্ধাদের' ক্ষেত্রে জেনেভা কনভেনশনের কথাগুলো

www.pathagar.com

প্রযোজ্য হবে না। এতে বলা হয়, মার্কিন নাগরিক শত্রুপক্ষের যোদ্ধা হলে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাউকে আটক করা হলে, চতুর্থ সংশোধনীটি প্রযোজ্য হবে না তার ক্ষেত্রে।

ওই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু হোয়াইট হাউসে সীমিত ছিল না। আমার মনে আছে মার্চের প্রথম দিকে সিনেট ফ্লোরে আমি হাঁটছিলাম। এসময় কালো চুলের এক যুবক হঠাৎ এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। সে আমাকে তার বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে যায়। তারা ফ্লোরিডা থেকে এখানে এসেছেন একটি তরুণীকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতে। টেরি শিয়াভো নামে এই মেয়েটি এখন সংজ্ঞাহীন। তরুণীটির স্বামী তার দেহ থেকে লাইফ সাপোর্ট খুলে তুলে নিতে চাইছে। তার কাহিনীটি ছিল হৃদয় বিদারক। আমি তাদের বলি, এ ধরনের ঘটনায় কংগ্রেসের হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত তেমন নেই। তখনো জানিনি, টম ডিলে ও বিল ফার্স্ট এ ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছেন।

যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা থাকে ব্যাপক। জীবনের সমাপ্তি টানার এ বিষয়ের সাথে জড়িত নৈতিকতার প্রশ্ন। এটা খুব সহজ বিষয় নয়; এ বিষয়ে আমি রিপাবলিকানদের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করি। এ নিয়ে বড় ধরনের বিতর্কের প্রয়োজন আছে বলে আমার বিশ্বাস। যা আমাকে পীড়া দেয় তা হলো– প্রক্রিয়া অথবা প্রক্রিয়ার অভাব– যার মাধ্যমে হোয়াইট হাউস ও তার কংগ্রেসীয় মিত্ররা বিপরীত মতকে দমন করে চলেছেন। অবস্থাটা এমন যে, আইনের শাসন যেন আর চলছে না। আমরা আপিল জানাতে পারি এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা অনুসরণীয় মানও নেই। এটা যেন, যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে তারাই হেভিয়াস করপাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর, ক্ষমতার পৃথকীকরণ যেন উপায় খুঁজে পাওয়ার অলঙ্কার। যা অপরিহার্য (সন্ত্রাসীদের দমনের প্রয়োজনে) তারা তা জটিল করে তোলে অথবা যা সঠিক (জীবনের পবিত্রতা) বাধা সৃষ্টি করা হয় সেখানে। ফলে এর সাথে দ্বিমত পোষণ অথবা সুদৃঢ় ইচ্ছার কাছে অবনত হওয়া যায়।

পরিহাসের বিষয় হলো, রিপাবলিকানদের এ তৎপরতা ছিল আইনের প্রতি অবজ্ঞা এবং একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ভাষার মারপ্যাঁচ দিয়ে বিকৃতির প্রচেষ্টা। অথচ রক্ষণশীলরা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের অভিযোগ করত লিবারেলদের বিরুদ্ধে। এটা ছিল নুয়েট গিংরিচের 'আমেরিকার সাথে চুক্তির' পেছনের যুক্তি। বলা হলো, সে সময় প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণকারী ডেমোক্র্যাট নেতারা নিজেদের স্বার্থে আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেছেন অব্যাহতভাবে। এটিই ছিল বিল ক্লিনটনের অভিশংসনের প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে একটি প্রবাদ স্মরণ করা যায়– যেখানে বলা হয়েছে, "এটি নির্ভর করে 'হয়'-এর অর্থ কী হবে তার ওপর"। লিবারেল একাডেমিকদের বিরুদ্ধে এটি ছিল রাজনৈতিক পরিশুদ্ধির পৌরহীত্যের দাবিদার রক্ষণশীলদের আপত্তির ভিত্তি। বলা হলো, চিরন্তন সত্যকে তারা স্বীকার করতে চান না, অথবা তারা মানতে চান না জ্ঞানের উত্তরাধিকার এবং আমেরিকান তরুণদের তারা বিপজ্জনক নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদে

www.pathagar.com

দীক্ষা দিচ্ছেন। ফেডারেল আদালতে রক্ষণশীলদের ওপর আক্রমণ চালানোর মোক্ষম অস্ত্র ছিল এটি।

সাধারণভাবে কোর্টের এবং বিশেষভাবে সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণ লাভ রক্ষণশীলদের একটি প্রজন্মের জন্য 'পবিত্র প্রচেষ্টা'য় পরিণত হয়। তারা এ ব্যাপারে শুধু জোর খাটিয়েই ক্ষান্ত হন না, প্রান্তিক অবস্থান নেন এ ব্যাপারে। কারণ, তারা মনে করেন গর্ভপাতপন্থী, ইতিবাচক সংস্কারবাদি, সমকামিতাবাদি, অপরাধবাদি, নিয়ন্ত্রণপন্থী, ধর্মবিরোধী উদারনৈতিক অভিজাততন্ত্রবাদীদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো আদালত। এসব একটিভিস্টদের অভিযোগ, লিবারেল বিচারকরা নিজেদের আইনের উর্ধ্বে বলে মনে করেন। তারা সংবিধান মেনে মত দেন না; রায় দেন নিজেদের ইচ্ছা-অভিরুচি মতো। সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও গর্ভপাত বা সমকামিতার অধিকার খুঁজে বেড়ান তারা। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, বাধাগ্রস্ত করছেন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের আসল ইচ্ছার বাস্তবায়নকে। তাদের ধারণা আদালতকে তার 'মূল' ভূমিকায় ফেরাতে হলে, যারা আইনের ব্যাখ্যা এবং আইন প্রণয়নের পার্থক্য বোঝেন, প্রতিষ্ঠাতাদের কথাগুলো যারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং যারা পারবেন আইনের যথাযথ অনুসরণ করতে– এমন 'কঠোর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি'র লালনকারীদেরই বিচারক হিসাবে নিয়োগ দিতে হবে ফেডারেল বেঞ্চে।

অন্য দিকে, বাম ধারায় বুদ্ধিজীবীরা পরিস্থিতিকে দেখেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। রক্ষণশীল রিপাবলিকানরা কংগ্রেস ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর বহু উদারতাবাদী ভাবেন নাগরিক অধিকার, নারী অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, পরিবেশ আইন, গীর্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ এবং নিউ ডিলের উত্তরাধিকার খর্ব করার চেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে আদালত। বর্কের মনোনয়নের বিরুদ্ধে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ ও ডেমোক্র্যাট নেতারা মতামত গঠন করেন অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে। আদালতের আঙ্গিনায় ইতোপূর্বে এমনটা আর দেখা যায়নি। মনোনয়ন যখন টিকলো না, রক্ষণশীলরা তখন উপলব্ধি করলেন, তৃণমূল পর্যায়ের 'সৈনিক' তৈরি করতে হবে তাদের।

এর পর থেকে উভয় পক্ষই অগ্রগতি ও ব্যর্থতাগুলো স্বীকার করে নিলেন। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত জুডিশিয়াল কমিটি যখন আপিল ও জেলা আদালতে ক্লিনটনের বাছাই করা ৬১ জন বিচারকের নিয়োগ আটকে দেয় তখন জোর গলায় আপত্তি জানাতে থাকে ডেমোক্র্যাটরা। আবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ডেমোক্র্যাটরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তখন জর্জ ডব্লিউ বুশের মনোনিত বিচারকদের ক্ষেত্রেও একই কৌশল অবলম্বন করেন তারা।

কিন্তু, ২০০২ সালে ডেমোক্র্যাটরা সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে তখন তাদের তুণীতে কেবল একটি তীরই অবশিষ্ট থাকে। সেই তীরটির নাম হলো 'ফিলিবাস্টার'। এর মাধ্যমে প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ জানিয়ে সিনেটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে দেয়া হয়। নিষ্ঠাবান ডেমোক্র্যাটরা তখন সমবেত হন 'ফিলিবাস্টারের' পেছনে।

www.pathagar.com

সংবিধানে 'ফিলিবাস্টার' সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। এটি সিনেটের একটি বিধান। কংগ্রেসে একেবারে প্রথম দিন থেকেই এর চর্চা চলে আসছে। এর মূল ধারণা অত্যন্ত সাদামাটা। সিনেটের সব কাজ সাধারণত সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে থাকে। তাই যেকোনো সিনেটর তার সীমাহীন বিতর্কের অধিকার কাজে লাগিয়ে সিনেটের চলমান কার্যধারা স্থবির করে দিতে পারেন। তার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিনেটকে পরবর্তী কর্মসূচিতে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন তিনি। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি যতক্ষণ খুশি ততক্ষণই কথা বলতে পারেন। বিবেচনাধীন কোন বিলের সারবস্থ নিয়ে কথা বলতে পারেন তিনি অথবা এ বিলেরও উপরও নতুন কোন প্রস্তাব আনতে পারেন। তিনি চাইলে প্রতিরক্ষা অথরাইজেশন বিলের ৭০০ পৃষ্ঠার পুরোটাই প্রতি লাইন পাঠ করে শোনাতে পারেন। এই বিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসও বর্ণনা করতে পারেন। তিনি পারেন, হামিংবার্ডের উড়ে বেড়ানোর সাথে অথবা আটলান্টার ফোন বইয়ের সাথেও একে সম্পর্কযুক্ত করতে। তিনি বা তার মতো সহকর্মীরা যতক্ষণ খুশী সিনেটে থেকে কথা বলতে পারেন। তাদের কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবকিছু অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে ফিলিবাস্টার প্রত্যেক সিনেটরকে কোন বিল আটকে দেয়ার সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছে। যে কোন আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু দলের কার্যকর 'ভেটো' ক্ষমতা হলো এটা।

ফিলিবাস্টার থামানোর একমাত্র উপায় হলো 'ক্লোজার'। সিনেটের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য দাবি করলেই কেবল বিতর্কের সমাপ্তি টানাতে কাউকে বাধ্য করা যাবে। তাই সিনেটের সব বিল, প্রস্তাব বা মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হলে শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগে না, এ জন্য প্রয়োজন হয় তিন-পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১০০ জনের মধ্যে ৬০ জনের সমর্থন)। অনেক জটিল আইনের অনুমোদন হয়েছে 'ফিলিবাস্টার' ও 'ক্লোজার' উভয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। শুধু ফিলিবাস্টারের হুমকি দিয়েই সহজে সংখ্যাগুরু দলের নেতার মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। তবে সিনেটের আধুনিক ইতিহাস জুড়ে 'ফিলিবাস্টার' একটি নিয়ন্ত্রিত বিশেষ অধিকার এবং একটি মর্যাদাশীল বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যায়। বলা হয়, প্রতি রাজ্য থেকে ছয় বছর মেয়াদে দু'জন সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থাই প্রতিনিধি পরিষদ থেকে সিনেটকে আলাদা করেছে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহারের বিপদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষা দেয়াল হিসেবে কাজ করছে এই সিনেট।

ফিলিবাস্টারের আরেকটি ইতিহাস আছে। এটি আমার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় শতাব্দিকাল ফিলিবাস্টার ছিল ফেডারেল হস্তক্ষেপ থেকে 'জিম ক্রো' (কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বৈষম্যবাদ টিকিয়ে রাখার নীতি) রক্ষার জন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। দক্ষিণের সিনেটররা একে কাজে লাগিয়ে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনীর সামনে কার্যকরভাবে আইনি বাধা তৈরিতে সক্ষম হন। জর্জিয়ার সিনেটর রিচার্ড রাসেলের (যার নামে সিনেটের সবচেয়ে অভিজাত স্যুটের নাম রাখা হয়) মতো বিনয়ী ও পণ্ডিত ব্যক্তিও দশকের পর দশক সিনেটে উপস্থাপিত প্রতিটি নাগরিক অধিকার আইনের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

ফিলিবাস্টার প্রয়োগ করেন। ভোটাধিকার বিল, ন্যায্য মজুরি বিল অথবা লাইসেন্সবিরোধী বিল– সেটা যাই হোক না কেন শব্দ, আইনের বিধান, পদ্ধতি ও দৃষ্টান্ত– এসব তুলে ধরে দক্ষিণাঞ্চলের সিনেটররা কালোদের দমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অত্যাচার চালিয়েও যা করা আগে সম্ভব হয়নি। ফিলিবাস্টার শুধু বিলগুলোকেই আটকে দেয়নি এটা দক্ষিণের অনেক কৃষ্ণাঙ্গের আশাটুকুও কেড়ে নিয়েছিল।

জর্জ বুশের প্রথম মেয়াদে মাঝে মধ্যে ফিলিবাস্টার ব্যবহার করেছে ডেমোক্র্যাটরা। প্রেসিডেন্ট বুশের নিয়োগ করা দুই শতাধিক বিচারকের মধ্যে মাত্র ১০ জনকে ফ্লোরের ভোটাভুটির সম্মুখিন হতে হয়। ওই ১০ জনই ছিলেন আপিল আদালতের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত এবং রক্ষণশীল আদর্শের বাহক। রক্ষণশীলরা হুমকি দেয় ডেমোক্র্যাটরা এদের বিরুদ্ধে ফিলিবাস্টার প্রয়োগ করলেও সুপ্রিম কোর্টে এদের নিয়োগ পাওয়া ঠেকানো যাবে না কিছুতেই।

বিষয়টি গেল প্রেসিডেন্ট বুশের টেবিলে। সিনেটে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচনকে জনগণের ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করলেন বুশ। তাই দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বুশ, আগে ফিলিবাস্টারের শিকার হওয়া সাত বিচারককে নতুন করে মনোনয়ন দিলেন। ডেমোক্র্যাটদের চোখে এটি ছিল একটি উসকানী। ফলে তারাও প্রতিক্রিয়া দেখায় এর বিরুদ্ধে। ডেমোক্র্যাট নেতা হেরি রিড আবারো 'ফিলিবাস্টার'র হুমকি দেন। এতে ডান ও বামের অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলো দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা প্রয়োজনীয় সব ঠিকানায় ই-মেইল ও চিঠি পাঠাতে শুরু করেন। আরেকটি 'আকাশ যুদ্ধে'র প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা চাওয়া হয় এসব বার্তায়। রিপাবলিকানরা ভাবলো, বিড়াল মারার এটিই উপযুক্ত সময়। তারা ঘোষণা করেন, ডেমোক্র্যাটরা বাধা সৃষ্টি অব্যাহত রাখলে তাদের সামনে আর কোনো উপায় থাকবে না। তারা 'পারমাণবিক বিকল্প' বেছে নেবেন। সিনেটের সভাপতি (সম্ভবত ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি) তখন সিনেট সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করে, সিনেটের ২০০ বছরের নজীর ভেঙে, হাতুড়ির এক ঘায়ে রায় দিয়ে দিলেন, সিনেটের বিধানে আর ফিলিবাস্টারের অনুমোদন দেয়া হবে না– অন্তত বিচার বিভাগীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে নয়।

বিচার বিভাগীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে 'ফিলিবাস্টার' এর অবসানের বিষয়টি খেলার মাঝপথে রিপাবলিকানদের নিয়ম পরিবর্তন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। অথচ, বিচার বিভাগীয় মনোয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'ফিলিবাস্টার' নাকচ হওয়ার মতো সুপার সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষেও ভালো যুক্তি ছিল। কারণ ফেডারেল বিচারপতিরা নিয়োগ পান তাদের কর্মক্ষম জীবনের পুরো সময়ের জন্য। তাই বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন তারা। আমাদের গণতন্ত্রের স্বার্থে একজন প্রেসিডেন্টের উচিত মধ্যপন্থী ধরনের ব্যক্তিকে বিচারকের জন্য মনোনীত করা, দুই দলের মধ্য থেকেই তার প্রতি সমর্থন থাকবে। প্রেসিডেন্ট বুশের কিছু মনোনয়নকে মধ্যপন্থী ধাচে ফেলা যায় না। বরং তারা নাগরিক অধিকার, প্রাইভেসি এবং নির্বাহী

www.pathagar.com

ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে এক ধরনের শত্রুসুলভ মনোভাব দেখান।

আমার সেদিনের কথা এখনো মনে পড়ে, যেদিন প্রথম 'পারমাণবিক বিকল্প'-এর কথা শুনি। শব্দটি শোনার পর আমার বেশ হাসি পেয়েছিল। যে পদ্ধতিতে বিচার বিভাগীয় মনোনয়ন নিশ্চিত করা হলো তাতে, এই বিভাগের ওপর হারানো নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই মনে হয়। এটা করা হয়েছে এক ধরনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। এ সময় সিনেট কক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের রিপাবলিকানদের নির্লজ্জ পৌরাণিক কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে দেয়া হয়। অনেকে ফিলিবাস্টারের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে বিষোদগার করেন। অথচ তারা যাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উত্তরসূরী তারাও যে এটাকে ব্যবহার করেছিলেন– এ কথা বেমালুম ভুলে যান তারা।

এই কঠিন বাস্তবতা মেনে নিতে পারেননি আমার অনেক ডেমোক্র্যাট সহকর্মী। বিচার বিভাগীয় নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে যখন উত্তাপ-উত্তেজনা চলছে তখন আমি আলাপ করছিলাম আমার এক বান্ধবীর সাথে। বিচারক নিয়োগে বাধা দেয়ার জন্য আমাদের কিছু কৌশল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করি তার কাছে। প্রেসিডেন্ট বুশের কিছু মনোনয়ন যে ক্ষতিকর হতে পারে এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এরকম বিচারকদের বিরুদ্ধে 'ফিলিবাস্টার' সমর্থন করি আমি। এ আশায়, অন্তত এর মাধ্যমে পরবর্তী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থীদের বাছাই করার একটি সঙ্কেত পাবে হোয়াইট হাউস। তবে বিচারকদের নির্বাচন শেষ পর্যন্ত অন্য কিছুই বুঝিয়েছে, আমি সেই বান্ধবীকে বলি। বেঞ্চে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক আমাদের মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাবেন এটা নিশ্চিত করার জন্য সিনেটের কার্যপ্রনালী ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথ ছিল না। এই পথটি ছিল নির্বাচনে জয়ী হওয়া।

আমার বান্ধবী প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলছিল, 'তুমি কি আসলেই মনে করো পরিস্থিতি উল্টো হলে রিপাবলিকানরা 'ফিলিবাস্টার' ব্যবহারে দ্বিধা করতো না?'

জবাবে বললাম, তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা থাকত বলে আমি মনে করি না। ফিলিবাস্টার ব্যবহারের কারণে ডেমোক্র্যাটদের একটি রক্ষণাত্মক ভাবমূর্তি ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করি আমি। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, জনগণের ভোটে জয়ী হতে না পেরে কোর্ট, আইনজীবী এবং পদ্ধতিগত জটিলতার সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে তারা। এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ডেমোক্র্যাটদের কোন সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে তা ব্যর্থ করার জন্য রিপাবলিকানরাও বারবার একই পথ অবলম্বন করেছে। এ ক্ষেত্রে 'অর্থ-আইনের' কথা বলা যায়। শুধু অধিকারই নয় আমাদের মূল্যবোধগুলোর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যও আমরা যদি কোর্টের ওপর নির্ভর করি, তবুও গণতন্ত্রের ওপর থেকে প্রগতির অনেক বিশ্বাস হারিয়ে যাবে– আমার আশঙ্কা এখানেই।

গণতন্ত্র যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর চেয়েও বেশি কিছু, দৃশ্যত রক্ষণশীলরা এ বোধ হারিয়ে ফেলেছেন। কয়েক বছর আগের এক বিকেলের ঘটনা মনে

www.pathagar.com

পড়ছে আমার। আমি তখন ইলিনয় রাজ্যভার সদস্য। রিপাবলিকানদের আনা মাতৃস্বাস্থ্যসংক্রান্ত একটি বিলের সংশোধনীর ওপর আমি বক্তব্য রাখছিলাম। আংশিক গর্ভপাত বন্ধের জন্য বিলটি আনা হয়। আমার সংশোধনী ছিল, মায়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে সে ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। দলীয় ভিত্তিতে ভোটাভুটিতে আমার সংশোধনীটি নাকচ হয়ে যায়। পরে আমি এক রিপাবলিকান সহকর্মীর কাছে গিয়ে বলি, সংশোধনীটি ছাড়া বিলটি পাস হলেও আদালতে তা সংবিধান পরিপন্থী ঘোষিত হতে পারে। তিনি আমার বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বললেন, এতে কোনো সংশোধনী যুক্ত হলো কি না তা বড় কথা নয়– বিচারক যা চাইবেন সেটিই তিনি করবেন।

'এটাই হলো রাজনীতি' বললেন তিনি। যেতে যেতে তিনি বললেন, 'এখনই আমরা ভোট দিতে যাব।'

আমি ভাবি, এসব লড়াইয়ের আসলেই কি কোনো প্রয়োজন আছে? সিনেটের কার্যপ্রণালী, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, বিচার বিভাগীয় মনোনয়ন, আইনের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা– আমাদের অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন উদ্বেগের সাথে এগুলো দূরত্ব অনেক। এগুলো শুধু দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিরই কিছু উদাহরণ মাত্র।

এর পরও এর প্রয়োজন রয়েছে। এটা, পরিবেশ দূষণকারীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সরকার ফোনে আড়ি পাততে পারে কি না আমাদের সরকারের কর্ম নীতিমালার এমন 'ফলগুলোকে' নির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, আমাদের গণতন্ত্র ও নির্বাচনকেও সংজ্ঞায়িত করতে সহায়তা করে এটা। আমাদের স্বশাসন ব্যবস্থা এমন এক জটিল পদ্ধতি, যার মাধ্যমে এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা আমাদের মূল্যবোধগুলোকে অবয়ব দিতে পারি আর পারি অঙ্গীকারগুলো ভাগাভাগি করে নিতে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই আমার পক্ষপাত রয়েছে। ওয়াশিংটনে আসার আগে আমি ১০ বছর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসনতান্ত্রিক আইন পড়িয়েছি। ল' স্কুলের ক্লাসরুমগুলো ছিল আমার পছন্দ। প্রত্যেক ক্লাসে কেবল চক নিয়ে আমি দাঁড়াতাম ব্লাকবোর্ডের সামনে। ছাত্ররা আমাকে বোঝার চেষ্টা করতো। তাদের কারো মধ্যে থাকতো আগ্রহ, আবার কারো মধ্যে উৎকণ্ঠা। কারো কারো মধ্যে ফুটে উঠত ক্লান্তির ভাব। আমার প্রথম প্রশ্নেই তাদের এসব ভাব কেটে যেতো। জিজ্ঞেস করতাম, এটা বলতে কী বুঝ? এরপর কিছু হাত উঠি উঠি করতো। তারা প্রাথমিকভাবে যে যুক্তিই দেখাক না কেন, সেগুলোকে পেছনে ঠেলে দিতাম আমি। এর পর ধীরে ধীরে কথা শুরু করতাম। ফলে দেখা যেতো ক্ষণিক আগেও ক্লাসে যে নিরস ও প্রাণহীন পরিবেশ ছিল, হঠাৎ তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমার ছাত্রদের চোখ তখন পুরো উন্মোচিত হয়ে যেতো। ক্লাসের পড়া তাদের কাছে তখন অতীতের কোন বিষয় হয়ে থাকতো না, তা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতো।

www.pathagar.com

কোনো কোনো সময় আমি কল্পনা করতাম ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের সাথে আমার কাজের বড় রকমের তফাত নেই– তিনি পুরো ক্যাম্পাস নিয়েই ভাবেন। এ জন্য আমি তাদের বাইবেল শিক্ষাদানের পদ্ধতিটাকে যথার্থ মনে করি। আমি দেখি, আমার ছাত্ররা না পড়েই মনে করে সংবিধান সম্পর্কে তারা অনেক কিছু জানে। তারা আগে শুনে কিছু প্রবাদ শিখে নেয়। আর এগুলো তাৎক্ষণিক যুক্তিতর্কে বেশ উৎসাহের সাথে ব্যবহার করে, অথবা তাদের নিজস্ব মনের বিপরীত বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যেতে চায়।

তবে আমি শাসনতান্ত্রিক আইন পড়াতে গিয়ে আমার সবচেয়ে বেশী যে উপলব্ধিটি হয়েছে, আমার ছাত্ররাও যা উপলব্ধি করুক বলে আমি চেয়েছি– তা হলো দু'শ বছর পর আজও কত সহজেই চাইলেই সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পাওয়া যায় । আমার ছাত্ররা আমাকে একজন গাইড হিসেবে ব্যবহার করতে পারতো, কিন্তু তাদের কোন মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল না। স্বাধীনতার ঘোষণা, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালীন কাগজপত্র এবং সংবিধানকে তাদের, মানুষের তৈরী কিছু বলেই মনে হতো। এগুলো টিমোথি অথবা লুকের মতো ধর্মীয় কোন গ্রন্থ ছিল না। আমি আমার ছাত্রদের বলি তাদের যুক্তিগুলো এবং তাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের আশাআকাঙ্ক্ষার রেকর্ড আমাদের সামনে আছে। আমরা সব সময় তাদের মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করতে না পারলেও আমরা অন্তত সময়ের পর্দাটি অপসারণ করতে পারি এবং পারি তাদের মৌলিক আদর্শগুলো অনুধাবন করতে যেগুলো তাদের কাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে ।

আমাদের সংবিধান এবং আদালতকে ঘিরে চলা বর্তমান বিতর্ক সম্পর্কে এতে কী বলা হয়েছে, তা আমরা বুঝবো কিভাবে? এ জন্য শুরুটা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালীন দলিলগুলো সতর্কভাবে পাঠ করার মধ্য দিয়ে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে অবয়ব পেয়েছে তা আমদের মনে করিয়ে দেবে এগুলো। শ্বাশত অধিকারের ধারণাটি আমরা গ্রহণ করতে পারি। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা এবং বিল অব রাইটস সংশোধনের পর দু'শ বছর পার হলেও এখনো আমরা খুঁজে ফিরছি 'যৌক্তিক' শব্দটির অর্থ। দ্বিতীয় সংশোধনী অস্ত্র আইনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে কি না অথবা পতাকার কোনো অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকারের বিষয় আছে কি না তাও ঠিক করতে পারিনি আমরা। বিয়ের অধিকার, আমাদের দৈহিক শুদ্ধতার অধিকারের মতো মৌলিক সাধারণ অধিকারসংক্রান্ত আইন নিয়েও আমরা বিতর্ক করছি। গর্ভপাত অথবা সমকামী দাম্পত্যের মতো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো সংবিধানে, প্রকাশ্যে না হলেও ইশারা-ইঙ্গিতে স্বীকৃতি আছে কি না তা নিয়েও বিতর্কের অবসান হয়নি।

তবে, রক্ষণশীল বা লিবারেলদের মধ্যে, রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের যে সব বিরোধের বিষয়গুলো রয়েছে তা এখনো নিরসন হতে পারে। অনেকে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের চিহ্নিত মৌলিক বিধিবিধান দেখেননি এবং সংবিধানকে পবিত্র ভেবে সংরক্ষিত করে রেখেছেন এবং আমাদের সাধারণ আইন, আমাদের কথা বলার অধিকার সম্পর্কে জানেন না। ধর্ম পালনের অধিকার এবং শান্তিপূর্ণভাবে একত্র হয়ে সরকারের কাছে দাবি জানানোর অধিকার,

www.pathagar.com

সম্পদের মালিকানার অধিকার, কেনা-বেচার অধিকার এবং যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়া কোনো কিছু অধিগ্রহণ না করা বা অযৌক্তিক তল্লাশির শিকার বা আটক না হওয়ার অধিকার, যথোপযুক্ত ও দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার, নিজস্ব সঙ্কল্প ও সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার, পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ন্যূনতম পর্যায়ে থাকা এবং শিশুদের লালন-পালনের অধিকার সম্পর্কেও অনেকে জানেন না।

আমরা এসব অধিকারকে চিরন্তন বলে মনে করি। স্বাধীনতা অর্থের বিধিবদ্ধকরণ এটাই। আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় যত মানুষ রয়েছে তাদের সবার কাছে এবং সরকারের সব পর্যায়ের জন্য স্বাধীনতার এ অর্থ কার্যকর হবে। এসব চিরন্তন অধিকার সব ব্যক্তির ওপর সমভাবে প্রয়োগযোগ্য হবে বলেও স্বীকার করে নিতে পারি আমরা। এই যুক্তিতে, আমরা রাজনৈতিক পরিসরে যাই বলি না কেন, আমরা সবাই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের শিক্ষাকেই গ্রহণ করছি।

আমরা আরো উপলব্ধি করি যে, একটি ঘোষণা কোন সরকার নয়– একটি মতবাদও যথেষ্ট নয়। জন্ম, পদমর্যাদা, সামাজিক উত্তরাধিকারের পিছুটান থেকে সবাই যদি সত্যিকার অর্থেই মুক্ত হয়ে যায় তবে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে যে নৈরাজ্যের বীজ সুপ্ত এবং সমতার ধারণার বিষক্রিয়ার বিপদটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা বুঝতে পেরেছিলেন। যদি আমার বিশ্বাসজনিত ধারণা আপনার ধারণা থেকে ভালো বা মন্দ বিবেচিত হয় এবং আমার সত্য, ভালো ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত অভিমত যদি আপনার সত্য, ভালো ও সৌন্দর্যের মতোই বিবেচিত না হয়, তাহলে আমরা কিভাবে একটি সহমর্মী সমাজ গঠনের আশা করতে পারি? হবস ও লকের মতো আলোকিত চিন্তাবিদরা বলেছেন, একজনের অধিকার অন্যজনের প্রতি জুলুমের কারণ হবে না– এই সমঝোতার ভিত্তিতে মুক্ত মানুষেরা সরকার গঠন করতে পারেন। তারা তাদের স্বাধীনতা আরো ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি পরিত্যাগ করবেন। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকান বিপ্লবের আগে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে– 'কেবল গণতন্ত্রই পারে স্বাধীনতা ও আইনের শাসন দুটোই নিশ্চিত করতে। গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে, কারা শাসন করবে তার সম্মতি দেবে জনগণ। আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাটি হবে সমরূপ, ভবিষ্যৎবাচ্য এবং স্বচ্ছ। তা একইভাবে প্রযোজ্য হবে শাসক ও শাসিতের ওপর।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতিরা এ তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তাদের পদক্ষেপ নিয়েছেন। এরপরও তাদেরকে নিরুৎসাহিত হওয়ার মতো বাস্তবতার সম্মুখিন হতে হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে গণতন্ত্র কাজ করার উদাহরণ স্বল্প। গণতন্ত্রের পুরনো মডেলগুলোর মধ্যে কোনোটাই প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রের চেয়ে বড় নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১৩টি রাজ্য এবং ৩০ থেকে ৪০ লাখ মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর গণতন্ত্রের এথেনিয়ান মডেল নিয়ে তেমন প্রশ্ন নেই। নিউ ইংল্যান্ডের টাউনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল কার্যকর ব্যবস্থাপনার অযোগ্য। জনগণই সরকার নির্বাচিত করবে এমন প্রজাতন্ত্র ধরনের সরকারই অধিকতর সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে আশাবাদি প্রজাতন্ত্রবাদিও

www.pathagar.com

মনে করেন, এ ধরনের ব্যবস্থা কাজ করতে পারে কেবল ভৌগোলিকভাবে সুসংহত ও সমজাতিক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেখানে আছে অভিন্ন সংস্কৃতি, অভিন্ন বিশ্বাস ও সুবিকশিত নাগরিক কৃষ্টি– যা সব নাগরিকের মধ্যে বিতর্ক ও সঙ্ঘাতকে সীমিত করে রাখে।

রাষ্ট্রের স্থপতিরা নানান যুক্তিতর্ক এবং অনেক লেখালেখির পর এই সমাধানে পৌঁছেন। তাদের এই অবদান অনবদ্য বলে পৃথিবীতে প্রমাণিত হয়েছে। মেডিসনের শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা এতটাই সহজবোধ্য যে, স্কুলছাত্ররাও তা পড়তে পারে। এটা শুধু আইনের শাসন বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই নয়, শুধু বিল অব রাইটসও নয়– একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতীয় সরকারের তিন অঙ্গের বিভাজনও করা হয়েছিল এতে। একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেস, একটি ফেডারেল সরকার এবং রাজ্যসরকারের কর্তত্ব সংরক্ষণ। এই পরিকল্পনার পুরোটাই করা হয়েছে, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, কাজের জবাবদিহিতা, নানামুখী স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য আনা এবং একক বা কিছু মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। অধিকন্তু, আমাদের ইতিহাস একজন স্থপতির অন্তর্দৃষ্টির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করেছে। আর তা হলো, প্রজাতন্ত্র ধরনের স্বশাসনব্যবস্থা মূলত বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে অধিকতর ভালোভাবে কাজ করতে পারে। হ্যামিলটনের ভাষায়, দলগুলোর প্রতিযোগিতা এবং মতের ভিন্নতা, মত প্রকাশ ও বিচক্ষণতাকে উৎসাহিত করে। রাষ্ট্রের ঘোষণা বুঝতে পারার সাথে সাথে আমরা সংবিধানের গঠন নিয়েও ব্যাপক বিতর্কে অবতীর্ণ হতে পারি। বাণিজ্য বিষয়ক ধারার সম্প্রসারিত ক্ষমতার অপব্যবহার রাজ্যগুলোর জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে বলে আমরা আপত্তি জানাতে পারি। কিন্তু, আমরা স্থপতিদের মূল পরিকল্পনার মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি আস্থাশীল এবং এর মাধ্যমে স্পষ্টত গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী। রক্ষণশীল বা উদারপন্থী আমরা সবাই আসলে সংবিধানবাদী।

যদি আমরা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী হই, আর গণতন্ত্রের এসব নীতির প্রতি হই আস্থাশীল–তাহলে রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক থাকবে কী নিয়ে? আমরা ফলাফলের জন্য তর্ক করে অনেক সময় কাটিয়েছি। আমরা নিজেদের ব্যাপারে সৎ হলে স্বীকার করতে হবে, আইনের যথার্থতার ইস্যুতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত দেবে আদালত এবং জটিল ইস্যুগুলো নিষ্পত্তি করে আমাদের জীবনধারা সচল রাখতে সহায়তা করবে আইনসভা। আমরা কি চাইবো যে, শিক্ষকরা আমাদের সন্তানদের প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিক এবং কিছু সংখ্যালঘু শিশুর বিশ্বাস হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হোক? নাকি আমরা সেই প্রার্থনায় বাধা দেবো এবং পিতামাতাকে বাধ্য করবো প্রতিদিন আট ঘন্টার জন্য তাদের সন্তানদের সেই সেকুলার বিশ্বেও যাজকদের হাতে তুলে দিতে? কোন বিশ্ববিদ্যালয় কি বর্ণবৈষম্যের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরে তা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ভর্তি কোটায় প্রয়োগ করতে পারছে? প্রায়ই তা পারছে না। ফিলিবাস্টার অধিকারের মতো কোন বিশেষ নিয়মতান্ত্রিক বিধি অথবা সংবিধানের ব্যাখ্যায় সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে বিতর্কে জয়ী হতে সাহায্য করতে পারে। পারে আমাদের প্রত্যাশা

www.pathagar.com

অনুযায়ী ফল বয়ে আনতে। তখন এক মুহূর্তের জন্য হলেও ভাববো, এটা বেশ ভালো আইন। কিন্তু, যদি বিজয়ী না হই, তখন এটা তেমন একটা পছন্দ হবে না আমাদের।

এ ব্যাপারে ইলিনয় আইনসভার বন্ধুর যুক্তিকে যথার্থ বলে মনে করি আমি। তিনি বলেছিলেন, আজকের শাসনতান্ত্রিক যুক্তিতর্ককে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যাবে না। তবে আমাদের সংবিধান ও আদালতের ভূমিকার যথার্থতা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তাতে তাৎক্ষণিক ফলাফলের বাইরেও অনেক কিছু এসেছে। আমি কিভাবে বিতর্ক করব সে বিষয়েও যুক্তি পেশ করতে পারি। আমরা বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা চাই। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ জনগণই স্বীকার করেন ধারাবাহিকতা, ভবিষ্যৎবাচ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণতার প্রয়োজনীয়তার কথা। আমাদের গণতন্ত্র শাসনকারী আইনগুলো যেন ন্যায্য হয়, আমরা সেটাই চাই।

আর তাই, আমরা যখন গর্ভপাত ও পতাকা পোড়ানো নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি, তখন রাষ্ট্রের স্থপতি ও সংবিধানপ্রণেতাদের মতো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই আমাদের কিছু নির্দেশনা দেয়ার জন্য। বিচারপতি স্ক্যালিয়ার মতো কেউ কেউ মনে করেন মূল চেতনাটি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর তা হলো কঠোরভাবে আইনের অনুসরণ। তাহলেই গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

আবার, বিচারপতি ব্রেয়ারের মতো অন্যরা সাংবিধানিক বিধানের মূল অর্থের গুরুত্বের ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেন না। কিন্তু, কোনো কোনো সময় আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু মূল অর্থের দিকে নজর না দিয়ে, ঘটনা, ইতিহাস এবং বাস্তব ফলাফলকেও বিবেচনায় নিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে রাষ্ট্রের স্থপতি এবং সংবিধানের মূল প্রণেতারা আমাদের বলে দেন কিভাবে চিন্তা করতে হবে। কি চিন্তা করতে হবে সেটি তারা বলেন না। আমাদের নিজস্ব বিবেচনা, নিজস্ব প্রয়োজন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে সেখানে।

প্রশ্ন হতে পারে– কার অধিকার। এ ক্ষেত্রে আমি বিচারপতি স্ক্যালিয়ার অবস্থানের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল। অনেক ক্ষেত্রেই সংবিধানের ভাষা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং সরাসরি তা প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন, কখন নির্বাচন করতে হবে অথবা একজন প্রেসিডেন্টের বয়স কত হতে হবে, সে বিষয়ে সংবিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের কঠোর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করি আমি। সেযুগে তারা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে কিভাবে এতটা সচেতন ছিলেন, তা ভেবে আমি অবাক হই। বিপ্লবের পর সংবিধানের সাদামাটা একটি কাঠামো তৈরি করেন তারা। এর জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় দলিলও তৈরি করেন। এসব দলিল অনুমোদন করেন এবং বিল অব রাইটসের মাধ্যমে তাতে সংশোধনী আনেন। এতকিছু করা হয় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। এসব দলিল পড়লে দেখা যাবে, এগুলোতে এতটাই অবিশ্বাস্য রকমের অধিকার সন্নিবেশিত যে, একে কোনো ঐশ্বরিক আইন না হলেও অন্তত প্রাকৃতিক আইন বলে মনে হবে। তাই বিচারপতি স্ক্যালিয়া ও অন্যরা আমাদের

www.pathagar.com

গণতন্ত্রকে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় বলে মত দিয়েছেন। এ বক্তব্য বেশ প্রলুব্ধকর। মৌলপন্থীদের বিশ্বাস, সংবিধানের মূল চেতনা ও বিষয়াবলি কোনো প্রশ্ন বা বিকৃতি ছাড়াই অনুসরণ করা হলে এবং প্রতিষ্ঠাতারা যে আইন তৈরি করে গেছেন সেগুলো মান্য করা হলে এর বিনিময়ে আমরা একটি কল্যাণমূলক পরিবেশ উপহার পাব।

শেষপর্যন্ত ভাবি, সংবিধানের ব্যাপারে বিচারপতি ব্রেয়ারের দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করতে হবে আমাকে– এটা কোন স্থির বিষয় নয়, এটা একটি জীবন্ত দলিল। নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে পাঠ করতে হবে একে।

এর অন্যথাই বা হবে কিভাবে? আমাদের মৌলিক নীতিমালা ও নির্দেশনা দেয় সংবিধান। আমরা সরকারের অযৌক্তিক তল্লাশির বিষয় হতে পারি না। নাসার কম্পিউটারের ডাটা মাইনিং অপারেশন সম্পর্কেও আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকতে হবে, এটা আশা করা যায় না। অবশ্য, সংবিধান অনুযায়ী আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা সংরক্ষিত থাকতে হবে। কিন্তু সংবিধান বলবে না, ইন্টারনেটের পরিপ্রেক্ষিতে এ স্বাধীনতার মানে কী হতে পারে।

যদিও সংবিধানের অনেক ভাষ্য স্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং তা সরাসরি প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত ধারা, সমঅধিকারের ধারার মতো এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি, সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। যেমন, চতুর্দশ সংশোধনীর মূল উপলব্ধি নিশ্চিতভাবে নারী-পুরুষ বৈষম্যকে সমর্থন করে। এমনকি এতে বর্ণবাদকে কিছুটা অনুমোদন করা হয়েছে। আমরা সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

অবশেষে, কেউ কঠোর পন্থায় আমাদের আধুনিক সাংবিধানিক বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি করতে চাইলে একটি বাড়তি সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই অমূল্য দলিল তৈরির সময় এর অর্থ নিয়ে স্থপতি ও প্রণেতাদের মধ্যেও গভীর ও জোরালো দ্বিমত ছিল। তা শুধু গৌণ বিষয়াবলির ক্ষেত্রেই নয়, অধিকন্তু প্রথম মূল নীতির ব্যাপারেও, শুধু বাহ্যিক উপাত্ত নিয়ে নয় বরং বিপ্লবের মূল বিষয়াবলি নিয়েও। কিন্তু সংবিধানের পাণ্ডুলিপির কালি শুকানোর আগেই সব যুক্তিতর্ক নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ, রাজ্য পর্যায়ের আইনগুলো ডিঙ্গিয়ে যাওয়া, জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন অথবা ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের ক্ষমতা কতটুকু হওয়া উচিত তা নিয়ে তারা বিতর্ক করেছেন। বিদেশী প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এবং আইনের ভূমিকা নির্ধারণে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক করেছেন তারা। রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখিন হলে কথা বলার স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের অধিকার এবং এ রকম আরো কিছু অধিকার স্থগিত রাখার বিপক্ষে তারা কিছু বলেননি। এসব অধিকার সমর্পণ সাময়িক কৌশলের বিষয়। দু'শত বছর পর স্থপতি ও প্রণেতাদের মূল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন একজন বিচারপতি, এটা বিশ্বাস করা অবাস্তব।

www.pathagar.com

কিছু ইতিহাসবিদ ও আইনতাত্ত্বিক সংবিধানের দৃঢ় গঠনের বিরুদ্ধে আরো এক ধাপ এগিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাদের মোদ্দা কথা হলো, সংবিধান নিজেই ছিল বড় ধরনের ইতিবাচক দুর্ঘটনার ফসল। এ দলিলটি কোনো নীতি থেকে উদ্ভূত সঙ্কলন নয়, এটি হলো ক্ষমতা ও সহনশীলতা থেকে উদ্ভূত। আমরা কখনো স্থপতিদের মূল ইচ্ছা কী তা নির্ণয় করতে পারি না। জেফারসন যা ভালো মনে করতেন, হ্যামিলটন সেরকম মনে করতেন না। আবার, হ্যামিলটন অনেক বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন অ্যাডামসের সাথে। সময়, স্থান ও খসড়া প্রণয়নকারীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সংবিধানের আইনগুলো সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আইনের ব্যাখ্যায়ও অনিবার্যভাবে একই বিষয়গুলোর প্রতিফলন ঘটবে। সেই কাঁচা প্রতিযোগিতা, একই বাধ্যবাধকতা, উচ্চ মনন থেকে উদ্ভূত নির্দেশনা– এসব বিষয়ই সবসময় থাকবে। আমি কঠোর গঠনপন্থীদের বিশ্বাস ভেঙে দেয়ার মতো কিছু আপত্তির স্বীকৃতি দিতে চাই। বিশ্বাসের প্রলুব্ধতার জন্য শাসনতন্ত্রের মূল বিষয় যতটা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করা হয় আসলে কিন্তু ততটা নয়। ফলে আমরা দূর অতীতের জটিল ঐতিহ্যের আনুগত্য থেকে আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধকে ভারমুক্ত করতে পারি। আপেক্ষিকতাবাদীদের স্বাধীনতা, নিয়মভঙ্গকারীদের স্বাধীনতা ও পিতা-মাতাকে ত্রুটিযুক্ত মনে করে যেসব তরুণ এবং যারা একজন অন্যজনের কাছ থেকে স্বপক্ষ ত্যাগের স্বাধীনতা শিখেছে– এটি হলো তাদের মত।

শেষ পর্যন্ত এ ধরনের স্বপক্ষ ত্যাগ আমার জন্য অসন্তোষও নিয়ে আসে। হতে পারে আমার কাছে স্থপতিদের প্রতি বিশ্বাসের পুরোটা ছুড়ে ফেলা অতিমাত্রায় অযৌক্তিক। হতে পারে এটিও তার মতই যারা ডারউইনের বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি মনে করি, কাউকে না কাউকে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে বসতে হবে। সবশেষে আমি নিজের কাছেই প্রশ্ন রাখি, সংবিধান কেবল ক্ষমতার বিষয় এবং এতে নীতির কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলে, আমরা সবাই কেন শুধু এটাকে নির্মাণের জন্য কাজ করছি। আমরা যদি এক সাথে যেতে পারি, আমাদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্র শুধু টিকবেই না অধিকন্তু পৃথিবীর অনেক সফল সমাজের জন্য এটি অনুসরণীয় মডেলের খসড়ার মতো ভূমিকা রাখতে পারে।

আমার কাছে মৌলিকত্বের কোনো তাৎপর্য নেই। আমি যে প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাই, তাহলো– আমাদের রূপ-কল্পনা থেকে সরে আসতে হবে। আমাদের গণতন্ত্রকে কেউ নির্মিত বাড়ি হিসেবে না দেখে নির্মীয়মান হিসেবেও দেখতে পারেন। তবে সেখানে থাকতে হবে সংলাপ বা আলোচনার অবকাশ। এ ধারণা অনুযায়ী মেডিসনের নকশার অসাধারণত্ব এটি নয় যে, এতে কাজের একটি স্থির নীলনকশা দেয়া হয়েছে– যেভাবে একজন স্থপতি তার ভবন নির্মাণের নকশা দেয়। এতে আমাদের বিধি-বিধানসহ একটি রূপরেখা দেয়া হয়েছে, তবে এসব আইনের আনুগত্য সত্যের ওপর সমঝোতা নিশ্চিত হওয়া বা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয় না। গর্ভপাত সঠিক না বেঠিক, একজন নারীর নিজের বিষয়ে একান্তভাবে তার সিদ্ধান্ত নেয়া অথবা কোনো আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের যথার্থতা এটি আমাদেও বলে দেয় না। একেবারেই প্রার্থনায় না

www.pathagar.com

যাওয়ার চেয়ে স্কুলের প্রার্থনা শ্রেয় কি না তাও তা বলে না।

সংবিধানের রূপরেখা যা বলতে পারে, তাহলো– আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার মতো উপায় সংগঠিত করা। এর সবকিছু হলো একটি বিস্তৃত মেশিনারির মতো যা ক্ষমতার পৃথকীকরণ করেছে, ক্ষমতায় ভারসাম্য এনেছে, প্রজাতান্ত্রিক নীতিমালা ও বিল অব রাইটস এর নকশা করেছে– যাতে আমরা সংলাপ বা আলাপ-আলোচনায় বাধ্য হই। একটি 'পরামর্শমূলক গণতন্ত্র'– যেখানে সব নাগরিকের বাইরের বাস্তবতার বিপরীতে তাদের ধারণা প্রক্রিয়াকরণে ব্যাপৃত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তাদের মতামতে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা থাকে এবং মতের পরিবর্তন বিনির্মাণ করে। কারণ আমাদের সরকারের হাতে ক্ষমতা বিভাজিত। আমেরিকার আইন তৈরির প্রক্রিয়া এমন সম্ভাবনাকে গ্রহণে বাধ্য করে যাতে সব সময় আমরা সত্যনিষ্ঠ নাও থাকতে পারি। কখনো কখনো আমাদের মতের পরিবর্তন ঘটতে পারে। এটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের স্বার্থ পরীক্ষার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে এবং বলে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত রায় একই সাথে আইনসম্মত আবার উচ্চমাত্রার ভ্রমপ্রবণও হতে পারে।

ঐতিহাসিক রেকর্ড এ মতকে সমর্থন করে। যত কিছুই হোক যদি রাষ্ট্রের সব স্থপতি কোনো প্রণোদনার অংশীদার হয়ে থাকেন, সেটি ছিল নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান। তিনি রাজা, ধর্মযাজক, জেনারেল, গোষ্ঠীগত প্রধান অথবা একনায়ক যা-ই হোন না কেন; কারো একচ্ছত্র ক্ষমতাকে তারা সমর্থন করেননি। তাই কায়জারের রাজত্বকে অস্বীকার করেছেন জর্জ ওয়াশিংটন এবং দুই মেয়াদ পূর্ণ করে ইস্তফা দেন। হ্যামিলটনের পরিকল্পনা ছিল নতুন সেনা বাহিনীকে নেতৃত্ব দেবেন এবং অ্যাডামসের সুখ্যাতি ছিল 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহ' আইনের জন্য। এই আইন তার চেতনা পুরোপুরি ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। ষাটের দশকের উদারবাদী বিচারকরা নয়, জেফারসনই সেই ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্র ও গীর্জার মধ্যে দেয়াল তৈরি করেছিলেন এবং আমরা জেফারসনের পরামর্শ মতো প্রতি দুই বা তিন প্রজন্ম পরপর বিপ্লবে অংশ নিতে অস্বীকার করছি শুধু এ কারণে যে, সংবিধান নিজেই একনায়কতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ রেখে দিয়েছে।

রাষ্ট্রের স্থপতিরা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে কেবল প্রতিরোধই করতে চাননি। সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই এটাকে সন্নিবেশিত করেছেন। যেখানে নির্দেশিত স্বাধীনতার ধারণা ও চূড়ান্ত সত্যের ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেকোনো মতবাদ, ধর্মতত্ত্ব, আদর্শ অথবা ধারণাকে ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে মনে করা এবং যেকোনো স্বৈরাচার সাদৃশ্যতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। অপরিবর্তনীয় কোর্স অথবা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু, নির্মম জিজ্ঞাসাবাদ, সঙ্ঘবদ্ধ নির্যাতন অথবা জিহাদি তৎপরতা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রাষ্ট্রের স্থপতিরা হয়ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন তবে তা করতেন আলোকিত চেতনা দিয়ে। তারা একই সাথে মন ও মননে বিশ্বাস রাখতেন। যা ঈশ্বরই তাদেরকে দিয়েছেন বলে ভাবতেন। বিমূর্ত কিছুর প্রতি তাদের সংশয় ছিল এবং তারা জানতে চাওয়াকে পছন্দ করতেন। যা আমাদের প্রারম্ভিক ইতিহাসে তত্ত্ব ছিল আর এখন বাস্তবতা ও

www.pathagar.com

প্রয়োজনে রূপ নিয়েছে। জেফারসন জাতীয় সরকারের ক্ষমতা সুসংহত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। তবে তিনি দাবি করেছেন, এ ধরনের ক্ষমতার জন্য তিনি অনুশোচনা করেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওয়াশিংটনের অফিস থেকে অ্যাডামসের বিদায়ের পর তার 'রাজনীতি ছাড়া রাজনীতি'র আদর্শ জনস্বার্থে একান্তভাবেই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। স্থপতিদের দূরদর্শিতা আমাদের প্রেরণা জোগাতে পারে। তবে সেটি ছিল তাদের সময়ের বাস্তবতা, তাদের সময়ের প্রায়োগিকতা, নমনীয়তা ও অনুসন্ধিৎসা– যা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়নের টিকে থাকা নিশ্চিত করেছে।

আমাদের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক মানবিকতা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান। সমঝোতা, মধ্যমপন্থা, শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এটিকে চ্যাম্পিয়ন মনে হবে। এতে পরস্পরের পিঠ চুলকানি, স্বার্থ সমঝোতা, স্বার্থপরতা, সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিনিময় দান, অদক্ষতা, কর্মহীনতা ও পক্ষপাতগ্রস্ততার মতো বিষয়গুলোকে কেউ প্রশ্রয় দেয়ার পক্ষে নয়। আমাদের পুরো ইতিহাসে কলামবাজরা বারবার দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এখন আমি ভাবি, গণতান্ত্রিক বক্তব্যের জন্য আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ অথবা ভালো জিনিসের প্রতি অঙ্গীকার বিসর্জন দিতে হবে মনে করে আমরা ভুল করেছি। সর্বোপরী সংবিধান আমাদের মুক্তভাবে কথা বলার স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, আমরা ইচ্ছামতো একের প্রতি অন্যজন গর্জন চিৎকার করব, অন্যজনকেও বলার সুযোগ দিতে হবে। যদিও আমাদের সে অধিকারও রয়েছে। এটি আমাদের ধারণার প্রকৃত স্থান সম্পর্কেও জানায়। দলীয় গলাবাজি ধরনের কাজ করার আগে কাউকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে হবে। আমরা বিতর্ক ও প্রতিযোগিতা করতে পারি যাতে আমাদের পরিপ্রেক্ষিত, মতবিনিময় এবং শুধু সমঝোতা নয় অধিকন্তু একটি যথার্থ ও ভালো চুক্তিতে উপনীত হতে পারি।

সংবিধানের ব্যবস্থার মধ্যে যে জবাবদিহিতা ও ভারসাম্যতা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রয়েছে তাতে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য সুযোগ সন্ধানীরা ওঁৎ পেতে থাকতে পারে, যা হওয়া উচিৎ নয়। ক্ষমতার এ ধরনের বিভাজনে অন্যদের স্বার্থের বিষয়কেও বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়েছে। এমনকি সময়ের পরিবর্তনে ওই গ্রুপগুলো কিভাবে এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপারে কী অনুভব করে তাও দেখতে হবে।

সর্বাত্মকবাদ প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কোনো কোনো সময় আমাদের রাজনীতিকে নীতিহীন করতে পারে। তবে আমাদের ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ে এটি তথ্য সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ ও যুক্তি উপস্থাপনকে উৎসাহিত করেছে। আমরা ইতিবাচক কাজের পক্ষে না বিপক্ষে, স্কুলে প্রার্থনার পক্ষে না বিপক্ষে তা নির্ধারণে আমাদের অবশ্যই আদর্শ ভিশন ও মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের বাস্তবতার বিপক্ষে যাচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। সুতরাং সময়ের বিবর্তনে নতুন আদর্শ ভিশন দিয়ে এবং মূল্যবোধকে গভীরতর করে এগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিশোধন, পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করা যেতে পারে। ম্যাডিসনের মতে, প্রক্রিয়াটা হতে পারে একটি

www.pathagar.com

কনভেনশনের মাধ্যমে সংবিধানকে উপস্থাপন করা। যাতে কোনো ব্যক্তি নিজে তার সম্পদ ও সত্যনিষ্টতা সম্পর্কে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার মত দেবে না এবং যুক্তি প্রদর্শন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সংবিধানে একটি রোডম্যাপ আঁকা হয়েছে যার মাধ্যমে আবেগ থেকে যুক্তিতে, ব্যক্তি স্বাধীনতার নমুনা থেকে সার্বিক সমাজের দাবি পূরণ ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। বিস্ময়কর বিষয় হলো এর কার্যাবলী। যুক্তরাষ্ট্র ইউনিয়নের প্রাথমিক দিনগুলোতে জুলুম-নির্যাতন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও অর্থনীতির বহুমুখী রূপান্তর এবং পশ্চিমা সম্প্রসারণ ঘটেছে। আর লাখ লাখ অভিবাসীর আগমনের পরও আমাদের গণতন্ত্র শুধু টিকেই থাকেনি বরং আরো সমৃদ্ধশালী হয়েছে। যুদ্ধকালে এবং আতঙ্কের সময় এর পরীক্ষা অবশ্যই হয়েছে। ভবিষ্যতেও যে আরো পরীক্ষা দিতে হবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

তবে শুধু একবার সংলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছিল এবং সেটি ছিল এমন একটি বিষয়ে, যা নিয়ে স্থপতিরা আলোচনা করতে চাননি।

ইতিহাসবিদ জোশেফ এলিসের ভাষায়, 'স্বাধীনতার ঘোষণা হলো পৃথিবীর ইতিহাসে রূপান্তরের একটি আন্দোলন, যখন সব আইন এবং মানবিক সম্পর্ক দমননীতির মাধ্যমে শাসনের চিরতরে অবসান ঘটায়।' তবে স্বাধীনতার এ চেতনা আমাদের স্থপতিদের মধ্যে খুব একটা বিস্তৃত হয়নি। যেসব দাস তাদের ক্ষেতে-খামারে কাজ করত, তাদের ঘরবাড়ি ঠিকঠাক রাখত এবং তাদের শিশুদের লালন-পালন করত, তাদের প্রতি এই চেতনা বিস্তার লাভ হয়নি।

সংবিধানের সূক্ষ্ম ব্যবস্থা আমেরিকার রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে বিবেচিত নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তবে এটি সংবিধানের বলয়ের বাইরের নেটিভ আমেরিকানদের অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করেনি। আদালতে জয়ী হওয়ার আগে নেটিভ আমেরিকানরা মূল্যহীন হিসেবে গণ্য হতো। কৃষ্ণাঙ্গ ড্রেড স্কট একজন মুক্ত ব্যক্তি হিসেবে সুপ্রিমকোর্টে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন দাস হিসেবে।

গণতান্ত্রিক ঘোষণায় সম্পদহীন সব সাদা মানুষের নাগরিক অধিকার পর্যাপ্তভাবে নিশ্চিত হয়েছে। এমনকি এ ঘোষণায় নারী, আদর্শ, যুক্তি এবং আমেরিকান প্রগতি নির্বিশেষে এক মহান জাতির অর্থনৈতিক বিকাশের বেদনা দূর হয়েছে। ধর্মীয় ও শ্রেণীগত উত্তেজনা দূর করার ক্ষেত্রে অন্য জাতির কাছে উদাহরণ হিসেবে এটি কাজ করবে। তবে শুধু এ ঘোষণা কোনো দাসকে তার স্বাধীনতা দেবে না, আমেরিকান আদি পাপকে তা মোচন করবে না। শেষ পর্যন্ত তলোয়ারই তাদের 'অমূল্য' সম্পদকে রক্ষা করেছিল।

আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে এটি কী বলে? একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা আমাদের জাতির স্থপতিদের 'ভণ্ড' হিসেবে দেখেন এবং বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণায়

www.pathagar.com

ঘোষিত মহা আদর্শের সাথে সংবিধান বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা কেবল চুক্তির মাধ্যমে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে যে মহান সমঝোতা হয়েছিল তা বিলুপ্তির বিষয়টিকে সমর্থন করেন। অন্য যারা অধিক নিরাপত্তা দাবির প্রতিনিধিত্ব করেন, অধিক কনভেনশনাল স্বাধীনতা চান– তারা জোর দেন দাসপ্রথার ব্যাপারে সব সাংবিধানিক সমঝোতার ওপর। স্বাধীনতার ঘোষণার মূল খসড়ার চেতনা মুছে দেয়া, তৃতীয়-পঞ্চম অনুচ্ছেদ, কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশনে উপস্থাপিত স্ব-আরোপিত বাকস্বাধীনতা আইন এবং দাসপ্রথা নিয়ে এ সময় বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক তোলে বিলুপ্তবাদীরা। এটি ছিল ইউনিয়ন গঠনের অপরিহার্য উপকরণ। প্রজাতন্ত্র ও সিনেট কাঠামোতেও এর প্রয়োজন ছিল। এ ব্যাপারে স্থপতিদের দুর্ভাগ্যজনক নীরবতায় বোঝা যায়, তারা দাসপ্রথার চূড়ান্তভাবে অবসান চাইতে পারতেন। না চাওয়াটা ছিল তাদের একমাত্র ভ্রান্তি, যা সংগঠকদের জন্য সুখকর ছিল না। এটি বিলুপ্তবাদীদের সুযোগ করে দিয়েছে আর বিতর্ক অব্যাহত থাকতে সহায়তা করেছে। একই সাথে এটা এমন একটি কাঠামো উপহার দিয়েছে, যার মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের অবসানের পরও সংঘাত অব্যাহত থাকে। সংবিধানের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর ইউনিয়ন পূর্ণতা পেয়েছে।

আফ্রিকান রক্ত নিয়ে একজন আমেরিকান হিসেবে আমি কিভাবে এ ধরনের বিতর্কে কোনো পক্ষ নেব? আমি আমেরিকাকে অনেক বেশি ভালোবাসি, আমার মেধা-শ্রম যা কিছু বিনিয়োগ সব এখানে। এখানকার প্রতিষ্ঠান, সৌন্দর্য, এমনকি অসৌন্দর্যের প্রতিও আমার অঙ্গীকার রয়েছে। রাষ্ট্রের পত্তনকালের পুরো পরিবেশ তুলে ধরা এ অঙ্গীকারের অংশ। তবে আমি অবিচারের বিস্তৃতিকে মুছে ফেলতে পারব না অথবা অতীত প্রজন্মের ভূতও তাড়াতে পারব না অথবা প্রকাশ্য ক্ষত ও বেদনাকে অস্বীকার করতে পারব না, যা এখনো দেশকে অস্বস্তির মধ্যে রাখছে।

আমি সর্বোচ্চ যা করতে পারি তা হলো ইতিহাসকে আমি স্মরণ করতে পারি, যা সব সময় প্রগতিকে এগিয়ে নেয়নি, কল্যাণকে উচ্চকিত করেনি অথবা সমঝোতায় পৌঁছতে বাধ্য করেনি। এটি স্বাধীনতার জন্য পরিবেশ তৈরি করেছে। কঠিন বা শীতল বাস্তবতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটি ছিল প্রথম ন্যায়বিচারের ডাক দেয়া উইলিয়াম লর্ড গ্যারিসনের মতো অনমনীয় আদর্শবাদীর বিষয়। ডেনমার্ক ভেসি ও ফ্রেডরিক ড্যালাসের মতো দাস ও সাবেক দাস এবং হ্যানিয়ার টাবম্যানের মতো নারীও যাকে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন, 'লড়াই ছাড়া ক্ষমতা অর্জন করা যায় না।' জন ব্রাউনের এটি ছিল দৈববাণীর মতো। তিনি সাদা-কালো মানুষের রক্ত বের করে দেখানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আধা-দাস, আধামুক্ত জাতির ইস্যুটি জনপ্রিয় করতে সহায়তা করেন তিনি। আমি সেই ভাষণকে স্মরণ করি, যেখানে বলা হয়, সাংবিধানিক আদেশও কোনো কোনো সময় ক্ষমতাধর বিলাসিতা হতে পারে এবং কোনো কোনো সময় তা বাতিকগ্রস্ত, গোড়া, অন্ধযাজক, বিক্ষুব্ধ, অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, সর্বাত্মকবাদিতা হয়ে দাঁড়ায় লড়াইয়ের নতুন ক্ষেত্র। এসব জেনেও যারা এ ধরনের বিষয় নিয়ে এগোতে চান, আমি তাদের সরাসরি নাকচ করে দিতে চাই।

www.pathagar.com

গর্ভপাতবিরোধী যেসব একটিভিস্ট আমার টাউন হলের সমাবেশে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অথবা প্রাণী অধিকারবাদী যেসব একটিভিস্ট একটি ল্যাবরেটরিতে চড়াও হয়েছিলেন– তাদের সাথে আমি কোন্ মাত্রায় দ্বিমত পোষণ করি, সেটা বড় নয়। আমি অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চয়তাকে তুলে নিতে চাই। চূড়ান্ত সত্যটিও অনেক সময় যথেচ্ছ হতে পারে– এ বিষয়টিও তুলে ধরতে চাই।

আমি লিঙ্কনের মতো কাউকে আগে বা পরে দেখিনি, যিনি আমাদের গণতন্ত্রের ঘোষণা আর এ ধরনের ঘোষণার সীমাবদ্ধতা– দুটিই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আমরা তাকে তার দৃঢ়তা এবং সংকল্পের গভীরতার জন্য স্মরণ করি– দাসত্বের ব্যাপারে তার নিস্ফল বিরোধিতা এবং কোন বিভক্ত বাড়ি টিকে থাকতে পারে না এ ব্যাপারে তার সংকল্প ছিল সুদৃঢ়। কিন্তু তার শাসন যে বাস্তবতা দ্বারা নির্দেশিত ছিল, তা আমাদের আজও পীড়া দেয়। একটি বাস্তবতা হলো, যুদ্ধ ছাড়া দক্ষিণকে ইউনিয়নের মধ্যে ধরে রাখার ব্যাপারে যুক্তিতর্ক পরীক্ষা করা যেতে পারত। একজনের পর একজন জেনারেল নিয়োগ, একটার পর একটা কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারত। এক সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। যেখানে যুদ্ধের সার্বিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে সংবিধান সেই বিষয়টিকে জোর দেবে। সুবিধাজনক কৌশলের স্বার্থে লিঙ্কন কখনো সংকল্পকে বিসর্জন দেননি বলে আমার বিশ্বাস। অধিকন্তু সেটি ছিল দু'টি সাংঘর্ষিক ধারার মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা। আমাদের সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা করে পৌঁছার শিক্ষা এ কারণে যে, আমরা সবাই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং কখনো ঈশ্বর আমাদের পক্ষে আছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলতে বা করতে পারি না। এরপরও আমাদের কাজ করতে হবে যেন আমরা ঠিক পথে আছি, মনে রাখতে হবে শুধু ঈশ্বরের বিধানই ভুলত্রুটি থেকে দূরে থাকতে পারে।

আমাদের গণতন্ত্রের কাঠামোর মাধ্যমে লিঙ্কন তার মূলনীতিগুলোকে এগিয়ে নিয়েছেন। বক্তৃতা-বিতর্ক ও যৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক আমাদের প্রকৃতির ভালো দিকগুলোর প্রতি আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। সেখানেও ছিল এক ধরনের নিগ্রহ, যা তিনি অনুমোদন করেন। এক সময় উত্তর ও দক্ষিণের সংলাপ ভেঙে যায়, আর অনিবার্য হয়ে ওঠে যুদ্ধ। প্রতিপক্ষে যুদ্ধরত পিতা ও পুত্রের নিষ্ঠুরতার বিস্তৃতি রোধ করা অথবা যুদ্ধবীরদের খাটো করা কতটা যথাযথভাবে হয়েছে সেটি কোনো বিষয় ছিল না। দাসদের রক্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের জাতিকে মাঝে মধ্যে নৈতিক দুর্বলতায় পেয়ে বসে এবং গেটিসবার্গে যারা সমাহিত তারা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা যদি নিজেদের চিরন্তন সত্য আবিষ্কারেই শুধু ব্যাপৃত রাখি এবং এটাকে স্বীকৃতি দিই তাহলে আমাদের বড় ধরনের মূল্য দিতে হতে পারে।

জর্জ বুশের ফেডারেল আপিল কোর্টে বিচারক মনোনয়ন দেয়ার পর এ ব্যাপারে আমার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের জন্য শেষ রাতের ধ্যানমগ্নতার প্রয়োজন হয়নি। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

সিনেটের সঙ্কট কেটে যায় অথবা বলা যায়, ধামচাপা পড়ে। সাতজন ডেমোক্র্যাট সিনেটর জর্জ বুশের পাঁচ বিতর্কিত বিচারকের মধ্যে তিনজনের ব্যাপারে ফিলিবাস্টার না করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ভবিষ্যতে 'অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির' জন্য ফিলিবাস্টার সংরক্ষিত রাখার সঙ্কল্প করেন তারা। এর বিনিময়ে 'ফিলিবাস্টার' স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত করতে 'পারমাণবিক বিকল্পে'র বিপক্ষে ভোটদানের প্রতিশ্রুতি দেন সাতজন রিপাবলিকান সিনেটর। আবার 'অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি' এলে তারা নিজের মত পরিবর্তন করতে পারেন। কোন্ অবস্থাকে আমরা 'অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি' বলব– তা কিন্তু কেউ বললেন না। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান একটিভিস্টরা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হন। তারা খুব তিক্তভাবে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাদের পক্ষ আত্মসমর্পণ করেছে।

কথিত ১৪ জনের গ্রুপে আমি যুক্ত হইনি। এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিচারকের জীবনবৃত্তান্ত দেয়া হয়। এদের মনোনয়নে ফিলিবাস্টার প্রয়োগের মতো 'অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি' তৈরী হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন কঠিন মনে হয়। তবে এখনো আমি সহকর্মীদের প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখিনি। এ বিষয়ে ডেমোক্র্যাটরা বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সমঝোতা ছাড়া সেই 'পারমাণবিক বিকল্প'কে বিদায় করতে পারার সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ।

ঘটনার এ মোড় পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশী উৎফুল্ল হন সিনেটর বির্ড। যেদিন সমঝোতার বিষয়টি ঘোষণা করা হয়া সেদিন সিনেটর বির্ড ভার্জিনিয়া থেকে নির্বাচিত 'গ্রুপ ১৪'-এর কনিষ্ঠতম রিপাবলিকান সিনেটর জন ওয়ার্নারকে সাথে নিয়ে হন হন করে নিচে ক্যাপিটলের হলঘরে চলে যান। জনাকীর্ণ সাংবাদিকদের সমাবেশে সিনেটর বির্ড ঘোষণা করেন, 'আমরা প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করেছি।' আমি মৃদু হাসি এবং সেই সফরের কথা ভাবি। আমরা দু'জন কয়েক মাস আগেই এ বিষয়টির সমাধান করতে পারতাম।

সেটি ছিল ক্যাপিটলের দ্বিতীয় তলায় সিনেটর বির্ডের ছোট রুম। ছোট, সুন্দর ও রঙের কর্মশোভিত অনেকগুলো কক্ষের একটি। এক সময় এখানে সিনেট কমিটিগুলো নিয়মিত বৈঠকে বসত। বির্ডের সচিব আমাকে তার ব্যক্তিগত অফিসে নিয়ে গেলেন। সেটি বিভিন্ন ধরনের বই ও পাণ্ডুলিপিতে ভর্তি ছিল। বিভিন্ন পুরনো ছবি ও নির্বাচনী প্রচারণার স্মারক ছিল দেয়ালে সাঁটা। সিনেটর বির্ড আমাকে বললেন, আপত্তি না থাকলে আমরা একসাথে কিছু ছবি তুলি। আমরা ফটোগ্রাফারের জন্য পরস্পর করমর্দন করলাম ও হাসলাম। আমরা একজোড়া জমকালে চেয়ারে পাশাপাশি বসি। আমি বির্ডের স্ত্রীর খবর নিলাম। শুনলাম তার অবস্থা অবনতির দিকে। আমি সিনেটর বির্ডের কাছে ছবি তোলার সময় কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। অবশেষে, সিনেটের একজন নতুন সদস্য হিসেবে আমার প্রতি তার পরামর্শ চাইলাম।

বির্ড বললেন, সিনেটের বিধিবিধান সম্পর্কে জান। তিনি আরো বললেন, শুধু বিধি জানলে হবে না, একই সাথে জানতে হবে এর অতীতের দৃষ্টান্তগুলোও। তিনি পেছনের মোটা বাঁধাই করা সারি সারি বইগুলো দেখালেন। এসব বইয়ের সব ক'টিতে হাতে

www.pathagar.com

লেখা লেভেল লাগানো। তিনি বললেন, 'এ সময়ে খুব বেশি লোক এসব জানার আগ্রহ দেখায় না। সব কিছুই যেন জনাকীর্ণ, সিনেটরের সময়ের দাবি অনেক। কিন্তু এসব বিধিবিধানের মধ্যেই বলা আছে সিনেটের ক্ষমতা। এগুলোই হলো রাষ্ট্রের চাবিকাঠি।'

আমরা সিনেটের অতীত নিয়ে আলোচনা করি। তার জানা প্রেসিডেন্ট এবং নিজের তৈরি করা বিলগুলো কিভাবে তিনি সামলিয়েছেন, তা নিয়ে কথা বলি। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি সিনেটে খুব ভালো করতে পারবে, তবে এখন অনেকে যেভাবে হোয়াইট হাউসের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছে তেমনটা হওয়া উচিত নয়। তারা বোঝে না যে, সংবিধান তৈরি করা হয়েছে সিনেটকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। সিনেটই হলে প্রজাতন্ত্রের হৃদয় ও আত্মা।'

সিনেটর বির্ড বললেন, 'সংবিধান এখন তেমন কেউই পড়ে না।' বুক পকেট থেকে সংবিধানের ক্ষুদ্র সংস্করণটি বের করে তিনি বললেন, 'আমি সব সময় বলি এই দলিলটি এবং পবিত্র বাইবেল–এ দু'টি থেকেই আমার প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা আমি পেতে পারি।'

আমি চলে আসার আগে তিনি বললেন, সচিব আমার জন্য তার সিনেট ইতিহাস বইয়ের একটি সেট নিয়ে আসছেন। সচিব বই আনার পর তিনি সুন্দরভাবে বাঁধানো বইগুলো ধীরে-সুস্থে টেবিলের ওপর সাজালেন এবং একটি কলম চাইলেন। আমি তাকে বললাম এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই লেখার সময় কিভাবে করে নিলেন?

তিনি বললেন, 'ওহ, আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।' মাথা নাড়িয়ে তিনি বললেন, 'এ জন্য আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমি যা পারতাম না তার চেয়ে বেশি এটি নয়।' হঠাৎ করে তিনি থামলেন এবং আমার চোখের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। বললেন, 'তুমি জান– আমার একটি দুঃখবোধ আছে, সেটি হলো, তারুণ্যের বোকামি...।' আমরা কিছু সময়ের জন্য চুপ থাকলাম। আমাদের দু'জনের বয়স ও অভিজ্ঞতার ব্যবধানের কথা ভাবলাম।

বিদায়ের সময় আমি বললাম, 'সিনেটর, আমাদের সবারই কিছু দুঃখ আছে। আমরা শুধু শেষ পর্যন্ত বলতে পারি, ঈশ্বর আমাদের করুণা করুন।'

এক মুহূর্ত তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, এরপর হাসলেন এবং তার একটি বইয়ের মোড়ক খুললেন। তিনি বললেন, 'ঈশ্বর দয়ালু। আমাকে স্বাক্ষর করতে দাও এরপর এটি তুমি নাও।' তিনি এক হাত দিয়ে নিয়ে অন্য হাতে ধীরে ধীরে উপহারের ওপর আমার নাম এঁকে দিলেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

রাজনীতি

www.amarboi.org

সিনেটর হিসেবে আমার প্রিয় কাজের একটি হলো টাউন হলে সমাবেশের আয়োজন করা। সিনেটর হওয়ার পর প্রথম বছরে ইলিয়নয়ের বিভিন্ন স্থানে আমি ৩৯টি সমাবেশের আয়োজন করি। এগুলোর মধ্যে আন্নার মতো মফস্বলের ছোট শহর যেমন রয়েছে, তেমনি আছে ন্যাপেরভিলের মতো সমৃদ্ধ শহরতলিও। এর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ গীর্জা এবং রক আইল্যান্ডের একটি কলেজও ছিল। খুব একটা জাঁকজমক থাকত না এসব অনুষ্ঠানে। আমার কর্মীরা স্থানীয় হাইস্কুল, লাইব্রেরি অথবা কমিউনিটি কলেজে গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতো, তারা এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায় কি না সে ব্যাপারে। এক সপ্তাহ বা তার কিছু আগে শহরের সংবাদপত্র, গীর্জার বুলেটিন ও স্থানীয় বেতার কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন দেয়া হতো অনুষ্ঠান সম্পর্কে। সভার দিন নগরীর নেতাদের সাথে আলোচনার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টা আগে আমি সমাবেশস্থলে হাজির হতাম এবং আমরা কিছু স্থানীয় ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতাম। এর মধ্যে থাকত কোথায় রাস্তার সংস্কার প্রয়োজন অথবা নতুন কোন প্রবীণ নিবাস নির্মাণ প্রয়োজন আছে কি না– এসব বিষয়। কিছু ছবি উঠানোর পর আমরা হল রুমে প্রবেশ করতাম। যেখানে অপেক্ষমাণ থাকত সাধারণ মানুষ। আমি তাদের সাথেও করমর্দন করে মঞ্চে উঠতাম। সেখানে সাধারণত থাকত একটি বক্তৃতামঞ্চ, একটি মাইক্রোফোন, এক বোতল পানি এবং স্ট্যান্ডে সাঁটানো একটি আমেরিকান পতাকা। এরপর এক ঘন্টা বা এর কিছু বেশি সময় ধরে আমি সেসব মানুষের প্রশ্নের জবাব দিতাম যারা আমাকে ভোট দিয়ে ওয়াশিংটন পাঠিয়েছেন।

এসব সমাবেশে উপস্থিতি সবসময় একরকম হতো না। ৫০ থেকে শুরু করে ২ হাজার বা তারও বেশি লোকের সমাগম হতো এসব অনুষ্ঠানে। তবে লোক যাই হোক না কেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতাম আমি। বিভিন্ন কাউন্টি থেকে আসতেন এরা।

www.pathagar.com

রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট, প্রবীণ ও নবীন, স্থূল ও ক্ষীণকায়, ট্রাকচালক, কলেজ অধ্যাপক, গৃহিণী, বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্কুলশিক্ষক ও বীমা এজেন্ট, সচিব, ডাক্তার, সমাজকর্মীসহ সব পেশার মানুষ থাকতো সমাবেশগুলোতে। অভ্যাগতরা সাধারণভাবে হতো অত্যন্তভদ্র ও মনোযোগী। তারা কোনো বিষয়ে আমার বা একে অন্যের সাথে দ্বিমত করলেও তাদের ভদ্রতার কোনো ব্যতিক্রম হতো না। তারা আমাকে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র, বাজেট ঘাটতি, মিয়ানমারে মানবাধিকার, ইথানল, বার্ড ফ্লু, স্কুলের অর্থায়ন এবং মহাকাশ গবেষণার মতো বিষয়েও প্রশ্ন করত। মাঝে মধ্যে কিছু প্রশ্নে বিস্মিত হতাম আমি। একটি ফার্ম কাউন্টিতে বসবাসকারী এক পীতাভ চুলের তরুণী আবেগভরা কণ্ঠে আবেদন জানায়, দারফুর পরিস্থিতিতে আমাদের হস্তক্ষেপের জন্য। ইনার সিটির অন্য এক পৌঢ় কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক মৃত্তিকা সংরক্ষণের ওপর কৌতূহলী প্রশ্ন করেন।

আমি জনতার দিকে তাকাতাম আর উৎসাহবোধ করতাম। আমি তাদের দেখেছি কঠোর পরিশ্রম করতে। যেভাবে তারা শিশুদের লালনপালন করে তা দেখে আমি আশান্বিত হই। তাদের সাথে আমার সময়টা যেন মনে হতো ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে উষ্ণ অনুভবের মতো। আমার বেছে নেয়া এ কাজের জন্য আমি প্রফুল্ল হতাম।

সভা শেষ হওয়ার পর জনগণ সাধারণত আমার সাথে হাত মেলাতে আসত, ছবি তুলত এবং তাদের শিশুদের অটোগ্রাফ দেয়ার জন্য পাঠাত। তারা আমার হাতে স্লিপ, প্রবন্ধ, বিজনেস কার্ড, হাতে লেখা নোট, ছোটখাটো ধর্মীয় সামগ্রী, শুভেচ্ছা কার্ড তুলে দিত। কোনো কোনো সময় হয়তো হাত চেপে ধরে বলত– আমার প্রতি তাদের অনেক আশা, তবে তারা উদ্বিগ্ন– ওয়াশিংটন হয়তো আমাকে পাল্টে দিতে পারে এবং ক্ষমতায় গিয়ে অন্যরা যে রকম হয় আমিও হয়তো সেরকমটি হয়ে যাবো।

তারা আমাকে বলত, 'তুমি যা ছিলে তা-ই থেকো'

দয়া করে হতাশ কোরো না আমাদের।

আমেরিকার ঐতিহ্য হলো, আমাদের রাজনীতির সমস্যাগুলো রাজনৈতিক নেতাদের মানের সাথে জড়িত। মাঝে মধ্যে এটা একেবারেই সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়– প্রেসিডেন্ট হলো আস্ত এক হাবা অথবা অমুক অমুক কংগ্রেসম্যান হলো একেবারে অকর্মা। মাঝে মধ্যে এ অভিযোগ করা হয় ব্যাপক পরিসরে। বলা হয়, 'তারা বিশেষ কায়েমি স্বার্থের হাতে বন্দী'। ওয়াশিংটনে সবার ব্যাপারেই অধিকাংশ ভোটার বলে 'তারা শুধু রাজনীতির খেল খেলছেন'। এর অর্থ– ভোটাররা নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছেন বা অবস্থান নিচ্ছেন। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে নির্বাচনী প্রচারণা বা নির্বাচন করার জন্য চাঁদা দিচ্ছেন অথবা দলের তাঁবেদারি করছেন। রাজনীতিকরা তাদের নিজস্ব পরিসর থেকেও সবচেয়ে মারাত্মক সমালোচনার সম্মুখীন হন। 'ডেমোক্র্যাটরা কোনো কিছুই করে না', আর 'রিপাবলিকানদের নামটাই শুধু আছে'– এসব বলা হয়। সবশেষে বলা হয়, 'ওয়াশিংটনে কোনো পরিবর্তন আনতে

www.pathagar.com

চাইলে দুর্বৃত্তদের সেখান থেকে তাড়াতে হবে।'

অথচ, বছরের পর বছর দুর্বৃত্তরা যেখানে ছিল, আমরা সেখানেই তাদের রেখেছি। প্রতিনিধি সভার সদস্যদের পুনর্নির্বাচনের হার প্রায় ৯৬ শতাংশ।

এ অবস্থার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অনেক কারণ হয়তো দেখাতে পারবেন। আজকের তথ্যপ্রযুক্তির এ বিশ্বে একজন ব্যস্ত ও ভিন্নমুখী নির্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা অনেক কঠিন। ফলে রাজনীতিতে বিজয়ী হওয়ার জন্য নাম-পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে ওঠে। বর্তমান জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনে নিজেদের বিজয়কে নিশ্চিত করার জন্য তাদের নাম বার বার যাতে উচ্চারিত হয় সেদিকে সজাগ থাকেন। আর এ জন্য ৪ জুলাইয়ের কুচকাওয়াজ অথবা রোববার সকালের টক শোর ফিতা কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা। ক্ষমতায় থাকা প্রার্থীরা তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রেও থাকেন সুবিধাজনক অবস্থানে। রাজনৈতিক চাঁদার বিষয়টি এলে ডান-বাম সব দিকের কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো হাজির হয় তাদের তদবির নিয়ে। রাজনৈতিক অসদুপায় অবলম্বনে বাধ্য করতে তাদের ভূমিকা, প্রতিনিধি সভার সদস্যদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। বর্তমানে যে কোন ক্ষমতাসীন দল, কমপিউটারের সুক্ষ্মতায় কংগ্রেসের প্রতিটি আসন এমনভাবে নির্ধারণ করতে পারে যেন সেখানে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান যে কোন একটি দলের ভোটারের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে। এটা এরকম যেন, ভোটাররা তাদের প্রতিনিধিকে বাছাই করছেন না, প্রতিনিধিরাই বাছাই করে নিচ্ছেন কারা তার ভোটার হবেন।

খুব কম উল্লেখ করা হলেও আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। ভোটাররা কংগ্রেসকে ঘৃণা করলেও কেন কংগ্রেস সদস্যদের পছন্দ করছেন, তা বুঝতে সাহায্য করবে এটা। সব রাজনীতিবিদই যে, সাধারণ মানুষের পছন্দ করার মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

অবশ্য আমার অনেক সিনেট সহকর্মীর ক্ষেত্রে এটা যে সত্য, তা আমি দেখেছি। পরস্পরের সাথে কথা বলার সময় তাদের সান্নিধ্য বেশ চমৎকার। টেড কেনেডি অথবা ট্রেন্ট লটের মতো ভালো গল্প বলতে কাউকে আমি দেখিনি। কেন্ট কনরাড বা রিচার্ড শেলবি'র রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ডেবি স্টাবেনো বা মেল মার্টিনেজের সঙ্গ বেশ উপভোগ্য। তারা নিজেদের মেধাবী, চিন্তাশীল ও কর্মঠ হিসেবে প্রমাণ করেছেন। নিজের রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন ইস্যুর পেছনে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করেন তারা। হ্যাঁ, স্থবির ধরনের কিছু লোকও আছেন যারা কথা বলেন অন্তহীন অথবা তাদের স্টাফদের শুধু নির্দেশই দিয়ে থাকেন। আমি সিনেট কক্ষেই বেশী সময় কাটাই। আমি বারবার চেষ্টা করেছি সেই সিনেটরদের চিহ্নিত করতে যাদের দোষে আমরা বিভিন্ন মাত্রায় সম্মানহানির সম্মুখীন। দেখা গেছে, সেখানে মেজাজের সমস্যা আছে, গভীর একগুঁয়েমি আছে, দুর্নিবার অহঙ্কার আছে। তবে একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে ব্যতিক্রম নন একজন সিনেটর। আমি সেসব সহকর্মীর সাথেও কথা বলেছি যাদের সাথে আমার মত একেবারেই মেলে না। তাদের মৌলিক আন্তরিকতা নিয়ে আমার কোন কথা নেই—তারা

www.pathagar.com

কোন জিনিস এখনই পেতে চায় এবং দেশকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী দেখতে চায়। তাদের এই ইচ্ছেগুলো, তাদের নির্বাচনী এলাকার জনগণেরই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং তাদের মূল্যবোধও তা-ই, যা তাদের নির্বাচনী এলাকার পরিবেশ অনুমোদন করে।

সুতরাং, এসব নারী-পুরুষকে নির্মম, অনমনীয়, অসৎ হিসেবে চিত্রিত করে এবং কখনো কখনো নীচ চরিত্রের বলে কুৎসা রটানোর কিছু নেই। কোন জিনিসটি এ অবস্থার যৌক্তিকভাবে প্রতিরোধে সাহায্য করবে? দীর্ঘ সময় আমি ওয়াশিংটনে কাটিয়েছি, আমি অনেক বন্ধুকে দেখেছি যারা আমার চেহারায় পরিবর্তনের চিহ্ন খুঁজে পেতে চেয়েছেন। আমাকে নব্য দাম্ভিকও প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমার যুক্তি প্রদর্শনের মানসিকতা ও হিসেব করে কথা বলার প্রবণতার কারণ বের করতে চেয়েছেন। আমিও একইভাবে নিজেকে পরীক্ষা করতে চেয়েছি। আমি দেখি, আমার নতুন সহকর্মীদের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে রয়েছে, যা আমাকে কোন টিভি সিরিয়ালের খল রাজনীতিকের মতো চরিত্রে রূপান্তর করতে পারে।

আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে আমি অনুসন্ধান শুরু করি। অন্তত এ ক্ষেত্রে সিনেটররা কিছুটা ভিন্ন। কেউ কেউ দৈবক্রমে আসীন হন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর পদে। অন্তত এ জন্য নিজেকে কিছুটা বড় করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার রাজ্যের মানুষ আপনাকে সম্মান দিয়েছে এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। যেভাবেই হোক আপনি এলাকার জনগণের পক্ষে কথা বলার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ বিশ্বাস অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়া উচিত। কোনো কোনো সময় ওপরে ওঠার কষ্ট সহ্য করার ইচ্ছা থাকতে হবে। কখনো বীর ভাবতে হবে নিজেকে।

শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষাই পর্যাপ্ত নয়। বলা হয়, লৌকিক বা অলৌকিক– উদ্দেশ্যের মধ্যে জট পাকানো অবস্থা যা-ই থাকুক না কেন, যারা একগুয়ে ধরনের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটান, নিজেদের স্বাস্থ্য, সম্পর্ক, মানসিক ভারসাম্য ও মর্যাদার তেমন তোয়াক্কা করেন, রাজনীতির ময়দানে তারাই সফল হন। এগুলোই তাদের সিনেটর হওয়ার পথে ঠেলে দেয়। আমার প্রাইমারির প্রচারণা শেষ হওয়ার পর ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখি দেড় বছরের মধ্যে মাত্র সাতটি দিন আমি অবকাশ নিতে পেরেছি। বাকি সময়ের প্রতিটি দিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা আমি কাটিয়েছি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে। এটি এমন কোনো কিছু ছিল না যার জন্য আমি গর্ব অনুভব করতে পারি। আমার কাজটি যে স্বাভাবিক হচ্ছে না, মিশেল সপ্তাহে কয়েকবার আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতো।

রাজনীতিকদের আচরণ ভালো নয় বলে যে সমালোচনা করা হয় তার জন্য উচ্চাভিলাস অথবা এককেন্দ্রিকতা দায়ী নয়। সব সময় আবেগ থাকা বেশ ক্ষতিকর। প্রার্থীতা ঘোষণার পর আবেগকে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রার্থীকে এবং নির্বাচনের দিন পার না হওয়া পর্যন্ত তা বন্দী করে রাখতে হবে। এই আবেগ হলো একধরনের ভয়।

www.pathagar.com

তা কেবল হেরে যাওয়ার ভয় নয়। যদিও এটাও অনেক খারাপ। ভয় হলো সম্পূর্ণ, পুরোপুরি অবমাননার শিকার হওয়ার ভয়।

যেমন, রাজনীতিতে আমার একটি হারের কথা বলা যায়। এটা এখনো পীড়া দেয় আমাকে। তখনকার ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান ববি রাসের কাছে ২০০০ সালে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছিলাম। এটি ছিল এমন এক প্রতিযোগিতা যেখানে সব কিছুতেই ভুল হয়েছিল আমার। নিজেরই ভুল কৌশল আমার জন্য বিপর্যয় নিয়ে আসে। আমার প্রার্থিতা ঘোষণার পর দুই সপ্তাহে মাত্র কয়েক হাজার ডলার চাঁদা ওঠে। আমি আমার প্রথম জরিপে অংশ নিয়ে দেখি ৯০ শতাংশ ভোটারই ববি রাসের নাম বাছাই করছে। আমার পক্ষে ভোটার সংখ্যা শেষ পর্যন্ত ১১ শতাংশে দাঁড়ায়। ৭০ শতাংশের বেশী ভোটার তাকে অনুমোদন করে, আর আমার পক্ষে আসে ৮ শতাংশ। এভাবে আমি আধুনিক রাজনীতির একটি মৌলিক শিক্ষা লাভ করি। প্রার্থিতা ঘোষণার আগে নিজে নিজেই নির্বাচন করা উচিত।

এর পর থেকে আমার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে শুরু করে। অক্টোবরে, আমার প্রতিপক্ষের প্রতি সমর্থন জানায়নি এমন কিছু দলীয় কর্মকর্তার সমর্থন আদায়ের জন্য তাদের সাথে বৈঠকের উদ্যোগ নিই আমি। এ সময় রেডিওতে শুনতে পাই যে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশের তরুণ ছেলে তার বাড়ির সামনে দু'জন মাদক ব্যবসায়ীর গুলিতে মারা গেছে। আমি রাশের জন্য শোকাহত হই এবং প্রচারকাজ স্থগিত করে দিই এক মাসের জন্য।

এরপরের বড় দিনের ছুটিতে নানীকে দেখতে আমি পাঁচ দিনের সফরে হাওয়াই যাই। সাথে ছিল স্ত্রী মিশেল ও ১৮ মাসের কন্যা মালিয়া। এ সময় আকস্মিকভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের ভোটাভুটির জন্য রাজ্য আইনসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। মালিয়া হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি ভোটাভুটিতে থাকতে পারিনি এবং বিলটি অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত। দু'দিন পর 'ও হেনরি বিমানবন্দরে' এসে নতুন বিপদে পড়ি। অসুস্থ শিশু মালিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়। মিশেল আমার সাথে কথা বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয় এক প্রতিবেদন। এতে বলা হয়, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলটি কয়েকটি ভোটের জন্য অনুমোদন পায়নি এবং রাজ্য সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান প্রার্থী বারাক ওবামা অবকাশ কাটাতে হাওয়াই গিয়েছেন। আমার প্রচার ম্যানেজার ফোন করে জানান, প্রতিপক্ষ কংগ্রেসম্যান আমার বিরুদ্ধে শিগগিরই একটি বিজ্ঞাপন ছাড়তে যাচ্ছেন। এতে দেখানো হবে, একটি পামগাছ, সৈকতের চেয়ারে বসে একজন স্ট্র দিয়ে মাই-টাই পান করছেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে মৃদু গিটার বাজছে, এরপর বলা হচ্ছে, 'শিকাগোতে যখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ হারে খুনের ঘটনা ঘটছে, তখন বারাক ওবামা...।'

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। ওটুকু বলার পরই সব বুঝে গেছি।

প্রচারকাজের অর্ধেক সময় তখন পেরিয়ে গেছে। জানি, আমি হেরে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

প্রতিদিন ভোরে একটি আতঙ্ক নিয়েই যাত্রা শুরু করি। এও জানি, আমাকে হাসি আর করমর্দনের মধ্য দিয়ে দিনটি কাটাতে হবে এবং দেখাতে হবে যেন সব কিছুই আমার পরিকল্পনা মতো চলছে। প্রাইমারির কয়েক সপ্তাহ আগে আমার প্রচারকাজে কিছুটা উন্নতি হয়। বিতর্কে আমি বেশ ভালো করি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও শিক্ষা প্রস্তাবগুলো প্রশংসিত হয়। এমনকি শিকাগো ট্রিবিউনের স্বীকৃতিও পাওয়া যায় আমার কথাগুলোর প্রতি। তবে ইতোমধ্যে দেরী হয়ে গেছে অনেক। বিজয় উৎসবের জন্য হাজির হয়ে দেখি প্রতিযোগিতার ফল ইতোমধ্যে দেয়া হয়ে গেছে। আর ৩১ পয়েন্টে হেরে গেছি আমি।

আমি বলব না যে, রাজনীতিকদের জন্য এ ধরনের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি নতুন কোন ঘটনা। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে বেদনাহত হওয়ার ঘটনা যেখানে গোপনে বা ব্যক্তিগতভাবে ঘটে, সেখানে রাজনীতিকদের ব্যর্থতার প্রদর্শনী হয় জনসমক্ষে। কিন্তু বিপর্যয়ের পরও আপনি আধাখালি বলরুমে হর্ষোৎফুল্ল ভাষণ দিতে পারেন, স্টাফ ও সমর্থকদের চাঙ্গা রাখার জন্য হাসিমাখা মুখ ও সাহসি ভাব দেখাতে পারেন, যারা সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন, প্রচারকাজের ঋণ পরিশোধের জন্য আরো সাহায্যের জন্য বিব্রতকর অনুরোধও জানাতে পারেন। আপনি যথেষ্ট ভালোভাবে এসব কাজ করতে পারেন। আপনি নিজেকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে পারেন। কিভাবে বাজে সময়, বাজে ভাগ্য অথবা ডলারের অভাবে আপনি হেরে গেছেন সেটি ভাবতে পারেন। হয়তো বা পুরো কমিউনিটি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে– এমন একটি চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলা একটি পর্যায় পর্যন্ত কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। যেখানেই আপনি যাবেন মানুষের মনের শব্দ যেন আপনি শুনছেন, সবাই যেন বলছেন– লোকটি হেরে গেছেন। এটি এমন একধরনের অনুভূতি অধিকাংশ মানুষ স্কুলজীবনের পর যার কমই সম্মুখীন হন। স্কুলে কোনো মেয়ে তার বান্ধবীদের সামনে কৌতুক করে যখন আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেন অথবা বাস্কেটবল খেলার লাইনে এসেও বল বাস্কেটে ফেলতে পারেননি– তখনকার অনুভূতির সাথে হয়তো খানিকটা মিলতে পারে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার এ অনুভূতি।

এ ধরনের কিছু আবেগ-অনুভূতির অভিজ্ঞতা রাজনীতির সাথে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের কমবেশি হয়। এরকম একজনের (যিনি আমার মতো নয়) কথা মনে পড়ে। তার জীবনে খুব কম ক্ষেত্র ছিল যেখানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। হাইস্কুলে কোয়ার্টারব্যাক ছিলেন তিনি, ছিলেন ক্লাসের বিদায় সমাবেশের বক্তা। যার পিতা ছিলেন একজন সিনেটর বা অ্যাডমিরাল। তার জীবনে এ ধরনের হেরে যাওয়ার বেদনা কি রকম হতে পারে ভেবে দেখুন। একজন করপোরেট নির্বাহির সাথে একসময় কথা বলছিলাম আমি– ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরের একজন বড় সমর্থক। আমরা তার অফিসে বসে পুরো ম্যানহাটনকে দেখছিলাম। তিনি নির্বাচনের ছয় মাস পরের দিকের একটি মিটিংয়ের কথা আমাকে বলছিলেন। এসময় আল গোর তার নতুন টেলিভিশন উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য বিনিয়োগকারী

www.pathagar.com

খুঁজছিলেন।

নির্বাহী আমাকে বললেন– আমি অবাক হলাম। 'ইনি আমেরিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। মাত্র কয়েক মাস আগেই যিনি হতে যাচ্ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। প্রচারাভিযান চলাকালে দিনের যেকোনো সময় তার ফোন পেলে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমার সব কর্মসূচি বদলে ফেলতাম। কিন্তু নির্বাচনের পর তিনি নিজেই যখন চলে এলেন আর তখন তার সাথে দেখা করার তেমন গরজ অনুভব করিনি আমি। দুঃখের সাথে এ কথা আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে। কারণ, সত্যিই লোকটিকে আমি ভালোবাসি। আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারিনি, বৈঠকটি ছিল নিষ্ফল-ক্লান্তিকর। কারণ, তিনি এখন আর সেই আল গোর নন, তিনি সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। প্রতিদিন আমার কাছে যে শত শত লোক টাকার জন্য আসেন, ইনি তাদের মতোই একজন হয়ে যান। লোকগুলো খাদের কোন কোণায় দাঁড়িয়ে আছে, তা বুঝতে এটি আমাকে সাহায্য করেছে।

আরেকটি বড় ধাপ এগুতে না পারার কারণেই ঘটে এই আকস্মিক পতনের ঘটনা। ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে বিদায়ের পর পাঁচ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। আল গোরের কোনো অসন্তোষ ছিল না। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের পর যে সময় আসে তাকে তিনি নিজের মতো করে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। আমার ধারণা, একদিন সেই নির্বাহী নিজে থেকেই হয়তো সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন। ২০০০ সালে হেরে যাওয়ার পরও গোর হয়তো তার বন্ধুর বদলে যাওয়া সম্পর্কটি বুঝতে পেরেছেন। সেখানে বসে তার টেলিভিশনের উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর বৈরী অবস্থাকেও তিনি উত্তম করার চেষ্টা করেন। অবস্থান ও পরিবেশ যে তাৎক্ষণিক আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়, তা তিনি নিশ্চয় নিজে প্রত্যক্ষ করেন। সারাজীবন চমৎকার সব ভাল কাজ করেও বুশের কাছে তিনি হেরে গেছেন শুধুমাত্র ডাকে আসা ভোট গণনা না করার কারণে। আল গোর নিজ থেকেই যখন তার নির্বাহী বন্ধুর কাছে গেলেন, তখন বন্ধুটি তার বছরের পর বছরের সফল ব্যবসার অবস্থানের ফলে সহজেই সেই বিনিয়োগ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারতেন। এটাকে তার কোম্পানির স্টকের দুর্বল অংশ বা একটি দুর্বল বিনিয়োগ বলেও ভাবতে পারতেন তিনি। কিন্তু এটি তিনি করেননি। এটি ঠিক ছিল না। কিন্তু তাই বলে তিনি যে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, এ সত্যও এতে বদলে যায় না। জনগণের সাথে কাজ করেন এমন নারী-পুরুষের মতো আল গোরও জানতেন, তিনি যখন নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন কী ঘটতে পারে। রাজনীতিতে দ্বিতীয় কাজ থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় স্থানের কোনো মূল্য নেই।

* * *

রাজনীতির অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের মধ্যে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা হলো বিজয়ী হওয়ার প্রয়োজন। তবে পরাজয়েরও নিশ্চয় দরকার আছে। হ্যাঁ, এটি ঠিক টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। প্রচারকাজের 'অর্থায়ন আইন' পাস হওয়া এবং রিপোর্টারদের ছিদ্রান্বেষণ তৎপরতা শুরুর আগে একসময় সরাসরি ঘুষের টাকায় রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত

www.pathagar.com

হতো। তখন অনেক রাজনীতিবিদ প্রচার তহবিলকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব মনে করতেন। তা দিয়ে আনন্দ উৎসব করতেন। তখন অনেকে প্রভাব বিস্তারের জন্য মোটা অঙ্কের ডলার নিয়ে হাজির হতেন এবং আইনের সুবিধাটি চলে যেত সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে। পত্রপত্রিকার সাম্প্রতিক খবর যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমেরিকায় এ ধরনের দুর্নীতি এখনো পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ওয়াশিংটনে এমন অনেককেই দেখা যায়, যারা রাজনীতিকে নেন ধনী হওয়ার সুযোগ হিসেবে। সেখানে ছোটখাটো অঙ্কের অর্থ নেয়ার লোক এখনো আছে। তারা চাঁদাদাতাদের স্বার্থ বেশভালোভাবেই দেখাশোনা করেন। পাশাপাশি নিজের অবস্থানটিও পাকাপোক্ত করতে থাকেন কখন লবিংয়ের লোভনীয় সুযোগটি আসবে।

রাজনীতিতে টাকার প্রভাবই সব কিছু নয়। তবে কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য টাকা খরচ করেন কিছু লবিস্ট। তাদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। তাদের প্রভাব থাকে শুধু সাধারণ ভোটারদের তুলনায় কর্মকর্তাদের কাছে সহজে পৌঁছার সুবিধা পর্যন্ত। সাধারণ ভোটারের চেয়ে অধিক তথ্য পায় তারা। ট্যাক্স কোডের গোপন কোন বিষয়ের সাথে ক্লায়েন্টদের শত শত কোটি ডলারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বিষয় জানা এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চান। কেউ অবশ্য এ বিষয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিতে চান না।

অধিকাংশ রাজনীতিবিদ ধনী হওয়ার জন্য টাকাকে বড় কোনো বিষয় মনে করেন না। সিনেটের অধিকাংশ সদস্যই আগে থেকেই থাকেন ধনী। সমাজে মর্যাদা ও ক্ষমতা ধরে রাখা এবং চ্যালেঞ্জকারীকে দমিয়ে রাখাটাই তাদের কাছে বড় বিষয়। অর্থ বিজয়কে নিশ্চিত করতে পারে না। ডলার দিয়ে আবেগ, ব্যক্তিত্ব অথবা কথা বলার দক্ষতা অর্জন করা যায় না। তবে ডলার ছাড়া এবং বিজ্ঞাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে না পারলে পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

বহুমুখী গণমাধ্যমের বাজার রয়েছে এমন কোনো বড় রাজ্যের নির্বাচনে অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে অবিশ্বাস্যরকম। রাজ্যসভার নির্বাচনে আমাকে কখনো ১ লাখ ডলারের বেশি খরচ করতে হয়নি। তহবিল গঠনের প্রশ্নে একরকম সুনাম আমি অর্জন করেছি। ২৫ বছর বয়সে প্রথম অর্থ আইন পাসের প্রচারের সময় লবিস্টদের খাদ্য গ্রহণ, জুয়াড়ি বা তামাক স্বার্থের সাথে জড়িতদের কাছ থেকে চেক নিতে আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছি। আমেরিকান সিনেটে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আমার গণমাধ্যম পরামর্শক ডেভিড অ্যাক্সেলরড আমার সামনে জীবনের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেন। আমাদের প্রচারাভিযান পরিকল্পনাকে বলা হয় 'অনাবৃত বাজেট'। এটি বহুলাংশে তৃণমূল সমর্থন এবং গণমাধ্যমে অর্জিত প্রচারনির্ভর। পত্রিকায় প্রকাশের মতো সংবাদমূল্য অর্জন করত আমাদের নিজস্ব খবরাখবর। ডেভিড আমাকে জানায় যে, শিকাগোর গণমাধ্যম বাজারে এক সপ্তাহ টিভি-বিজ্ঞাপন দিতে ৫ লাখ ডলারের মতো প্রয়োজন। রাজ্যের অন্যান্য এলাকার টিভিতে সপ্তাহে একবার করে বিজ্ঞাপন দিতে প্রয়োজন হয় আড়াই লাখ ডলার। চার সপ্তাহের টিভি বিজ্ঞাপন স্টাফ ও অন্যান্য প্রচারব্যয় মিলিয়ে প্রাইমারির জন্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় বাজেটের অঙ্ক দাঁড়ায় ৫০ লাখ ডলারে। প্রাইমারিতে আমি বিজয়ী হবো ধরে নিলে সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমাকে সংগ্রহ করতে হবে আরো এক কোটি থেকে দেড় কোটি ডলার।

আমি সে রাতে বাড়ি ফিরি এবং পরিপাটি কাগজে তাদের উদ্দেশে লিখতে বসি, যারা আমাকে নির্বাচনে আর্থিক সহায়তা দিতে পারে বলে মনে করি আমি। তারা বিব্রত বোধ করবে না এমন সর্বোচ্চ অঙ্ক উল্লেখ করে আমি লিখি।

সবার কাছে চিঠি লেখা হলে সব মিলিয়ে দেখলাম মোট অঙ্কটা মাত্র ৫ লাখ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে বিপুল অর্থসম্পদের মালিক না হলে সিনেট নির্বাচনের জন্য তহবিল সংগ্রহের একটি পথই শুধু খোলা থাকে। এ জন্য আপনি ধনী লোকদের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। আমার প্রচারকাজের প্রথম তিন মাসে আমি সহকারীদের সাথে নিয়ে একটি রুমে বসে কেবল তহবিল সংগ্রহের কাজই করে গেছি। এ সময় আর্থিক সহায়তার জন্য ডেমোক্র্যাটিক দলের পূর্বতন দাতাদের কাছে সাদামাটা আবেদন করেছি। এটা কোনো মজার বিষয় ছিল না। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল ফোন। কোনো কোনো সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমার কাছে ফোন আসত। সচিবরাই সাধারণত আমার পাঠানো মেসেজ গ্রহণ করতেন। আমি আর ফিরতি ফোন পেতাম না। এরপর আমি দুই বা তিনবার ফোন করতাম। যতক্ষণ তাদের কাছ থেকে সাড়া না আসে অথবা যার কাছে কল করেছি তিনি চূড়ান্ত কোনো জবাব না দেন বা সরাসরি তার অপারগতার কথা না জানান ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতাম। ফোন করা হলে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নানা অযুহাত পেতাম– বাথরুমে গিয়েছেন, কফি খেতে গিয়েছেন– এ ধরনের নানা কথা শুনতে পেতাম। মাঝে মধ্যে আমি আমার নানার কথা ভাবি যিনি মধ্য বয়সে নিজের জীবন বীমা বিক্রি করে দিয়েছিলেন অথচ তিনি খুব ভালো অবস্থায় ছিলেন না। তার মানসিক যন্ত্রণার কথা আমার এখনো মনে পড়ে। তিনি তার দাঁতের রুট ক্যানেল করার অর্থের জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বীমা এজেন্টের সাথে কথা বলেন। এ সময় নানীর কাছ থেকে হতাশাজনক সাড়া পান তিনি। অথচ বিয়ের পর থেকে নানার চেয়েও অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেছেন নানী।

আমি নানার অনুভূতি কেমন ছিল, অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তা বেশি অনুভব করি।

তিন মাসের চেষ্টায় আমাদের প্রচার তহবিলে আড়াই লাখ ডলার জমা হয়। মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য পর্যায় থেকে এটি অনেক নিচে ছিল। আমার অবস্থা এমন হলো, যাকে অনেক রাজনীতিবিদ দুঃস্বপ্ন বলে মনে করেন। একজন নিঃস্ব ব্যক্তির নিজ খরচে নির্বাচনী প্রচার চালানোর মতোই অবস্থা দাঁড়াল। কয়েক বছর আগে ব্রেয়ার হাল নামে এক ব্যক্তি তার আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি গোল্ডম্যান সশের কাছে ৫৩ কোটি ১০ লাখ ডলারে বিক্রি করে দেন। নিঃসন্দেহে সেই লোকটি ছিল যথার্থ ব্যক্তি। নির্দিষ্টভাবে

www.pathagar.com

জনসেবার আগ্রহ তিনি তখনো প্রকাশ করেননি। যেকোনো বিবেচনায় ব্লেয়ার একজন মেধাবী ব্যক্তি। তবে তিনি প্রচারকাজের পরীক্ষায় একেবারেই নিঃসংশয় ছিলেন না। জীবনের অধিকাংশ সময় কম্পিউটার স্ক্রিনে কাটানো এই ব্যক্তির স্বভাবটাই অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে। আমার জানা অন্য অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট বা মিস্ত্রির মতো রাজনীতিক হওয়ার জন্য তার কিছু চর্চা ও প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। আশা ছিল, তার মতো একজন ব্যবসায়ী রাজনীতিতে, মোটামুটি হলেও ভালো করতে পারবেন। টেলিভিশনে দেখা অন্য অনেক পেশাজীবীর চেয়ে তিনি ভালো করতে পারবেন বলে মনে করা হয়েছিলো। মিস্টার হাল তার ব্যক্তিগত বিপুল অর্থসম্পদের সুবিধা নেন। প্রচারকাজের এক পর্যায়ে তিনি এক রিপোর্টারের কাছে প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য অঙ্কের একটি ফর্মুলাও প্রকাশ করেন। ফর্মুলার শুরুটা ছিল এ রকম :

সম্ভাবনা = ১/(১ + প্রত্যাশা (-১×(-৩.৯৬৫৯০৫৬ +

(সাধারণ নির্বাচনের ওয়েট × ১.৯২৩৮০২১৯)...

বোধ্যগম্য নয় এমন কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করে ফর্মুলাটি শেষ করা হয়।

এপ্রিল বা মে মাসের কোনো এক সকালে আমার কনডো কমপ্লেক্স থেকে সার্কুলার ড্রাইভওয়ে দিয়ে অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে-কারো পক্ষে মিস্টার হালকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বাতিল করে দেয়াটা ছিল স্বাভাবিক। সার্কুলার ড্রাইভওয়ে দিয়ে অফিসে যাওয়ার পথে রাস্তার পর রাস্তায় লাল-সাদা-নীল রঙের বিল বোর্ড ও নিয়নসাইন দেখতে পাই। লাল রঙের নিয়নসাইনে লেখা, সিনেটের জন্য ব্লেয়ার হালকে চাই। এরপর পাঁচ মাইল সড়ক জুড়ে একই বিল বোর্ড দেখি প্রতিটি মোড়ে। প্রতিটি কোণ ও রাস্তায়। সেলুনের জানালা বা পরিত্যক্ত ভবনে, বাস টার্মিনালের সামনে, মুদি দোকানের কাউন্টারের পেছনে মিস্টার হালের বিলবোর্ড ও পোস্টারের ছড়াছড়ি। মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে গ্রীষ্মের সবুজ জমিনে ডেইজি ফুলের সাজানো ডটের ছবিই যেন দেখছি।

ইলিয়নয়ের রাজনীতিতে একটি কথা চালু আছে। সেটি হলো নিয়নসাইন মানে ভোট নয়। এর অর্থ হলো– কোনো প্রার্থীর কতটা নিয়নসাইন রয়েছে তা দিয়ে প্রতিযোগিতা বিচার করলে চলবে না। তবে ইলিয়নয়ের কোনো ব্যক্তি পুরো নির্বাচনী প্রচারকালেও যতটা নিয়নসাইন ও বিলবোর্ড দেখেনি মিস্টার হাল প্রতিদিনই তা লাগিয়েছেন। এক রাতের ব্যবধানেই দেখা যেত মিস্টার হালের নির্বাচন কর্মীদের কল্যাণে অনেককে তাদের নিয়নসাইন সরিয়ে নিতে। আর সেখানে শোভা পেতে শুরু করে হালের নিয়নসাইন। আমি একসময় কাছাকাছি এক জায়গার কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের মনোভাবটা যাচাই করার চেষ্টা করি। তারা আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে, ইনার সিটিতে ব্লেয়ার হালই হবেন চ্যাম্পিয়ন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের নেতারা তাদের পারিবারিক খামারে মিস্টার হাল থেকে সহায়তা পেয়েছিলেন। এরপর এলো টিভি বিজ্ঞাপনের ধুম। ছয় মাস আগে থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত অবিরাম চলে এ বিজ্ঞাপন। রাজ্যজুড়ে সব স্টেশনে ব্লেয়ারকে দেখা যায়। কোথাও

www.pathagar.com

হয়তো প্রবীণদের সাথে, কোথাও শিশুদের সাথে। মিস্টার হাল বিশেষ স্বার্থে ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আসতে প্রস্তুত– এসব কথা থাকে বিজ্ঞাপনে। ২০০৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে মিস্টার হাল নির্বাচনের প্রচারকাজে প্রথম স্থানে চলে যান। আমার সমর্থকরা আমাকে নিয়ে অথৈ পানিতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে এগোতে থাকেন। আর ভোটারদের বোঝাতে থাকেন যে, কিছু করতে পারলে আমিই পারব। তারা আমাকে দ্রুত টিভি বিজ্ঞাপনে যাওয়ার পরামর্শ দেন এবং জানান, এটি করতে পারলে সবাই হেরে যাবেন আমার কাছে।

আমি আর কী করতে পারি? আমি বলি আমার অবস্থা ব্লেয়ার হালের মতো নয়। অর্থ আগমনের ভালো দৃশ্য কল্পনা করলেও আমরা মাত্র চার সপ্তাহ টিভি বিজ্ঞাপন চালাতে পারব। পুরো নির্বাচনী প্রচারের বাজেট আগস্টের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলার কোন অর্থ হয় না। সমর্থকদের আমি ধৈর্য ধরতে বলি। বলি– আতঙ্কিত হলে চলবে না, আস্থা রাখতে হবে দৃঢ়ভাবে। ফোন রেখে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই এবং আরবি'র দিকে তাকিয়ে দেখি মিস্টার হাল রাজ্যের সর্বত্র সাজ সাজ রব তুলেছেন। জাঁদরেল লোকজন নিয়োগ করেছেন তার প্রচারাভিযানে। আমি আসলেই ভাবি, এ অবস্থায় আতঙ্কিত না হয়ে কী পারা যায়?

এ ধরনের পরিস্থিতিতে অন্য যেকোনো প্রার্থীর চেয়ে আমি অনেক ভাগ্যবান। যে কারণেই হোক কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার প্রচারাভিযান বিস্ময়করভাবে গতি পেতে শুরু করে। চার দিকে গুঞ্জরণের ঢেউ ওঠে আমাকে নিয়ে। সম্পদশালীদের জন্য আমার পক্ষে থাকা এবং সহযোগিতা করাটা ফ্যাশনে রূপ নেয়। একই সাথে ছোট ছোট দাতারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে চেক পাঠাতে শুরু করেন– যা আমি কোনো দিন ভাবিনি। কঠিন সত্য হলো– আমার দুর্বল অবস্থান তহবিল গঠনে অনেক বিপজ্জনক পথ থেকে আমাকে রক্ষা করেছে। অধিকাংশ করপোরেট জায়ান্ট আমাকে উপেক্ষা করে আর এতে তাদের প্রতি আমার কোনো দায়ও আর থাকেনি। 'লিগ অব কনজারভেটিভ ভোটারস'-এর মতো কয়েকটি গ্রুপ আমাকে সাহায্য করেছে একান্তভাবেই আদর্শগত কারণে। তাদের আদর্শের জন্য আমি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছি।

মিস্টার হাল তখনো তার ব্যয়বহুল প্রচারকাজ বন্ধ করেননি। তবে তার বিশেষ কৃতিত্ব হলো– তিনি কখনো আমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক বিজ্ঞাপন দেননি। আমার নির্বাচনকর্মীরা তার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। প্রচারণার চূড়ান্তসপ্তাহগুলোতে আমার টিভি বিজ্ঞাপনগুলো প্রচার হতে শুরু করে। দেখা যায় এতে আমার নম্বর দ্রুত বাড়ছে। হালের প্রচার হঠাৎ করে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তার সাবেক স্ত্রীর সাথে কিছু নোংরা ধরনের কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর।

আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সম্পদের অভাব অথবা বড় করপোরেট হাউসের সমর্থন জয়ের পথে কোনো বাধা হয়নি। এখনো পর্যন্ত আমি দেখি না, টাকা কোনোভাবেই আমাকে পরিবর্তন করেছে। শেষ পর্যন্ত এমন কোনো লজ্জায় আমাকে পড়তে হয়নি যে কোনো আগন্তুকের কাছ থেকে আমি বিপুল অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করছি। প্রচারাভিযানের

www.pathagar.com

শেষে রব তোলা হয় যে আমার আবেদন শেষ হয়ে গেছে। আমি এর পেছনে ছোটা বন্ধ করে দিই এবং চেষ্টা করি কোনো প্রশ্নের জবাবে যেন 'না' বলতে না হয়।

তবে আমার কাজের মধ্যে ভিন্ন ধরনের এক পরিবর্তন এসে পড়ায় আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমি দেখি, সাধারণ জনগণের পরিবর্তে ল ফার্মের অংশীদার, বিনিয়োগ ব্যাংকার্স, শস্য তহবিল ব্যবস্থাপক এবং পুঁজি উদ্যোক্তাদের পেছনেই আমার বেশীরভাগ সময় ব্যয় হচ্ছে। সাধারণভাবে তারা বেশ চৌকস, আগ্রহোদ্দীপক মানুষ, সরকারি নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং চেক দেয়ার বদলে তাদের বক্তব্য শোনা ছাড়া আর কোনো প্রত্যাশা তাদের থাকে না। তবে তারা প্রায় সবাই নিজেদের শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। এদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১ শতাংশ বা তার সামান্য কিছু বেশি হবে। এসব লোক একজন রাজনৈতিক প্রার্থীকে ২ হাজার ডলার পর্যন্ত চেক দিতে পারেন। তারা মুক্তবাজারে বিশ্বাসী, আর বিশ্বাস করেন শিক্ষাগত মেধাতন্ত্রে। স্যাট–এর উচ্চ স্কোর দিয়ে কোন সামাজিক ব্যাধি দূর করা যাবে না, এটা তারা বিশ্বাস করেন না। সংরক্ষণবাদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই। ইউনিয়নের মধ্যে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপাদান দেখেন। বিশেষভাবে বিশ্ব পুঁজিপ্রবাহের কারণে বিপর্যস্তদের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই তাদের মনে। তাদের অধিকাংশ দৃঢ়ভাবে নারীদের নিজস্ব পছন্দপন্থী ও বন্দুকবিরোধী এবং গভীর ধর্মানুভূতির প্রতি সংশয়প্রবণ।

আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাদের মতামতের বেশ পার্থক্য রয়েছে। যদিও আমরা একই স্কুলে, একই বই পড়েছি। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগও একই রকম। আমি তাদের সাথে আলোচনার সময় কিছু বিষয় এড়িয়ে যাই যাতে সম্ভাব্য মতের পার্থক্য একেবারেই স্পষ্ট হয়ে না পড়ে। তাদের আশা-আশঙ্কা সম্পর্কে আগে থেকেই ভেবে নেই আমি। তবে একটি বিষয়ে আমি খুবই অকপট। আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, জর্জ বুশের কাছ থেকে তারা যে কর রেয়াত সুবিধা পাচ্ছেন তা প্রত্যাহার করা উচিত। সম্ভব হলে এর প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করি আমি। তবে আমাকে নির্বাচকমণ্ডলীর অন্য অংশের বক্তব্যও শুনতে হয়। রাজনীতিতে বিধিসম্মত ভূমিকার একটি বিষয় থাকে। যেমন বলা যায়, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিতে বন্দুকেরও একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে।

আমার তহবিল সংগ্রহের পরিণতি আমি জানি। আমি যদি ধনী দাতাদের বেশি পছন্দের ব্যক্তিতে পরিণত হই, তাহলে আমাকে বেশি সময় দিতে হবে তাদের জন্য। যেসব লোক ক্ষুধার্ত, হতাশ, ভীত, অযৌক্তিকতার শিকার এবং অন্য যারা দুঃখকষ্টে আছেন সেই ৯৯ শতাংশ মানুষের জন্য সময় কমে যাবে। এসব লোককে সেবাদানের অঙ্গীকার নিয়েই আমি রাজনীতিতে নেমেছিলাম। আমার মনে হয়, এটি অন্য সব সিনেটরের জন্যও প্রযোজ্য। আপনি যত দীর্ঘ সময় সিনেটর থাকবেন, আপনার মতবিনিময়ের সুযোগ তত সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আপনি হয়তো টাউনহলের সমাবেশে, এলাকা সফরের সময় এবং প্রতিবেশীরা যাত্রাপথে আটকে দিলে তাদের কথা শুনতে পারবেন। কিন্তু অন্য পথটি আপনার সূচিকে ভিন্ন একদিকে তাড়া করে নিয়ে যাবে

www.pathagar.com

যেখানে সংখ্যগুরু মানুষের প্রতিনিধিত্ব নেই।

পরবর্তী প্রতিযোগিতার সময় আপনার মনে হতে পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাতার কাছ থেকে তহবিল জোগানোর ক্লান্তিকর পথে আপনি কেন আবার হাটবেন? আপনি ভাববেন, আপনার মধ্যে সেই সিলমোহর আর নেই। আপনি ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছেন নতুন চেহারা নিয়ে। আপনি ওয়াশিংটনকে পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং ভোটের জটিল অঙ্ক কষতে গিয়ে আপনি কেন অনেকের বিরাগভাজন হবেন। তার চেয়ে, বিশেষ স্বার্থবাদীগ্রুপগুলোর মাধ্যমে করপোরেট জায়ান্ট এবং শীর্ষ লবিস্টদের নিয়ে তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানের আয়োজন অনেক বেশী সহজ। তখন নতুনভাবে তাকাতে শুরু করবেন আপনি। আপনার সাথে থাকা ভেতরের লোকেরা যদি এতে ক্ষুব্ধ হয়, একসময় তাদের বলবেন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতেই এই পরিবর্তন, এই আপসকামিতা। এটি এক জটিল অভিজ্ঞতার শিক্ষা। সাধারণ মানুষের সমস্যা, রাস্ট বেল্ট শহরের কান্না, অথবা ক্ষয়িষ্ণু হার্টল্যান্ড একসময় বিলীয়মান প্রতিধ্বনীতে পরিণত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ের বদলে বিমূর্ত অবস্থাকে সামলে নিতে হবে।

সিনেটরদের ওপর আরেকটি বিশেষ শক্তি সক্রিয় থাকে। নির্বাচনের প্রচারকাজে অবশ্যই অর্থের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, তবে শুধু তহবিল সংগ্রহ করে কোনো প্রার্থী কাঙ্ক্ষিত শীর্ষ স্থানে পৌছাতে পারে না। আপনি নির্বাচনে জয়ী হতে চাইলে অথবা যদি হারাতে না চান তবে দেখবেন সংগঠিত মানুষের শক্তি নগদ অর্থের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে কোনো প্রাইমারিতে স্বল্প অংশগ্রহণ হলে তাতে জেতার জন্য সবচেয়ে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়। এ ধরনের নির্বাচনে নানা কূটকৌশল ও বিভাজিত নির্বাচকমণ্ডলী থাকে। এতে স্বল্পসংখ্যক লোকেরই রাজনৈতিক প্রচারকাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ হয়। বিশেষত ভোটারদের চিঠি পাঠানো, তাদের ঘরে ঘরে যাওয়া, বক্তব্যের খসড়া তৈরির জন্য বড় বড় চিন্তাভাবনা করার পাশাপাশি নিত্যদিনের নির্বাচনী প্রচারের জন্য কর্মীর প্রয়োজন হয়। আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হলে আপনার প্রয়োজন রাজনৈতিক কর্মী অথবা ভোটার তালিকা। বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারস্থ হবেন আপনি। ডেমোক্র্যাটদের জন্য এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন, পরিবেশ গ্রুপ, প্রো-চয়েজ (গর্ভসংরক্ষণে নিজের ইচ্ছাপন্থী) গ্রুপের কথা বলা যায়। অন্য দিকে রিপাবলিকানদের ক্ষেত্রে এ ধরনের সংগঠিত গোষ্ঠী হলো ধর্মীয় অধিকারপন্থীরা, স্থানীয় চেম্বার অব কমার্স, ন্যাশনাল রিকভারি ইনস্টিটিউশন (এনআরএ) এবং কর-বিরোধী সংস্থাগুলো।

আমি কখনোই 'বিশেষ স্বার্থ' শব্দটি নিয়ে স্বস্তিবোধ করি না। এই বিশেষ স্বার্থ এক্সন-মোবাইল ও ব্রিকলায়ার্স ফার্মাসিউটিক্যালস লবি ও বিশেষ শিশুদের পিতা-মাতাদের একত্র করতে পারে। অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমার সাথে হয়তো দ্বিমত পোষণ করবেন। আমার মতে, যারা অর্থের জোরে প্রভাব বিস্তার করে সেই করপোরেট লবি, আর যারা সাধারণ স্বার্থ বা চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখে সংঘবদ্ধ হওয়া সমমনা ব্যক্তি– তারা এক নয়। সেটি হতে পারে, বস্ত্র শ্রমিক, যুদ্ধবীর, পারিবারিক খামারিদের জোট–

www.pathagar.com

যারা সাধারণ স্বার্থের জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। এই দুইয়ের মধ্যে যারা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য অর্থের শক্তিকে ব্যবহার করে এবং যারা শুধু প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য তাদের ভোটকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি গণতন্ত্রের চেতনা বা ধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর অন্যটি গণতন্ত্রের ভাবার্থকে করে উচ্চকিত।

নির্বাচনে প্রার্থীর ওপরে স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর প্রভাব সব সময় সুখকর হয় না। সক্রিয় সদস্যপদ রাখার জন্য তাদের চাঁদা দিতে হয়, তাদের কথা শুনতে হয়, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তারই সব সময় তাদের উদ্দেশ্য হয় না। তারা সব সময় চিন্তাশীল ব্যক্তিকে, সর্বাধিক গুণবান বা মহৎ হৃদয়ের মানুষকে সমর্থন করে এমনটাও নয়। এর পরিবর্তে তারা দৃষ্টি দেয় তাদের পেনশন, শস্যসহায়তা ও তাদের অন্যান্য দাবিদাওয়ার প্রতি। তারা শুধু তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে এগিয়ে নিতে চায়। তারা আপনাকে নির্বাচিত করতে চায় যেন তাদের স্বার্থপূরণে এ নির্বাচন সহায়ক হয়।

আমার নিজের কথা বলতে পারি এক্ষেত্রে। নিজের প্রাইমারির প্রচারাভিযানের সময় আমাকে কমপক্ষে ৫০টি প্রশ্নপত্র পূরণ করতে হয়। এগুলোর কোনোটাতেই কোনো সূক্ষ্ম প্রশ্ন ছিল না। ১০ থেকে ১৫টি প্রশ্ন দিয়ে একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। যার মধ্যে এমন কথাও ছিল– "যদি আপনি নির্বাচিত হন তাহলে কি আপনি 'স্ক্রুজ' আইন বাতিল করবেন, যা বিধবা ও এতিম তৈরীর কারণ হয়েছে?"

যেসব সংগঠন আমকে সমর্থন দিয়েছে আমি শুধু তাদের প্রশ্নপত্রই পূরণ করি। আমার ভোটিং রেকর্ড অনুযায়ী এনআরএ (ন্যাশনাল রিকভারি এডমিনিস্ট্রেশন) এবং ন্যাশনাল রাইটস লাইফ-এর কথা উল্লেখ করা যায়, এরাও আমাকে বাদ দেয়নি। তাই কোনরকম অস্বস্তি ছাড়াই আমি অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ দিতে পেরেছি। তবে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে আমাকে খানিক থামতে হয়েছে। আমি অবশ্যই আমাদের বাণিজ্য আইন অনুযায়ী শ্রম ও পরিবেশমান কার্যকর করার ব্যাপারে ইউনিয়নের সাথে একমত হতে পারি। কিন্তু আমি কি মনে করি যে নাফটা বাতিল হওয়া উচিত? আমি সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যাপারে একমত হতে পারি, যা আমাদের অন্যতম জাতীয় অগ্রাধিকার। কিন্তু এ লক্ষ্য ভালোভাবে অর্জনের জন্য আমি কি সংবিধানের সংশোধনী চাইবো?– এ ধরনের কিছু প্রশ্নে আমাকে ইতস্তত করতে হয়েছে। যেখানে জটিল নীতির বিষয় রয়েছে সেখানে মার্জিনে ব্যাখ্যা করে আমাকে বোঝাতে হয়েছে। একবার আমার স্টাফরা মাথা নেড়ে বলল, একটি জবাব ভুল হয়ে গেছে। এতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের সমর্থন ও অনুমোদনের ঠিকানা অন্যজনের কাছে চলে গেছে। আমি বললাম তাদেরকে নিজেদের কাজ করতে দাও, তোমরা এতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। হতে পারে শেষ পর্যন্ত তাদের সাহায্যের ইতি ঘটবে।

প্রচারাভিযানের সময় আপনি একটি বলবেন, আর অফিসে এসে ভিন্ন রকম ভাববেন– তাহলে আপনি হবেন একজন দ্বিমুখী রাজনীতিবিদ।

আমি প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিত জবাব না দিতে পারায় কিছু সমর্থন হারিয়েছি। তবে দু'বার

www.pathagar.com

একটি গ্রুপের প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দেয়ার পরও তারা আমাকে সমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। অনেক সময় দেখতাম কোন প্রশ্নে আপনি কী জবাব দিলেন সেটি তেমন বিবেচ্য হতো না। মিস্টার ব্লেয়ার হালের বাইরে সিনেট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে আমার অন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ইলিয়নয় রাজ্যের কম্পট্রোলার ড্যান হাইনস। তিনি ছিলেন চমৎকার মানুষ। তার বাবা টম হাইনস ছিলেন রাজ্য সিনেটের স্পিকার, কুক কাউন্টির অ্যাসেসর, ওয়ার্ড কমিটিম্যান, ডেমোক্র্যাট জাতীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্যে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত পরিচিত এক ব্যক্তিত্ব। প্রতিযোগিতায় নামার আগেই ড্যান রাজ্যের ১০২ কাউন্টি চেয়ারম্যানের মধ্যে ৮৫ জনের সমর্থন পেয়ে যান। রাজ্য আইনসভায় অধিকাংশ সদস্য তাকে সমর্থন দেয়। ইলিয়নীয় আইনসভার স্পিকার ও ইলিয়নীয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সভাপতি মাইক ম্যাডিগানের মতো ব্যক্তিও তাকে সমর্থন জানান। ড্যানের ওয়েবসাইটে সমর্থনকারীদের তালিকা দেখা অনেকটা মুভির শেষে 'স্ক্রল' দেখার মতো। যা শেষ হওয়ার আগেই উঠে যান আপনি।

এত সবকিছুর পরও নিজস্ব কিছু সমর্থকের আশায় আমি বুক বেঁধে থাকি। বিশেষত এর মধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলোর ওপর আমার আস্থা খানিকটা বেশিই ছিল। রাজ্য আইনসভায় আমি তাদের মিত্র ছিলাম। সভায় আমি তাদের পক্ষে অনেক বিল উত্থাপন করি এবং তাদের বিভিন্ন বিষয় সংসদের দৃষ্টিতে আনি। আমি জানি ঐতিহ্যগতভাবে আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার (এএফএল) ও কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অরগানাইজেশন (সিআইও) তাদের প্রতি সমর্থন জানায় যারা তাদের পক্ষে ভূমিকা রাখে। কিন্তু প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার পর দেখি বৈরী ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। একদিন শিকাগোতে সমর্থন জানানোর জন্য গ্রুপ নেতাদের সম্মেলন ডাকা হয়। আমি সেখানে কথা বলতে চাইলে তারা এতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা আমার সাথে একবার কথা পর্যন্ত না বলে ড্যান হাইনসকে সমর্থন জানায়। ইলিনয় রাজ্যে মেলা চলাকালে এক শ্রমিক সংবর্ধনায় যাওয়ার পর আমাদের বলা হলো, সেখানে কোনো প্রচারণা চালানো যাবে না। অথচ আমার স্টাফরা সেখানে গিয়ে দেখতে পায় হাইনসের পোস্টারে কক্ষটি সয়লাব। এএফএল-সিআইও'র সমর্থন আদায়ের জন্য তাদের অধিবেশনের দিন সন্ধ্যায় আমি সেখানে যাই। কিন্তু তারা আমাকে একদমই পাত্তা দেয়নি বরং চোখ ঘুরিয়ে রেখেছে। শুধুমাত্র একজন বয়স্ক লোক আমার কাছে হেঁটে এসে পিঠ চাপড়ে দিয়ে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তিনি বললেন, 'বারাক বিষয়টিকে ব্যক্তিগতভাবে নেয়া ঠিক হবে না। আপনি জানেন, টম হাইনস এবং আমি ৫০ বছর ধরে একসাথে চলেছি। একই পরিবেশে আমরা বেড়ে উঠেছি। একই যাজকের কাছে আমরা যাই। ড্যান বড় হয়েছে আমার চোখের সামনে।'

আমি তাকে বলি, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

স্টাফদের কাছে গিয়ে আমি বললাম, আমরা এএফএল-সিআইও'র অনুমোদন পাচ্ছি না।

www.pathagar.com

আমাকে পুরো বিষয়টি অন্যভাবে সাজাতে হলো। ইলিয়নয়ের ফেডারেশন অব টিচার্স, সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন (এসইআইইউ), আমেরিকান ফেডারেশন অব স্টেট কাউন্টি অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ (এএফএসসিএমই) এবং বস্ত্র, হোটেল ও খাদ্যসেবা কর্মচারীদের বৃহত্তম শ্রমিক ইউনিয়ন 'ইউনাইট হেয়ার ফেডারেল' নেতাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাইনসের পক্ষে থাকার বদলে আমাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সমর্থন আমার প্রচারকাজের জটিল সময়ে বেশ কিছুটা ভারসাম্য সৃষ্টি করে। তাদের জন্য এ সিদ্ধান্ত ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। আমি হেরে গেলে এসব ইউনিয়নকে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য মূল্য দিতে হতো।

আমি এসব ইউনিয়নের কাছে ঋণী। যখন তাদের নেতারা আমাকে ফোন করে, আমি সাথে সাথেই সাড়া দেয়ার চেষ্টা করি। আমি সেসব স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে কোনো দ্বিধা করি না যারা সামান্য বেতনের জন্য রোগীদের বেড প্যান পরিষ্কার করে অথবা সেই সব শিক্ষকের প্রতি যারা দেশের সবচেয়ে কঠিন স্কুলগুলোতে শিক্ষকতা করেন– যাদের অনেককেই বছরের শুরুতে স্কুলের ছাত্রদের জন্য তাদের নিজ পকেটের অর্থ খরচ করে চক বা বই কিনে দিতে হয়। আমি মূলত তাদের পক্ষে সংগ্রাম করতে রাজনীতিকে বেছে নিয়েছি। আমি একটি ইউনিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ যে ইউনিয়নটি আমার সংগ্রামের পুরনো বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

তবে আমি এটিও বুঝি যে, কোনো এক সময় এ দায়বদ্ধতার সাথে অন্য দায়বদ্ধতার সঙ্ঘাত দেখা দিতে পারে। ইনার সিটির যেসব শিশু পড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না অথবা সেই সব শিশু– যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, দুনিয়ায় যারা আসবে ঋণের বোঝা নিয়ে– তাদের প্রতিও আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। ইতোমধ্যে দায়বদ্ধতার বৈপরীত্যসংক্রান্ত এমন কিছু সমস্যা দেখাও দিয়েছে। শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মেধাভাতা চালুর প্রস্তাব করেছি আমি। ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্সের বন্ধুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি জ্বালানি-সাশ্রয়ী মান নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছি। আমি নিজে মেধার মূল্যায়নের পক্ষে কথা বলে যাবো– শুধু এ আশা করে নয় যে, আমার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ নতুন কর আরোপ না করার প্রতিশ্রুতি দেবেন অথবা স্টিম সেল গবেষণার বিরোধিতা করবেন। সার্বিকভাবে দেশের কল্যাণ হবে মনে করে আগের নির্বাচনে সমর্থকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রিপাবলিকান প্রার্থী এটি করেছিলেন। আশা করি, সব সময় আমি আমার ইউনিয়নের বন্ধুদের কাছে যেতে পারব এবং আমার অবস্থান ভিন্ন কিছু হলেও তাদের সামনে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব। কিভাবে এটি তাদের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ এবং আমার মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব।

কিন্তু আমার সন্দেহ ইউনিয়নের নেতারা সব সময় বিষয়টিকে সেভাবে দেখবেন না। এমন সময় আসতে পারে যখন তারা আমার অবস্থানকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখবেন। তারা তাদের সদস্যদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে পারেন আমি তাদের বিক্রি করে দিয়েছি। আমি ক্ষোভ মেশানো বার্তা ও ফোনকল পেতে পারি। তারা ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

আর আমাকে সমর্থন না-ও জানাতে পারেন।

যদি তা হয়েও থাকে, তবে হয়তো এর জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। জটিল নির্বাচনী পরিস্থিতির কারণে হারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আপনার কাছে তা পাগলামিই মনে হবে। অথবা প্রাইমারিতে চ্যালেঞ্জারের কাছে আপনার প্রচারকাজের প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে বলে মনে হবে। প্রতিপক্ষ আপনাকে ভোটারদের কাছে বিশ্বাঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করবে। আপনি প্রচারকাজের সঙ্ঘাতে হারতে শুরু করবেন। আপনি কি বিশেষ স্বার্থকে এড়িয়ে চলবেন অথবা আপনার বন্ধুর ছিটকে পড়ার বিষয়টি আপনি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন? উত্তর অবশ্যই 'না' হবে না। সুতরাং আপনি ভোটযুদ্ধ শুরু করুন যেন একটি প্রশ্নমালার জবাব দিচ্ছেন। আপনি অতিমাত্রায় গভীরভাবে আপনার অবস্থান বিবেচনা করতে যাবেন না। এ পথ ধরেই আপনার হ্যাঁ বাক্সটিকে ওঠানামা করুন।

বড় অঙ্কের চাঁদা দাতা অথবা বিশেষ স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চাপের কাছে বন্দী থাকেন রাজনীতিবিদরা। যেসব রাজনীতিবিদ তাদের আসন রক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, তাদের জন্য তৃতীয় শক্তি হলো গণমাধ্যম বা মিডিয়া। এটি কাউকে যেমন উঠাতে পারে, তেমনি টেনেও নামাতে পারে। আধুনিককালে রাজনৈতিক রিপোর্টিং এমনভাবে করা হয়, যেন আমাদের গণতন্ত্রের চর্চায় কোনো ভুলত্রুটি হচ্ছে কি না তার বিশ্লেষণ করাই এগুলোর কাজ। রাজনীতিবিদরা কী করতে পারবেন আর কী পারবেন না, তিনি কোন অবস্থান নেবেন আর কোনটি নেবেন না– সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রাজনৈতিক বিতর্কের একটি রূপ দেয় মিডিয়া। ৪০ বা ৫০ বছর আগে এ শক্তি ছিল রাজনৈতিক দলেরই উপকরণ। সে সময় নগরকর্তা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা আর ওয়াশিংটনের ক্ষমতার দালালরা একটি ফোনকল করে কারো ক্যারিয়ারকে ভাঙতে বা গড়তে পারতেন। বর্তমানে গণমাধ্যম বা মিডিয়া সেই ভূমিকায় রয়েছে।

সিনেটে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করা এবং সিনেটে আমার প্রথম বছর পার হওয়ার এই তিন বছরের মধ্যে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ইতিবাচক প্রেস কাভারেজ পেয়েছি। এর পেছনে একটি কারণ হতে পারে যে, আমি ছিলাম সিনেটের প্রাইমারি নির্বাচনে আন্ডারডগ প্রার্থী। পাশাপাশি আমি ছিলাম বহিরাগত একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থী। আমার কথা বলার ধরনও এ ক্ষেত্রে হয়তো বা কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। আমার বলার ভঙ্গিটা বেশ খানিকটা অসংলগ্ন, ইতস্ততা প্রকাশ পায় কোনো কোনো সময় এবং কথা খানিকটা বেশি উদ্দীপনাময় হয়ে যায় (আমার স্টাফরা এবং স্ত্রী মিশেল বারবার ব্যাপারটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন)। হয়তো বা এগুলোই উল্টো শিক্ষিত শ্রেণীর সহানুভূতি পেতে আমাকে বেশি সাহায্য করেছে।

অধিকন্তু কোনো রিপোর্টার যখন নেতিবাচক প্রতিবেদনের জন্য আমাকে টার্গেট বানিয়েছেন, আমি তার মোকাবেলা করি 'সরাসরি গুলি ছোড়া'র স্টাইলে। তারা আমার

www.pathagar.com

বক্তব্য ও কথাবার্তা রেকর্ড করেন এবং এর সাথে তাদের নিজস্ব বক্তব্য মেশানোর চেষ্টা করেন। রিপোর্টাররা মিডিয়ায় যত সমালোচনাই করুক না কেন, আমাকে অন্তত একবার ডাকেন যার সুযোগ আমি নিতে কসুর করিনি।

এসব কারণে ব্যক্তিগতভাবে মিডিয়ার ব্যাপারে আমার আপত্তি করার মতো কিছুই নেই। আমি প্রেসকে উপেক্ষাও করতে পারি। সংক্ষেপে এর কারণ হলো, আমি প্রেসকে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি– যেটি আমার জন্য কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে সেটিকে উল্টো দিকেও ঘুরিয়ে দেয়া যায়। এ জন্য আমি চিন্তা করি কত দ্রুত এর ভূমিকাকে বিপরীতমুখী করে ফেলা যায়।

মিডিয়া নিয়ে একটি সহজ অঙ্কের কাহিনী বলি। আমার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বছরে নির্বাচনী এলাকায় ৩৯টি টাউন হল সমাবেশ করি। এসব সমাবেশে গড়ে চার থেকে পাঁচ শ' মানুষ সমবেত হয়। এর মানে টাউন হল সমাবেশের মাধ্যমে আমি ১৫ থেকে ২০ হাজার লোকের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। এভাবে চললে কি পুরো মেয়াদে আমি সবার কাছে পৌঁছতে পারব? নির্বাচনের সময়ে আমি পুরো এলাকা ঘুরে সরাসরি যোগাযোগ করেছি এমন লোকের সংখ্যা হবে ৯৫ হাজার থেকে ১ লাখ।

এর বিপরীতে শিকাগোর গণমাধ্যম বাজারে স্থানীয় পর্যায়ের নিচের স্তরের কোনো টেলিভিশনে ৩ মিনিটের একটি কাহিনী প্রচার হলে তা কমপক্ষে ২ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে। ফেডারেল পর্যায়ের সব রাজনীতিবিদকে আমি পছন্দ করি। তবে আমি নিজের নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য অনেকটা এককভাবে মিডিয়ার ওপর নির্ভর করি। মিডিয়া হচ্ছে একধরনের ফিল্টার বা ছাঁকুনি, যার মাধ্যমে আমি জানতে পারি আমাকে ভোট দেয়াটাকে কিভাবে দেখা হচ্ছে, আমার বিবৃতির ব্যাখ্যা হচ্ছে কিভাবে, কিভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে আমার ধারণা বা বিশ্বাসকে। মোটা দাগে এভাবে বলা যায় যে, আমি সে রকমই যা মিডিয়া বলে, আমি তা-ই বলি যা বলেছি বলে মিডিয়া উল্লেখ করে, আমি তা-ই হচ্ছি যা হচ্ছি বলে মিডিয়া জানায়।

আমাদের রাজনীতিতে মিডিয়ার প্রভাব পড়ছে নানাভাবে। এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য দিক দেখা যায় মিডিয়ায়। দলবাজ পত্রিকার সংখ্যা এখন দ্রুত বাড়ছে। টক রেডিও, ফক্স নিউজ, সংবাদপত্র কলামিস্ট, ক্যাবল টক শো সার্কিট এবং অতি সাম্প্রতিক ইন্টারনেটের ব্লগ– এসবের বিস্তার লাভ ঘটছে। এসব গণমাধ্যমে দিনে ২৪ ঘণ্টা অথবা সপ্তাহের সাত দিন কাউকে না কাউকে হেয় করা হয়, অভিযুক্ত বানানো হয় এবং কটাক্ষ করা হয় অব্যাহতভাবে। এ ধরনের পক্ষপাত সাংবাদিকতাকে অনেকে সাংবাদিকতায় নতুন কিছু নয় বলে মনে করেন। যেভাবেই হোক এ ধরনটি আমেরিকান সাংবাদিকতার ওপর ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করছে। উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্ট ও কর্নেল ম্যাক করমিকের মতো প্রকাশকরা এই ধারাটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটার আগে তারা এটি করেছিলেন।

www.pathagar.com

এখনো পর্যন্ত এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব শব্দ ও ক্রোধ জনগণের কাছে বড় করে দেখানো হয়। এগুলো আমেরিকান রাজনৈতিক সাংস্কৃতিকে ক্রমেই স্থূল করে তুলছে। আমরা রাজনীতিবিদরা স্বীকার করি বা না করি অব্যাহত প্রতারণামূলক প্রচারকাজ আমাদের মৌলিক চেতনাকে ঝাপসা করে ফেলে। তবে স্থূল সাংবাদিকদের কর্মকাণ্ড নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। যদি রাস লিমবার্গের শ্রোতারা আমাকে 'ওসামা ওবামা' বলায় পুলকিত হয়, তাহলে আমি বলি তাদের কৌতুক করতে দাও। উচ্চমার্গের লোক যারা সূক্ষ্মভাবে আঘাত করতে চায়, তারা তা করে কিছুটা ভিন্নভাবে। সাধারণ মানুষের সামনে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলক বেশি। দক্ষতার কারণে তাদের এই গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে– যাকে কাজে লাগিয়ে আপনার বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তারা কিছু সংযোজন করতে চাইবে এবং তা করবে যাতে আপনার ব্যাপারে উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়।

উদাহরণ হিসেবে ২০০৫ সালের এপ্রিলের একটি ঘটনার কথা বলা যায়। স্প্রিংফিল্ডে লিংকন প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরির এক অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিই। পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় আব্রাহাম লিংকনের মানবতাবাদ, তার অসম্পূর্ণতা, তার গুণগুলো– যা তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে– তার ওপর আলোকপাত করি। আমার বক্তব্যের এক স্থানে আমি বলি 'লিংকন দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছেন'। আমি বলি 'তার (লিংকনের) নিজস্ব পড়াশোনা, ভাষা ও আইনের ওপর অসাধারণ দক্ষতা, ব্যক্তিগত ক্ষতিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা, বারবার পরাজয়ের পরও অবিচল থাকা– এ সবকিছুকে আমেরিকান সনদের মৌলিক উপাদান হিসেবে আমরা দেখতে পাই। এ কারণে বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের বৃহত্তর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিজেদের অব্যাহতভাবে পুনর্গঠন করতে পারি আমরা।

এর কয়েক মাস পর টাইম ম্যাগাজিন তাদের বিশেষ সংখ্যায় লিংকনের ওপর আমার লেখা প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করে। নতুন কিছু লেখার মতো সময় ছিল না আমার। তাই আমি সাময়িকীটির সম্পাদককে বলি– আমার ভাষণটা যদি তাদের পছন্দ হয় তাহলে সেটি তারা প্রকাশ করতে পারেন। তারা জানান, হ্যাঁ তা হতে পারে তবে এর সাথে আমার ব্যক্তিগত জীবনে লিংকনের প্রভাব সম্পর্কে আরো কিছু যুক্ত করলে ভালো হয়। সাময়িকীর প্রতিনিধির সাথে সে বৈঠকের মধ্যেই আমি কিছু যোগ বিয়োগ করি সে লেখায়। সেই পরিবর্তনের একটি ছিল এ রকম– 'দারিদ্র্য থেকে লিংকনের বেড়ে ওঠা, ভাষা ও আইনের ওপর তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তার ব্যক্তিগত ক্ষতিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা এবং বারবার পরাজয়ের পরও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ থাকা– এ সবকিছু আমার নিজের সংগ্রামের কথাও মনে করিয়ে দেয়।'

লেখাটি প্রকাশ হওয়ার পর বেশী দেরি হয়নি। সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের ভাষণ লেখিকা এবং এখন ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের কলামিস্ট মিজ পেগি নুনান এর তীব্র সমালোচনা করে কলাম লিখেন। তিনি 'কনসিট অব গভর্নমেন্ট' শিরোনামে লিখেন, এ সপ্তাহে সতর্ক সিনেটর বারাক ওবামা টাইম ম্যাগাজিনে তার ডানা উড়িয়েছেন

www.pathagar.com

এবং ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তিনি শুধু নিজের ভালোর জন্যই আব্রাহাম লিংকনকে এত বেশি পছন্দ করেন। তিনি আরো লিখেন, বারাক ওবামার ধারণার মধ্যে বিভ্রম কিছু নেই তবে এটি হলো 'লগ-কেবিন-ফ্রি জোন'; সুতরাং এটি 'গ্রেটনেস-ফ্রি জোন'ও বটে। তিনি যদি নিজের ব্যাপারে এভাবে আকাশে উঠতে চান তবে সব সময় তা করতে পারেন।

উহ!

এটি বলা কঠিন যে, মিজ নুনান আসলেই কী ভেবেছেন আমি নিজের সাথে আব্রাহাম লিংকনের তুলনা করছি, নাকি আমাকে এভাবে হেনস্তা করে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। টাইমে যা গেছে তাতে তেমন সুনির্দিষ্ট কিছু ছিল না, তা ছিল বেশ হালকা এবং আদৌ তা অনভিপ্রেত ছিল না।

আমার প্রবীণ সহকর্মীরাও যা জানেন, সে কথা স্মরণ হয় আমার– আমি যেসব বিবৃতি দিই তা যাচাই-বাছাই যোগ্য, পণ্ডিতরা তা ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন, এমনভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন যার ওপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সম্ভাব্য ত্রুটি পেতে তা চিরুনি-বাছাই করা হতে পারে, ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে, কি বাদ দিয়ে গিয়েছি এবং বৈপরিত্য আছে কি না তা অনুসন্ধান করা হতে পারে। আমার বিরোধী পক্ষ এবং বৈরী টেলিভিশনে সেসব প্রদর্শনও হতে পারে। এটা এমন এক পরিবেশ, যেখানে বছরের পর বছর ধরে মন্দ বিবেচিত নীতির চেয়েও একটি মাত্র ভুল মন্তব্য অনেক বেশি বিরূপ প্রচারণা বা বিতর্ক তৈরি করতে পারে। ক্যাপিটল হিলে করা কোনো কৌতুক নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হলেও আমি অবাক হবো না। এ জন্য তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে, ক্ষোভ উস্কে দেয়া হতে পারে, অনুরাগকে বিবেচনা করা হতে পারে বিপজ্জনক হিসেবে। আর কতকতাল একজন রাজনীতিবিদের জন্য এ অবস্থা চলতে থাকবে, তা ভেবে অবাক হই আমি! কত দিন নকলনবিস কমিটি, সম্পাদক আর নিয়ন্ত্রকদের বিচরণ ঘটবে আপনার মাথায় ওপর। কত দিন একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়-আসয় নিয়েও ঘাটাঘাটি চলতে থাকবে। কথা বলার সময় এ বাস্তবতাকে সামনে রাখতে হবে আপনাকে।

এখানে শেখার আরেকটি বিষয় আছে। মিজ নুনানের কলামের আঘাত আসতে না আসতেই এটি পুরো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি ডান ধারার ওয়েবসাইটে এটাকে ঔদ্ধত্যপনার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়। বলা হয়, আমি হলাম এক অর্বাচীন নির্বোধ (মিজ নুনানের উদ্ধৃত উক্তি এবং এটি সাধারণভাবে এসব সাইটে দেখা যায়)। এটি আধুনিক গণমাধ্যমের অতি সূক্ষ্ম উপাখ্যানের শিকার হওয়ার কাহিনী। কিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনাকে বারবার ফিরিয়ে আনা হয় সাইবার স্পেসের মাধ্যমে এবং তা ছড়িয়ে দেয়া হয় বিবেচ্য ক্ষেত্রে। যদিও বাস্তবতার সাথে এর ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। রাজনৈতিক ক্যারিকেচার এবং ঐতিহ্যগত স্বাধীনতার অমূল্য উপাদানকে অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মাথায় উল্টাপাল্টা ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না।

www.pathagar.com

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে– সে সময় ডেমোক্র্যাটদের এমন কোনো কিছু ছিল না যাতে বলা যায় আমরা 'দুর্বল' এবং কোনো কিছুই করার মধ্যে আমরা নেই। অন্য দিকে রিপাবলিকানরা খুব 'শক্তিমান' (যদি সঙ্কীর্ণ অর্থেও ধরা হয়) এবং বুশ ছিলেন সিদ্ধান্ত দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, কোনো কিছুই তাকে বদলাতে পারে না। হিলারি ক্লিনটনের একটি ভোট বা বক্তৃতা দ্রুত ব্যবচ্ছেদের জন্য পাঠানো হয়। আর জন ম্যাককেইনের কিছু উদ্যোগকে তার জীবনবৃত্তান্তে যুক্ত করা হয় সুন্দরভাবে। একজন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেন, নিয়ম অনুযায়ী যেকোনো নিবন্ধে আমার নামের আগে রাইজিং স্টার উল্লেখ করা উচিত। যদিও নুনানের লেখায় উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে ভিন্নভাবে। আমার মনে হয় যুবক বয়সের কেউ নির্বাচিত হয়ে ওয়াশিংটনে এলে প্রচারের তোড়ে তার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হবে এবং তিনি ব্যতিক্রমী কোনো শিবিরে নিজের স্থান করে নিতে না পারলে শেষ পর্যন্ত হয় তাকে খুব হিসেবী হতে হবে, নয়তো হতে হবে দলবাজ।

অবশ্যই রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের জনসংযোগ ব্যবস্থা– এ সব ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। গত কয়েকটি নির্বাচন চক্রে ডেমোক্র্যাটরা বার্তা প্রেরণে যা করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল রিপাবলিকানরা (এটি ডেমোক্র্যাটদের জন্য বেদনাদায়ক সত্যি ছিল)। যদিও এর একটি কারণ হলো মিডিয়া নিজেই গতিময়তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। ওয়াশিংটনে প্রত্যেক রিপোর্টারই সম্পাদক ও মালিকদের চাপের মধ্যে থেকে কাজ করছিলেন। রিপোর্টাররা প্রকাশক বা নেটওয়ার্ক এক্সিকিউটিভদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। তারা আগের সপ্তাহের রেটিং বা আগের বছরের প্রচার সংখ্যা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তারা প্লে স্টেশন ও রিয়েলিটি টিভি'র অগ্রাধিকারের সামনে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন। আর বাজার ধরে রাখতে এবং ক্যাবল নিউজের চাহিদা পূরণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন রিপোর্টাররা। একই সংবাদের ওপর বারবার নজর দেন। একই স্টক পরিসংখ্যান বারবার মূল্যায়ন করেন। অপর দিকে ব্যস্ত ও নৈমিত্তিক সংবাদপাঠকরা সাদামাটা বর্ণনাকে আর পছন্দ করছেন না। এটি আমাদের চিন্তা ও সময়ের কিছু চাহিদা তৈরি করে। ঘটনাপরম্পরা সহজ ও দ্রুত উপলব্ধির জন্য এ চাহিদা সৃষ্টি হয়। জটিল বিষয়ও এতে সবার কাছে সহজ বলে মনে হয়।

কোন্ পক্ষ সঠিক পথে রয়েছে তা বিবেচনা না করেই অনেক বিবেকবান রিপোর্টারও কেন বিভিন্ন পক্ষের বিতর্কের বিষয় প্রকাশ করেন, তা ব্যাখ্যা করতে উপরে উল্লিখিত উপাদানগুলো সহায়তা করে। একটি আদর্শ সংবাদ কাহিনীর শুরুটা এভাবে হয়, 'হোয়াইট হাউস আজ জানিয়েছে যে, সর্বশেষ দফা কর কমানোর পরও ২০১০ সাল নাগাদ বাজেট ঘাটতি অর্ধেকে নেমে আসতে পারে।' এই সূচনার পরবর্তী বাক্যে এমন একজন লিবারেল বিশ্লেষকের মন্তব্য যুক্ত করা হয় যিনি হোয়াইট হাউসকে আক্রমণ করে কথা বলেন। পরে একজন রক্ষণশীল বিশ্লেষকের মন্তব্য দেয়া হয় যিনি হোয়াইট হাউসের সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দেন। একজন বিশ্লেষক কি অন্য বিশ্লেষক থেকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হতে পারেন না? আমাদের সামনে সঠিক মূল্যায়নটি তুলে ধরতে

www.pathagar.com

পারেন এমন নিরপেক্ষ বিশ্লেষক কি কোথাও নেই। কে এর জবাব দেবেন? এ ধরনের ইস্যুতে বিস্তারিত বিশ্লেষণের সময় রিপোর্টারের কমই হয়ে থাকে। সংবাদ কাহিনীতে কর রেয়াতের সুবিধা অথবা ঘাটতির বিপদ সম্পর্কে তেমন কিছুই বলা হয় না। পাঠক এর উপসংহারে পৌঁছেন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের গুরুত্বহীন ঝগড়াবিবাদ নিয়ে। আর পাতা উল্টে চলে যান খেলাধুলায় যেখানে কাহিনীগুলো কম অনুমাননির্ভর এবং স্কোর বক্সে আপনাকে জানানো হয় কে জয়ী হলো।

ব্যক্তিগত সজ্ঞাত জিইয়ে রাখার সাংবাদিকতার পুরনো কৌশল রিপোর্টারদের দু'টি প্রতিযোগিতামূলক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে পাশাপাশি রাখতে প্রলুব্ধ করে। গত এক দশকে রাজনৈতিক ভদ্রতার যে যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একই সাথে প্রধান প্রধান ইস্যুতে দলগুলোর মতের ব্যবধানও বেড়েছে। তবে রাজনৈতিক ভদ্রতার এই অবনতির একটি কারণ হলো গণমাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা। ভদ্রতা মিডিয়ায় বিরক্তিকর বিবেচিত হয়। আপনি যদি বলেন, 'আমি অন্যজনের বক্তব্যের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে চাই'– তাহলে আপনার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ করা হবে না। অথবা যদি বলেন, 'বিষয়টিতে আসলেই জটিলতা রয়েছে।' অথচ আপনি আক্রমণে গেলে সে যুদ্ধ শুধু ক্যামরাতেই হবে। আর রিপোর্টার এগোবে তার নিজস্ব কৌশলে। রিপোর্টার এমনভাবে আপনাকে উসকানি দিয়ে প্রশ্ন করবে যাতে আপনি উত্তেজনাকর মন্তব্য করে বসেন। শিকাগোর এক উদ্যত রিপোর্টারের কথা আমার মনে আছে, যিনি কাঙ্ক্ষিত মন্তব্য বের করার জন্য একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলেন।

এই রিপোর্টার প্রশ্ন করেন, 'গতকালের সরকারি সিদ্ধান্তকে আপনি কি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেন?' আমি বলি, 'না, আমি গভর্নরের সাথে কথা বলেছি এবং আমি নিশ্চিত যে অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই আমরা মতপার্থক্য দূর করে ফেলতে পারব।' রিপোর্টারের আবার পাল্টা প্রশ্ন 'সত্যি... কিন্তু গভর্নর কি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?' আমার জবাব, 'আমি এ শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না। তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো এ রকম...। রিপোর্টারের আবার প্রশ্ন– 'কিন্তু এটাকে কি গভর্নরের পক্ষ থেকে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না?'

জটিলতা সৃষ্টি, সজ্ঞাতের বিস্তৃতি, কেলেঙ্কারি খোঁজার চেষ্টা– এসবের সম্মিলিত ফলাফল সত্যে পৌঁছতে সর্বসম্মত বিচার মানকে ক্রমাগতভাবে নষ্ট করে দেয়। নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত পরলোকগত মেধাবী ও প্রবাদপ্রতিম সিনেটর ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান সম্পর্কে এক অদ্ভুত হয়তোবা সংশয়পূর্ণ কাহিনী রয়েছে। সিনেটে ময়নিহান একটি বিষয়ে তার এক সহকর্মীর সাথে উত্তপ্ত বিতর্কে জড়িয়ে যান। অন্য সিনেটরটি ভাবলেন তিনি তর্কে হেরে যাচ্ছেন। তাই বোকার মতো বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, আপনি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন প্যাট, কিন্তু আমি আমার মত প্রকাশের অধিকার রাখি।' সাথে সাথে ময়নিহান শীতল কণ্ঠে জবাব দেন, 'আপনি আপনার মতামত প্রকাশের অধিকার রাখেন ঠিকই কিন্তু আপনি আপনার 'ব্যক্তিগত ঘটনা' বলার অধিকার রাখেন না।'

www.pathagar.com

ময়নিহানের জোরালো কণ্ঠ তখন আর ছিল না। আমাদের এখন সেই ওয়াল্টার ক্রনকাইট অথবা এডওয়ার্ড মুরোর মতো কর্তৃত্বশালী ব্যক্তিত্ব আর নেই, যাদের কথা আমরা শুনি এবং বিশ্বাস করি, আস্থা রাখি যেকোনো বিতর্কিত দাবিতে। এর পরিবর্তে মিডিয়া এখন সহস্রভাগে বিভাজিত। বাস্তবতা নিয়ে প্রত্যেকের নিজস্ব বক্তব্য আছে। বিভক্ত জাতির আনুগত্য দাবি করে সবাই। এটা নির্ভর করে, বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কি না, বাজেট ঘাটতি নিচে যাচ্ছে নাকি ওপরে উঠছে– এসব বিষয়ে আপনি কোন মতটিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তার ওপর।

জটিল ইস্যুগুলোর রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোনো বিধিনিষেধ নেই। ২০০৫ সালের শুরুর দিকে নিউজউইকের এক রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে, গুয়ানতানামো বে কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমেরিকান গার্ডরা বন্দীদের নানাভাবে নিগৃহীত করার পাশাপাশি তাদের হাত থেকে কুরআন কেড়ে নিয়ে টয়লেটে ছুড়ে ফেলেছে। হোয়াইট হাউস জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করে বলে, 'এই কাহিনীতে সত্যের লেশমাত্র নেই।' এ ব্যাপারে পাকিস্তানে সহিংস প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হলে কোনো শক্ত প্রমাণ না দিয়ে তাদের বক্তব্য থেকে সরে আসে নিউজউইক। এর কয়েক মাস পর পেন্টাগনের এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে গুয়ানতানামো বে কারাগারে আমেরিকান গার্ডদের অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক কর্মকাণ্ডের বিষয় উল্লেখ করা হয় এতে। এতে বলা হয় যে, এক মহিলা আমেরিকান গার্ড জিজ্ঞাসাবাদের সময় বন্দীর ওপর পিরিয়ডের রক্ত ঢেলে দিয়েছে এবং যেখানে গার্ড কুরআন এবং একজন বন্দীকে মলমূত্রে নিক্ষেপ করেছে বলে প্রমাণও রয়েছে। সেদিন বিকেলেই আবার ফক্স নিউজ উল্লেখ করে, টয়লেটে কুরআন নিক্ষেপের অভিযোগের কোনো ধরনের বাস্তব প্রমাণ পেন্টাগন পায়নি।

আমি বুঝি ঘটনার প্রকৃত তথ্য সব সময় আমাদের রাজনৈতিক বিরোধগুলো নিষ্পত্তিতে সহায়তা করতে পারে না। গর্ভপাতের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রূণের বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। অথবা, আমরা ইরাক থেকে কখন কিভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করব এ ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় এর সম্ভাবনার নানা দিক বিবেচনা করে। তবে কখনো কখনো অধিক সত্য বা কম সত্য জবাবও থাকতে পারে। কখনো কখনো আবার বাস্তবতা বোঝার জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টি হচ্ছে কি না তা জানার জন্য ঘরের বাইরে কয়েকটি পদক্ষেপ দিলেই চলে। বাস্তব বিষয়টি সম্পর্কে খসড়া যুক্তিও একইভাবে মতামত তৈরি করতে পারে এবং এতে সুচিন্তিত সমঝোতার প্রয়োজন দূর হয়ে যায়। যারা সঠিক পথে থাকে মিডিয়া তাদেরই পুরস্কৃত করে না। বরং তারাই এখান থেকে সুবিধা পায় যারা হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিসের মতো জোরালোভাবে, বারবার, এবং আপসহীনভাবে সত্য-অসত্য যুক্তিতর্ক তুলে ধরতে পারে।

এখনকার রাজনীতিবিদরা এ বাস্তবতা বোঝেন। তারা হয়তো এর ওপর নির্ভর করেন না কিন্তু বুঝতে পারেন যারা সব সময় সত্যটাই বলেন তাদের জন্য সব সময় বড় ধরনের পুরস্কার জমা থাকে না। আর সে সত্যটি যদি জটিল প্রকৃতির হয়, তাহলে তো

www.pathagar.com

কথাই নেই। সত্য বলাটা অনেক সময় আতঙ্কের কারণও হতে পারে। সত্যের আক্রমণের শিকারেও পরিণত হতে পারেন কেউ। গণমাধ্যম সত্যের প্রতি মনোযোগী নাও হতে পারে। ফলে সাধারণ মানুষ জানতে পারে না সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যটা কী। এরপর চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ এর ওপর দেয়া বিবৃতি বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে অথবা আরো প্রচারকাজের প্রয়োজন হতে পারে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে দেয়া বক্তব্য তার ভাবমর্যাদা সৃষ্টি করবে এবং মিডিয়ায় রাজনীতির জন্য পৃথকভাবে বিবরণীর বাক্স রাখা হবে। এখনো পর্যন্ত রাজনীতিকরা সততা বজায় রাখেন। তারা সত্য বলার চেষ্টা করেন। রাজনীতিবিদ যা দেখেন ও জানেন, তা বলেন। কিন্তু এটি জানেন না যে, তিনি তার নিজ অবস্থানের বিষয়টি বিশ্বাস করার জন্য দেখছেন, নাকি তিনি দেখে বিশ্বাস করার জন্য দেখছেন। সাধারণত সরাসরি যেসব বক্তব্য দেয়া হয় তার চেয়ে কম প্রচার করা হয় টিভিতে।

আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এমন অনেক রাজনীতিবিদ রয়েছেন যারা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারেন এবং নিজেদের সততা বজায় রাখতে পারেন। দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়েই যারা নির্বাচনের তহবিল গঠন করেন, বিশেষ স্বার্থের কাছে জিম্মি না হয়েই যারা সমর্থন পেয়েছেন এবং নিজের চেতনাকে বিসর্জন না দিয়েই যারা গণমাধ্যমকে করায়ত্ব করতে পেরেছেন, তারা নিজেদের সততা বজায় রেখেই বাধাবিপত্তি পার হতে সক্ষম হন। তবে এর পরও একটি চূড়ান্ত বাধা থেকে যায়। সেটি হলো নিজের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা। ওয়াশিংটনে একসময় আপনি সব কিছু নিষ্পত্তি করলেন কিন্তু নিজ নির্বাচনী এলাকাকে আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। আপনার নির্বাচনী এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করতে পারেন যে আপনি ঠিক করেননি। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য মনে করতে পারেন তারা।

একজন আইন প্রণয়নকারী যে ভোট পেয়েছেন তার জন্য নিয়মিতভাবে মনোকষ্ট পেতে হয় কি না আমি জানি না। তবে এমন সময় আসে যখন বিশেষ কোনো আইন তার নিজ এলাকায় অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জন ম্যাককেইনের জিজ্ঞাসাবাদে নির্যাতনের ওপর বিধিনিষেধ সংশোধনীর প্রস্তাব স্মরণ করা যেতে পারে। অন্য এক সময় একটি বিল সিনেটে উত্থাপন করা হয় যা ছিল নির্লজ্জ, একপক্ষীয় ও দুর্বলভাবে তৈরি। কিভাবে এ আইনটির উত্থাপক বিতর্কের মোকাবেলা করবেন তা বোধগম্য হয়নি।

তবে অধিকাংশ সময় আইন হয় ঘোলা পানীয়ের মতো ছোটবড় শত রকমের সমঝোতার ফল। বৈধ নীতি লক্ষ্যের মিশ্রণ, রাজনৈতিক মহা-অবস্থান, নিম্নমানের নিয়ামক প্রকল্প এবং পুরনো আমলের রাজনৈতিক উৎকোচের মতো বিষয় থাকে এর পেছনে। সিনেটে আমার প্রথম কয়েক মাসে আসা বিলগুলো আমি পড়েছি। দেখেছি আমি আগে যেভাবে ভেবেছিলাম তার চেয়ে এসব বিলের মূল বিষয়াবলি অনেক বেশি অস্বচ্ছ। বিবেকের তাড়নায় আমি এসব বিলে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের বেশি কিছু করতে পারিনি। আমি কি এমন কোন জ্বালানি বিলে ভোট দিতে পারি, যেখানে বিকল্প জ্বালানি

www.pathagar.com

উৎপাদন জোরদার করার ব্যাপারে আমার মতকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা বলা হলেও বিদেশী তেলের ওপর আমেরিকার নির্ভরতা কমানোর ব্যাপারে তেমন কিছুই করা হয়নি। আমি কি সেই বিলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারি যেখানে ক্লিন এয়ার অ্যাক্টকে (বিশুদ্ধ বাতাস আইন) পরিবর্তন করে কিছু এলাকার জন্য আইনটিকে শিথিল করা হয়েছে কিন্তু অন্য এলাকায় এর কার্যকারিতা জোরদার করা হয়েছে। একই সাথে করপোরেট কমপ্লায়েন্স (অনুসরণীয় শর্ত) ব্যবস্থাকে আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিল দূষণকে বৃদ্ধি করার পরও ক্লিন কোল প্রযুক্তিতে আর্থিক সহায়তা দেয়ায় তা ইলিনয়ের দরিদ্র এলাকায় কি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে?

বারবার আমি আমার সীমিত সময়-সুযোগের মধ্যেও প্রমাণাদির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাই করেছি। আমার স্টাফরা আমাকে জানায়, এ ব্যাপারে চিঠিপত্র এবং ফোনকল আসছে পক্ষে-বিপক্ষে দু'দিক থেকেই। স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো দু'পক্ষেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমার ভোট দেয়ার সময় যখন উপস্থিত হলো তখন আমি ৫০ বছর আগে লেখা জন এফ কেনেডির প্রোফাইল ইন কারেজ বইয়ের কিছু উদ্ধৃতি বারবার স্মরণ করছিলাম। সেখানে বলা হয় :

এ ধরনের কষ্টকর পরিস্থিতির সম্মুখীন কেউ যদি হয়ে থাকেন তবে হয়তো অল্প সময়েই হয়েছেন। একজন সিনেটরের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কল যখন আসে, যেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে উভয় দিকে একই ধরনের আতঙ্ক বা ভয়ের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি তার সিদ্ধান্তের জন্য আরো বেশি সময় নিতে পারেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন যে এর মধ্যে উভয় পক্ষ থেকে আরো কিছু বলা হতে পারে। তিনি অনুভব করতে পারেন, কিছু সংশোধনী সব জটিলতার অবসান ঘটাতে পারে– কিন্তু যখন তার ডাক পড়ে তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না। তিনি সমাপ্তিও টানতে পারেন না, তিনি দেরিও করতে পারেন না এবং তিনি তার নির্বাচনী এলাকার কথা ভাবেন, র‍্যাভেন ইন পোয়ের কবিতার মতো, যিনি সিনেট ডেস্কে বসে আছেন, কর্কশভাবে বলছেন– 'আর নয়, তিনি যখন ভোট দিচ্ছেন তা তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।'

এটি কিছুটা হয়তো নাটকীয় মনে হতে পারে। তবে এখনো পর্যন্ত রাজ্য বা ফেডারেল কোনো পর্যায়ের আইন প্রণয়ণকারীই এ ধরনের জটিল পরিস্থিতির বাইরে থাকেননি। দল ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় এর ভূমিকা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হিসেবে আপনার যেকোনো বিলে কিছু ইনপুট দেয়ার সুযোগ থাকে– যেটি ফ্লোরে উত্থাপনের আগে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আপনি কমিটি চেয়ারম্যানকে বিলের কোনো শব্দ আপনার এলাকার জনগণের জন্য বিব্রতকর বলে মনে হলে সেটি বাদ দিতে অনুরোধ জানাতে পারেন। অথবা বলতে পারেন তাতে নতুন কোনো শব্দ সংযোজনের জন্য, যা আপনার এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এমনকি আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে অথবা বিলের উদ্যোক্তাকে আপনার পছন্দের সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত বিলটি স্থগিত রাখতেও বলতে পারেন।

www.pathagar.com

যদি আপনি সংখ্যালঘু দলের সদস্য হন তবে এ ধরনের কোনো সুরক্ষা আপনার জন্য থাকবে না। যে বিলই আসুক না কেন আপনার ভূমিকা থাকবে হ্যাঁ বা না বলা পর্যন্ত। আপনি বা আপনার সমর্থকরা এটিকে ভালো বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করুন বা না করুন এ নিয়ে সমঝোতার সম্ভাবনা থাকে ক্ষীণ। পারস্পরিক পিঠ চুলকানির এই যুগে এবং বিচিত্র ধরনের ব্যয় সংবলিত বিলে কী কী মন্দ দিক আছে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন। সেখানে সৈনিকদের দেহের বর্ম তৈরির জন্য অথবা যুদ্ধবীরদের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করার বিষয় থাকতে পারে– যা এধরনের বিলের বিরোধিতা করাকে কঠিন করে তোলে।

জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রথম মেয়াদে হোয়াইট হাউস এ ধরনের আইন প্রণয়ন খেলায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেয়। বুশের প্রথম মেয়াদে প্রথম দফা কর রেয়াতের ব্যাপারে সমঝোতার এক গঠনমূলক কাহিনী রয়েছে। এ সময় কার্ল রোভ প্রেসিডেন্টের প্যাকেজে সমর্থন দেয়ার জন্য একজন ডেমোক্র্যাট সিনেটরকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। জর্জ বুশ পূর্ববর্তী নির্বাচনে এই সিনেটরের রাজ্যে ব্যাপক ভোটে জয়ী হন আর সেখানকার একটি বড় ইস্যুই ছিল কর রেয়াত। ওই সিনেটর নিজেই কম কর হারের পক্ষে। বুশ প্রশাসনের প্রস্তাবিত কর রেয়াতের ব্যাপারে তার আপত্তির দিক ছিল ধনীদের ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব বেশি করা হয়েছে। এজন্য তিনি প্রস্তাবে কিছু সংশোধনী এনে প্যাকেজটিকে মধ্যপন্থী বানানোর পরামর্শ দেন।

ডেমোক্র্যাট সিনেটর রোভকে বলেন, এই পরিবর্তনগুলো করে দিন, তাতে শুধু আমিই এর পক্ষে ভোট দেবো না, সিনেটে ১০০ ভোটের মধ্যে আপনি এর পক্ষে অন্তত ৭০ জনের রায় পেয়ে যাবেন।

রোভ সাথে সাথে জবাব দেন, 'আমাদের ৭০ ভোটের প্রয়োজন নেই। আমাদের দরকার ৫১ ভোট।'

মি. রোভ ভাবতেও পারেন আবার না-ও পারেন যে, হোয়াইট হাউসের বিলটি ছিল ভালো উদ্যোগ। তবে ১ ভোট নিতে পারলে সেটি যে রাজনৈতিক বিজয় হবে তা তিনি জানতেন। এই ডেমোক্র্যাট সিনেটরের সামনে পথ ছিল হয়তো বা তিনি এ ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভোট দেবেন এবং বিল পাসে সহায়তা করে প্রেসিডেন্টের কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবেন অথবা না ভোট দিয়ে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি পরাজিত হওয়ার ঝুঁকি নেবেন।

শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকটি রেড ডেমোক্র্যাট রাজ্যের সিনেটরের মতো এই সিনেটরও ভোটের সময় তার নিজ রাজ্যে কর রেয়াতের ব্যাপারে যে সাধারণ মত রয়েছে তার প্রতিফলন ঘটান। এই কাহিনীর মতো এখনো যেকোনো সংখ্যালঘু দলের সদস্য বর্তমান দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে আবার অনেকে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার এ ধারাকে পছন্দও করেন। বিশেষভাবে গণমাধ্যম এই 'দ্বিদলীয়' শব্দটির প্রতি বেশ অনুরক্ত। ক্যাপিটল হিল সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে দু'দলের ঝগড়া সংক্রান্ত খবরাখবর এ কারণে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পায়।

www.pathagar.com

সত্যিকার দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অবশ্য দেবো-নেবোর একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়া। এটি সমঝোতার একটি মানসম্মত উপায়। লক্ষ্য অর্জনে তা কতটা ভূমিকা রাখতে পারল তার ওপর এর মূল্যায়ন নির্ভর করে । এ ক্ষেত্রে স্কুলের সার্বিক পরিবেশ তা উন্নত করতে পারল কি না অথবা বাজেট ঘাটতি কমাতে তা সহায়তা করল কি না এসব বিষয় দেখা হতে পারে। ইতিবাচক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভালো মনোভাব নিয়ে সমঝোতার জন্য এগিয়ে যায়। গণমাধ্যমের মাধ্যমে নির্বাচক মণ্ডলীও চূড়ান্তভাবে জানতে পারেন। যদি এ অবস্থা না থাকে, যদি ওয়াশিংটনের বাইরে কেউই বিলের মূল বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি না দেয়, যদি কর রেয়াতের বাস্তব ব্যয় নামকাওয়াস্তে হিসাব-নিকাশে ধামাচাপা পড়ে যায় এবং ট্রিলিয়ন ডলার বা এ রকম পরিসংখ্যানের আড়ালে প্রকৃত অঙ্ক অপ্রকাশিত থেকে যায় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের ১০০ ভাগ চাহিদা পূরণ করার কথা বলে সমঝোতা আলোচনা শুরু করতে পারে। এরপর হয়তো তারা ১০ ভাগ ছাড় দেবে এবং সংখ্যালঘু দলের কেউ এ সমঝোতায় সমর্থন না দিলে তাকে সমঝোতার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সংখ্যালঘু দলের জন্য এ পরিবেশে দ্বিদল মানে অব্যাহতভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকা। যদিও বিশেষ কোনো সিনেটর সমঝোতার মাধ্যমে সব সময় সংখ্যাগুরু দলের পক্ষ থেকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করতে পারেন এবং মধ্যপন্থী ও উদার হিসেবে তার সুনাম সৃষ্টি হতে পারে।

এতে, যেকোনো রিপাবলিকান উদ্যোগের বিপক্ষে ডেমোক্র্যাট সিনেটরদের দাঁড়াতে এক্টিভিস্টরা জোরাজুরি করলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এমনকি সে উদ্যোগে নীতিগত বিবেচনায় বেশ কিছু ভালো দিক থাকলেও সে ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে বলা হয়। এটি বলা অসঙ্গত হবে না যে, এ ধরনের ব্যক্তিরা রিপাবলিকান প্রভাবিত রাজ্যে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে কোনো উচ্চ পদে নির্বাচিত হতে পারেন না। অথবা মিলিয়ন ডলারের নেতিবাচক টিভি বিজ্ঞাপনের লক্ষ্যবস্তুও হওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। প্রত্যেক সিনেটর উপলব্ধি করেন, মন্দ দৃশ্যমান কোনো প্রস্তাবিত মার্কিন আইনে ভোট দেয়া অত সহজ হয় না। ৩০ সেকেন্ডের একটি নেতিবাচক টিভি বিজ্ঞাপনের বিপরীতে একই বিষয়ে ইতিবাচক যুক্তি তুলে ধরা ২০ মিনিটের কম সময়ে সম্ভব হয় না। প্রত্যেক সিনেটর জানেন, তাকে এক একটি মেয়াদে কয়েক হাজার বার ভোট দিতে হয়। ভোটাভুটির এ পুরো বিষয় নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় পরবর্তী নির্বাচনে।

নিজের সিনেট নির্বাচনে সৌভাগ্যক্রমে কোনো প্রার্থীই আমার ব্যাপারে নেতিবাচক টিভি বিজ্ঞাপন করেননি। যা আমার সিনেট নির্বাচনের পুরো পরিবেশকেই কলুষিত করতে পারত এবং ইতিবাচক বিষয়গুলো সামনে না থাকলে এই ক্ষতিকর বিষয়ই আলোচনায় সক্রিয় থাকত। আমি রাজ্য আইনসভার সাত বছর সদস্য ছিলাম, যার মধ্যে ছয় বছরই ছিলাম সংখ্যালঘু দলের সদস্য। এ সময় আমাকে হাজার হাজার বার ভোট দিতে হয়েছে, যার মধ্যে বেশ কিছু জটিল ইস্যুও ছিল। এ সময়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে ন্যাশনাল রিপাবলিকান সিনেটরিয়াল কমিটি মনোনয়নপ্রাপ্তির আগে থেকে আমার

www.pathagar.com

ব্যাপারে নানা গবেষণার প্রস্তুতি নেয়। আমার নিজস্ব গবেষক দলও আমার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানদের পক্ষ থেকে কী ধরনের নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা হতে পারে তা রেকর্ড থেকে বের করার চেষ্টা করে।

তারা আমার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু পায়নি, তবে তারা চালাকি করার মতো অনেক কিছু পেয়ে যায়। এক ডজন বা তার কিছু বেশি ক্ষেত্রে সংসদে আমার ভোটের বিষয় ছিল এমন যেখানে মূল বিষয়টিকে বাদ দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভোট দিয়েছি বলে দেখানো হলে তাতে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। আমার গণমাধ্যম পরামর্শক ডেভিড অ্যাক্সেলরড এক জরিপের মাধ্যমে তা যাচাই করেন। এতে দেখা যায়, আমার সমর্থন হার ১০ পয়েন্ট কমে গেছে। এক সময় স্কুলে মাদকবিরোধী অভিযানের একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল। তবে এটি এত দুর্বলভাবে তৈরি করা ছিল যে, আমি উপসংহারে এটি অকার্যকর ও অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করি। বলা হয়, এ সময় আমি নাকি স্কুলগুলোতে মাদকের বিস্তারকারী চক্রের জরিমানা শিথিল করার পক্ষে ভোট দিয়েছি। জনমতে এর কী প্রভাব পড়বে। গর্ভপাতবিরোধী সক্রিয় ব্যক্তিরা সংসদে একটি বিল আনেন, যাতে যৌক্তিক অনেক বিষয় ছিল। এতে 'অপরিপক্ব' নবজাতকের জন্য জীবন রক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়নি যে, বিদ্যমান আইনে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এতে গর্ভের ভ্রূণ বোঝানোর জন্য 'পারসনহুড' শব্দ ব্যবহার করায় রোয়ে ভি ওয়াদে তা নাকচ করে দেন। জরিপে বলা হয়, নবজাতকের জীবন রক্ষার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি নাকি নেতিবাচক পক্ষ নিয়েছি। এ তালিকায় আরো দেখা যায়, এভাবে নাকি যৌন নিপীড়ন থেকে শিশুদের রক্ষার একটি বিলের বিপক্ষেও ভোট দিয়েছি আমি।

ডেভিডের হাত থেকে কাগজটি নিয়ে আমি বলি, ১ মিনিট অপেক্ষা করুন। দুর্ঘটনাক্রমে আমি বিল পাসের সময় ভুল বোতামে চাপ দিয়েছিলাম। বিলটিতে আসলে আমার ভোট ছিল 'না', যা পরক্ষণেই সংশোধন করে 'হ্যাঁ' করে দিই।

ডেভিড হেসে বললেন, যেভাবেই হোক রিপাবলিকান বিজ্ঞাপনে অফিসিয়াল রেকর্ডের সে অংশটুকু রাখা হয়নি। তিনি ভদ্রভাবে জরিপের কাগজটি আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, যা হোক আমরা এগোতে থাকি। আমার পিঠ চাপড়ে রসিকতা করে আরো বলেন, আমি নিশ্চিত এটি আমাদের যৌন নিপীড়নকারীদের ভোট পেতে সাহায্য করবে।

বিজ্ঞাপনে যেসব বিষয় প্রচার করা হয়, তা কিভাবে পাল্টা আঘাত করে– তা দেখে আমি মাঝে মধ্যে অবাক হই। এ ক্ষেত্রে অবশ্য আমি হারলাম কি জিতলাম সেটি বড় কথা নয়। প্রাইমারি পার হওয়ার পর আমি দেখি, রিপাবলিকান প্রার্থীর তুলনায় আমি ২০ পয়েন্ট এগিয়ে গেছি। কিন্তু এখনো বুঝতে পারি না ভোটাররা আমাকে কিভাবে নিয়েছিল, কিভাবে আমি সিনেটে প্রবেশ করলাম। এ কারণে আমি ভাবি, আমার

www.pathagar.com

রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সহকর্মীদের কতজন আবার সিনেটে প্রবেশ করছেন, তাদের ভুলগুলো কতটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে, তাদের বক্তব্যকে কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কতটা প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। তাদের আগুনে পুড়িয়ে হয়তো যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তাদের ভোট দানের প্রতিটি ক্ষেত্রকে দেখা হয়েছে। তাদের দেয়া প্রতিটি বক্তব্য-বিবৃতি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি যাচাই করা হয়েছে। শুধু একজনকে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় হারাবার জন্য এটি করা হয়নি, অধিকন্তু যারা তাদের ওয়াশিংটনে পাঠাতে চাচ্ছে তাদেরও হারিয়ে দেয়ার জন্য এটি করা হয়েছে। এটি তাদেরকেও হারানোর জন্য করা হয়েছে যারা এক সময় বলেছিলেন, 'আপনার প্রতি আমাদের অনেক আশা, দয়া করে আমাদের নিরাশ করবেন না।'

অবশ্যই আমাদের গণতন্ত্রে কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে, যা এ ধরনের চাপ থেকে রাজনীতিবিদের কিছুটা হলেও মুক্তি দেয়। রাজনীতির কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন ভোটার ও তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংযোগকে জোরদার করতে পারে। নির্দলীয়ভাবে জেলা বিভাজন, একই দিনে ভোটার নিবন্ধীকরণ এবং সাপ্তাহিক বন্ধের দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতার গতিকে আরো বৃদ্ধি করবে এবং নির্বাচকমণ্ডলীর অংশগ্রহণও বাড়াবে। এতে অধিকসংখ্যক নির্বাচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, অধিক পরিমাণে সংহতি-সততা উৎসাহিত হবে। নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি অর্থায়ন অথবা রেডিও-টিভিতে বিনা খরচে সময়ের ব্যবস্থা করা হলে অর্থের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা থেকে প্রার্থীরা রেহাই পেতে পারেন। এতে কমতে পারে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব। প্রতিনিধি সভা অথবা সিনেটের বিধিবিধানের পরিবর্তন সংখ্যালঘু দলের আইনপ্রণেতাদের ক্ষমতাশালী করতে পারে। এতে পুরো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বাড়বে এবং তা সঠিক রিপোর্টিংকে উৎসাহিত করবে।

কিন্তু এ ধরনের কোনো পরিবর্তনই এমনি এমনি হয়ে যাবে না। যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এ জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রত্যেক রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন দাবি করতে পারেন। এখানে ক্ষমতায় যারা আছেন তাদের হারানোর কিছু নেই। এ ধারণাকে সামনে রেখে শত্রু-মিত্র সবাইকে নিয়ে লড়াইয়ে নামতে হবে। এতে জনগণের এ ব্যাপারে স্বল্প আগ্রহ রয়েছে বলে মনে হতে পারে। প্রত্যেক নারী-পুরুষকে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে ঝুঁকির মধ্যে তারা এখনো রয়েছেন।

জন এফ কেনেডি ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে এক সার্জারি থেকে সুস্থ হয়ে ফেরার পর যে গুণের কথা বলেছিলেন, তা এখনো প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের বীরত্বপনা মনে রাখা যেতে পারে, তবে অধিকতর অনিশ্চিত ঝুঁকি আমাদের সামনে– সেটি হলো সাহসের মান। যেভাবেই হোক আপনি দীর্ঘ সময় রাজনীতিতে থাকলে এ ধরনের সাহসের প্রয়োজন আরো বেশি। এখানে এক ধরনের স্বাধীনতা থাকে, যা আসে এই উপলব্ধি থেকে যে আপনি যা করছেন তা এমন কিছু নয়। কোনো ব্যক্তি হয়তো আপনার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে পারেন। আপনার সতর্কতার সাথে

www.pathagar.com

ভোটদানের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক আক্রমণ কোনো বিষয় হবে না। এই বিবেচনা হবে দুর্বলচিত্তের কাজ অথবা হিসাব-নিকাশের মধ্যেই সাহসের পরিচয় থাকবে। প্রকৃতপক্ষে আমি যত সময় রাজনীতিতে আছি জনপ্রিয়তার জন্য কম উদ্বিগ্ন না হয়ে স্বস্তিতে থাকতে চাই, ক্ষমতা, মর্যাদা ও সুখ্যাতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হবে দারিদ্র্য জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং এরপর আমার জবাবদিহিতা হবে আমার বিবেকের প্রতি ।

গডফ্রে'তে আমার নির্বাচনী এলাকার এক টাউন হল সমাবেশ শেষ করার পর এক প্রবীণ ব্যক্তি কাছে আসেন। ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করার পরও কেন আমি পুরো সেনা প্রত্যাহার চাইনি, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আমি সংক্ষিপ্ত ও ভদ্রভাবে বলি, এখনই পুরো সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে দেশটিতে সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এ গৃহযুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আমাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর তিনি করমর্দন করেন।

প্রবীণ এই ব্যক্তি বলেন, আমি এখনো মনে করি আপনার চিন্তা সঠিক নয়। তবে এটি আমাকে খুশি করেছে, আপনি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। তবে এটি আমাকে হতাশ করত, যদি সব কিছুতে আমার সাথে আপনি একমত হয়ে যেতেন।

আমি তাকে বললাম, 'ধন্যবাদ'। এরপর তিনি চলে গেলেন। আমি তখন বিচারপতি লুইস ব্রান্ডিসের একটি কথা মনে করছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অফিস হলো নাগরিকের দরবার।'

www.pathagar.com

অধ্যায় : পাঁচ

সুযোগ

www.amarboi.org

আমেরিকান সিনেটরদের বৈশিষ্ট্য হলো, বিমানে প্রচুর ভ্রমণ করতে হয় তাদের। সপ্তাহে অন্তত কয়েকবার ওয়াশিংটন ও নিজ রাজ্যের মধ্যে যাওয়া-আসা তো আছেই; আছে বক্তৃতা দেয়া, তহবিল সংগ্রহ, সহকর্মীদের নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো। আপনি যদি ইলিনয়ের মতো বড় রাজ্যের প্রতিনিধি হন তাহলে রাজ্যের এমাথা-ওমাথা করতে গিয়েও প্রচুর উড়তে হবে আপনাকে। বিভিন্ন শহরের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে শুরু করে শপিংমলের ফিতা কাটার মতো অনেক কিছু করে আপনাকে বুঝাতে হবে যে, জনগণকে আপনি ভুলে যাননি ।

বেশিরভাগ সময় কমার্শিয়াল ফ্লাইটে যাতায়াত হতো আমার। জানালার পাশের সিটটি আমার পছন্দ। মাঝে মধ্যে ব্যস্ততার কারণে শেষ কমার্শিয়াল ফ্লাইটটিও মিস করে ফেললে প্রাইভেট জেট খোঁজা ছাড়া উপায় থাকত না। প্রথম দিকে ভাড়ার কথা ভেবে প্রাইভেট জেটে চড়ার বিষয়টি এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণাকালে আমার এক স্টাফ জানায়, আইনে আছে সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থী চাইলে যে-কারো প্রাইভেট জেট ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য তাকে কমার্শিয়াল ফ্লাইটের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিলেই চলবে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী শিডিউল ও সময়ের কথা চিন্তা করে প্রাইভেট জেটে যাতায়াতের সিদ্ধান্ত নিই আমি।

আমার প্রাইভেট জেটে চড়ার অভিজ্ঞতা বেশ চমৎকার। ব্যক্তিগত টার্মিনাল থাকে এসব প্লেনের জন্য। টার্মিনালের লাউঞ্জ বাড়ির ড্রইং রুমের মতোই চমৎকারভাবে সাজানো আর আরামদায়ক। এখানকার রেস্টরুম প্রায়ই খালি পড়ে থাকে। টার্মিনালে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আপনি দেরি করলে প্লেন অপেক্ষা করবে আপনার জন্য। আর সময়ের আগে চলে এলে দেখবেন ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্লেনটি প্রস্তুত। লাউঞ্জে ঢুকতে

www.pathagar.com

না চাইলে সরাসরি গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারেন প্লেনের সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত। তা না হলে টার্মিনালের গেটে পাইলট আপনাকে স্বাগত জানাবে। আপনার ব্যাগটি হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে প্লেনের কামরা পর্যন্ত।

প্রাইভেট প্লেনে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতাটি আমার হয় এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময়। প্লেনের ভেতরটি যেন কোনো বাড়ির বেডরুম। চামড়া দিয়ে বাঁধানো চেয়ারের পেছনেই টেবিলে রাখা আছে খাবার। সামনের মিনিবারটি সাজানো হরেক রকম পানীয় দিয়ে। পাইলট আমার কোটটি ঝুলিয়ে রেখে কিছু পত্রিকা দিয়ে গেল। জেনে গেল কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না।

এবার ওড়ার পালা। শক্তিশালী রোলস রয়েস ইঞ্জিন এমনভাবে প্লেনটিকে আকাশে টেনে তুলল, যেমনটি নিঁখুতভাবে তৈরি কোনো স্পোর্টস কার মাটি আঁকড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে সাবলীলভাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের পর্দা ঢেকে দিলো প্লেনের জানালা। তাই সামনের টিভি মনিটরটি অন করি আমি। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানচিত্র ফুটে ওঠে। এর পাশে, প্লেন কোন দিকে যাচ্ছে, আবহাওয়া কেমন, কত উঁচু দিয়ে উড়ছি, গন্তব্যে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে, বাইরের তাপমাত্রা কত– এসব তথ্য দেখানো হচ্ছে। ৪০ হাজার ফুট ওপরে উঠে সমান্তরাল হলো আমাদের প্লেন।

আমি চোখ ফেরাই জানালার বাইরে। ইলিনয়ের পশ্চিমাঞ্চলের বৈচিত্র্যময় প্রান্তর, বিশাল অজগরের মতো মিসিসিপির এঁকেবেঁকে ছুটে চলা কৃষিখামার, র‍্যাঞ্চ ও পাথুরে পাহাড় পেছনে ফেলে প্লেন ছুটছে। একসময় রক্তিম বর্ণালী ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য। রাতের আঁধার যেন গিলে ফেলল এতক্ষণ ধরে দেখা নিচের দৃশ্যটি।

সিনেট নির্বাচনের আগে এটা ছিল একটি 'ফান্ড রেইজিং ট্রিপ'। লস অ্যাঞ্জেলেস, সান দিয়াগো ও সানফ্রানসিসকোতে আমার বন্ধু ও সমর্থকরা এ রকম বেশ কয়েকটি সমাবেশের আয়োজন করে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউ শহরের ট্রিপটি আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে স্মরণীয়। সিলিকন ভ্যালির প্রাণকেন্দ্রে এই শহরের অবস্থান। সার্চ ইঞ্জিন কোম্পানি গুগলের করপোরেট সদর দফতর এখানেই।

আমার এই সফর ছিল ২০০৪ সালের মাঝামাঝি। ইতোমধ্যে বিশ্বজোড়া স্বীকৃত গুগলের আধিপত্য। শুধু ইন্টারনেটের ক্ষমতাই নয়, বিশ্ব অর্থনীতি রূপান্তরেরও প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সার্চ ইঞ্জিন। সানফ্রানসিসকো শহরের উপকণ্ঠে গুগলের সদর দফতরে যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে আমি পড়ে নিই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস। স্ট্যামফোর্ডের ডরমিটরিতে বসে কমপিউটার বিজ্ঞানের দু'জন পিএইচডি গবেষক ছাত্রের, ওয়েব সার্চের আরো ভালো কোনো উপায় আছে কি না তা খুঁজে বের করার চেষ্টা থেকে গুগলের জন্ম। ল্যারি পেজ ও সার্গে ব্রিন নামে ওই দুই ছাত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে মাত্র ১০ লাখ ডলার জোগাড় করে ১৯৯৮ সালে স্থাপন করেন গুগলের ভিত্তিপ্রস্তর। একটি গ্যারেজের মধ্যে মাত্র তিনজন কর্মীকে নিয়ে শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞাপন প্রচারের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। ফলে 'ডট-কম' বুমের

www.pathagar.com

মধ্যেও রাতারাতি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় গুগল। ছয় বছরের মধ্যে পেজ ও ব্রিন পরিণত হন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই ধনাঢ্য ব্যক্তিতে।

ক্যালিফোর্নিয়ার উপকণ্ঠের কোনো গতানুগতিক শহরের মতোই মাউন্টেন ভিউ। নিরিবিলি সড়ক, মাঝে মধ্যে উঁকি দেয় নতুন অফিসের ঝকঝকে পার্কিং এরিয়া, অসাধারণ বিলাশবহুল অট্টালিকা। আমাদের গাড়িটি গিয়ে থামে আধুনিক ডিজাইনে গড়া একসারি ভবনের সামনে। গুগলের জেনারেল কাউন্সিলর ডেভিড ড্রুমন্ড স্বাগত জানান আমাকে। প্রায় আমার বয়সী এই আফ্রিকান-আমেরিকান লোকটিই ছিল আমার সেই সফরের আয়োজক। ডেভিড জানালেন, যখন প্রথম তার সাথে পেজ ও ব্রিনের সাক্ষাৎ ঘটে তখন লোক দু'জনকে সত্যিকার একজোড়া 'স্মার্ট' মানুষ বলে মনে হয়েছিল। মাথা থেকে নতুন কোনো আইডিয়া বের হওয়ার জন্য যেন উঁকি দিচ্ছিল তাদের চোখে।

গুগলের প্রধান অফিসের ভেতরটা কোনো কলেজের ছাত্রকেন্দ্র বলেই মনে হচ্ছিল আমার কাছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে ক্যাফে। খাওয়ার পাশাপাশি আড্ডা দেয়া, পিংপং খেলা অথবা সুসজ্জিত জিমন্যাসিয়ামে গিয়ে শারীরিক কসরত করার সবরকম সুবিধা আছে এখানে। ডেভিড বলে, 'কর্মীরা এখানে প্রচুর সময় কাটায়। আমরাও চাই তাদের সময়টুকু যেন আনন্দে কাটে।' দ্বিতীয়তলায় টি-শার্ট ও জিন্স পরা প্রচুর ছেলেমেয়ের দেখা পেলাম আমরা। এদের সবার বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। কমপিউটার পর্দার ওপর ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে যে যার কাজ করে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত ল্যারি পেজের দেখা পেলাম। একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলছিলেন কোনো সফটওয়্যারের সমস্যা নিয়ে। ল্যারির পোশাকটিও একজন কর্মচারীর মতো। মাথার চুলের রঙ কিছুটা ধূসর হয়ে এলেও চেহারা দেখে একজন তরুণ মনে হচ্ছিল তাকে। বিশ্বের যাবতীয় তথ্য যাতে ব্যবহারযোগ্য আকারে নাগালের মধ্যে পেতে পারে সাধারণ মানুষ– গুগলের এই মিশনের কথা বললেন তিনি। গুগলের ইনডেক্সে ইতোমধ্যে ছয় শ' কোটিরও বেশি ওয়েবসাইটের তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি নতুন ওয়েবভিত্তিক ই-মেইল সিসটেম চালুর কথা তিনি জানালেন, যা নিজ থেকেই অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। জানালেন, বর্তমানে এখানকার ইঞ্জিনিয়াররা এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যার মাধ্যমে টেলিফোনে গলার স্বরটি কার, তাও খুঁজে বের করা যাবে। পাশাপাশি আরেকটি প্রকল্পে হাত দিয়েছে গুগল। তা হলো, পৃথিবী সৃষ্টির পর এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবগুলো বই স্ক্যান করে 'ওয়েব অ্যাকসেসেবল' আকারে নিয়ে আসা। এটা এমন এক ভার্চুয়াল লাইব্রেরি হবে, মানবতার পূর্ণ জ্ঞান জমা থাকবে সেখানে।

সবার শেষে ল্যারি আমাকে একটি রুমে নিয়ে যান, যেখানে বিশাল ফ্লাট-প্যানেল মনিটরের ওপর পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক একটি মডেল ঘুরছে। সেখানে কাজ করছিল কিছু ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার। ল্যারি তাদেরকে বললেন, এই রুমে কী কাজ করা হচ্ছে তা যেন আমাকে বুঝিয়ে বলে। তারা আমাকে কিছু আলোর বিন্দু দেখিয়ে বলল, এগুলো হলো এ মুহূর্তে পৃথিবীর কোথায় কী কী খোঁজা হচ্ছে তার চিহ্ন। প্রতিটি ভাষার জন্য আলাদা রঙ। স্ক্রিনটি উল্টে দিয়ে আমাকে বলল, এভাবে দেখলে গোটা ইন্টারনেট

www.pathagar.com

সিসটেমের ট্রাফিক প্যাটার্ন বোঝা যাবে।

সত্যিই বিস্ময়কর দৃশ্য। বিশ্বের মানুষ, জাতীয়তা, জাতিগত, ধর্ম, সম্পদ– এর সব সীমানা এখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্যাম্ব্রিজের পদার্থবিদদের সাথে টোকিওর ব্যবসায়ী, ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো ছাত্রের সাথে মেক্সিকো সিটির কোনো ডিপার্টমেন্ট স্টোরের ম্যানেজারের বন্ধন গড়ে উঠছে। ইন্টারনেটের এই জগতে স্থান ও কালের ব্যবধান সত্যিই মুছে গেছে। মনিটরের ছবিতে আমি কিছু অন্ধকার অঞ্চল দেখতে পাই। এগুলো হলো– আফ্রিকার বেশিরভাগ এলাকা, দক্ষিণ এশিয়ার বড় একটা অংশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেরও কিছু অংশে আলোকবিন্দুগুলো নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারে মুছে গেছে।

সের্গের আগমনে আমি স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসি। লোকটি ল্যারির চেয়ে কিছুটা তরুণ। সে এসে আমাকে তাদের 'থ্যাংক গড ইটস ফ্রাইডে' সমাবেশে যোগদানের আমন্ত্রণ জানায়। কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা এই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এখানে গুগলের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী হাজির হন। খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ফাঁকে আলাপ করে তাদের নানা আইডিয়া নিয়ে। বিশাল এক হলরুমে এই আয়োজন। আমাদের আগেই হলটি প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ হাসিঠাট্টায় মশগুল, আবার কেউ মগ্ন তার ল্যাপটপ নিয়ে। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার গুঞ্জরণে পরিবেশটি মুখরিত। তবে তুলনামূলক বয়স্কদের দেখা গেল কিছুটা নিশ্চুপ। ডেভিড আমাকে জানালেন, কোম্পানিতে যোগ দিতে যাচ্ছে এমন একদল সদ্য গ্র্যাজুয়েট তরুণ-তরুণীকে গুগলের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে এখানে। একে একে তারা সামনে এগিয়ে আসছিল, আর তাদের মুখের ছবিটি ফুটে উঠছিল পেছনের বিশাল টিভি স্ক্রিনে। সেখানে মানুষটির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শখ, আগ্রহ এসবও দেখানো হচ্ছিল। আমি দেখলাম নতুন যোগদানকারীদের অর্ধেকই এশিয়ান। শ্বেতাঙ্গদের বেশিরভাগ এসেছে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে। কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্যাটিনো নেই একজনও। ফেরার সময় আমি যখন প্রসঙ্গটি টানলাম, মাথা নেড়ে তাতে সায় দিলেন ডেভিড।

এটা একটা সমস্যা, ডেভিড বললেন। জানালেন, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে সংখ্যালঘু ও মেয়েদের টেনে আনতে বৃত্তিও দিচ্ছে গুগল। পাশাপাশি, প্রতিষ্ঠানটিকে টিকে থাকতে হবে প্রতিযোগিতায়। গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কমপিউটার বিজ্ঞানের ক্লাসগুলোতে কৃষ্ণাঙ্গ বা ল্যাটিনোদের উপস্থিতি কতটা কম সে কথা ডেভিড আমাকে বললেন। আসলে সাদা-কালো যা-ই হোক না কেন, জন্মসূত্রে আমেরিকান এমন ইঞ্জিনিয়ার পাওয়াই নাকি কষ্টকর হয়ে গেছে। আর তাই সিলিকন ভ্যালির প্রতিটি কোম্পানিকে ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশী ছাত্রদের ওপর।

কিন্তু এখন এই উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন। নাইন-ইলেভেনের পর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া নিয়ে জটিলতার কারণে উচ্চশিক্ষার্থীরা এখানে আসতে চাওয়ার আগে অন্তত দু'বার ভাবে। উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ার বা সফটওয়্যার ডিজাইনারদের

www.pathagar.com

এখন কাজ খোঁজা বা ব্যবসা শুরুর জন্য সিলিকন ভ্যালির দিকে তাকাতে হয় না। চীন, ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশে উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের প্রসার ঘটছে দ্রুত। এটা শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতির জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ পেল ডেভিডের কণ্ঠে।

তিনি বললেন, খ্যাতির কারণে গুগল এখনো মেধাবীদের টানতে পারছে। কিন্তু নতুন ব্যবসা শুরু করতে গেলে বা স্বল্প পরিচিত কোম্পানিগুলোর সমস্যার কথা ভাবাই যায় না। জনবল সংগ্রহ কতটা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গেছে তা ওয়াশিংটনের বোঝা উচিত। আমাদের এই আধিপত্য চিরস্থায়ী নয়।

একই সময়ে আরেকটি সফরে গিয়ে আমি বুঝেছিলাম, কতটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের অর্থনীতি। এই সফর ছিল গাড়িতে। ইলিয়নয়ের পশ্চিমাঞ্চলে আইওয়া সীমান্ত থেকে ৪৫ মিনিট বা এমন সময়ের দূরত্বে অবস্থিত শহর–গালিসবার্গে। একটি কলেজ শহর হিসেবে ১৮৩৬ সালে এর প্রতিষ্ঠা। নিউইয়র্কের প্রেজবিটেরিয়ান ও কংগ্রেশনাল গীর্জার একদল অনুসারী সামাজিক সংস্কারের সাথে বাস্তবিক শিক্ষার মিশ্রণের ধারণাটি পশ্চিম সীমান্তে ছড়িয়ে দিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শহর। গৃহযুদ্ধের আগে এই শহর অ্যাবলিশনিস্ট কর্মকাণ্ডের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পাতাল রেলের একটি শাখা গেছে শহরের মধ্য দিয়ে। দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর হিরাম রিভিলসের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন এখানেই কেটেছে। ১৮৫৪ সালে রেলরোড স্থাপনের পর শুরু হয় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এর চার বছর পর এই শহরে লিংকন-ডগলাসের বিতর্ক শুনতে জড়ো হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সেই বিতর্কের মধ্য দিয়ে লিংকন প্রথম দাসপ্রথার বিরোধিতাকে একটি নৈতিক ইস্যু হিসেবে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

শহরটির এরপরের ইতিহাস খুব বেশি সমৃদ্ধ নয়। আমি সেখানে গিয়েছিলাম মেট্যাগ প্লান্টের একদল শ্রমিক নেতার সাথে সাক্ষাতের জন্য। মেট্যাগ কর্তৃপক্ষ দেড় হাজারের বেশি শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে। প্লান্টটি মেক্সিকোতে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ইলিনয়ের মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেক শহরের মতো শিল্পকারখানা বাইরে চলে যাওয়ায় গালিসবার্গের অর্থনীতিতে দুঃসময় চলছে। শহরে বেকারত্বের হার ইতোমধ্যে ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। মেট্যাগ প্লান্ট বন্ধ হয়ে গেলে বেকারের সংখ্যা আরো ৫ থেকে ১০ শতাংশ বাড়বে।

শ্রমিকদের ইউনিয়ন হলে তাদের সাথে দেখা করি আমি। সেখানে আমার জন্য সাত-আটজন পুরুষ দুই-তিনজন নারী শ্রমিক অপেক্ষা করছিল। সবার বয়স চল্লিশের ওপরে বা পঞ্চাশের কাছাকাছি। ইউনিয়নের সভাপতি ডেভ বেভার্ড জানান, মেট্যাগ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বদলের জন্য এমন কোনো চেষ্টা নেই যা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছি, শেয়ারহোল্ডারদের সাথে আলোচনা হয়েছে,

www.pathagar.com

স্থানীয় ও রাজ্য কর্মকর্তাদের সহায়তা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু মেট্যাগ কর্তৃপক্ষের অবস্থান বদল হয়নি।

এটা এ জন্য নয় যে, এই প্রতিষ্ঠানটি লাভ করছে না– ডেভ আমাকে বললেন। আপনি যদি কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করেন তারা বলবে, সবচেয়ে উৎপাদনশীল প্লান্টগুলোর মধ্যে এটি একটি। এখানকার শ্রমিকরা দক্ষ। তাদের ভুলের হারও সবচেয়ে কম। আমরা নিজেদের বেতন কমিয়েছি, এমনকি অনেক সুযোগ-সুবিধা নেয়া বন্ধ করে দিয়েছি। প্লান্টটি এখানে থাকবে এই প্রতিশ্রুতির কারণে গত আট বছরে রাজ্য ও শহর কর্তৃপক্ষ মেট্যাগের অন্তত এক কোটি ডলার কর মওকুফ করেছে। কিন্তু এগুলোও যথেষ্ট হয়নি। মিলিয়ন ডলার কামানো সিইও-রা কোম্পানির শেয়ারের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, প্লান্টটি মেক্সিকোতে সরিয়ে নেয়া। কারণ সেখানকার শ্রমিকদের মেট্যাগের ছয় ভাগের এক ভাগ মজুরি দিলেই চলবে।

শ্রমিকদের জন্য রাজ্য ও ফেডারেল এজেন্সিগুলো কী ব্যবস্থা নিয়েছে, জানতে চাইলাম আমি। আমার কথায় গোটা ইউনিয়ন অফিস হাসিতে ফেটে পড়ে। 'শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থা, কৌতুকের মতো শোনায়'– বললেন ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডুগ ডেনিসন। যেখানে কোনো কাজই থাকছে না, সেখানে আবার ব্যবস্থা নেবে কী? ডেনিসন বললেন, তিনি নাকি বিষয়টি নিয়ে কোনো এক এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিলরের সাথে পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন। সেই কাউন্সিলর তাকে নার্সিং সহকারী হওয়ার পরামর্শ দেয়। ওয়ালমার্টের একজন ফ্লোর ক্লার্কও তার চেয়ে বেশি মজুরি পায়। আরো করুণ কাহিনী শোনাল আরেক তরুণ। সে কমপিউটার টেকনিশিয়ান হবে বলে একটি কোর্সে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এক সপ্তাহ না যেতেই মেট্যাগ কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠায়। তার চাকরি অস্থায়ী হলেও আইন অনুযায়ী পরে যখন সে কোর্সটি করবে তার জন্য মেট্যাগ অর্থ দিতে বাধ্য। কিন্তু সে যদি মেট্যাগের নির্দেশ অমান্য করে তবে সেই সুযোগ হারাবে। অন্য দিকে ভর্তির পর এক সপ্তাহ গেলেও সে যদি কোর্সটি ছেড়ে দেয়, তবে সরকার ধরে নেবে তার কোর্স করা হয়ে গেছে। ফলে আবার সে যখন কোর্সটি করবে তখন সরকারি বৃত্তি আর পাবে না।

গ্রুপটিকে আমি বললাম, আমার নির্বাচনী প্রচারে বিষয়টি আমি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরব। সেই সাথে গালিসবার্গের মতো শহরের সমস্যা নিয়ে আমার স্টাফদের দেয়া কিছু পরিকল্পনার কথাও জানালাম তাদের। এর মধ্যে ছিল– যেসব কোম্পানি বিদেশে প্লান্ট সরিয়ে নেবে তাদের কর মওকুফ সুবিধা প্রত্যাহার। শ্রমিকদের পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে ফেডারেল কর্মসূচি জোরদার এবং পর্যাপ্ত তহবিল জোগানো ইত্যাদি। আমি যখন ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি তখন টিম হুইলার নামে বিশাল বপুধারী এক ব্যক্তি এসে দাঁড়ায় আমার সামনে। তিনি পার্শ্ববর্তী বাটলার স্টিল প্লান্টের একজন শ্রমিক। সেখানকার শ্রমিকরা ইতোমধ্যে বিদায়ের নোটিশ পেয়ে গেছেন। বেকার বীমা সংগ্রহ করে চলছিলেন টিম। সামনের দিনগুলো কিভাবে কাটবে, তার মনে সেই ভাবনা। স্বাস্থ্যসেবা বীমা নিয়ে মোটেই ভাবছিলেন না তিনি।

www.pathagar.com

অনেকটা কাঁদো কাঁদো সুরে টিম বললেন, 'আমার ছেলের লিভার ট্রান্সপ্লান্ট প্রয়োজন। লিস্টে নাম লিখিয়ে ডোনারের জন্য অপেক্ষা করছি।' তিনি জানান, তার স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা ইতোমধ্যে নেয়া হয়ে গেছে। তাই মেডিকেইড দিয়ে ছেলের চিকিৎসার খরচ চলবে কি না, তা বোঝার চেষ্টা করছেন। কেউ তাকে স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারছেন না। টিম বললেন, 'ছেলের জন্য সব কিছু করব আমি। প্রয়োজন হলে ঋণ করবে...।' কান্নায় বুজে আসে তার গলা। পাশেই মাথা নিচু করে বসেছিলেন টিমের স্ত্রী। তার চোখ দিয়ে ঝরছিল অশ্রু। কোন মেডিকেইডে তার ছেলের চিকিৎসা হয়ে যাবে, এটা খুঁজে বের করব বলে আমি তাকে আশ্বস্ত করি।

শিকাগো ফেরার সময় গাড়িতে বসে ভাবছিলাম টিমের কথা : কাজ নেই, ঘরে অসুস্থ ছেলে, সঞ্চয় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত– এসব।

চল্লিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে প্রাইভেট জেটে উড়ে গেলে অজানা থেকে যায় এমন অনেক কাহিনী।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে মৌলিক রূপান্তর ঘটছে, সে ব্যাপারে ডান-বাম কারোরই কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতি, ফাইবার অপটিক, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট এবং পরিবহন ব্যবস্থা দেশ ও মহাদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বাধাগুলোকে ক্রমেই দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সর্বোচ্চ মুনাফার খোঁজে পুঁজি এখন চষে ফেলছে গোটা বিশ্ব। কয়েকটি বোতাম টিপলেই শত শত কোটি ডলার এক দেশ থেকে চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ভারত ও চীনে বাজারভিত্তিক অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ, বাণিজ্য বাধাগুলো নিচু পর্যায়ে নেমে আসা এবং ওয়ালমার্টের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তার, আমেরিকান কোম্পানি ও শ্রমিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে। অর্থনৈতিক বিশ্ব পুরোপুরি সমতল না হলেও প্রতিদিনই তা আরো বেশি সমতল হয়ে উঠছে।

আমেরিকান ভোক্তাদের জন্য সুযোগ এনেছিল বিশ্বায়ন। এর ফলে, একসময় বিলাসসামগ্রী হিসেবে বিবেচিত বিশাল স্ক্রিনের টিভি থেকে শুরু করে শীতকালের নাশপাতি পর্যন্ত জিনিসের দাম কমে আসে। স্বল্প আয়ের আমেরিকানদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয় তা। শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের লাভ বেড়ে যায়। আমেরিকান পণ্য ও সেবা বিক্রির জন্য সৃষ্টি হয় নতুন নতুন বাজার। বিশ্বায়নের কারণে চীন ও ভারতের মতো দেশগুলোর পক্ষেও দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়– যা দীর্ঘ মেয়াদে পৃথিবীকে আরো বেশি স্থিতিশীল করেছে।

পাশাপাশি কোটি কোটি সাধারণ আমেরিকানের অর্থনৈতিক অবস্থা অস্থিতিশীল করে দিয়েছে বিশ্বায়ন, সে কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিযোগিতামূলক করতে ও বিনিয়োগকারীদের সন্তুষ্ট রাখতে শিল্পকারখানা প্রযুক্তিসজ্জিত হয়েছে, কমিয়েছে জনবল, বাইরে থেকে কাজ করিয়ে আনছে বা কারখানাগুলো সরিয়ে নেয়া

www.pathagar.com

হচ্ছে বিদেশে। আমরা মজুরি বাড়িয়েছি কিন্তু বদলে ফেলেছি স্বাস্থ্যসেবা ও অবসর পরিকল্পনার সুবিধাগুলো– যা শ্রমিকদের অধিক ব্যয় ও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এর ফলে উত্থান ঘটেছে তথাকথিত 'বিজয়ীর সব সুবিধা' অর্থনীতির। যেখানে ঢেউয়ের ওপর সবার নৌকা ভেসে থাকার দরকার নেই। গত কয়েক দশকে অর্থনীতির শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি আমরা দেখেছি, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়েনি। উৎপাদনশীলতা বহু গুণ বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি আয়। করপোরেট মুনাফা স্ফীত হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকরা সেই মুনাফার ভাগিদার হয়নি। গুগলের মতো কোম্পানি বা এর বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমিকদের কাছে এই অর্থনীতির প্রভাব ততটা বড়ো নয়; কিন্তু মেট্যাগের শ্রমিকদের জন্য তা অত্যন্ত ভয়াবহ। এর ফলে নিম্ন আয়ের শ্রমিকের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে। অসুস্থ হলে যারা আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। অবসর বা সন্তানের পড়ার খরচের জন্য সঞ্চয়ের সামর্থও যারা হারিয়ে ফেলবে।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিশ্বায়নের প্রভাব দেখা দিলে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির একটি অংশ নতুন অর্থনীতিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়। তারা মুক্তবাণিজ্য ও আর্থিক শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যতে উচ্চ প্রযুক্তি ও উচ্চ বেতনের কাজের যোগ্য করে শ্রমিকদের গড়ে তুলতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কথা বলে। কিন্তু ডেভ বেভার্ডের মতো কুলীন শ্রমিকদের মতো দলের বড়ো একটি অংশই এর বিরোধিতা শুরু করে। তাদের যুক্তি ছিল বিশ্বায়ন কাজ করছে 'ওয়াল স্ট্রিট'-এর স্বার্থ হাসিলের জন্য। আমেরিকার ভালো বেতনের কাজগুলো রক্ষার মতো কিছু নেই এতে।

রিপাবলিকানরাও মুক্ত ছিল না এই টানাপড়েন থেকে। প্যাট বুকাননের 'আমেরিকা ফার্স্ট' তত্ত্বের অনুসারী একদল রক্ষণশীল দাঁড়িয়ে গেল বুশ প্রশাসনের মুক্তবাজার নীতির বিরুদ্ধে। ২০০০ সালের নির্বাচনী প্রচার এবং প্রথম মেয়াদের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট বুশ অর্থনীতিতে সরকারের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা রাখার প্রস্তাব দিলেন। বলা হলো, এটা 'সহনশীল রক্ষণশীলতা'। 'মেডিকেয়ার প্রেসক্রিপশন ড্রাগ প্লান' বা 'বাদ যাবে না একটি শিশু'র মতো শিক্ষাসংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করে হোয়াইট হাউস। এটাও অনেক রক্ষণশীলের মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

প্রেসিডেন্ট বুশের আমলে রিপাবলিকানদের অর্থনৈতিক এজেন্ডা ছিল কর রেয়াত, আইন শিথিল, সরকারি সেবা খাতের বেসরকারীকরণ– এসব। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা একে বলেন 'মালিকানাভিত্তিক সমাজ'। এর মূল বৈশিষ্ট্য আসলে ১৯৩০-এর দশক থেকে চলে আসা 'লেইসে ফেয়ার' অর্থনীতির মতোই থেকে গেছে। আয়, বিশালায়তন এস্টেট, পুঁজির মুনাফা বা ডিভিডেন্ডের ওপর কর ব্যাপকভাবে কমানো বা বিলোপের কথা বলা হয়েছে এখানে। এতে পুঁজি গঠন হবে, সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়বে, ফলে অর্থনীতির ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এই অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন, সরকারি বিধিনিষেধ বাজার বিকাশে বাধা। এরা বলেন, সরকারের কর্মসূচিগুলো অদক্ষ। এতে নির্ভরশীলতা বাড়ে। এতে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, উদ্যোগ ও পছন্দ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট রিগ্যানও ছিলেন 'লেইসে ফেয়ার' অর্থনীতির সমর্থক। তিনি বলতেন,

www.pathagar.com

'আমাদের সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান সরকার দিতে পারবে না; সরকার নিজেই একটি সমস্যা'।

বুশ প্রশাসন এই চেতনার অর্ধেক ধারণ করেছে মাত্র। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস কর কমানোর জন্য বারবার চাপ দিয়েছে। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য কঠোর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করে তারা। বুশ ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশেষ স্বার্থে বরাদ্দ বাজেটের ৬৪ শতাংশে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে কমিয়ে ফেলার বিরোধিতা করে ডেমোক্র্যাটরা। তার সামাজিক নিরাপত্তাকে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দ্ব্যর্থহীনভাবে। ফেডারেল বাজেট ঘাটতি ও জাতীয় ঋণের বোঝা বাড়তে থাকা যেন কোনো ব্যাপারই নয়– বুশ প্রশাসন এমনটা ভাবে কি না তাও পরিষ্কার নয়। তবে এই প্রশাসনের রেখে যাওয়া ঋণের লাল কালির দাগগুলো, ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও আমেরিকার সামাজিক নিরাপত্তা জাল বৃদ্ধি করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে– এটা কিন্তু পরিষ্কার।

এই বিপজ্জনক অচলাবস্থাকে বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করছি না আমি। কিছু না করে বিশ্বায়নকে তার পথে এগিয়ে যেতে দিলে এখনই হয়তো আমেরিকার অর্থনীতি ধসে পড়বে না। চীন ও ভারতের সম্মিলিত জিডিপি'র চেয়েও ওপরে থাকবে আমেরিকা। সফটওয়্যার ডিজাইন বা ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণার মতো আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক কোম্পানি এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মান পৃথিবীর সকলের উপরে।

কিন্তু তাই বলে কিছু না করে বসে থাকার অর্থ হলো, এখন আমরা যে আমেরিকা দেখতে পাচ্ছি তার চেয়ে ভিন্ন এক আমেরিকা সৃষ্টি হবে। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস হবে বর্তমানের চেয়ে ভিন্ন। সেখানে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণী ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে– ধনাঢ্য ও বিলাসবহুল এলাকা ও বাড়িতে তারা থাকবে, মন যা চাইবে পেয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। পাশাপাশি সৃষ্টি হবে নিম্ন আয়ের বিশাল আরেক জনগোষ্ঠী। যাদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা থাকবে না। কাজ করতে হবে দীর্ঘ সময়। আর চিকিৎসাসেবা, অবসরকালীন সুবিধা এবং সন্তানের শিক্ষার জন্য তাদের নির্ভর করতে হবে তহবিলস্বল্পতা ও অদক্ষতার ভারে নুয়ে পড়া সরকারি খাতের ওপর।

এর অর্থ এমন এক আমেরিকা যেখানে আমাদের সম্পদগুলো ক্রমাগতভাবে বন্ধক রাখা হচ্ছে বিদেশীদের কাছে। তেলের জন্য আমাদের মরিয়া হয়ে ওঠা পাগলামির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এটা এমন এক আমেরিকা হচ্ছে যেখানে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জনবল প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগ ক্রমাগত কমছে। উপেক্ষা করা হচ্ছে সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি। এটা এমন এক আমেরিকা যা রাজনৈতিকভাবে আরো বিভক্ত ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিক হতাশার বিস্তার ঘটছে এখানে এবং এতে পরস্পরের প্রতি আগ্রাসী হয়ে উঠছে মানুষ।

সবচেয়ে খারাপ খবরটি হলো, এটা এমন এক আমেরিকা হতে যাচ্ছে যেখানে তরুণদের জন্য খুব কম সুযোগ থাকবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঊর্ধ্বমুখী সচলতা

www.pathagar.com

দেশটিতে সম্ভাবনার যে সূচনা ঘটিয়েছিল, তা এখন নিম্নমুখী।

আমরা নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য এমন আমেরিকা চাই না। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার মতো মেধা ও সম্পদ আছে আমাদের। সেই ভবিষ্যৎ গড়ার পথে আমরা যে এগোতে পারছি না তার জন্য 'আইডিয়ার অভাব' দায়ী নয়, দায়ী জাতীয় অঙ্গীকারের অভাব। আমেরিকাকে আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়ার অভাব। বাজারব্যবস্থায় সরকারের কোন ভূমিকাটি সঠিক হবে, সে ব্যাপারে এক নতুন ঐকমত্যের অভাব।

এই ঐকমত্য তৈরির জন্য আমাদের তাকাতে হবে কিভাবে সময়ের প্রেক্ষাপটে এখানকার বাজারব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে। ক্যালভিন কোলিজ একবার বলেছিলেন, আমেরিকান জনগণের প্রধান কাজ হলো ব্যবসা। পৃথিবীতে বাজারব্যবস্থার প্রতি এত যৌক্তিক ও অনুকূল জায়গা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমাদের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানাকে স্থান দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা ব্যবস্থার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে। কঠোর পরিশ্রমের মূল্যবোধ লালন করে আমাদের ধর্ম। সমৃদ্ধ জীবনকে আমরা মনে করি বস্তুগত পুরস্কার। ধনীদের সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করতে প্রস্তুত নই বরং আমরা তাদেরকে তুলে ধরি 'রোল মডেল' হিসেবে। আমাদের রূপকথার বইগুলো সেসব মানুষের কাহিনীতে ভর্তি, যারা অভিবাসী হিসেবে খালি হাতে এসেছিল এই মহাদেশে। এরপর অর্জন করেছে বিশাল সৌভাগ্য। আমরা সেই সব তরুণের কথা বলি, যারা ভাগ্যের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিল পশ্চিমে। টেড টার্নারের বিখ্যাত উক্তি 'আমেরিকায় টাকা হলো– কিভাবে আয় করব তা নয়, কিভাবে হিসাব রাখব, তা।'

এই 'ব্যবসায় সংস্কৃতি'র ফল দাঁড়ায় এমন এক সমৃদ্ধি, যার দ্বিতীয় কোনো নজির মানবেতিহাসে নেই। আমেরিকানরা কতটা ভালো আছে তা বুঝতে হলে বিদেশে একটি সফরই যথেষ্ট। গরিব মানুষেরও মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের নিশ্চয়তা আছে আমাদের এখানে। পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কাছে যা এখনো দুর্লভ। আমাদের এই অর্থনৈতিক সাফল্যের অবদান কেবল এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো আমাদের সামাজিক সংগঠন ব্যবস্থা। এটা এমন এক ব্যবস্থা যেখানে উদ্ভাবন, ব্যক্তি উদ্যোগ ও সম্পদের কার্যকর বিনিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় সবসময়।

মুক্তবাজারের প্রতি আমেরিকানদের ঝোঁক একেবারে শুরু থেকেই। চাহিদা ও সরবরাহ তত্ত্ব এবং অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত' দিয়ে যেন স্বাভাবিকভাবেই মুক্তবাজারের প্রবাহ ঘটেছে এখানে। এর ফলে করারোপ, আইন, শুল্ক, শ্রমিক সুরক্ষা– যেকোনো নামেই সরকার বাজারব্যবস্থার গতিধারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাক না কেন, তা অবশ্যই ব্যক্তি উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করবে এবং থমকে দেবে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি। কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের দেউলিয়াত্বে এ ধারণাকেই বদ্ধমূল করে মাত্র। আমাদের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক পাঠ্যবই এবং আমাদের রাজনৈতিক বিতর্কে 'লেইসে ফেয়ার' হলো স্থির আইন। কেউ একে চ্যালেঞ্জ করার মানে, সে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে চাইছে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, আমাদের মুক্তবাজার অর্থনীতি কোনো প্রাকৃতিক আইন বা ঐশ্বরিক নির্দেশ নয়। পরীক্ষা ও ভুলে ভর্তি এক বেদনাদায়ক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর উন্মেষ ঘটেছে। দক্ষতা ও ন্যায্যতা, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের মতো কঠিন পছন্দ বেছে নেয়ার মধ্য দিয়ে একে যেতে হয়েছে। যদিও আমাদের মুক্তবাজার ব্যবস্থার সুফল প্রধানত আসে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অর্থনৈতিক উত্থান ও রূপান্তরের প্রতিটি সময়ে সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচনের প্রতিযোগিতা উৎসাহিত এবং বাজারকে আরো কার্যকর করতে আমরা নির্ভর করেছি সরকারের পদক্ষেপের ওপর ।

ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, সরকার এই পদক্ষেপ নেয় তিনভাবে। প্রথমত, আমাদের ইতিহাস জুড়ে দেখা যাবে অবকাঠামো নির্মাণ, জনবল প্রশিক্ষণসহ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিটি সরকার গড়ে দিয়েছে। জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের সবাই ব্যক্তিগত সম্পদ ও স্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্কটি স্বীকার করেছিলেন। পাশাপাশি, আলেক্সান্ডার হ্যামিল্টন উপলব্ধি করেছিলেন জাতীয় অর্থনীতির সম্ভাবনা কৃষির মধ্যে নেই; আছে বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের মধ্যে। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি যুক্তি দিলেন, আমেরিকার প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও কার্যকর জাতীয় সরকারের। আমেরিকার প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি নিজের চিন্তাধারা কাজে পরিণত করেছিলেন। তিনি বিপ্লবী যুদ্ধের ঋণ জাতীয়করণ করেন। এটি প্রতিটি রাজ্যের অর্থনীতিকেই কেবল এক সুতোয় গেঁথে দেয়নি। এর ফলে ঋণ দানের এক জাতীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে এবং পুঁজিবাজার স্ফীত হতে থাকে। আমেরিকার শিল্প খাতকে উৎসাহিত করতে শক্তিশালী প্যাটেন্ট আইন থেকে শুরু করে উচ্চ শুল্ক পর্যন্ত বিষয়গুলো তিনি রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। পাশাপাশি বাজারে পণ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য সড়ক, সেতু নির্মাণ খাতে বিনিয়োগের প্রস্তাব করেন।

হ্যামিল্টনের এই চিন্তাধারার তীব্র বিরোধিতা করেন টমাস জেফারসন। তিনি মনে করতেন, ধনাঢ্য বাণিজ্য স্বার্থের সাথে যুক্ত একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার তার ভূমির সাথে যুক্ত সমতাবাদী গণতন্ত্রের লক্ষ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু হ্যামিল্টন বুঝেছিলেন, স্থানীয় ভূমির স্বার্থ থেকে পুঁজিকে মুক্ত করতে পারলেই আমেরিকার জন্য সবচেয়ে ক্ষমতাবান সম্পদটি হাসিল করা সম্ভব। আর তা হলো, আমেরিকান জনগণের শক্তি ও উদ্যোগ। সামাজিক সচলতার এ ধারণা আমেরিকার প্রাথমিক পুঁজি গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে। শিল্প ও বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ ব্যাপক অস্থিতিশীলতার জন্ম দিতে পারত। কিন্তু এটা এমন এক গতিশীল ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যেখানে মেধা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে শীর্ষস্থানটি দখল করে নিতে পারে যে-কেউ। জেফারসনের বিশ্বাসের ভিত্তিও ছিল যোগ্যতার লালন; পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আভিজাত্যের তোষামোদি নয়। তাই তিনি নতুন জাতিকে শিক্ষিত করতে, এর মেধাগুলোকে প্রশিক্ষিত করতে সরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে তিনি এক মহান অর্জন বলে বিবেচনা করে গেছেন আজীবন।

www.amarboi.org

আমেরিকার অবকাঠামো এবং এর জনগণের পেছনে বিনিয়োগের এই ঐতিহ্য আব্রাহাম লিংকন এবং তখনকার রিপাবলিকানরা আগাগোড়া অনুসরণ করে গেছেন। লিংকনের মতে, আমেরিকার সৌরভ হচ্ছে সুযোগ এবং জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য 'অবাধ শ্রমের' সামর্থ্য। লিংকন মনে করতেন, এই সুযোগ সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উপায় হলো পুঁজিবাদ। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শিল্পভিত্তিক সমাজে উত্তরণ কিভাবে জীবনকে ব্যাহত করে, কমিউনিটিকে ধ্বংস করে– তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তাই গৃহযুদ্ধের মধ্যেই লিংকন এমন অনেক নীতি গ্রহণ করেন যা শুধু একটি সমন্বিত জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজই করেনি, পাশাপাশি সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটি পর্যন্ত বিস্তৃত করে সুযোগ-এর মইটি। তিনিই প্রথম আন্তঃমহাদেশীয় 'রেল রোড' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স। ১৯৬২ সালে তার উদ্যোগে পাস হয় ঐতিহাসিক 'হোমস্ট্যাড অ্যাক্ট'। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তীর্ণ সরকারি ভূমি ছেড়ে দেয়া হয় পূর্বাঞ্চল এবং সমগ্র বিশ্ব থেকে আসা বসতি স্থাপনকারীদের হাতে। দেশটির অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেও এই আইন বিশাল ভূমিকা রাখে। এই আইন করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে প্রতিষ্ঠা করেন 'ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ' ব্যবস্থা। এর ফলে কৃষকরা তাদের স্বপ্নগুলো খামারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার কথাও ভাবতে শেখে। জাতীয় সরকারের ক্ষমতা ও সম্পদ মুক্তবাজার অর্থনীতির পথে বাধা সৃষ্টি না করে বরং সহায়ক হবে– বিষয়টি হ্যামিলটন ও লিংকন দু'জনই বুঝেছিলেন। আমেরিকার উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের নীতিতে মাইলফলক হিসেবে এটি কাজ করে গেছে। হুভার ড্যাম, টেনেসি ভ্যালি অথরিটি, আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে ব্যবস্থা, ইন্টারনেট, হিউম্যান জেনম প্রজেক্ট– এ সব কিছুতেই ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেছে সরকারি বিনিয়োগ। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি স্কুল ও ইনস্টিটিউশন এবং জেনারেল ইস্যু বিলের মতো ব্যবস্থা কোটি কোটি ছাত্রের কলেজ শিক্ষার পথ সুগম করে। প্রযুক্তির অব্যাহত পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে জনগণকে চলতে সরকার সহায়তা দেয়।

প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ গঠনের পাশাপাশি বাজারের ব্যর্থতাগুলো সামাল দিতেও একটি কার্যকর জাতীয় সরকার ছিল অপরিহার্য। যেকোনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব ব্যর্থতা কাজের দক্ষতাকে বাধাগ্রস্ত করে। অথবা এর ফল দাঁড়ায় জনগণের জন্য ক্ষতিকর। রুজভেল্ট বুঝেছিলেন, প্রতিযোগিতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে একচেটিয়া ক্ষমতা। তাই তার প্রশাসনের মূল চেতনায় পরিণত হয় 'ট্রাস্ট-বাস্টিং'। অর্থবাজারে আতঙ্ক দূর এবং অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন

www.pathagar.com

উড্রো উইলসন। ফেডারেল ও রাজ্য সরকারগুলো প্রথমবারের মতো ভোক্তা আইন প্রণয়ন করে। আমেরিকাবাসীকে ক্ষতিকর পণ্য থেকে রক্ষার জন্য তৈরি করা হয় 'পিয়র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাক্ট', 'মিট ইন্সপেকশন অ্যাক্ট'– এসব আইন।

কিন্তু ১৯২৯ সালে শেয়ারবাজারে বিপর্যয় এবং এর পরবর্তী মন্দার মধ্য দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা যখন নষ্ট হওয়ার পথে, আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম, ভোক্তাচাহিদা ও বিনিয়োগ নিম্নমুখী, তখন ফ্রেডরিক রুজভেল্টের সরকার আরো অবনতি ঠেকানোর জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এর পরের আট বছর অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার 'নিউ ডিল' নীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। যদিও সরকারের হস্তক্ষেপ সব ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল দেয়নি, কিন্তু এর ফলে এমন এক নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়, যা অর্থনৈতিক সঙ্কটের ঝুঁকি কমিয়ে আনে। আর্থিক বাজারে স্বচ্ছতা আনতে গঠিত হয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। ব্যাংকে আমানতকারীদের আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স করপোরেশন (এফডিআইসি)। ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের বাজারে ফিরিয়ে এনে চাহিদা বাড়াতে নেয়া হয়– কর কমানো, তারল্য বৃদ্ধি বা সরাসরি সরকারি বিনিয়োগের মতো কাউন্টার সাইকেল ফিসকেল ও মনিটরিং পলিসি।

অবশেষে, সবচেয়ে বিতর্কিত আমেরিকার শ্রমিক ও ব্যবসার মধ্যে সামাজিক চুক্তির কাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে সরকার। আমেরিকার প্রথম দেড় শ' বছরে ট্রাস্ট ও সীমিত দায়ের করপোরেশনগুলোতে পুঁজি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ইউনিয়ন গঠন বা এ রকম কার্যক্রম থেকে তাদের বিরত রাখা হতো আইন দ্বারা বা সহিংস উপায়ে। অনিরাপদ বা অমানবিক পরিবেশে কাজ করা থেকে শ্রমিকদের রক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমেরিকার সংস্কৃতিতেও শ্রমিকদের জন্য খুব বেশি সহানুভূতি রাখা হয়নি। পুঁজিবাদের 'সৃজনশীল ধ্বংস'-তত্ত্বের শিকার হয়ে ক্রমাগত দারিদ্র্যের পথে তারা এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯৩০-এর দশকের শুরুতে 'মহামন্দা'র কবলে পড়ে আমেরিকার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকার হয়ে যায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের চরম সঙ্কট দেখা দেয়। এ সময় সমাজের এ ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হস্তক্ষেপ করতে হয় সরকারকে। মাত্র দুই বছর ক্ষমতায় থাকে ফ্রেডরিক রুজভেল্ট। এরই মাঝে ১৯৩৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাস করিয়ে নেয় কংগ্রেস। এক নতুন কল্যাণ রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই আইন। প্রবীণদের অর্ধেককেই টেনে তোলে দারিদ্র্যসীমার ওপরে। কর্মচ্যুতদের জন্য বেকারভাতার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক দরিদ্রদের চলার জন্য পরিমিত অঙ্কের অর্থ জোগান দেয়া হয়। রুজভেল্টের করা কিছু আইন পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক মৌলিকভাবে বদলে দেয়। সাপ্তাহিক ৪২ ঘণ্টা শ্রম, শিশুশ্রম আইন, ন্যূনতম মজুরি আইন, জাতীয় শ্রম আইন– এসবের ফলে ব্যাপকভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়ন

www.pathagar.com

সংগঠন গঠিত হয় এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে শ্রমিকদের সাথে দরকষাকষিতে বসতে বাধ্য হয় মালিকরা।

রুজভেল্টের এসব আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা অংশত এসেছিল 'কেনেসীয় অর্থনীতি'র ধারণা থেকে– 'অর্থনৈতিক মন্দার একটি নিরাময় হলো আমেরিকানদের পকেটে খরচ করার মতো অর্থ আরো বেশি করে ঢুকাও।' পাশাপাশি রুজভেল্ট এটাও বুঝেছিলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের জন্য জনগণের সম্মতিও প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সুফলের বড় অংশ শ্রমিকদের দিতে গিয়ে সরকার পরিচালিত 'কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম'-এর আবেদন ক্ষুণ্ন করে তার সংস্কার। ফলে অনেকেই তাকে ফ্যাসিস্ট, সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করছিল। ইউরোপজুড়ে এসব মতবাদের পক্ষে তখন জনসমর্থন ক্রমেই বাড়ছে।

গল্পের শেষ এখানেই নয়। রুজভেল্ট একটি অ্যাকটিভিস্ট ধরনের ফেডারেল সরকার গঠনের মাধ্যমে আসলে পুঁজিবাদকেই বাঁচিয়েছিলেন। এই সরকার তার জনগণ ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করে। নিয়ন্ত্রণ করে বাজার। ক্রমাগত বঞ্চনা থেকে রক্ষা করে শ্রমিককে। পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের মধ্যেই আমেরিকান কল্যাণ রাষ্ট্রের এই মডেল ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। ডানদের মধ্যে একদল বলত, এটা একধরনের নীরব সোশ্যালিজম। আরেক দল বলত, রুজভেল্ট তেমন কিছুই করেননি। কিন্তু আমেরিকার উৎপাদনধর্মী অর্থনীতির সুবিশাল প্রবৃদ্ধি এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উৎপাদনশীলতার সামর্থ্যে বিস্তর ফারাক– এসব আদর্শিক যোদ্ধাদেরকে নিশ্চুপ করে দেয়। তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই মার্কিন কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি ও প্রশাসনিক ব্যয়গুলো ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। পূর্ণ কর্মসংস্থানের ফলে ইউনিয়নবদ্ধ শ্রমিকরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়। মাত্র একটি আয় দিয়েই পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে তারা। তারা স্বাস্থ্য ও অবসর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। এই পরিবেশে বাড়তে থাকে করপোরেট মুনাফা, বাড়ে শ্রমিকের মজুরি। কর বৃদ্ধি করতে গিয়ে তেমন রাজনৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় না নীতিনির্ধারকদের। তারা তখন মনোযোগ দেয় সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলায় আরো আইন করার দিকে। যার ফলে জনসনের আমলে নেয়া হয় মেডিকেয়ার, মেডিকেইড ও ওয়েলফেয়ারের মতো 'গ্রেট সোসাইটি প্রোগ্রাম'। আর পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সি এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন গঠন করেন নিক্সন।

লিবারেলদের এই বিজয়ে একটি সমস্যা ছিল। পুঁজিবাদের অগ্রগতি এতে থমকে দাঁড়ায়। সত্তরের দশকের দিকে যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির ইঞ্জিন তথা উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি কমতে থাকে। ওপেকের ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বের ফলে বিদেশী তেল উৎপাদকরা দখল করে নেয় বিশ্ব অর্থনীতির একটা বড় অংশ। এ সময় আমেরিকার জ্বালানিপ্রাপ্তির সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। মার্কিন কোম্পানিগুলো এশিয়ার সস্তায় পণ্য উৎপাদকদের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। আশির দশক নাগাদ পোশাক থেকে শুরু করে অটমোবাইল– আমদানি করা সস্তা সব পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ছেয়ে যায়। ইতোমধ্যে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের কিছু কিছু উৎপাদন স্থাপনা বিদেশে সরিয়ে নিতে শুরু করে। এর উদ্দেশ্য কিছুটা বিদেশী বাজার দখল আর কিছুটা সস্তা শ্রমের সুবিধা পাওয়া।

অধিক প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক পরিবেশে পুরনো ধাঁচের সুষম মুনাফা ও গুরুগম্ভীর ব্যবস্থাপনার পুরনো করপোরেট ফর্মুলা আর কাজ করছে না। উচ্চমূল্যের পণ্য তৈরিতে অপারগতা অথবা ক্রেতার হাতে বাজে পণ্য গছিয়ে দেয়ার কারণে করপোরেট মুনাফা ও বাজারে তাদের অংশ কমতে থাকে। অন্য দিকে করপোরেট শেয়ার মালিকরা দাবি করেন অধিক মুনাফার। উদ্ভাবন ও অটোমেশনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পেছনে ব্যয় হয় কিছু করপোরেট তহবিল। অন্যরা যায় লে-অফের দিকে। অথবা তাদের উৎপাদন ক্ষেত্র সরিয়ে নেয় বিদেশে। কোনো না কোনোভাবে পুরনো ধাঁচের উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রমিকদের নিয়ে টিকে থাকা আমেরিকান কোম্পানিগুলো ক্রমেই ক্ষীণ ও বিলীয়মান হতে থাকে। আর রূপান্তরের এই আগুনে পুড়তে হয় গেলিসবার্গের মতো শহরগুলোকে।

কেবল বেসরকারি খাতকেই যে নতুন পরিবেশ গ্রহণ করতে হয়েছে তা কিন্তু নয়। এটা পরিষ্কার হয় রোন্যাল্ড রিগ্যানের নির্বাচনে। জনগণ সরকারেরও পরিবর্তন চাইছিল।

বিগত পঁচিশ বছরে যে কল্যাণ রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে কিছুটা বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করেন রিগ্যান। সুসময়ের চরম মুহূর্তেও ফেডারেল বাজেট ছিল পশ্চিম ইউরোপের সাথে মার্কিন অর্থনীতির তুলনায় অনেক কম। এমনকি প্রতিরক্ষা বাজেটের বিশাল অঙ্কটি এর সাথে যোগ করার পরও তা ছিল কম। রিগ্যানের নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও জোরদার হচ্ছিল রক্ষণশীল বিপ্লব। তিনি মনে করতেন, লিবারেল ওয়েলফেয়ার স্টেটটি অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত ও আমলানির্ভর হয়ে পড়েছে। তিনি ভাবতেন, ডেমোক্র্যাট নীতি নির্ধারকরা অর্থনৈতিক সুফলটিকে বাড়ানোর বদলে একে ভাগ করতেই বেশি ব্যস্ত। সে সময় প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত এমন বহু করপোরেট ম্যানেজার মূল্য জোগান দেয়া বন্ধ করে দেয়। ভোক্তা (সরকারি সেবা নিচ্ছেন যারা) এবং শেয়ারহোল্ডাররা (করদাতা জনগণ) তাদের টাকার মূল্য ফেরত পাচ্ছেন কি না সে সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করে দেয় সরকারি আমলারা।

বিজ্ঞাপনে যেমন প্রচার করা হতো তেমনভাবে কোনো সরকারি কর্মসূচিই কাজ করত না। অনেক কর্মসূচি ভালোভাবে কাজ করত বেসরকারি খাতে। যেমন কখনো কখনো বাজারভিত্তিক ইনসেনটিভ বা প্রণোদনাগুলো থেকে 'কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল' ধরনের নিয়ন্ত্রণের মতোই একই ফল পাওয়া যেত। রিগ্যান দায়িত্ব গ্রহণকালে সুদের যে উচ্চ প্রান্তিক হার ছিল তা কর্মক্ষেত্র বা বিনিয়োগে ইনসেনটিভ কমাতে পারেনি কিন্তু তা বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে বিকৃত করে দেয়। ফলে কর মওকুফের সুযোগ নিতে গড়ে উঠতে থাকে অপচয়মূলক শিল্প। যদিও ওয়েলফেয়ার কর্মসূচি বহু দরিদ্র আমেরিকানকে স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু এটা যখন নীতি ও পরিবারিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করে, তখন তা কিছুটা পথভ্রষ্ট ইনসেনটিভের জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের সাথে আপস করতে গিয়ে রিগ্যান সরকারের আকার ছোট করার মতো উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অনেক কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তবে তিনি পেরেছিলেন রাজনৈতিক বিতর্কটি মৌলিকভাবে বদলে দিতে। কর নিয়ে মধ্যবিত্তদের বিরোধিতা জাতীয় রাজনীতির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সরকারের আকার কতটা বড় হতে পারবে তারও একটা সীমা বেঁধে দেয়া হয়। অনেক রিপাবলিকানের কাছে বাজারে হস্তক্ষেপ না করা ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই অনড় বিষয়।

কিন্তু অর্থনীতির নিম্নগতি থেমে থাকেনি। ফলে অনেক ভোটার তাকিয়েছিল সরকারের দিকে। অর্থনীতিতে আরো আগ্রাসী ধরনের ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষা বিল ক্লিনটনকে হোয়াইট হাউজে যাওয়ার পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু তার স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়া এবং ১৯৯৪ সালে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের ক্ষমতা দখলের পর ক্লিনটনও তার আকাঙ্ক্ষার রাশ টানতে বাধ্য হন। এর পরও রিগ্যানের কিছু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করতে পেরেছিলেন তিনি। বড় সরকারের যুগ শেষ হয়েছে– এ কথা ঘোষণা করে 'ওয়েলফেয়ার রিফর্ম' বিলে স্বাক্ষর করেন ক্লিনটন। মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী দরিদ্রদের জন্য কর কমানো এবং আমলাতন্ত্র ও লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনার কাজ করেন তিনি। রিগ্যান কখনোই করেননি এমন কিছু কাজও করেন ক্লিনটন। দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং শিক্ষা খাতে নতুন করে মাঝারিগোছের বিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থিক খাতেও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন তিনি। তার সময় প্রশাসনে অনেকটাই ভারসাম্য ফিরে আসে। ছোট সরকারের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা জালের সফল বিস্তার ঘটাতে পেরেছিলেন তিনি।

পুঁজিবাদ ছাড়া ক্লিনটনের এই উদ্যোগ থাকতে পারত না। রিগ্যান এবং ক্লিনটন যদিও 'লিবারেল ওয়েলফেয়ার স্টেট'র কিছু সুবিধা ছাঁটাই করেছিলেন, কিন্তু তারা বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অন্তর্নিহিত বাস্তবতা বদলাতে পারেননি। কেবল শিল্প ক্ষেত্রেই নয়, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবা খাতের কর্মসংস্থানও বিদেশে চলে যেতে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে উচ্চ ব্যয়ের সাথে ব্যবসার লড়াই চলতে থাকে। রফতানির চেয়ে বেশি আমদানি, দেয়ার চেয়ে বেশি ঋণ নিতে থাকে আমেরিকা।

সুস্পষ্ট কোনো প্রশাসনিক দর্শন ছাড়াই প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার কংগ্রেস সহযোগীরা রক্ষণশীল বিপ্লবকে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে থাকেন। কর আরো কমিয়ে আনা, আরো স্বল্প আইন এবং অধিকতর খাটো নিরাপত্তা জাল। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে রিপাবলিকানরা ত্রিশের দশকের 'নিউ ডিল কর্মসূচি'র পক্ষেই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। আশির দশকে তারা এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। অন্য দিকে পুরনো যুক্তি নিয়েই ডেমোক্র্যাটরা এ যুদ্ধে লড়তে বাধ্য হচ্ছে।

আসলে শেষ পর্যন্ত কোনো কৌশলই কাজ করবে না। কেবল দাম কমিয়ে আর সরকার ছোট করে, চীন ও ভারতের সাথে লড়তে পারবে না আমেরিকা। এতে দেশটির জীবনমানের ব্যাপক অবনতি ঘটবে, বাড়বে গেলিসবার্গের মতো শহরের সংখ্যা, রাস্তায়

www.pathagar.com

দেখা যাবে ভিখারির লাইন। বিশ্বের সব কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত না করে কেবল বাণিজ্য বাধা সৃষ্টি ও নিম্ন মজুরি বাড়িয়ে এ প্রতিযোগিতায় টেকা যাবে না। ইতিহাস বলে, অর্থনীতির মহাগোলযোগের মধ্যেও আমরা অধিকতর শক্তিশালী হিসেবে আবির্ভূত হতে পারি। পূর্বসূরিদের মতো আমরাও নিজেদের জিজ্ঞেস করতে পারি– কোন কোন নীতির অনুসরণ একটি গতিশীল মুক্তবাজার, সুবিস্তৃত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, উদ্ভাবনধর্মী উদ্যোগ ও ঊর্ধ্বমুখী সচলতার পথে আমাদের নিয়ে যাবে। আমরা আগাগোড়া লিংকনের 'সিম্পল ম্যাক্সিমাম' দ্বারা পরিচালিত হবো কি না তা-ও ভাবতে পারি। আর সেটা হলো, আমরা আমাদের সরকারের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কেবল সেসব কাজই করব, ব্যক্তিগত এবং বেসরকারিভাবে যেগুলো করা যাবে না। অন্য কথায়, যে কাজ করে তার মাধ্যমেই আমরা পরিচালিত হবো ।

একটি নতুন অর্থনীতির ঐকমত্য কেমন হবে? এর উত্তর দেয়ার মতো ধৃষ্টতা আমি দেখাব না। আমেরিকান অর্থনৈতিক নীতির বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বহুসংখ্যক মোটা বই হয়ে যাবে। আমি কেবল দেখাতে চাই, কোন কোন জায়গায় আমরা বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থাকে ভাঙতে পারি। হ্যামিলটন ও লিংকনের পথ ধরে কোথায় আমরা অবকাঠামো ও জনগণের পেছনে বিনিয়োগ করতে পারি। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্রেডরিক রুজভেল্টের দেখানো পথে কিভাবে আমরা আধুনিক ও সামাজিক যোগাযোগটি পুনর্গঠিত করতে পারি।

বিশ্ব অর্থনীতিতে আমেরিকাকে অধিক প্রতিযোগিতাপূর্ণ করে তুলবে– এমন বিনিয়োগের কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যায়। বিনিয়োগের এই খাতগুলো হলো– শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জ্বালানির স্বনির্ভরতা।

ইতিহাসজুড়ে দেখা যায়, জনগণের সাথে এ জাতির চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেই শিক্ষা– তুমি যদি দায়িত্ব নাও আর কঠোর পরিশ্রম করো তবে উন্নত জীবনের সুযোগ পেতে পারো তুমিও। এটা এমন এক বিশ্ব, যেখানে শ্রমের বাজারে তোমার মূল্য নির্ধারিত হবে তোমার জ্ঞান দিয়ে। এখানে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি শিশুকে শুধু বোস্টনের আরেকটি শিশুর সাথে প্রতিযোগিতা করলেই চলবে না, তাকে প্রতিযোগিতা করতে হবে ব্যাঙ্গালোর বা বেইজিংয়ের শিশুর সাথেও। এখনকার বেশিরভাগ আমেরিকান স্কুল চেতনার এই অবস্থানটি ধরে রাখতে পারছে না।

২০০৫ সালে আমি শিকাগোর কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত দক্ষিণ উপকণ্ঠে থর্নটন উপশহরের একটি হাই স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। এ উপলক্ষে টাউন হলে ছাত্র-শিক্ষকদের এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রত্যেক ক্লাস প্রতিনিধিরা ঠিক করে তাদের ক্লাসের ছাত্ররা কি কি বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে বা বলার আছে। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে আমার স্টাফরা এক সপ্তাহ শিক্ষকদের সাথে কাজ করে। আলোচনাকালে ছাত্ররা স্কুলে সহিংসতা ও ক্লাসরুমে কম্পিউটার স্বল্পতার কথা জানায়। কিন্তু তাদের এক নম্বর

www.pathagar.com

সমস্যাটি ছিল, কর্তৃপক্ষ যেহেতু শিক্ষকদের পূর্ণদিবস কাজের বেতন দিতে পারে না, তাই থর্নটনের স্কুলগুলো দেড়টার মধ্যেই ছুটি হয়ে যায়। সংক্ষিপ্ত স্কুল রুটিনে বিজ্ঞান গবেষণাগার বা বিদেশী ভাষা শেখার মতো কোনো ক্লাস রাখা হয়নি। এভাবে ছাত্ররা কলেজ পর্যন্ত যেতে পারবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে তারা। তারা আরো দীর্ঘ সময় স্কুলে কাটাতে চায়।

এটা আমেরিকার সাধারণ একটি চিত্র। দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিন ছেলেমেয়েরা এমন সব স্কুলে লেখাপড়া করছে, যেগুলো তাদের তথ্যযুগ তো দূরের কথা, পুরনো শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির উপযোগী করেও গড়ে তুলতে পারছে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই সমস্যা কেবল উপশহরগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকায় 'হাইস্কুল ড্রপআউট' সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ওপরের ক্লাসগুলোতে আমেরিকান ছাত্ররা বিদেশী বংশোদ্ভূতদের তুলনায় গণিত ও বিজ্ঞান পরীক্ষায় খারাপ করছে। টিনএজারদের অর্ধেকেরই কোনো ধারণা নেই মৌলিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে। নয় বছর বয়সী শিশুদের অর্ধেকই পারে না সাধারণ গুণ-ভাগ করতে। কলেজগুলোতে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও তাদের মধ্যে মাত্র ২২ শতাংশ কলেজ পর্যায়ে ইংলিশ, গণিত ও বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে ইচ্ছুক।

সরকারের একার পক্ষে এই পরিসংখ্যান বদলানো সম্ভব বলে মনে করি না আমি। কঠোর পরিশ্রম ও শিক্ষার্জনের চেতনা শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব বাবা-মায়ের। আবার শিশুদের শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সরকার পুরোপুরি অংশীদার হবে, এমন আশাও করবে জনগণ।

দুঃখজনক হলো গুগলে চাকরির প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার মতো করে থর্নটনের শিশুদের গড়তে আমাদের স্কুলগুলোতে যে সৃজনশীল ও সাহসী সংস্কার প্রয়োজন, সরকার তা নিচ্ছে না। এটা অংশত হয়েছে তথাকথিত আদর্শিক যুদ্ধের কারণে। অনেক কনজারভেটিভ বলেন, শিক্ষাগত অর্জন বাড়ানোর জন্য অর্থ কোনো সমস্যা নয়। সরকারি স্কুলগুলোর সমস্যার জন্য দুর্ভাগা আমলা ও আপসহীন শিক্ষক ইউনিয়নগুলোকে দায়ী করা হয়। এর একমাত্র সমাধান, শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান। আবার আরেক দল মনে করে, অধিক ব্যয়ই কেবল পারে শিক্ষার মান উন্নত করতে।

দু'টি ধারণাই ভুল। অর্থ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা না হলে উপশহরে বসবাস করতে গিয়ে স্কুলের জন্য বাবা-মা কেন বেশি টাকা খরচ করবেন? শহর ও গ্রাম এলাকার বহু স্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, পুরনো দিনের বই, অপর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ এবং পর্যাপ্ত বেতন পর্যন্ত পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। কিন্তু সরকারি স্কুলগুলো যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে কিভাবে এগুলোকে পর্যাপ্ত তহবিল দেয়া যায়, সেটাও একটি সমস্যা।

তাই ছাত্রদের সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয় এমন সব সংস্কার চিহ্নিত করতে হবে আমাদের। দিতে হবে পর্যাপ্ত তহবিল এবং ফলদায়ক নয় এমন কর্মসূচিগুলো

www.pathagar.com

বাতিল করতে হবে। সংস্কার যে সুফল বয়ে আনে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। গণিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অধিক জোর দেয়া প্রয়োজন। পাঠ্যসূচি, বিনা বেতনের স্কুলের সময় ও দিন বাড়ানো, আরো কম বয়স থেকে শিশুদের শিক্ষাদান শুরু করা, ছাত্ররা কেমন করছে সে সম্পর্কে অর্থবহ ও ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন এবং কার্যকর ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক শ্রেণিশিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে পারে।

আলাদাভাবে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষকের বিষয়টি। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, কোনো ছাত্রের অর্জন নির্ধারণে তার 'গাত্রবর্ণ' কোনো বিষয় নয়। বিষয়টি হলো তার শিক্ষক। অথচ অনভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে আমাদের বেশিরভাগ স্কুল চলছে। যে বিষয়ে তিনি পড়ান সে বিষয়ে তার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। দিন দিন এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটছে। স্কুলে ছাত্র বাড়ছে। পাশাপাশি প্রতি বছর অভিজ্ঞ শিক্ষকরা চলে যাচ্ছেন অবসরে। স্কুলগুলোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আগামী এক দশকে অন্তত ২০ লাখ শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

শিক্ষা পেশায় কারো আগ্রহ নেই এমন নয়। দেশের সবচেয়ে উঁচুমানের সরকারি স্কুলগুলোতে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে এমন অনেক সদ্য গ্র্যাজুয়েট তরুণকে আমি জানি। তাদের সৃজনশীলতা ও উৎসাহে শিশুরা উপকৃত হয়। কিন্তু দু'বছর পরই তাদের পেশা বদলে ফেলতে দেখা যায়। অথবা দেখা যায়, তারা উপশহরের স্কুলগুলোতে চলে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী সরকারি স্কুলগুলোর নিম্ন বেতন, আমলাদের কাছ থেকে সহায়তার অভাব এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ।

একবিংশ শতকের স্কুলব্যবস্থা চাইলে শিক্ষকদের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের। ব্যয়বহুল অতিরিক্ত 'কোর্স ওয়ার্ক' এড়ানোর জন্য 'সার্টিফিকেশন' প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে শিক্ষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় পড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে, যেন পুরনোরা বিচ্ছিন্নতাবোধ না করেন। শ্রেণিকক্ষের নিয়ন্ত্রণ আরো অধিক মাত্রায় ছেড়ে দিতে হবে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের হাতে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন দিতে হবে। একজন অভিজ্ঞ, সুযোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক পেশা জীবনের শীর্ষে থাকাকালে বছরে তার ১ লাখ ডলার আয় না করার কোনো কারণ নেই। গণিত ও বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ এবং যারা শহরের মতো সমস্যাবহুল জায়গার স্কুলে পড়াতে চান তাদের আরো বেশি বেতন দিতে হবে।

এটা একটা দিক মাত্র। অর্থের সাথে শিক্ষকদের পারফরম্যান্সকে যুক্ত করতে হবে। অকার্যকর শিক্ষক থেকে মুক্তি পেতে স্কুল ডিস্ট্রিক্টগুলোর যোগ্যতা আরো বাড়াতে হবে। পারফরম্যান্সভিত্তিক বেতনের ধারণার বিরোধিতা করে শিক্ষক ইউনিয়ন। তাদের যুক্তি, এটা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। স্কুল ডিস্ট্রিক্টগুলো শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কেবল তাদের পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে। এই পরীক্ষার ফল হয়তো– ক্লাসে নিম্ন আয় বা বিশেষ প্রয়োজনের উপযুক্ত শিশুর সংখ্যার মতো নিয়ন্ত্রণহীন অনেক কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল। তাই শিক্ষক ইউনিয়নের যুক্তিতেও সত্যতা আছে।

www.pathagar.com

কিন্তু এটা সমাধানের অযোগ্য কোনো সমস্যা নয়। শিক্ষক ইউনিয়ন সাথে নিয়েই রাজ্য ও স্কুল জেলাগুলো পারফরম্যান্স নিরূপণের ভালো মাপকাঠি তৈরি করতে পারে। লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে তৈরি হবে এ মাপকাঠি। শিখতে চায় এমন ছাত্ররা যাতে অযোগ্য শিক্ষকদের হাতে বন্দী হয়ে না থাকে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

স্কুলগুলোকে সচল কার্যকর করতে যাওয়ার আগে, প্রতিটি শিশু শিখতে পারবে সেই বিশ্বাসটিও নতুনভাবে জন্মাতে হবে আমাদের মনে। সম্প্রতি শিকাগোর পশ্চিম উপকণ্ঠে ডজ ইলিমেন্টারি স্কুলটি পরিদর্শনে যাই আমি। একসময় সব ক্ষেত্রে নিচু অবস্থানে ছিল এই স্কুল। কিন্তু এখন এটি মাঝারি মানের স্কুলে পরিণত হয়েছে। স্কুলের সমস্যা নিয়ে আমি কথা বলি শিক্ষকদের সাথে। একজন তরুণী শিক্ষিকা বললেন, তারা 'দিজ কিড্‌স সিনড্রোমে' ভুগছেন। শিক্ষিকার মতে, এসব 'শিশু' কেন শিখতে পারছে না তার পক্ষে সমাজ হাজারো যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে। 'এসব শিশু কঠিন পরিবেশ থেকে এসেছে' অথবা 'এসব শিশুর মেধা' অনেক কম– এসব বলা হচ্ছে। সেই শিক্ষিকাই আবার বললেন, অথচ তারা 'এসব শিশু' নয়। তারা 'আমাদের শিশু'।

শিশুদের প্রতি এই অবহেলার মনোভাব কতটা দ্রুত আমরা বদলাতে পারব, আগামী দিনে আমেরিকান অর্থনীতির সাফল্য তারই ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষা খাতে আমাদের বিনিয়োগ কেবল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দশটি কাজের মধ্যে নয়টিতেই যেখানে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োজন, সেখানে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জায়গাগুলো পূরণের জন্য শ্রমিকদের কিছু উচ্চশিক্ষাও দিতে হবে। শিল্পযুগের প্রয়োজন পূরণের জন্য বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে আমাদের সরকার যেমন হাইস্কুল পর্যন্ত শিক্ষা বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক করেছিল, তেমনিভাবে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার সাথে শ্রমিকরা যাতে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সে জন্যও সরকারকে সাহায্য করতে হবে।

এ কাজটি এক শ' বছর আগের চেয়ে এখনকার নীতিনির্ধারকদের জন্য অনেক বেশি সহজ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি কলেজগুলো আরো অনেক শিক্ষার্থী গ্রহণের মতো যথেষ্ট সুসজ্জিত। উচ্চশিক্ষার মূল্য সম্পর্কে আমেরিকানদের নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই। প্রতিটি দশকে ব্যাচেলর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। ১৯৮০ সালে এটা যেখানে ১৬ শতাংশের মতো ছিল, এখন তা প্রায় ৩৩ শতাংশ।

আমেরিকানদের এখন যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রয়োজন তা হলো, কলেজের ঊর্ধ্বমুখী খরচ সামাল দেয়া। আমি ও মিশেল দু'জনই এ পরিস্থিতির সাথে পরিচিত। বিয়ের পর প্রথম দশ বছর দু'জনের আয় দিয়েও আমাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও ল' স্কুলে পড়ার খরচের ঋণ পরিশোধ করা যাচ্ছিল না। গত পাঁচ বছর সরকারি কলেজগুলোতে চার বছরের কোর্সের টিউশন এবং ফি মিলিয়ে সাড়ে ৪০ শতাংশ

www.pathagar.com

বেড়েছে। এই খরচ মেটাতে গিয়ে ছাত্ররা এ যাবৎকালের সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাই অনেক তরুণই আর শিক্ষকতার মতো কম লোভনীয় পেশা বেছে নিতে আগ্রহী হয় না। খরচ কিভাবে মেটাবে তা বুঝতে না পেরে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না কলেজে।

উচ্চশিক্ষার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও ভর্তি সহজতর করতে বেশ কিছু ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন বছর বছর টিউশন ফি না বাড়ায়, রাজ্য সেদিকে লক্ষ রাখতে পারে। পরিবর্তনশীল অর্থনীতির উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির জন্য অনিয়মিত শিক্ষা, কারিগরি স্কুল ও অনলাইন কোর্সগুলো ব্যয়সাশ্রয়ী হতে পারে। নতুন স্টেডিয়াম তৈরির জন্য তহবিল সংগ্রহের পেছনে না ছুটে কাজটি যেন শিক্ষামানের উন্নয়নের জন্য করা হয়, সে জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে হবে ছাত্রদের।

পাশাপাশি, অনুদান, স্বল্প সুদে ঋণ, করমুক্ত শিক্ষা সঞ্চয় অথবা পুরোপুরি করবিহীন টিউশন ও অন্যান্য ফি ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক ছাত্রছাত্রী ও তাদের পিতা-মাতাকে কলেজের ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সরাসরি সাহায্য করতে হবে। এখন পর্যন্ত এর উল্টো দিকেই চলছে কংগ্রেস। কেন্দ্র অনুমোদিত ছাত্রঋণের ওপর কর বাড়ানো এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে লড়াইরত নিম্ন আয়ের ছাত্রদের অনুদান না বাড়ানোর মতো নীতির কোনো যৌক্তিকতা নেই।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি দিক নজর কাড়বে। যাকে বলা যায়, প্রতিযোগিতামূলক আমেরিকার হৃদয়। লিংকনের 'মরিল অ্যাক্ট' স্বাক্ষর ও 'ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, এ জাতির প্রাথমিক গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রতিভাগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আর এর জন্য রাসায়নিক ল্যাব থেকে শুরু করে 'পার্টিক্যাল এক্সিলেটর' পর্যন্ত সব কিছু জোগান দিয়ে গেছে ফেডারেল সরকার। তাৎক্ষণিক শিল্পোৎপাদনে তা হয়তো কাজে লাগবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে বিশাল কোনো অর্জনের জন্য কাজে লাগবে– এমন গবেষণাকাজেও অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করা হয়নি।

এখানেও আমাদের নীতি চলছে ভুল পথে। ২০০৬ সালে নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার কথা হয় এমআইটি'র রসায়ন প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. রবার্ট ল্যাঙ্গারের সাথে। এই মানুষটি শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধু একটি রত্নই নন, পাঁচ শতাধিক প্যাটেন্টেরও মালিক তিনি। ধূমপানের ক্ষতি থেকে শুরু করে ব্রেন ক্যান্সার পর্যন্ত বিস্তৃত তার গবেষণার বিষয়বস্তু। শোভাযাত্রা শুরুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আমি তার বর্তমান কাজ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ওষুধ যাতে আরো ভালোভাবে শরীরে কাজ করতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করছিলেন ড. ল্যাঙ্গার। স্টেমসেল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের কথা মনে হওয়ায় আমি জানতে চাইলাম, বুশ প্রশাসন 'স্টেমসেল' গবেষণা যেভাবে সীমিত করে দিচ্ছে তাতে তার গবেষণা বাধাগ্রস্ত হবে কি না।

www.pathagar.com

ড. ল্যাঙ্গার বললেন, অবশ্যই। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, এ খাতে কেন্দ্রের অনুদান ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়া। তিনি বললেন, পনেরো বছর আগেও গবেষণা প্রস্তাবগুলোর ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কেন্দ্রের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পেত। সেটা এখন ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। এর অর্থ বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এখন গবেষণার জন্য কম সময় পাচ্ছেন। তাদের বেশি সময় দিতে হচ্ছে তহবিল সংগ্রহের কাজে। এভাবে প্রতি বছর গবেষণার নতুন অনেক সড়ক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গবেষণায় এখন তেমন কেউ আর যেতে চাচ্ছে না।

ড. ল্যাঙ্গারের বক্তব্যে পুরো চিত্রটি আসেনি। প্রতি মাসে অনেক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী আমার অফিসে আসেন। মৌলিক গবেষণায় তহবিল জোগান দিতে ফেডারেল সরকারের প্রতিশ্রুতি কিভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছে তা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। অন্য দেশগুলো যেখানে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে, সেখানে বিগত তিন দশকে জিডিপি'র অনুপাতে আমেরিকার এই বরাদ্দ কেবল কমেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে আমাদের তরুণ সমাজের ওপর। প্রতি বছর চীনে কেন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে আট গুণ বেশি ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে– তার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়।

প্রতি বছর অনেক গুগলের জন্ম দেবে এমন সৃজনশীল একটি অর্থনীতি চাইলে ভবিষ্যৎ প্রতিভাগুলোর পেছনে বিনিয়োগ করতে হবে আমাদের। আগামী পাঁচ বছর মৌলিক গবেষণা খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করতে হবে। আগামী চার বছরের মধ্যে অতিরিক্ত ১ লাখ প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দেশের সম্ভাবনাময় তরুণরা যেন জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই গবেষণা শুরু করতে পারে, সে জন্য নতুন অনুদান জোগান দিতে হবে। হিসাব করলে আগামী পাঁচ বছরে এই ব্যয় মোটামুটি ৪ হাজার ২০০ কোটি ডলারের মতো দাঁড়ায়। সত্যি কথা বলতে, এই অঙ্ক সাম্প্রতিক ফেডারেল হাইওয়ে বিলের ১৫ শতাংশ মাত্র।

অন্য কথায়, যা করা প্রয়োজন আমরা তা অনায়াসে করতে পারি। টাকার অভাব এখানে নেই। জরুরি বিষয়টি উপলব্ধির মতো জাতীয় চেতনার অভাব রয়েছে এখানে।

সর্বশেষ আমেরিকাকে প্রতিযোগিতামূলক করতে যে গুরুত্বপূর্ণ খাতে আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে তা হলো জ্বালানি অবকাঠামো। আমাদের দুর্বলতাগুলো অতীতে সব সময় শিক্ষা ও বিজ্ঞানে বড় ধরনের বিনিয়োগের জন্য আমাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও আমরা দেখেছি, রাশিয়া স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর আমরা ভাবলাম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তারা এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করে দিলেন। ফলে জন্ম নিলো বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটানোর উপযুক্ত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের একটি প্রজন্ম। একই বছর গঠিত হলো ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিচার্স প্রজেক্ট এজেন্সি। এভাবে শত শত কোটি ডলার ব্যয় হলো মৌলিক

www.pathagar.com

গবেষণার পেছনে। ফলে আবিষ্কৃত হলো ইন্টারনেট, বার কোড, কম্পিউটার, এইডেড ডিজাইনের মতো প্রযুক্তি। ১৯৬১ সালে অ্যাপোলো মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা করলেন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি। এটা বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তে পা বাড়াতে তরুণ প্রজন্মকে আরো বেশি উৎসাহিত করে।

বর্তমান পরিস্থিতির দাবি, জ্বালানির ক্ষেত্রেও একই মনোভাব গ্রহণ করব আমরা। তেলের প্রতি আগ্রহ আমাদের ভবিষ্যৎ কতটা অনিশ্চিত করেছে, তা বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। জ্বালানি নীতি বিষয়ক জাতীয় কমিশনের মতে, আমাদের জ্বালানি নীতিতে কোনো পরিবর্তন না এলেও আগামী ২০ বছরে তেলের চাহিদা ৪০ শতাংশ বাড়বে। একই সময় বিশ্বব্যাপী চাহিদা বাড়বে ৩০ শতাংশের মতো। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পসামর্থ্য যেভাবে বাড়ছে, তাতে একই সময় তাদের রাস্তায় আরো ১৪ কোটি গাড়ি যোগ হবে। তেলের প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা কেবল অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, নিরাপত্তাকেও দুর্বল করে দেবে। প্রতিদিন বিদেশ থেকে তেল কিনতে আমরা যে ৮০ কোটি ডলার ব্যয় করি তা সৌদি আরব, নাইজেরিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং পরোক্ষভাবে ইরানের মতো বিশ্বের সবচেয়ে অস্থিতিশীল সরকারগুলোর হাতে যায়। কে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে, আর কোন্ দেশ সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য– এটা না ভাবলেও আমাদের টাকা তাদের হাতে যাচ্ছে। কারণ তাদের তেল আমাদের প্রয়োজন।

খারাপ দিকটি হলো, সরবরাহে কোনো বিপর্যয় ঘটলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। পারস্য উপসাগরীয় এলাকার তেল শোধনাগারগুলোতে হামলার হুমকি দিয়ে আসছে আল কায়েদা। সৌদি আরবের বড় কোনো তেল স্থাপনায় একটি সফল হামলাই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে কাহিল করে দিতে পারে। ওসামা বিন লাদেন তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, 'ইরাক ও পারস্য উপসাগরে তেল স্থাপনার ওপর হামলার দিকে মনোযোগ দাও। এটাই তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

আমাদের জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানির পরিবেশগত বিরূপ ফলও রয়েছে। হোয়াইট হাউসের বাইরের প্রতিটি বিজ্ঞানী মনে করেন, আবহাওয়ার পরিবর্তন বাস্তবিক, গুরুতর এবং কার্বনডাই অক্সাইডের ক্রমাগত নিঃসরণে এর আরো অবনতি ঘটছে। আইস ক্যাপ গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার ধরন বদলে যাওয়া, আরো ভয়ঙ্কর টর্নেডোর আবির্ভাব, সীমাহীন ধূলিঝড়, বনাঞ্চল কমে যাওয়া, কোরাল রিফের মৃত্যু এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ ও পতঙ্গবাহী ব্যাধি বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি যদি গুরুতর হুমকি বলে বিবেচিত না হয়, তবে কোনটা বিবেচিত হবে তা আমি জানি না।

এখন পর্যন্ত বুশ প্রশাসনের জ্বালানি নীতি হলো বড় তেল কোম্পানিগুলোকে ভর্তুকি দেয়া এবং তেল অনুসন্ধানের পেছনে বিনিয়োগ। বিকল্প জ্বালানি উন্নয়নে বিনিয়োগ হচ্ছে নামমাত্র। এটা বুদ্ধিমানের হতো, যদি আমেরিকায় তেল সরবরাহের অফুরন্ত উৎস থাকত। কিন্তু তা নেই। পৃথিবীর মাত্র ৩ শতাংশ তেলের মজুদ আছে আমেরিকায়। অন্য দিকে আমরা বিশ্বের ২৫ ভাগ তেল ব্যবহার করছি। এভাবে আমরা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না।

www.pathagar.com

একবিংশ শতাব্দীতে আমরা নবায়নযোগ্য, আরো কম দূষণযুক্ত জ্বালানি উৎস সৃষ্টি করতে পারি। তেল কোম্পানিগুলো এখন যে কর মওকুফ সুবিধা ভোগ করছে তার প্রত্যেকটি রদ করতে হবে। তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফার ১ শতাংশ– যা মাসে ২ শ কোটি ডলারের মতো– তা যেন বিকল্প জ্বালানি গবেষণা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে ব্যয় করা হয়– এ দাবি করতে হবে। এই প্রকল্প কেবল আমাদের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও পরিবেশগত সফলতাই বয়ে আনবে না, এটা নতুন প্রজন্মের আমেরিকান বিজ্ঞানী ও গবেষক জন্ম দিতে পারে। এটা হতে পারে, রফতানিমুখী শিল্প ও উচ্চ বেতনের চাকরির নতুন উৎস।

ব্রাজিল এ কাজটি করছে ৩০ বছর ধরে। দেশটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী বায়োফুয়েল শিল্প গড়ে তুলতে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সরাসরি সরকারি বিনিয়োগও করেছে। দেশটির ৭০ শতাংশ নতুন গাড়ি এখন গ্যাসোলিনের বদলে ইথানলে চলে। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ইথানল শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করেছে সরকারের কোনো রকম মনোযোগ ছাড়াই। মুক্তবাজার অর্থনীতির তত্ত্ব বলে, ব্রাজিল সরকারের মতো কঠোরহস্ত-নীতির সুযোগ যুক্তরাষ্ট্রে নেই। কিন্তু নমনীয়তা এবং বাজার শক্তিগুলোর স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় রেখে আইন করা হলে তা জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ ব্যাপকভাবে নিয়ে আসতে পারে।

জ্বালানি সাশ্রয়ের মানের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। গত দুই দশকে গ্যাস যখন সস্তা ছিল, তখন এ মান কি আমরা বাড়াতে পেরেছি? আমেরিকান অটোমোবাইল কোম্পানিগুলোকে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারকারী স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যালের বদলে নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী মডেলের গাড়ি নির্মাণে বিনিয়োগ করা উচিত ছিল। গ্যাসের বাড়তি মূল্যের বিপরীতে উচিত ছিল গাড়িগুলো প্রতিযোগিতামূলক করা। তার বদলে আমরা দেখছি, জাপানি প্রতিযোগীরা এসে ডেট্রয়েটকে ঘিরে ফেলেছে। টয়োটার মতো কোম্পানি আমেরিকান গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলোকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিচ্ছে। এমনকি চীনও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয় মান অর্জন করতে পেরেছে।

গাড়ি শিল্পের ভবিষ্যৎ হলো জ্বালানি সাশ্রয় এবং ইথানলের মতো বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার। আমরা যদি এখনই এ ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারি, তবেই আমেরিকান কোম্পানিগুলোর ভবিষ্যৎ কিছুটা উজ্জ্বল হতে পারে। নতুন করে কারখানা সাজানোর খরচের দোহাই দিয়ে আমেরিকান গাড়ি নির্মাতা ও শ্রমিক ইউনিয়ন বছরের পর বছর উচ্চ জ্বালানি সাশ্রয় মানের বিরোধিতা করে আসছে। ইতোমধ্যে ডেট্রয়েট বিপুল অঙ্কের অবসরকালীন স্বাস্থ্যসেবা খরচ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে পড়েছে। তাই সিনেটে নির্বাচিত হওয়ার প্রথম বছরে আমি গাড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারে একটি বিল আনি। এটা ছিল আমেরিকান গাড়ি নির্মাতাদের সাথে একটি চুক্তির মতো। এতে বলা হয়, অবসরে যাওয়া গাড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা খরচ ফেডারেল সরকার বহন করবে। তার বদলে কোম্পানিগুলো এ খাতের অর্থ ব্যয় করবে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী গাড়ি তৈরির পেছনে।

www.pathagar.com

বিকল্প জ্বালানি উৎসের পেছনে বিপুল বিনিয়োগ হলে হাজার হাজার নতুন কর্মসংস্থান হবে। ফলে ১০ বা ২০ বছর পর গালিসবার্গের মেট্যাগ প্লান্ট আত্মপ্রকাশ করতে পারে কোনো ইথানল রিফাইনারি রূপে। তখন হয়তো বিজ্ঞানীদের দেখা যাবে নতুন কোনো হাইড্রোজেন জ্বালানির ইঞ্জিন আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। আর নতুন অটো কোম্পানিগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়বে হাইব্রিড কার নির্মাণে। প্রাথমিক স্কুল ও কলেজে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে আমেরিকান শ্রমিকদের দিয়েই এসব নতুন কর্মক্ষেত্র পূরণ করা যাবে।

কিন্তু এ জন্য দীর্ঘদিন ইতস্তত করা যাবে না। বিদেশী জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা একটি জাতির জন্য কতটা ক্ষতিকর, ২০০৫ সালে ইউক্রেন সফরকালে সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। সে সময় দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভিক্টর ইউশচেঙ্কো। নানা কারণেই তার নির্বাচনটি ছিল বেশ আলোচিত। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে লড়াই, প্রতিবেশী রাশিয়ার হুমকি এবং হত্যাপ্রচেষ্টা থেকে বেঁচে যাওয়া ইউশচেঙ্কোর ক্ষমতায় আসা সে দেশের ইতিহাসে 'অরেঞ্জ রেভলিউশন' নামে পরিচিত।

সিনেটর ডিক লুগ্যারের সাথে আমার সফর ছিল সেটা। আমরা যখন যাই তখন গণতান্ত্রিক উদারীকরণ ও অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে কথা চলছিল সেখানে। ইউশচেঙ্কো ও তার মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার পর আমরা বুঝতে পারলাম, দেশটি একটি বড় সমস্যায় পড়েছে। তারা তেল ও গ্যাসের জন্য পুরোপুরি রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। রাশিয়া ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, এত দিন বিশ্ববাজারের চেয়ে কম মূল্যে যে জ্বালানি সরবরাহ করেছে, আগামীতে তা আর করা হবে না। আর এটা হলে শীতকালে ঘর গরম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তেলের দাম তিন গুণ হয়ে যাবে। এতে যে জনরোষ দেখা দেবে তা আরেকটি নির্বাচন নিয়ে আসবে। দেশের ভেতর রুশপন্থী শক্তি এ রকম সময়েরই অপেক্ষায় আছে। ইউক্রেন এখনো তার সাবেক অংশীদারের দয়ার ওপর নির্ভরশীল।

যে জাতি তার জ্বালানির উৎস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তার ভাগ্যও তার নিয়ন্ত্রণে নেই। ইউক্রেনের সামনে হয়তো আর কোনো রাস্তা খোলা নেই। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাধর দেশটি চাইলে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে পারে।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জ্বালানি– এই তিন খাতে বিনিয়োগ আমেরিকাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। তবে রাতারাতি এই বিনিয়োগের সুফল পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি বিনিয়োগের সাথে অনেক বিতর্ক জড়িয়ে আছে। আমাদের ফেডারেল বাজেট যখন টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে চলছে, তখন গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে একই সাথে বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগটি কোত্থেকে হবে? আমেরিকান কারগুলো জ্বালানি সাশ্রয় করা বা পাবলিক স্কুলগুলোতে যোগ্যতাভিত্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণের আগে দূর করতে হবে শ্রমিক-শিক্ষকদের আতঙ্ক। এসব নিয়ে বিতর্ক শিগগির বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই বিতর্ক হতে হবে অর্থবহ ও উন্মুক্ত। বিরোধের মধ্য দিয়ে বিতর্কের সমাপ্তি ঘটানো

www.pathagar.com

চলবে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে, বিশ্বে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের অবনতি ঘটবে। আমরা সাহসিকতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে আমাদের অর্থনীতি অনেক সুসংহত হবে। আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্য অনুকূলে আসবে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের গতি আরো দ্রুততর হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে আমেরিকান শ্রমিকরা আরো শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারবে।

এটাই কি যথেষ্ট? ধরে নিলাম, আমরা আদর্শিক বিভক্তি অনেক কমিয়ে এনে আমেরিকান অর্থনীতিকে বেড়ে উঠতে দিলাম। তাহলে আমরা কি গালিসবার্গের সেই সব শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টি দিতে পারব? তাদের ও তাদের সন্তানদের জন্য বিশ্বায়ন কাজ করছে এ কথা কি বলা যাবে?

২০০৫ সালে মধ্য আমেরিকান মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল বা 'কাফটা' নিয়ে বিতর্কের সময় ওপরের প্রশ্নটি ঘুরে-ফিরে আমার মনে আসে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এই চুক্তি আমেরিকান শ্রমিকদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। মধ্য আমেরিকার গোটা অর্থনীতি মোটামুটি কানেকটিকাটের নিউ হ্যাভেন শহরের সমান। এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করবে। হন্ডুরাস ও ডমেনিকান রিপাবলিকের মতো গরিব দেশগুলো পাবে অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী বিনিয়োগ। চুক্তিতে কিছু সমস্যা থাকলেও সার্বিকভাবে কাফটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভজনক হবে।

কিন্তু বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা আমার সাথে একমত হতে পারেন না। তাদের কথা, 'নাফটা' যেমনভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জন্য বিপর্যয়কর হয়েছে, এটা তার চেয়ে ব্যতিক্রম কিছু হবে না। তাদের বক্তব্য আমরা মুক্ত বাণিজ্য চাই না, ন্যায্য বাণিজ্য চাই। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য করতে চাইলে দেশগুলোকে শ্রমিক সুরক্ষাব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। ইউনিয়ন করার অধিকার দেয়া এবং শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। উন্নত করতে হবে শ্রমপরিবেশ। রফতানিপণ্যের ওপর ভর্তুকি, আর আমেরিকান পণ্যের বিরুদ্ধে অশুল্কগত বাধা দূর করতে হবে। মেধাপণ্যের স্বত্ব রক্ষা করতে হবে কঠোরভাবে এবং বিশেষ করে চীনের মতো দেশগুলোকে স্থানীয় মুদ্রার কৃত্রিম অতিমূল্যায়ন বন্ধ করতে হবে, যা আমেরিকান কোম্পানিগুলোকে সব সময় একটি অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে রাখছে।

সব ডেমোক্র্যাটের মতো আমিও এ বিষয়গুলো সমর্থন করি। কিন্তু এসব ব্যবস্থা নেয়া হলেও যে বিশ্বায়নের অন্তর্নিহিত বাস্তবতায় কোনো পরিবর্তন আসবে না, সে কথা আমি ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বলি। বাণিজ্য চুক্তিতে শ্রমিক বা পরিবেশের ব্যাপারে কঠিন শর্ত হয়তোবা দেশগুলোকে শ্রমপরিবেশ উন্নত করার জন্য চাপের মধ্যে রাখবে। কিন্তু এটা করে আমেরিকান শ্রমিক এবং বাংলাদেশ, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া ও মোজাম্বিকের মতো দেশগুলোর শ্রমিকদের ঘণ্টাপ্রতি মজুরির মধ্যে বিশাল পার্থক্যটি কমানো যাবে না।

www.pathagar.com

একইভাবে চীন তার মুদ্রার দাম বাড়তে দিলে সেখানে উৎপাদিত পণ্যের দাম কিছুটা বাড়তে পারে। এতে হয়তো আমেরিকান পণ্য কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক হবে। কিন্তু এসব বলা বা করার পরও চীনের যে বিশাল শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত থেকে যাবে, তার অর্ধেকই যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার সমান। এর অর্থ, ওয়ালমার্ট সেখানকার রফতানিকারকদের বহু বছর ব্যস্ত রাখতে পারবে। তাই এসব বাস্তবতা স্বীকার করে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে বাণিজ্যের প্রশ্নগুলো। ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা আমার যুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। কিন্তু আমার কথায় তারা আমাকে 'কাফটা' প্রশ্নে না ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তা আমি জানি না।

১৯৮০ দশকের শুরু থেকে মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে মৌলিক বিতর্ক তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। এই বিতর্কে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিরা ক্রমাগত হারছে। আবার নীতিনির্ধারক, সংবাদমাধ্যম ও বর্তমান যুগের ব্যবসায়ী মহলের প্রচলিত ধারণা যে, মুক্ত বাজার সবার জন্য কল্যাণকর। যুক্তি দেখানো হয়, বাণিজ্যের কারণে কিছু আমেরিকান চাকরি হারাতে পারেন বা স্থানীয়ভাবে দুর্ভোগ-দুর্দশা সৃষ্টি হতে পারে; এমনকি দু-একটি প্লান্টও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতে শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিতে কয়েক গুণ বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে সেবা খাত।

বিশ্বায়নের গতি এখনো তুঙ্গে ওঠেনি। এর পরও শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেবল ইউনিয়নগুলোই যে উদ্বিগ্ন তা কিন্তু নয়। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ব্যাপক অটোমেশন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরও প্রতি বছর সমসংখ্যক কর্ম সৃষ্টির জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিও বাড়ছে। সেবা খাতে আরো প্রাধান্য বিস্তার করে মার্কিন অর্থনীতি একই প্রবৃদ্ধির দেখা পাবে কি না সে প্রশ্ন অনেক বিশ্লেষকের। কারণ গত পাঁচ বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আমেরিকায় চাকরিতে বেতন যতটা না বেড়েছে, তার চেয়ে কমেছে অনেক বেশি।

বিশ্ব অর্থনীতির সাথে খাপ খাওয়ার সামর্থ্য বাড়াতে আমেরিকান শ্রমিকদের কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ালেই হবে না। ভালো শিক্ষা পেলে তারা ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে তা কিন্তু নয়। যুক্তরাষ্ট্র যদি চীন, ভারত বা পূর্ব ইউরোপের দ্বিগুণ কমপিউটার প্রোগ্রামার তৈরি করে, তার অর্থ দাঁড়াবে বিশ্ববাজারে বিপুলসংখ্যক প্রোগ্রামের উপস্থিতি। যত প্রোগ্রামার যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে, তার চেয়ে বেশি থাকবে বাইরে। এদের পেতে চাইলে, যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বেতন দিলেই চলবে। অন্য কথায়, বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সুফল বাড়াতে পারে মুক্তবাজার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা এর বড় অংশ পেতে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা এখানে নেই। এই বাস্তবতার কারণে বোঝা যায়, কেন কেউ কেউ বিশ্বায়নকে থামিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে চায় আমাদের। নিউইয়র্কে 'কাফটা' নিয়ে বিতর্কে একবার অংশ নিই আমি। সেখানে আমি ক্লিনটনের সাবেক অর্থমন্ত্রী রবার্ট রুবিনের কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরি। রুবিনের মতো ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্বায়নকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন কোনো ডেমোক্র্যাট আমি দেখিনি। তিনি বহু বছর

www.pathagar.com

ধরে কেবল ওয়াল স্ট্রিটের প্রভাবশালী ব্যাংকারই ছিলেন না, নব্বইয়ের দশকের বেশিরভাগ সময় বিশ্ব অর্থব্যবস্থার গতিধারা নির্ধারণেও সাহায্য করেছিলেন তিনি। তিনি আমার দেখা সবচেয়ে চিন্তাশীল ও সহজে বোঝা যায় না এমন প্রতিভাধর মানুষ। গালিসবার্গে মেট্যাগে শ্রমিকদের কাছ থেকে শোনা আশঙ্কাগুলোর কতটুকু ভিত্তি আছে, সে সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে। তাদের আশঙ্কা, সস্তা শ্রমের দেশগুলোর কাছে যুক্তরাষ্ট্র উন্মুক্ত হয়ে গেলে দীর্ঘ মেয়াদে এখানকার জীবনমানে অবনতি ঠেকানোর উপায় নেই।

রুবিন বলেন, এটা একটা জটিল প্রশ্ন। মানুষের প্রতিভা অসীম। তাই আমেরিকার অর্থনীতি কী পরিমাণে নতুন ও ভালো কর্মসংস্থান করতে পারবে তারও কোনো সহজাত সীমা নেই– বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ এমন কথাই বলবে। নতুন শিল্প আবিষ্কার করে মানুষ। নতুন প্রয়োজন ও চাহিদা দেখা দেয়। আমি মনে করি অর্থনীতিবিদরা ঠিক। ইতিহাস এর সাক্ষী। আবার অতীতের মতো একই ঘটনা আগামীতেও ঘটবে তারও নিশ্চয়তা নেই। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গতি, আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর আকার, এসব দেশের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য ইত্যাদি কারণে একটি ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। তাই সব কিছু ঠিকঠাকমতো করে গেলেও কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারি আমরা।

আমি বললাম, আপনার কথায় গালিসবার্গের মানুষ কোনো আশ্বাস পেল না। তিনি বললেন, 'আমি বলেছি এটা সম্ভব, অবশ্যম্ভাবী নয়। আমি সতর্ক আশাবাদী। আমরা যদি অর্থব্যবস্থা শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে পারি, উন্নত করতে পারি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– তাহলে তাদের সন্তানরা ভালো করবে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। অর্থনীতি সংরক্ষণের যেকোনো চেষ্টা উল্টো ফল বয়ে আনবে। এতে আমাদের সন্তানরা দরকষাকষির ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে চলে যাবে।'

বিশ্বায়নের প্রশ্নে আমেরিকান শ্রমিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যৌক্তিক কারণ আছে বলে রুবিনের স্বীকারোক্তির আমি প্রশংসা করি। বেশিরভাগ শ্রমিক নেতাকেও এই ইস্যুটি নিয়ে ভাবতে দেখেছি আমি।

তবে রুবিনের মৌলিক অন্তর্দৃষ্টিও উপেক্ষা করা কঠিন। তার মতে, বিশ্বায়নকে বিলম্বিত করার চেষ্টা আমরা করতে পারি, কিন্তু একে থামাতে পারব না। আমেরিকার অর্থনীতি বাকি বিশ্বের সাথে এতটা নিবিড়ভাবে জড়িত, ডিজিটাল বাণিজ্যের এতটাই বিস্তার ঘটেছে যে, এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরক্ষা গড়ার কথা কল্পনা করাও কঠিন হবে। স্টিলের ওপর শুল্ক আরোপ করলে আমেরিকান স্টিলসামগ্রী হয়তো সাময়িক সুবিধা পাবে। কিন্তু এতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টিল ব্যবসায়ীরা বিশ্ববাজারে গিয়ে কঠিন প্রতিযোগিতায় পড়বে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি কোনো ভিডিও গেম যখন মেক্সিকোয় প্যাকেট হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে, তখন 'আমেরিকান পণ্য' কেনা বেশ কঠিন। ভারতের কোনো কলসেন্টারের সেবা নেয়ায় বাধা দিতে পারবে না আমেরিকার সীমান্তরক্ষীরা; অথবা প্রাগের কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে ই-মেইলে সেবা নেয়া থেকেও বিরত

www.pathagar.com

রাখা যাবে না কোনো আমেরিকান কোম্পানিকে। তাই বাণিজ্যের প্রশ্ন এলে বাধাদানের সুযোগ কমই পাওয়া যাবে।

এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব। আর শ্রমিকদের বলব, নিজেরা যা পারো করো গিয়ে। 'কাফটা' বিতর্কের শেষ দিকে হোয়াইট হাউসে এক দল সিনেটরের সাথে আলোচনায় এ কথা আমি প্রেসিডেন্ট বুশকে বলেছি। এও বলেছি, মুক্ত বাণিজ্যের সুফল রয়েছে, এটা আমি জানি। আমি আরো জানি, 'কাফটা' পাস করানোর মতো ভোটও হোয়াইট হাউস পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি বলছি, এই বিরোধিতা কেবল 'কাফটা'র বিরুদ্ধে নয়; এটা আমেরিকান শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার জন্য। এই ভীতি দূর করার কৌশল বের করা না গেলে এবং ফেডারেল সরকার তাদের পক্ষে আছে, এটা বোঝানো না গেলে সংরক্ষণবাদী মনোভাব কেবল বেড়েই চলবে।

প্রেসিডেন্ট মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন এবং বললেন, আমার সাথে আরো কথা বলবেন তিনি। সাথে এটাও বললেন যে, আমার ভোটটি তিনি আশা করছেন।

তার আশা অবশ্য পূরণ হয়নি। 'কাফটা'র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছি আমি। সিনেটে বিলটি ৫৫-৪৫ ভোটে পাস হয়। তবে ভোট দিয়ে আমি কোনো তৃপ্তি পাইনি। কিন্তু মুক্তবাণিজ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি হোয়াইট হাউসের মনোযোগ কাড়তে এ ছাড়া প্রতিবাদের আর কোনো উপায়ও আমার ছিল না। বব রুবিনের মতো আমিও বিশ্বাস করি, মুক্তবাণিজ্য পরিবেশ একসময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে এবং আমেরিকান শ্রমিকদেরও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাবে। তবে এর জন্য বিশ্বায়নের মূল্য ও সুফলকে ন্যায্যভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে।

শেষবার যখন আমরা অর্থনৈতিক রূপান্তর দেখেছিলাম, সে সময়টাও ছিল আজকের মতোই সংকটজনক। এক নতুন সামাজিক বন্ধনের দিকে সেই রূপান্তরের নেতৃত্ব দেন ফ্রেডরিক রুজভেল্ট। সরকার, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের মধ্যে দর কষাকষি ও নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় ব্যাপক সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী এ অবস্থা বজায় ছিল। সাধারণ আমেরিকান শ্রমিকদের নিরাপত্তার ভিত্তি তিনটি : পরিবার চালানো ও জরুরি অবস্থার জন্য সঞ্চয় করা যাবে এমন যথেষ্ট মজুরিসম্পন্ন কাজ পাওয়ার সামর্থ্য; নিয়োগকর্তার কাছ থেকে স্বাস্থ্য ও অবসর সুবিধাপ্রাপ্তি এবং সরকারের কাছ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসাসহায়তা ও চিকিৎসাসেবা, বেকারভাতা এবং কিছুটা সীমিত আকারে দেউলিয়াত্ব ও অবসরকালে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার মতো নিরাপত্তা জাল। যেসব নাগরিক জীবনে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছেন, এই নিরাপত্তা জাল রক্ষা করেছে তাদের। 'নিউ ডিল' চুক্তির পেছনে সামাজিক সংহতির এই চেতনাটি নিশ্চিতভাবে কাজ করেছে। নিয়োগকর্তাই দেবে শ্রমিকের অধিকার। এর পরও ভাগ্য বা হিসাবের ভুলে কেউ বিপর্যয়ের শিকার হলে তাকে তুলে নেয়ার জন্য আমেরিকার বৃহৎ সমাজ তো রয়েছেই।

www.pathagar.com

এই চুক্তিতে আরেকটি বোধ কাজ করেছে। তা হলো, ঝুঁকি ও পুরস্কার ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যবস্থা আসলে বাজারের কার্যকারিতা উন্নত করে। রুজভেল্ট বুঝেছিলেন, শ্রমিকদের সম্মানজনক মজুরি ও সুবিধা দেয়া হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তাদের একটি ভিত্তি তৈরি হবে। এটা আমেরিকান অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার পাশাপাশি এর সম্প্রসারণ ঘটাবে। রুজভেল্ট স্বীকার করতেন, আমরা সবাই জীবনে ঝুঁকি নিতে পারব। যদি জানি ব্যর্থ হলেও কিছু সুরক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহলে চাকরি পরিবর্তন, নতুন ব্যবসা শুরু বা অন্য দেশের কাছ থেকে প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানানোর ঝুঁকি নিতে পারব আমরা। www.amarboi.org

'নিউ ডিল' আইনের মূল চেতনা ছিল এই সামাজিক নিরাপত্তা। এটা এমন এক সামাজিক বীমা যা আমাদেরকে ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। নিজেদের জন্য আমরা প্রাইভেট বীমা কোম্পানি থেকে বীমা করে থাকি। কারণ আমরা জানি পরিকল্পনামতো আমাদের জীবন চলে না। সন্তান অসুস্থ হতে পারে, চাকরি চলে যেতে পারে, শেয়ারবাজারে দরপতন হতে পারে। যত বেশি মানুষ বীমার আওতায় আসবে, বীমা ঝুঁকির ক্ষেত্র যত বিস্তৃত হবে, মানুষকে তত বেশি নিরাপত্তা দেয়া যাবে, ব্যয়ও ততই কমে আসবে। আবার অনেক কিছু বিষয়ে বীমা করা যায় না। কারণ বীমা কোম্পানি এসব ক্ষেত্রগুলো লাভজনক মনে করে না। আবার কখনো কর্মস্থলে আমরা যে বীমা পাই তা যথেষ্ট নয়। আকস্মিক এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, বীমায় যার ক্ষতিপূরণ হয় না। আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে বীমার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাতে পারি এবং সৃষ্টি করতে পারি একটি 'বীমাপুল'। আমেরিকার প্রতিটি মানুষ অন্তর্ভুক্ত হবে সেই পুলে।

রুজভেল্ট যে চুক্তির মধ্য দিয়ে সমাজকে এক সুতায় গেঁথেছিলেন, সেই বন্ধন এখন শিথিল হতে শুরু করেছে। বিদেশী প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শেয়ারবাজারের চাপের কারণে মালিকরা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো অটোমেশন করেছেন, আকার কমিয়েছেন বা নিয়ে গেছেন বিদেশে। ফলে শ্রমিকদের চাকরি হারানোর সংখ্যা বেড়ে যায়। মজুরি ও সুবিধা বাড়ানোর দাবিও দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবীমা দেয়া হলে কোম্পানি কর মওকুফ সুবিধা পাবে এই উদার মনোভাব ফেডারেল সরকার দেখালেও কোম্পানিগুলো বীমার বাড়তি ব্যয় শ্রমিকদের ঘাড়েই চাপায়। উচ্চ প্রিমিয়াম, কো-পেমেন্ট এবং অনুমেয় ইত্যাদি কৌশলে এসব চাপানো হয়। অন্য দিকে, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকই তাদের কর্মচারীদের বীমাসুবিধা আদৌ দিতে পারেনি। একইভাবে প্রচলিত নির্দিষ্ট সুবিধার অবসর পরিকল্পনা থেকেও সরে যায় কোম্পানিগুলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবসর বাধ্যবাধকতা এড়াতে দেউলিয়া আদালতকেও ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিবারগুলোর ওপর এর সামষ্টিক প্রভাব মারাত্মক। গত দুই দশকে মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে আমেরিকার গড়পরতা শ্রমিকদের বেতন বাড়েনি। ১৯৮৮ সাল থেকে পরিবারগুলোর গড়পরতা স্বাস্থ্যবীমা ব্যয় তিন গুণ বেড়েছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়

www.pathagar.com

এতটা নিম্ন পর্যায়ে কখনো হয়নি। অন্য দিকে ব্যক্তিগত ঋণও কখনো এতটা উচ্চ ছিল না।

এই প্রবণতার প্রভাব কমানোর বদলে বুশ প্রশাসনের কর্মকাণ্ড একে আরো উৎসাহিত করেছে। মালিকানাভিত্তিক সমাজের মূল ধারণা ছিল ওটাই। আমরা যদি শ্রমিকদের প্রতি বাধ্যবাধকতা থেকে নিয়োগকর্তাদের মুক্ত করে দিই এবং সরকার চালিত সামাজিক বীমার মতো 'নিউ ডিল'-এর চেতনা নস্যাৎ করে দিই, তাহলে বাজার ক্ষেত্রের ম্যাজিক বাকি অধঃপতনের কাজটা করে দেবে। সামাজিক বীমার প্রচলিত ব্যবস্থার দর্শনটিকে যদি বলা হয়, 'আমরা সবাই এক'– তাহলে মালিকানাভিত্তিক সমাজের দর্শনটি হলো– 'তুমি তোমার নিজের জন্য'।

'মালিকানাভিত্তিক সমাজ' বেশ মোহনীয় একটি ধারণা। অন্যের প্রতি কোনোরকম দায়বোধ থেকে এটা আমাদের মুক্ত করে দেয়। কিন্তু এতে একটি সমস্যা রয়ে গেছে। যারা ইতোমধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়েছে তাদের জন্য এটা কাজ করবে না।

সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার সরকারি উদ্যোগের কথাই ধরা যাক। প্রশাসন যুক্তি দেখায়, ব্যক্তির বিনিয়োগের বিপরীতে ভালো মুনাফা দিতে পারে শেয়ারবাজার। এক দিকে তারা ঠিক।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তার জীবনযাত্রা ব্যয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাজার অসাধারণ কাজ দেখিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তির বিনিয়োগ সিদ্ধান্তটি সব সময় হার-জিতের সাথে যুক্ত। কে আগে মাইক্রোসফটের শেয়ার কিনেছে, আর কে পরে এনরনের শেয়ার কিনেছে তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে। যারা ক্ষতির শিকার হয়েছে তাদের জন্য 'মালিকানাভিত্তিক সমাজ' কী করবে? আমরা যদি প্রবীণদের না খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা দেখতে না চাই, কোনো না কোনোভাবে তাদের অবসর সুবিধাটি দিতে রাজি না হই এবং আমাদের মধ্যে কোন দল হেরে যাবে তা যখন জানি না তখন আমাদের সাধারণ জ্ঞানে বলে এমন এক তহবিল গড়ে তোলা উচিত যা অন্তত আমাদের 'সোনালি সময়ে' নিশ্চিত আয়ের সুযোগ দেবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কাউকে উচ্চ ঝুঁকির, উচ্চ মুনাফার বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করব না। তারা এটা করবে। এর অর্থ হলো– তারা এটা করবে, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য রাখা সঞ্চয়ের বাইরে যে সঞ্চয় রয়েছে সেই সঞ্চয় দিয়ে।

নিয়োগকর্তা বা সরকারের দেয়া স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা ব্যক্তিগত সেভিংস অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে প্রশাসনের উদ্যোগের প্রশ্ন এলেও একই নিয়ম কাজ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে এককালীন অর্থ পাবে তা যদি একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা কেনার উপযুক্ত হয় এবং সেই অর্থ যদি চিকিৎসাব্যয়ের মুদ্রাস্ফীতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তবে এ ধারণা যৌক্তিক হতে পারে। কিন্তু আপনি এমন এক মালিকের অধীনে কাজ করেন, যিনি আপনাকে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা দিয়েছেন তাহলে কী হবে? আবার স্বাস্থ্যসেবা ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে প্রশাসনের তত্ত্ব যদি

www.pathagar.com

ভুল হয়, তাহলে? তখন 'পছন্দের স্বাধীনতার' অর্থ দাঁড়াবে, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা খরচ বেড়ে যাওয়ার ভার বইতে হবে নিয়োগকর্তাকে এবং তাদের হেলথ সেভিংস অ্যাকাউন্টের অর্থ দিয়ে কেনা বীমার সুবিধা প্রতি বছরই কমতে থাকবে।

অন্য কথায়, নতুন অর্থনীতির ঝুঁকি ও লাভ সব আমেরিকানের ওপর ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না মালিকানাভিত্তিক সমাজ। তার বদলে 'বিজয়ীর সব সুবিধা' ধরনের বর্তমান অর্থনীতির অসম ঝুঁকি ও লাভগুলোকেই আরো বড় করে দেখাবে। আপনি যদি সুস্থ ও ধনবান অথবা সৌভাগ্যবান হন, তাহলে অচিরেই সেগুলো আরো বেশি করে পাবেন। এর উল্টোটা হলে, আপনাকে সাহায্য করার মতো কাউকে আপনি খুঁজে পাবেন না। কোনো টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অথবা আমেরিকার শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রক্ষার মতো কোনো রেসিপি এটা নয়। যাকে আমরা 'পরস্পরের সাফল্যের ভাগিদার আমরা সবাই' বলি– এটা সেই মূল্যবোধেরও বিরোধী।

একবিংশ শতকের উপযোগী করে ফ্রেডরিক রুজভেল্টের সামাজিক অনুশাসনগুলো নতুনভাবে সাজানো যায়। মজুরি, বেকারত্ব, অবসর ও স্বাস্থ্যসেবার মতো যেসব ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নাজুক অবস্থায় থাকে সেগুলোর মধ্যে এমন অনেক নতুন ও পুরনো ধারণা রয়েছে, যা আমেরিকাবাসীকে নিরাপদ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মজুরির কথাই ধরা যাক। আমেরিকানরা কাজে বিশ্বাসী। এটা শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়, জীবনকে একটি লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা দেয়া এবং শৃঙ্খলা ও মর্যাদা লাভের জন্যও কাজ করে তারা। শিশু আছে এমন পরিবারগুলোকে সাহায্য করার মতো পুরনো ওয়েলফেয়ার কর্মসূচি উপরিউক্ত মূল্যবোধ রক্ষায় প্রায়ই ব্যর্থ হয়। এই কর্মসূচি কেন জনপ্রিয়তা পায়নি তা দিয়ে এই ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। এই কর্মসূচি গ্রহণকারীরা কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সেটাও বোঝা যায় এখান থেকে।

আমেরিকানরা বিশ্বাস করে পূর্ণ সময় কাজ করতে পারলে তারা পরিবার ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের কাজ চালাতে সক্ষম। অথচ অর্থনীতির নিম্নধাপে অবস্থানকারী বহু মানুষের জন্য এই প্রাথমিক অঙ্গীকার পূরণ করা যায়নি। এরা মূলত স্বল্প দক্ষ শ্রমিক। সরকার এসব শ্রমিককে সাহায্য করতে পারে। এতে বাজারের দক্ষতায় সামান্যই প্রভাব পড়বে। ন্যূনতম মজুরি বাড়িয়ে আমরা শুরুটা করতে পারি। ন্যূনতম মজুরির আকস্মিক বৃদ্ধি অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগে মালিকদের নিরুৎসাহিত করবে বলে যুক্তি দেখান কিছু অর্থনীতিবিদ। এটা হয়তো ঠিক। কিন্তু নয় বছরের মধ্যেও যখন ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হয়নি এবং ১৯৫৪ সালের প্রকৃত মূল্যে ডলারের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সর্বনিম্ন মজুরিতে পূর্ণ সময় কাজ করেও কেউ যখন দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারবে না, তখন অর্থনীতিবিদদের যুক্তি কাজে খাটে না। রোনাল্ড রিগ্যান চালু করেছিলেন 'আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট' কর্মসূচি। এতে কর আইনের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের সম্পূরক আয়ের সুযোগ দেয়া হয়। আরো অনেক পরিবার যেন এই

www.pathagar.com

কর্মসূচির সুফল ভোগ করতে পারে, সে জন্য একে আরো সহজ ও সম্প্রসারণ করা যায়।

দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির উপযোগী করে শ্রমিকদের গড়ে তুলতে বিদ্যমান বেকার বীমা ও উপযোজন সহায়তা ব্যবস্থা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ ধরনের একটি ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের কাছে অনেক ভালো পরামর্শ রয়েছে। আমরা সেবা শিল্পগুলোকেও এ ধরনের সহায়তা দিতে পারি, শ্রমিকরা যেন টিকে থাকতে পারে সে জন্য শিক্ষা ব্যয় নমনীয় করা যায়। অথবা শিল্প স্থানান্তরের কারণে কর্মচ্যুতি ঘটতে পারে এমন শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ-সহায়তা দেয়া যেতে পারে। যে অর্থনীতিতে পুরনো চাকরি নতুন চাকরির চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেয়, সেখানে মজুরি বীমার ধারণা চালু করা যায়। এই বীমা শ্রমিককে তার পুরনো ও নতুন কর্মক্ষেত্রের মজুরি পার্থক্যের অর্ধেক পূরণ করবে।

অবশেষে শ্রমিকদের উচ্চ মজুরি ও ভালো সুবিধা পেতে সাহায্যের জন্য আমাদের আবার শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিকদের মধ্যে দরকষাকষির ক্ষেত্রটি সমতল করা প্রয়োজন। ১৯৮০-র দশকের শুরু থেকে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো ধীরে ধীরে পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে। এটা শুধু অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই হয়নি, বর্তমান শ্রম আইনের জন্যও হয়েছে। ন্যাশনাল লেবার রিলেশন্স বোর্ড শ্রমিকদের রক্ষা করতে পেরেছে খুব সামান্যই। প্রতি বছর ২০ হাজারের মতো শ্রমিক চাকরি হারায় কেবল শ্রমিকদের সংগঠিত করা বা ইউনিয়নে যোগ দেয়ার জন্য। এটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। সংগঠন করার জন্য শ্রমিকদের বরখাস্ত বা বৈষম্য সৃষ্টি থেকে মালিকদের বিরত রাখতে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বেশিরভাগ শ্রমিক যদি কোনো ইউনিয়ন পছন্দ করে সম্মতি পত্রে তার স্বাক্ষর দেয় তাহলে মালিককে ওই ইউনিয়নের স্বীকৃতি দিতে হবে। নবগঠিত ইউনিয়ন ও মালিকপক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক চুক্তিতে পৌঁছার ব্যাপারে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অধিকতর ইউনিয়ন ঘেঁষা শ্রমশক্তি আমেরিকার অর্থনীতির নমনীয়তা ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নষ্ট করে দেবে– ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো এমন যুক্তি দিতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি নয়। কারণ বিশ্বের অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকরা যখন উচ্চ উৎপাদনশীলতার ন্যায্য অংশ পাবে, তখন তারা প্রস্তুত থাকবে মালিকদের সহযোগিতা করতে।

সরকারি নীতি যেমন পারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত না করে শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে। তেমনি আমরা পারি মর্যাদার সাথে তাদের অবসরে যাওয়ার সামর্থ্যকে শক্তিশালী করতে। সামাজিক নিরাপত্তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অক্ষুণ্ন রাখার অঙ্গীকার নিয়ে এটা আমরা শুরু করতে পারি। পারি এর আর্থিক সামর্থ্যকে বাড়াতে। সামাজিক নিরাপত্তা ট্রাস্ট তহবিলের অনেক সমস্যা বাস্তবে থাকলেও তা

www.pathagar.com

সামাল দেয়া সম্ভব। ১৯৮৩ সালে একই সমস্যা দেখা দিলে রোনাল্ড রিগ্যান ও হাউজ স্পিকার টিপ ও'নিল বসে একটি দ্বিপক্ষীয় পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা ভবিষ্যত ৬০ বছরের জন্য ব্যবস্থাটিকে স্থিতিশীল করেছে। এখন আমাদের তেমনটা না পারার কোনো কারণ নেই।

বেসরকারি খাতের অবসর ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, সুনির্দিষ্ট সুবিধাভিত্তিক অবসর পরিকল্পনার অবনতি ঘটেছে। তবে শ্রমিক ও অবসরগ্রহণকারীদের দেয় প্রতিশ্রুতি কোম্পানি বাস্তবায়ন করবে, এর ওপর আমরা জোর দেবো। 'ক্রেডিটর লাইনের' সামনের দিকে পেনশনভোগীদের নিয়ে যেতে দেউলিয়া আইন সংশোধন করতে হবে। যাতে শ্রমিকদের শায়েস্তা করতে কোম্পানি 'চ্যাপ্টার ১১' ব্যবহারের সুযোগ না পায়। তা ছাড়া নতুন আইনের মাধ্যমে কোম্পানিগুলোকে তাদের অবসর তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ রাখতেও বাধ্য করতে হবে।

আমেরিকানরা সামাজিক নিরাপত্তার সম্পূরক হিসেবে সুনির্দিষ্ট অবদানভিত্তিক ৪০১(কে)-এর মতো পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল হতে শুরু করলে তা আরো বিস্তৃত পরিসরে সব নাগরিকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জিনি স্পারলিং একটি সার্বজনীন ৪০১(কে) পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়, নিম্ন ও মাঝারি আয়ের পরিবারগুলোর জন্য একটি নতুন অবসর তহবিল গঠন করবে সরকার। অন্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, নিয়োগকর্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার শ্রমিকদের সর্বোচ্চ অনুমোদিত পর্যায়ে ৪০১(কে) পরিকল্পনাভুক্ত করবেন। কোনো শ্রমিক এতে সর্বোচ্চ অঙ্কের চেয়ে কম বা আদৌ কোনো অর্থ জমা না-ও রাখতে পারে– এমন আশঙ্কা করেন কেউ কেউ। কিন্তু বাস্তবতা হলো এমনটা করা হলে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায়। সামাজিক নিরাপত্তার সম্পূরক হিসেবে আমরা এসব ধারণা সহজেই গ্রহণ করতে পারি এবং যাত্রা শুরু করতে পারি এক সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার দিকে, যা কেবল সঞ্চয় বাড়াবে না, এটা প্রত্যেক আমেরিকানের কাছে বিশ্বায়নের সুফলের একটা বড় অংশ পৌঁছে দেবে।

আমেরিকান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও তাদের অবসর নিরাপত্তা জোরদারের মতোই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– আমাদের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা মেরামত করা। সরকার পরিচালিত দু'টি প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি– মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড আসলেই ভেঙে পড়েছে। কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ২০৫০ সাল নাগাদ এই দুই কর্মসূচি ও সামাজিক নিরাপত্তার পেছনে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হবে, যা হবে এখনকার গোটা ফেডারেল বাজেটের সমান। এ ছাড়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল 'প্রেসক্রিপশন ড্রাগ বেনিফিট', পরিস্থিতি আরো খারাপ করবে। ফলে অদক্ষ আমলাতন্ত্র, অন্তহীন ফাইল চালাচালি, যোগানদাতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা ও রোগীর অসন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে বিকাশ ঘটবে বেসরকারি খাতের।

১৯৯৩ সালে ক্লিনটন সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরির জোরালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সেখানে থমকে যায়। তখন থেকেই বিষয়টি সরকারি

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তহীনতায় আটকে আছে। কেউ বলেছেন, স্বাস্থ্য সঞ্চয় হিসাবের মাধ্যমে বাজার শৃঙ্খলার কঠোর ওষুধ প্রয়োগের কথা। অন্যরা বলছেন, ইউরোপ ও কানাডার মতো একক পরিশোধকারী জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার কথা। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শধারী বিশেষজ্ঞরা বর্তমান ব্যবস্থাটিকেই যুক্তিসম্মতভাবে ও ধীরে ধীরে সংস্কারের সুপারিশ করছেন। কিন্তু কিছু সাধারণ সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে আমাদেরকে এ অচলাবস্থার নিরসন ঘটাতে হবে।

আমরা স্বাস্থ্যসেবার পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করি, তা দিয়ে প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক বীমা সুবিধা দেয়া সম্ভব। প্রতি বছর স্বাস্থ্যসেবায় মুদ্রাস্ফীতি যেভাবে বাড়ছে, তাতে আমরা টিকে থাকতে পারব না। টিকে থাকতে হলে মেডিকেয়ার ও মেডিকেইডসহ গোটা ব্যবস্থায় ব্যয়ের রাশ টেনে ধরতে হবে।

আমেরিকানরা দ্রুত পেশা বদল করে। বেকারত্বের ঝুঁকিও তাদের বেশি। তাদের মধ্যে খণ্ডকালীন চাকরি বা স্ব-উদ্যোগী কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেশি। তাই নিয়োগকর্তারা কোনোভাবেই স্বাস্থ্যবীমা চালিয়ে যেতে পারেন না। এই বীমা স্থানান্তরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন।

কেবল বাজারের মাধ্যমে আমাদের স্বাস্থ্যসেবা খাতের দুর্দশা লাঘব করা সম্ভব নয়। এর আংশিক কারণ, ব্যক্তির সাধ্যের মধ্যে খরচটি রেখে যথেষ্ট বড় বীমাপুল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাজারের অসামর্থ্য, যা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আরো কারণ হলো স্বাস্থ্যসেবা অন্য কোনো পণ্য বা সেবার মতো নয়। আপনার সন্তান অসুস্থ হলে আপনি সাশ্রয়ী দামে ওষুধ পাওয়ার আশায় দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবেন না। সর্বশেষ, আমরা যেকোনো সংস্কারই বাস্তবায়ন করি না কেন, তাতে উন্নত মান, প্রতিরোধক ও দক্ষ সরবরাহের জন্য জোরালো ইনসেনটিভ দিতে হবে।

এসব বিষয় মাথায় রেখে একটি কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার পরিকল্পনা কেমন হতে পারে আমি তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রাথমিকভাবে আমরা ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের ইনস্টিটিউট অব মেডিসিনের (আইওএম) মতো নির্দলীয় কোনো গ্রুপকে দায়িত্ব দিতে পারি। একটি উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক পরিকল্পনাটি কেমন হবে এবং এতে কত ব্যয় হতে পারে তা নির্ধারণ করবে তারা। এই মডেল পরিকল্পনা তৈরির সময় বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি কতটা অর্থসাশ্রয়ী করা যায় সে দিকটিও তারা পরীক্ষা করবে। মডেল পরিকল্পনায় প্রাথমিক সেবা, প্রতিরোধক, গুরুতর সেবা এবং অ্যাজমা ও ডায়াবেটিসের মতো নিরাময়ের অযোগ্য রোগব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। চিকিৎসাসেবার ৮০ ভাগই নিয়ে থাকেন মোটামুটি ২০ ভাগ রোগী। পাশাপাশি আমরা রোগ প্রতিরোধ এবং সঠিক পথ্য ও নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার মতো সাধারণ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে পারলে দেখব, স্বাস্থ্যসেবার মান নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। এই পদ্ধতি অনেক অর্থও বাঁচিয়ে দেবে।

www.pathagar.com

এর পরে আমরা এই মডেল স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা কেনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। ফেডারেল বা বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীদের বিদ্যমান বীমাপুলের মাধ্যমে এটা কেনা যেতে পারে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোও মডেল পরিকল্পনার মতো সুবিধা দানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তবে তারা যে পরিকল্পনাই দিক না কেন তা আইওএম নির্ধারিত উচ্চমান ও মূল্যসাশ্রয়ী হতে হবে।

ব্যয় আরো কমানোর জন্য এই স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থাকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসতে পারি। এতে রেকর্ড সংরক্ষণ যেমন সহজ হবে, তেমনি কমবে ভুলের মাত্রা। পাশাপাশি এতে প্রশাসনিক ব্যয় নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। এটি সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আরো বেশি কমবে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যয় কমে যাওয়ায় যে সাশ্রয় হবে তা দিয়ে আমরা মডেল পরিকল্পনা কিনতে স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে সাহায্য করতে পারব। এ সময় তাদের সন্তানদের জন্যও বীমা কেনা বাধ্যতামূলক করতে পারি। যেসব প্রতিষ্ঠান তার কর্মচারীদের এই স্বাস্থ্যসেবা দেবে, প্রয়োজনে কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে তাদেরকেও ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার এই প্রস্তাবের অর্থ এই নয় যে, আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সমস্যার সমাধান খুবই সহজ। মোটেই তা নয়। এ রকম একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে খুঁটিনাটি বহু বিষয়ে বহু আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান নিয়োগকর্তারা তাদের কর্মচারীদের জন্য ইতোমধ্যে যেসব স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা নিয়েছেন, নতুন পরিকল্পনা প্রকাশের পর সেগুলো বাতিল করে দেবে না– বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য আরো মূল্যসাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক পথ থাকতে পারে।

আসল কথা হলো, সবাই সুষ্ঠু স্বাস্থ্যসেবা পাক– এ ব্যাপারে আমরা যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি, তাহলে ফেডারেল কোষাগারের ক্ষতি না করে বরং সাশ্রয়ী পথেই এ কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। আমরা যদি চাই বিশ্বায়নের দুর্ভোগ আমেরিকা মেনে নেবে। তাহলে আমাদেরকে সেই অঙ্গীকারও করতে হবে।

পাঁচ বছর আগে এক রাতে পাশের ঘরে শোয়া ছোট মেয়ে সাশার কান্নার শব্দে আমি ও মিশেল জেগে উঠি। সে সময় সাশার বয়স মাত্র তিন মাস। তাই মাঝরাতে তার জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার কান্নার ধরন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। কিছুতেই থামছিল না। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। আমরা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি ভোরে তার চেম্বারে দেখা করতে বললেন। পরীক্ষার পর ডাক্তার আশঙ্কা করলেন মেনিনজাইটিস হয়েছে সাশার। ইমার্জেন্সিতে আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। সময়মতো রোগটি ধরা না গেলে

www.pathagar.com

শিশুটি শ্রবণশক্তি হারাতে পারত। এমনকি মারাও যেতে পারত। টানা তিন দিন আমি ও মিশেল হাসপাতালে কাটিয়েছি উদ্বেগ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে।

সাশা এখন বেশ সুস্থ আছে। কিন্তু সেই তিন দিনের কথা আজো আমি ভুলতে পারি না। আমার বিশ্ব যেন একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছিল। হাসপাতালের ওই রুমের চার দেয়ালের বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারিনি। গালিসবার্গে সেই স্টিল কারখানার শ্রমিক টিম হুইলারের সাথে কথা বলার সময়ও মেয়ের ঘটনাটি আমার মনে পড়ে যায়। সে সময় আমার একটি বীমা ছিল। কিন্তু ছেলের লিভার ট্রান্সপ্লান্টের চিন্তায় ব্যাকুল টিম হুইলারের মতো দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিন কাটানো লাখ লাখ আমেরিকানের তা নেই।

আমেরিকাবাসী সমগ্র বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত। যেকোনো ধনী দেশের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম করি আমরা। সামনে এগিয়ে যেতে আরো বেশি অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সহ্য করতে ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু আমরা তখনই প্রতিযোগিতায় নামতে পারব, যখন লড়াইয়ের সুযোগ করে দিতে বিনিয়োগ করবে সরকার। যখন জানব, আমাদের পরিবারের জন্য এমন একটি সুরক্ষা জাল আছে, যার নিচে কখনোই তারা পড়ে যাবে না। আমেরিকাকে প্রতিযোগিতামূলক করার পেছনে ব্যয় এবং একটি নতুন সামাজিক অনুশাসন একই সাথে কার্যকর করা গেলে আমাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রেখে যাওয়া যাবে, এটা হলো সোজা কথা। কিন্তু এই ধাঁধার শেষ অংশ এখনো বাকি। এটা হলো 'বিলম্ব করার' প্রশ্ন। ওয়াশিংটনের প্রতিটি নীতি-বিতর্কে অনিবার্যভাবে এ প্রশ্ন দেখা দেয়।

আমরা এর জন্য কিভাবে মূল্য দেবো?

বিল ক্লিনটনের মেয়াদের শেষের দিকে এর একটি জবাব ছিল আমাদের কাছে। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের বিশাল এক বাজেট উদ্বৃত্ত দেখতে পাই আমরা। জাতীয় ঋণও কমছিল দ্রুত। এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান অ্যালান গ্রিনস্প্যান উদ্বেগ প্রকাশ শুরু করেছিলেন এই বলে, জাতীয় ঋণ খুব দ্রুত পরিশোধ হয়ে যেতে পারে। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য সীমিত হয়ে পড়বে। 'ডটকম'-এর অকল্পনীয় আধিপত্য এবং অর্থনীতি নাইন-ইলেভেনের ধাক্কা সামাল দেয়ার পরও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সব নাগরিকের বৃহত্তর সুযোগ সৃষ্টির জন্য আগাম বিনিয়োগের একটি পথ আমাদের সামনে ছিল। কিন্তু সেই পথে আমরা এগোইনি। তার বদলে প্রেসিডেন্ট আমাদের বললেন, আমাদের দু'টি যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের সামরিক ব্যয় বাড়ল ৭৪ ভাগ। মাতৃভূমি রক্ষা, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি, প্রবীণদের জন্য নতুন প্রেসক্রিপশন ড্রাগ প্লান চালু, দফায় দফায় ব্যাপক কর কর্তন, সব কিছু একসাথে করা হলো। সরকারের বাজেট ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করা হবে বলে আমাদের আশ্বাস দিলো কংগ্রেস নেতারা।

একের পর এক বিশাল ব্যয়ের কর্মসূচি নিতে থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে বাজেটের

www.pathagar.com

অবস্থা দাঁড়াল শোচনীয় পর্যায়ে। বর্তমানে বাজেট ঘাটতি ৩০ হাজার কোটি ডলারের ওপরে। তার ওপর প্রতি বছর সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ১৮ হাজার কোটি ডলার ধার করছে সরকার। এর সবগুলো সরাসরি আমাদের জাতীয় ঋণের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সেই ঋণ এখন দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ কোটি ডলারে। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি নারী, পুরুষ ও শিশুর মাথায় প্রায় ৩০ হাজার ডলারের ঋণের বোঝা।

ঋণ সব সময় সমস্যা নয়। আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক করবে এমন কাজের পেছনে টাকা ব্যয় হলে সেই ঋণ যৌক্তিক হতে পারে। আমাদের স্কুলগুলো পুনর্গঠন, ইন্টারনেট সিস্টেম সবার নাগালে পৌঁছে দেয়া, সারা দেশের গ্যাস স্টেশনগুলোতে ইথানল জ্বালানির পাম্প সংযোজন– এসব খাতে বিনিয়োগ অর্থবহ হতে পারে। আমরা বাজেটের উদ্বৃত্ত অর্থ সামাজিক নিরাপত্তা আরো জোরদার বা স্বাস্থ্যসেবা খাত পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করতে পারি। অথচ এই ঋণের বেশিরভাগ অংশ সরাসরি হয়েছে ধনী ব্যক্তিদের কর মওকুফের কারণে। বছরে ১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের বেশি যে লোকটি আয় করছে, তার কাছে যাচ্ছে এই অর্থ।

অন্য কথায়, আমরা জাতীয় ক্রেডিট কার্ডটি এমনভাবে ব্যবহার করেছি যাতে বিশ্ব অর্থনীতির সর্বাধিক সুবিধাভোগীরাই সব সময় সুবিধার বড় অংশটি নিতে পারে।

আমাদের ঋণের এই বোঝা সহজেই পাহাড়সম উচ্চতায় উঠে যাচ্ছে। কারণ বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো, বিশেষ করে চীন তাদের পণ্য আমাদের কাছে ধারে বিক্রি করতে আগ্রহী। কিন্তু সহজে ঋণ পাওয়ার এই সুসময় চিরদিন থাকবে না। একসময় আমাদের ধার দেয়া বন্ধ করে দেবে বিদেশীরা। সুদের হার বেড়ে যাবে। তখন আমাদের জাতীয় উৎপাদনের বড় অংশই খরচ হয়ে যাবে এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে।

এ রকম একটি ভবিষ্যৎ এড়াতে চাইলে আমাদেরকে এর পরিত্রাণের পথটি খুঁজতে হবে এখনই। অন্তত কাগজে-কলমে আমরা জানি কী করতে হবে। আমরা অপ্রয়োজনীয় কর্মসূচি পরিহার বা সঙ্কুচিত করতে পারি। পারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে। করপোরেশনগুলো যে ফাঁকফোকর দিয়ে কর মওকুফ পেয়ে যায়, সেগুলো বন্ধ করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ বাইরে যাওয়া ঠেকাতে আমরা ক্লিনটন আমলের 'পে গো' আইনের মতো কোনো আইনও করতে পারি।

আমরা এসব ব্যবস্থা নেয়ার পরও বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হতে পারে। বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান জোরদার করার জন্য প্রয়োজন– এমন কিছু বিনিয়োগও আমাদেরকে স্থগিত করতে হতে পারে। তাই সংগ্রামরত আমেরিকান পরিবারগুলোকে সহায়তার জন্য আমাদেরকে কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু এসব কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে গত ছয় বছরের শিক্ষা। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমাদের বাজেট ও কর নীতিতে সেসব মূল্যবোধের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে কি না, যেগুলো ধরে রাখব বলে আমরা ঘোষণা দিয়েছি।

www.pathagar.com

'আমেরিকায় যদি শ্রেণিসংগ্রাম চলতে থাকে তাহলে আমার শ্রেণী তাতে জয়ী হচ্ছে।'

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধনী, বার্কশায়ার হ্যাবাওয়ের চেয়ারম্যান ওয়ারেন বাফেটের অফিসে আমি বসেছিলাম। বাফেটের সাধারণ জীবনযাত্রার সুনাম আমি শুনেছিলাম। ১৯৬৭ সালে কেনা মাঝারি মানের বাড়িতে এখনো থাকেন তিনি। ওহামায় সরকারি স্কুলে তিনি সন্তানদের পড়িয়েছেন। তাই তার সাদামাটা অফিস দেখে আমি বিস্মিত হই। অফিসটি বেশ নির্জন। মেয়েলি কণ্ঠে 'এদিকে আসুন' ডাক শুনে পেছনে ফিরে তাকাই। দেখি ঘরের কোনায় মেয়ে সুসি ও অ্যাসিসট্যান্ট দিব্বের সাথে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছেন বাফেট।

বাফেট আমাকে ডেকেছিলেন কর নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য। দেশ যখন কপর্দকহীন হয়ে যাচ্ছে, তখন ওয়াশিংটন কেন স্বল্প আয়ের মানুষের কাছ থেকে কর কর্তনে ব্যস্ত, তা তিনি জানতে চান।

আমি অফিসে বসার পর বাফেট বললেন, তিনি হিসাব করে দেখেছেন, এ বছর তাকে তার রিসিপশনিস্টের চেয়েও কম কর দিতে হবে। তিনি নিশ্চিত যে, গড়পড়তা আমেরিকানের চেয়ে তার করের হার কম। এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে এটুকুও দিতে হবে না বলে জানান তিনি।

বাফেটের করের পরিমাণ কম হওয়ার কারণ, অধিকাংশ ধনী আমেরিকানের মতো তারও প্রায় সব আয় আসে ডিভিডেন্ড ও 'ক্যাপিটাল গেইন' থেকে। ২০০৩ সাল থেকে বিনিয়োগের আয়ের ওপর মাত্র ১৫ শতাংশ কর দিতে হচ্ছে। অন্য দিকে বেতনভুক্ত রিসিপশনিস্টকে কর দিতে হয় এর দ্বিগুণ হারে। 'ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কনট্রিবিউশন' আইন হওয়ার পর এই দশা। বাফেট মনে করেন এই বৈষম্য অযৌক্তিক।

তিনি বললেন, 'মুক্তবাজারই হলো সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ ও উৎপাদনশীল ব্যবহারের জায়গা। আবার উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য ও বিচক্ষণ বিতরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাজার খুব উদাসীন। পরবর্তী প্রজন্ম যেন ন্যায্য সুযোগ পায়, সে জন্য কিছু সম্পদ শিক্ষা খাত, আমাদের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজার অর্থনীতিতে যারা ছিটকে পড়বে তাদেরকে সুরক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করতে হবে। আর এটা সাধারণ বিবেচনার কথা যে, আমরা যারা বাজারব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুফলভোগী তাদেরকেই এর বড় অংশটি বহন করতে হবে।'

এরপর দীর্ঘ একটি ঘণ্টা ধরে আমরা বিশ্বায়ন, নির্বাহী বিন্যাস, অবনতিশীল বাণিজ্য ঘাটতি এবং জাতীয় ঋণ নিয়ে কথা বলি। বাফেট বিশেষ করে, বুশের এস্টেট কর বিলোপের প্রস্তাব চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, এটা আভিজাত্যকেই উৎসাহিত করবে, মেধাকে নয়।

বাফেট বলেন, এস্টেট কর মওকুফ পেয়ে গেলে দেশের যে সম্পদ কেউ অর্জন করেনি, তার ওপরও আপনি কর্তৃত্ব পেয়ে যাবেন। এটা যেন ২০২০ সালের অলিম্পিক টিম গঠনের জন্য ২০০০ সালের গেমসে বিজয়ীদের সন্তান-সন্ততিদের বেছে নেয়া।

www.pathagar.com

চলে আসার আগে বাফেটকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর কতজন বিলিয়নিয়ার তার মতো ভাবে? এর জবাবে মৃদু হাসি উপহার দেন তিনি। বললেন, 'আমি আপনাকে তেমন কিছুই বলিনি। তারা শুধু ভাবে এগুলো তাদের অর্থ। তারা ভাবে প্রতিটি পেনি তাদেরই থাকবে। তারা শুধু পারে বেসরকারি বিনিয়োগগুলোকে প্রভাবিত করতে– যেগুলো নিজেদের মতো করে চলতে দিচ্ছে আমাদের। আমার কথাই ধরুন। সম্পদ বিনিয়োগের মেধা আছে আমার। কিন্তু আমার এই মেধার ব্যবহার পুরোপুরি নির্ভর করছে যে সমাজে আমি জন্মেছি তার ওপর। আমি কোনো উপজাতীয় শিকারি সমাজে জন্ম নিলে আমার এই মেধা হতো মূল্যহীন। আমি জোরে দৌড়াতে পারি না। গায়ে তেমন বলও নেই। হয়তো আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটত কোনো বন্যপশুর পেটে গিয়ে।

কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান এমন এক সময় ও সমাজে জন্ম নিয়েছি যেখানে আমার মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে। মেধার উন্নয়নের জন্য আমাকে ভালো শিক্ষা দিয়েছে। আমি যা ভালোবাসি তা আমাকে করতে দেয়ার মতো আইন ও আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে– এসবের পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করেছে। তাই এসবের জন্য সমাজকেও কিছু ফেরত দেয়ার দায়িত্বও রয়েছে আমার।

পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ সুযোগ ভোগকারীদের একজনের মুখে এ ধরনের কথা শুনে বিস্মিত হতে পারেন অনেকে। কিন্তু তাই বলে বাফেটের কথাগুলো শুধু কোমল হৃদয়ের পরিচায়ক নয়। এটা হলো, কতটা ভালোভাবে আমাদেরকে বিশ্বায়নের প্রতি সাড়া দেয়া উচিত তার উপলব্ধি। এটা শুধু সঠিক রাজনীতিটি বেছে নেয়া নয়। মনোবলের পরিবর্তন এবং আমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভিন্ন স্বার্থটি সামনে নিয়ে আসার সদিচ্ছাটিও এর সাথে জড়িত।

বিশেষ করে সব ধরনের 'ব্যয় কমানো' বা সব ধরনের 'কর বৃদ্ধি'র অর্থ একই– এমন ভান করা বন্ধ করতে হবে আমাদের। অর্থনীতির উদ্দেশ্যসাধনে কোনো কাজে লাগে না এমন করপোরেট ভর্তুকির অবসান ঘটাতে হবে। সাধারণ পরিবারগুলো যখন চতুর্মুখী আঘাতে বিপর্যস্ত তখন করের বোঝা যতটা কম চাপানো হবে, সেটাই হবে তাদের জন্য সম্মানজনক এবং সঠিক। যেটা কম সম্মানজনক, সেটা হলো ধনী ও ক্ষমতাবানদের কর দিতে অনীহা। প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস সদস্য, রক্ষণশীল ভাষ্যকার এবং লবিস্টরা যেভাবে মধ্যবিত্তের ওপর করের বোঝাটি হালকা করে দেখানোর প্রয়াস পান, সেটাও সম্মানজনক নয়।

সম্প্রতি, এস্টেট কর বাতিল করা নিয়ে বিতর্ক এই বিভ্রান্তিকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই নীতি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে, স্বামী-স্ত্রী ৪০ লাখ ডলার পর্যন্ত আয় করলেও তাদের কোনো এস্টেট কর দিতে হবে না। ২০০৯ সাল নাগাদ এই অঙ্ক দাঁড়াবে ৭০ লাখ ডলারে। এ কারণে জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ যারা, সেই ধনীদেরও মাত্র অর্ধেক করের আওতায় আসছে। ২০০৯ সাল সেই সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসবে। এস্টেট কর পুরোপুরি বিলুপ্ত হলে আমেরিকার কোষাগারের ক্ষতি হবে এক ট্রিলিয়ন ডলারের মতো। সাধারণ আমেরিকানদের প্রয়োজন পূরণ বা দেশের দীর্ঘমেয়াদি

www.pathagar.com

স্বার্থ পূরণের জন্য কর আদায়ের এমন আর কোনো খাত নেই, যা এত কম মানুষকে প্রভাবিত করবে।

এর পরও প্রেসিডেন্ট ও তার সহযোগীদের ধূর্ত প্রচারণার কারণে ৭০ শতাংশের মতো মানুষ 'ডেথ ট্যাক্স'-এর বিরোধিতা করছে। বিভিন্ন গ্রুপ আমার অফিসে এসে বলেছে 'এস্টেট ট্যাক্স'-এর অর্থ হলো পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি। যদিও 'ডেথ ট্যাক্স'-এর কারণে দেশের একটি প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু ঘটেছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেক সিইও এসে আমাকে বলেছে, বাফেটের পক্ষে 'এস্টেট ট্যাক্স' সমর্থন করা খুব সহজ। কারণ, তার এস্টেটে ৯০ শতাংশ কর কাটা হলেও কয়েক শ কোটি ডলার থেকে যাবে তার সন্তানদের জন্য। কিন্তু মাত্র এক বা দেড় কোটি ডলারের এস্টেটের ওপর এই কর চাপানো হবে অন্যায়।

১৯৭১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে গড়পড়তা শ্রমিকদের প্রাথমিক মজুরি বা আয়ে কার্যত কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে সমাজের ধনী ব্যক্তিটির আয় বেড়েছে ৫০০ গুণ। সম্পদের 'বণ্টন রেখা'টিও মারাত্মকভাবে বেঁকে গেছে। সোনালি যুগের পর যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অপর্যাপ্ততার মাত্রা অনেক বেশি। নব্বই দশকজুড়ে এই প্রবণতা অব্যাহত ছিল। ক্লিনটনের কর নীতি এই প্রবণতাকে ধীর করেছিল মাত্র। বুশের কর নীতি একে আরো তীব্র করেছে।

আমি এ তথ্য তুলে ধরেছি এ জন্য নয় যে, রিপাবলিকানরা এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমি শ্রেণীগত হিংসা সৃষ্টি করতে চাই তা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। আমি অনেক ধনী আমেরিকানের ভক্ত। তাদের সাফল্যের জন্যও অসন্তুষ্ট নই আমি। আমি জানি, সবাই না হলেও তাদের বেশিরভাগ কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এসব অর্জন করেছেন। তারা ব্যবসা গড়ে তুলছেন, সৃষ্টি করছেন কাজের সুযোগ এবং ক্রেতাদের কাছে পণ্য বা সেবার জোগান দিচ্ছেন। আমি শুধু মনে করি, এই নতুন অর্থনীতির সুফল যারা সবচেয়ে বেশি ভোগ করবেন তাদেরকে সেই ভারটিও কাঁধে নিতে হবে, যেন প্রতিটি আমেরিকান শিশু একই রকম সাফল্য অর্জনের সুযোগ পায়। সম্ভবত আমার এই চেতনাটি আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমার মা ও নানা-নানীর কাছ থেকে। ওয়ারেন বাফেটও এই চেতনার অংশীদার।

সম্পদের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে বিপুল ব্যবধান থাকলেও আমরা একসাথে এগোব অথবা পিছিয়ে যাব, যেকোনো কিছুর চেয়ে এই চেতনা অনেক বড়। এই চেতনা কিছুতেই আমরা হারাতে পারি না। কিন্তু পরিবর্তনের গতি যতই দ্রুততর হচ্ছে; যখন কেউ এগোচ্ছে, কেউ পিছিয়ে পড়ছে– বেশিরভাগ এই সময়ে আত্মীয়তার বন্ধনের মতো চেতনা ধরে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। দেশের ব্যাপারে হ্যামিলটনের 'ভিসন' নিয়ে জেফারসনের ভয় পুরোপুরি অমূলক ছিল না। আত্মস্বার্থ ও কমিউনিটি, বাজার ও গণতন্ত্র, সম্পদ ও ক্ষমতা এবং সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে আমরা সব সময় একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছি। কিন্তু সেই ভারসাম্যটি হারিয়ে ফেলেছে আজকের ওয়াশিংটন। আমরা যখন নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের পেছনে মরিয়া হয়ে ছুটছি, ইউনিয়ন

www.pathagar.com

দুর্বল হয়ে পড়েছে, প্রেস উসকানি দিচ্ছে এবং সুবিধা হাসিলের জন্য লবিস্টদের চাপ ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে, তখন এর বিপরীত কণ্ঠগুলো খুবই দুর্বল। আমরা কে, কোথা থেকে এসেছি– এ কথাগুলো দুর্বল কণ্ঠেও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না কেউ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে জোরদার আহ্বান আসছে না কোনো কণ্ঠ থেকে।

২০০৬ সালে এক ঘুষ কেলেঙ্কারির পর যখন ওয়াশিংটনের ওপর লবিস্টদের প্রভাব খর্ব করতে নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়, তখনো বিতর্কে ওপরের প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। একটি প্রস্তাব ছিল, সিনেটরদের প্রাইভেট জেটে সস্তায় ভ্রমণের সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হোক। যদিও এই বিল পাস হওয়ার সুযোগ ছিল সামান্যই। এখনো আমার স্টাফরা বলছে, আমি যেহেতু ডেমোক্র্যাট দলের 'নৈতিক সংস্কার'-বিষয়ক মুখপাত্র, তাই আমি যেন নিজ থেকেই প্রাইভেট জেটে চড়া বন্ধ করে দিই।

এটা করাই ভালো হতো। কিন্তু আমি মিথ্যা বলব না, তা আমি চেষ্টা করেও অনেক সময় পারিনি। আমি দু'দিনের মধ্যে চারটি শহরে সফরের জন্য সময়সূচি ঠিক করে বাণিজ্যিক বিমানে টিকিট বুকিং দিয়েছিলাম। ও'হেয়ার বিমানবন্দরে গিয়ে দেখি মেমফিসের ফ্লাইট দেরি হবে। একটি শিশু আমার পায়ের ওপর 'অরেঞ্জ জুস' ফেলে দেয়। আমি যখন লাইনে অপেক্ষা করছিলাম, মাঝ বয়সী এক লোক আমার দিকে এগিয়ে আসেন। বলেন, তার আশা 'স্টেমসেল' গবেষণার ব্যাপারে কংগ্রেস কিছু করবে। তিনি জানান, তার পারকিনসন্স রোগ দেখা দিয়েছে। অথচ তিন বছর বয়সী একটি ছেলে আছে তার। যদিও আমি জানি আমার দেরি হচ্ছে। কিন্তু আমার ব্যস্ততা কেমন, তা কল্পনা করারও কথা নয় এ রকম মানুষের।

মনে মনে ভাবলাম, প্রাইভেট জেটে ভ্রমণ করলে চারপাশকে জানার কত কিছুই না বাকি থেকে যায়।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ছয়

বিশ্বাস

www.amarboi.org

আমেরিকান সিনেট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দল থেকে মনোনয়ন লাভের দু'দিন পর আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল স্কুলের এক ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ই-মেইল পাই।

ডাক্তার লিখেছেন, 'নিরঙ্কুশ ও উদ্দীপনাময়ী প্রাইমারি জয়ের জন্য আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আপনাকে ভোট দিতে পারলে খুশি হতাম। আগামী সাধারণ নির্বাচনে আপনার পক্ষে ভোট দেয়ার বিষয়টি আমি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করব। তবে শেষ পর্যন্ত হয়তোবা কোন কারণে আপনাকে ভোট দিতে পারবো না, এটাই আমার উদ্বেগের কারণ।'

ডাক্তার নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান হিসেবে তুলে ধরেন এবং নিজের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তিনি ব্যাপক এবং সর্বাত্মক আনুগত্য পোষণ করেন। তার বিশ্বাসটি গর্ভপাত ও সমবিয়ের কঠোর বিরোধিতা করে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, তার বিশ্বাস মুক্তবাজারের প্রতি অতি অনুরাগেরও বিরোধী এবং জর্জ বুশের পররাষ্ট্র নীতি জুড়ে যে সমরবাদের জয়ডঙ্কা, তার দ্রুত অবসান হওয়া প্রয়োজন।

আমার বিপক্ষে ভোট দানের ব্যাপারটি এ জন্য ডাক্তার বিবেচনা করছেন না যে গর্ভপাতের পক্ষে আমি অবস্থান নিয়েছি। অধিকন্তু তিনি আমার ওয়েবসাইটে পড়েছেন, যেসব মহিলা গর্ভের ভ্রূণ রাখা-না-রাখার ব্যাপারে নিজের ইচ্ছা বা পছন্দের অধিকার গ্রহণ থেকে দূরে থাকতে চায়, আমি সেই ডান ধারার আদর্শবাদীদের বিপক্ষে লড়ব।

তিনি বলেন– 'আমার ধারণা, ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আপনার বিবেচনাবোধ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যেকোনো রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় ন্যায়বিচারের ব্যাপারে আমার অবস্থান অনিশ্চিত থাকবে না। একই সাথে আমি এটিও জানি যে, আপনি বাকহীন অসহায়দের

www.pathagar.com

পক্ষে কথা বলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমার এও ধারণা যে, আপনি এমন একজন মুক্ত ও সুবুদ্ধির মানুষ– যার আদর্শের প্রতি উচ্চমাত্রার শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।... যেটাই আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হোক না কেন সেটাতে যথাযথভাবেই আপনি আস্থার পরিচয় দেন। আপনি যদি আসলেই বিশ্বাস করে থাকেন যে, যারা গর্ভপাতের বিরোধিতা করছে তারা নারীদের ওপর দুর্দশা চাপিয়ে দেয়ার বিকৃত আকাঙ্ক্ষার জন্যই তা করছে– তাহলে আপনি আমার বিবেচনায় ঠিক মনে করছেন না...। আপনি জানেন যে, আমরা কল্যাণের বা অকল্যাণের জন্য সংগ্রাম করার সময়ে প্রবেশ করছি, বহু মতকে একটি সাধারণ মতে রূপান্তরের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, এমন এক সময়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারব না যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে একটি দাবির বিষয়ে অন্য সবাইকে সংশ্লিষ্ট করতে চাচ্ছি...। আমি এ সময়ে আপনাকে গর্ভপাতের বিরোধিতা করতে বলছি না, আমি শুধু অনুরোধ করছি এই ইস্যুতে মুক্ত ও ভালো মন নিয়ে কথা বলুন।'

আমি তখনই আমার ওয়েবসাইটটি চেক করি। দেখি সেখানে যে বক্তব্য রয়েছে তা আমার নয়। ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির সময় বিরোধী পক্ষ 'রোয়ে ভি ওয়াদে'কে সমর্থনের ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে ইচ্ছাপন্থী (গর্ভপাতের বিষয়ে) অবস্থান নিয়ে আমার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ স্টাফরা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেয়। ডেমোক্র্যাটিক দলের রাজনীতিতে এটি ছিল সাধারণ বক্তব্য (বয়লার প্লেট), যা দলের সমর্থনভিত্তিকে ওপরে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ইস্যুতে যুক্ত অন্য পক্ষের আবেগ-অনুরাগকে এতে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। এই ইস্যুতে কোনো ধরনের দ্বৈততা বা অস্পষ্টতার মধ্যে দুর্বলতারই প্রকাশ ঘটে বলে মনে করা হয় এবং একপক্ষীয় মনোভাবের পরিচয় দেয়া হয়। এখানে গর্ভপাতবিরোধীদের বক্তব্যের কোনো অবকাশ রাখা হয় না। কোনো দুর্বলতাকে ধরে থাকাকে সঙ্গত মনে করা হয় না।

ডাক্তারের চিঠিটি আমি নতুন করে পড়ে কিছুটা লজ্জা ও বেদনা বোধ করি। আমি ভাবি হ্যাঁ, তাদের প্রতি আমার কোনো পক্ষপাত নেই– যারা নারীদের ক্লিনিকে যেতে বাধ্য করে অথবা বাধা দেয় এবং বিধ্বস্ত নারীদের টানহেঁচড়ার ছবি উঠায় এবং তলোয়ারের ডগায় ভ্রূণ নিয়ে ঘুরায়। তাদের প্রতিও পক্ষপাত নেই, যারা আজ্ঞাবহ হয়ে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মাঝে মধ্যে সহিংসতাকেও উসকে দেয়।

তবে গর্ভপাতবিরোধী এসব প্রতিবাদকারী তারা ছিল না যারা আমার নির্বাচনী প্রচারকাজের সময় মাঝে মধ্যে দৃশ্যমান হতো। আমি একবার ডাউনস্টেট কমিউনিটিতে সফরে গিয়ে ক্ষুদ্র এক প্রতিবাদের মুখে পড়েছিলাম। তাদেও চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে ছিল কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে নীরবে প্রবিবাদ জানিয়ে যাচ্ছিল তারা। আমার সমাবেশস্থলের বাইরে তাদের বক্তব্য সংবলিত ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আমাদের অনুষ্ঠানে কোনো ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি বা তাতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি। যদিও তারা এখানে হাজির হওয়ায় আমার কর্মীরা কিছুটা বিচলিত বোধ করে। প্রথমবার একটি দলের প্রতিবাদ দেখে আমার অগ্রবর্তী দল সতর্ক হয়ে যায়। তারা সজ্ঞাত

www.pathagar.com

এড়ানোর জন্য অন্য পথে সমাবেশস্থলে প্রবেশের পরামর্শ দেয় আমাকে।

গাড়ির ড্রাইভারকে আমি বলি, 'পেছনের দরজা দিয়ে আমি সমাবেশস্থলে যেতে চাই না। তাদেরকে বলো আমরা সামনের দরজা দিয়েই যাচ্ছি।'

আমরা লাইব্রেরি পার্কিংয়ের দিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে দেখি সাত বা আটজন প্রতিবাদকারী অবস্থান করছে সেখানে। একটি পরিবারের মতো ছিল তারা– যাদের মধ্যে ছিল একজন মহিলা, একজন পুরুষ ও দুই তরুণ। আমি গাড়ি থেকে নেমে দলটির কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দেই। কিছুটা ইতস্তত করে ভদ্রলোক আমার সাথে হাত মেলান এবং আমাকে তার নাম বলেন। জিন্সের প্যান্ট, পশমি শার্ট এবং সেন্ট লুইসের কার্ডিন্যাল টুপি পরা লোকটাকে দেখে আমার সমবয়সী মনে হলো। একই সাথে তার স্ত্রীও আমার সাথে হাত মেলান, তবে প্রৌঢ়া মহিলাটি একটু দূরত্বে সরে দাঁড়ান। ১০ বছর বয়সের শিশুটি অকপট অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

আমি বলি, 'আপনারা কি ভেতরে আসতে চান?'

লোকটি জবাব দিলো– 'না, আপনাকে ধন্যবাদ।'

তিনি আমাকে একটি লিফলেট হাতে দিলেন। বললেন, 'মি. ওবামা, আমি আপনাকে জানাতে চাই, আপনি যা বলছেন তার অনেক কিছুর সাথেই আমি একমত।

আমি বললাম, 'এ জন্য আপনার প্রশংসা করি।'

তার জবাব, 'আমি জানি আপনি একজন খ্রিষ্টান, সাথে আপনার পরিবারও।'

'আপনি যথার্থই বলেছেন'– বললাম আমি।

'তবে, কিভাবে আপনি শিশুহত্যাকে সমর্থন করেন'–তার প্রশ্ন।

তাকে বলি আপনার অবস্থান আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তবে এর সাথে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করি আমি। নিজের বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়ে আমি বলি যে, কিছু মহিলা তাদের গর্ভের ভ্রূণ রাখতে চান না, কোনো গর্ভবতী মহিলা এর সাথে নৈতিক ইস্যুসংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন এবং সচেতনভাবে তার হৃদয়ভাঙা কষ্টকর সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। আমার ভয় গর্ভপাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা তাদেরকে অনিরাপদ গর্ভপাতের দিকে ঠেলে দেবে। তারা অনিরাপদ গর্ভপাত এ দেশে করতে পারে এবং এটা হলে যারা তা করবে এবং যেসব ডাক্তারের সেবা এ ক্ষেত্রে তারা নেবে উভয়েই বিচারের সম্মুখীন হবেন– যদি এ ব্যাপারে কোনো আইন তৈরি করা হয়। আমার বক্তব্য হলো– সম্ভবত এ ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি, যেসব মেয়ে গর্ভপাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনাকে অগ্রাধিকার বলে ঠিক করতে পারি আমরা।

লোকটি শান্তভাবে আমার কথা শুনলেন এবং লিফলেটে উল্লিখিত প্রতিদিন জন্ম না নেয়া শিশুর সংখ্যাটি শোনালেন আমাকে। কয়েক মিনিট পর আমি বললাম– ভেতরে অপেক্ষমাণ অতিথিদের সম্ভাষণ জানাতে যেতে হবে আমাকে, আপনারা যদি চান ভেতরে

www.pathagar.com

যেতে পারেন। লোকটি ভেতরে যেতে আবারো অস্বীকৃতি জানান। তার স্ত্রী আমাকে বললেন, 'আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করব, আমি প্রার্থনা করব যাতে আপনার হৃদয়-মনে পরিবর্তন আসে।'

আমার হৃদয় বা মন কোনোটাতেই সেদিন পরিবর্তন আসেনি, পরিবর্তন আসেনি পরবর্তী দিনগুলোতেও। তবে আমি সেই পরিবারের কথা মনে রেখে ফিরে এসে সেই ডাক্তারের কাছে ই-মেইল করি এবং তার পাঠানো ই-মেইলের জন্য ধন্যবাদ জানাই। পরের দিন আমি ই-মেইলটি আমার স্টাফদের কাছে সরবরাহ করি এবং আমার ওয়েবসাইটে গর্ভপাত বিষয়ে আমার ইচ্ছাপন্থী অবস্থানকে পরিষ্কার করতে ভাষায় পরিবর্তন আনি। সেই রাতেই ঘুমানোর আগে আমি নিজে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমার অনুমিত কল্যাণময়ী বিশ্বাসের বিস্তৃতি ঘটে ডাক্তার ও অন্যদের মধ্যে।

এটা সত্য যে, আমরা আমেরিকানরা ধার্মিক। একেবারে অতি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায়, ৯৫ শতাংশ আমেরিকান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি গীর্জায় যান, ৩৭ শতাংশ নিজেদের একনিষ্ঠ খ্রিষ্টান মনে করেন এবং এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক বিবর্তনের পরিবর্তে ঈশ্বরদূতে বিশ্বাস করেন। ধর্ম শুধু প্রার্থনা কেন্দ্রে সীমিত নয়। আমেরিকায় মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিষয়ে লেখা বইগুলো লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। খ্রিষ্টান মিউজিক ফাইল, বিলবোর্ড চার্ট এবং ব্যাপক পরিসরের নতুন নতুন গীর্জা প্রধান প্রধান শহরে দেখা যায়। ডে-কেয়ার থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে যাজকদের উপস্থিতি দেখা যায়। আমাদের প্রেসিডেন্ট নিয়মিত স্মৃতিচারণ করেন, যিশুখ্রিষ্ট কিভাবে তার হৃদয়ে পরিবর্তন এনেছেন। ফুটবল খেলোয়াড়রা বল স্পর্শের আগে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন যেন স্বর্গ থেকে তিনি তা দেখছেন।

এ ধরনের ধর্মানুভূতি কিছুটা নতুন মনে হতে পারে। কঠোর ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ 'ক্যালভিনিজমের' (এই প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে যিশুখৃষ্টের ওপর বিশ্বাস রাখলেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়) মতো ধর্মীয় শাস্তি ও রীতি থেকে রেহাই পেতে অনেকে আমাদের কাছে আসে। ইভানজেলিক্যালের প্রভাব দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। অভিবাসীরা অদ্ভুত এক নতুন দুনিয়ায় বাস করতে হয়তো এ ধরনের বিশ্বাসে নোঙর করছে। ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় সক্রিয়তা আমাদের কিছু শক্তিমান রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছে। উইলিয়াম জেনিংস ব্রানায়ানের উত্তর আমেরিকার সমতলভূমির জনপ্রিয় নাগরিক আন্দোলনকে দমন করা এর মধ্যে একটি।

৫০ বছর আগের সবচেয়ে খ্যাতনামা সাংস্কৃতিক বিশ্লেষককে আমেরিকার ধর্মীয় ভবিষ্যৎ কেমন– প্রশ্ন করা হলে নিঃসন্দেহে জবাব আসত, এর প্রভাব ক্রমেই কমছে। বলা হয়, বিজ্ঞান, সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে পুরনো আমলের ধর্মীয় প্রভাব বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ এখনো প্রতি রোববার গীর্জায় যায়, সাউদার্ন রিভাইবাল সার্কিটে বাইবেল-ভক্তরা এখনো ধর্মীয় প্রচার

www.pathagar.com

চালান। একসময় ম্যাককার্থিজম ও রেড স্ক্যায়ার মতোবাদের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে ঈশ্বর-বিহীন কমিউনিজমের আতঙ্ক। তবে সনাতন ধর্মীয় রীতি এবং কিছু ধর্মীয় মৌলবাদ আধুনিকতার সাথে মানানসই নয় বলে মনে করা হয় অধিকাংশ এলাকায়। এমনকি পণ্ডিত, একাডেমিক ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত এক সময় বিলি গ্রাহামের ক্রুসেড মনুমেন্টকে উৎসুক অরাজকতা হিসেবে বিবেচনা করতেন। সূচনাকালে আধুনিক অর্থনীতি অথবা পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই বলেই মনে করা হতো।

ষাটের দশক এবং এর পরবর্তীকালে প্রধান ধারার প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক নেতারা উপলব্ধি করেন, আমেরিকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকতে হলে বা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে হলে সময়ের পরিবর্তনের সাথে একাত্ম হতে হবে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং বাইবেলের সামাজিক দিকগুলোকে অর্থনৈতিক অসাম্য, বর্ণবাদ, মৌলবাদ ও আমেরিকান বস্তুবাদ ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনতে হবে।

এরপর কী ঘটলো? আমেরিকানদের ধর্মীয় উৎসাহে ভাটা পড়ার বিষয়টিকে সব সময় বাড়িয়ে দেখানো হয়। এ ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে 'উদারনৈতিক আভিজাত্যবাদের' রক্ষণশীল সমালোচকদের একটি জোরালো সত্য-পরিমাপ রয়েছে। সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, বৃহৎ নগর কেন্দ্রগুলোতে, একাডেমিক ব্যক্তিদের মধ্যে, সাংবাদিকদের মধ্যে এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে ধর্মীয় চর্চার বিষয়টি প্রশংসা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। দেশের প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমেরিকার ধর্মীয় প্রেরণাকে স্বীকৃতি দিতে না পারায় একসময় ধর্মীয় উদ্যোগ শিল্পোন্নত দুনিয়ায় বেমানান হয়ে পড়ে। দৃশ্যপট থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা হলেও তখনো দেশটির মূল ভূমি এবং বাইবেল বিশ্বাসীদের মনে ধর্মের জীবনীশক্তি টিপটিপ করে জ্বলতে থাকে। আর সেই সাথে একটি সমান্তরাল বিশ্ব এগিয়ে আসে– যেখানে জীবনীশক্তির পুনরুজ্জীবনই ঘটেনি, একই সাথে সমৃদ্ধিও লাভ হয়। তবে খ্রিষ্টান টেলিভিশন, রেডিও, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক এবং বিনোদন কেন্দ্র লোকসংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে ধার্মিকদের উদ্বুদ্ধ করে।

ইভানজেলিক্যালদের (সুসমাচার মতবাদে বিশ্বাসী) অনেকে রাজনীতিতে যুক্ত হন– যাদের দৃষ্টি থাকে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের দিকে এবং এরা সিজারের প্রতি নিজেদের মর্যাদাকে সমর্পণ করেন। ষাটের দশকের সামাজিক অভ্যুত্থানের কারণে অনিশ্চিত দুঃখজনক পরিণতি ভোগ থেকে নিষ্কৃতির জন্য তারা এটি করে থাকতে পারেন। দক্ষিণের খ্রিষ্টানদের মনে ঐতিহ্যগত দক্ষিণাঞ্চলীয় জীবনের ভিত্তির প্রতি বহুমুখী আঘাতের বিষয়টি সক্রিয় ছিল। ফেডারেল কোর্ট স্কুলে প্রার্থনা বন্ধের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি এ আঘাত আসে। আমেরিকাব্যাপী আন্দোলন, যৌন-বিপ্লব, গে ও লেসবিয়ানদের সোচ্চার হওয়া এবং বোয়ে ভি. ওয়াদের সুপ্রিম কোর্টের শক্তিমান সিদ্ধান্তে বিয়ে, যৌনতা এবং নারী-পুরুষের যথাযথ সম্পর্ক নিয়ে গীর্জা-শিক্ষার প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়। হাস্যস্পদ ও আক্রান্ত হওয়ার অনুভূতির ফলে রক্ষণশীল খ্রিষ্টানরা দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতায় নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয় বলে মনে করে। অধিকন্তু তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, যিনি প্রথম

www.pathagar.com

ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টবাদের ভাষাকে আধুনিক রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। আর ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তোলা ইভানজেলিক্যালদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া শুরু করে আর উদারবাদী অর্থডক্সদের বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগায়।

রোনাল্ড রিগ্যান, জেরি ফলওয়েল, প্যাট রবার্টসন, র‍্যালফ রিড এবং চূড়ান্তভাবে কার্ল রোভ ও জর্জ ডব্লিউ বুশ কিভাবে এই খ্রিষ্টান সেনাদের তাদের সৈনিক বানিয়েছেন সে কাহিনী এখানে পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এটা বলাই যথেষ্ট যে, শ্বেতাঙ্গ ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানরা রক্ষণশীল ক্যাথলিকদের মতোই তৃণমূল পর্যায়ে রিপাবলিকান পার্টির হৃদযন্ত্র এবং আত্মার মতো হয়ে যায়। পুরোহিতদের একটি নেটওয়ার্ক এবং গণমাধ্যমে তাদের প্রচার এই তৃণমূল ভিত্তিকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। গর্ভপাত, সমবিয়ে, স্কুল প্রার্থনা, বুদ্ধিবৃত্তিক নকশা, কোর্ট হাউসে দশ ঐশী বিধান (টেন কমান্ডমেন্টস) প্রেরণ, গৃহ স্কুল, ভাউচার পরিকল্পনা এবং সুপ্রিমকোর্ট গঠনের বিষয়কে বারবার শিরোনামে নিয়ে আসা হয় এবং আমেরিকান রাজনীতিতে একটি প্রধান বিচ্যুতি রেখা হিসেবে এসব ইস্যুকে তুলে ধরা হয়। দলীয় সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে দুই রাজনৈতিক দলে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মধ্যে একক বৃহত্তম ব্যবধান নারী বা পুরুষ অথবা তথাকথিত রেড রাজ্য বলয় বা ব্লু রাজ্যগুলোয় বসবাসকারীদের মধ্যে নয়। তবে যারা নিয়মিত গীর্জায় যান অথবা যারা যান না তাদের মধ্যে এ ব্যবধান অনেক। অন্য দিকে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন বলয়ের বড় অংশ সেক্যুলার মানসিকতাসম্পন্ন হলেও ধর্মের সমর্থন পেতে তারাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভয় নিঃসন্দেহে যথার্থই হতে পারে যে, আগ্রাসী খ্রিস্টান এজেন্ডা তাদের জন্য কোনো স্থান অবশিষ্ট রাখবে না অথবা তাদের জীবনের পছন্দের জন্য কোনো অবকাশ রাখবে না।

তবে খ্রিষ্টান অধিকারের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়টি কাহিনীর একটি অংশমাত্র। নৈতিক সংখ্যাগুরু এবং খ্রিষ্টান কোয়ালিশন ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের অগ্রযাত্রার শিকার হতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টবাদের শুধু টিকে থাকাই নয়, বরং আধুনিক উচ্চ প্রযুক্তির আমেরিকাকে সমৃদ্ধ করতে তাদের ক্ষমতার বিষয়টিও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক পর্যায়ে যখন মূল ধারার প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জাগুলো দ্রুত তাদের সদস্যপদ হারায়, তখন এর বিপরীতে ইভানজেলিক্যাল গীর্জাগুলোর বিকাশ ঘটতে থাকে দ্রুতগতিতে। অন্য কোনো আমেরিকান প্রতিষ্ঠান তাদের সদস্যদের অঙ্গীকার ও অংশগ্রহণকে এই মাত্রায় নিয়ে যেতে পারছে না। ইভানজেলিক্যালদের শক্তিমত্তা মূল ধারায় নিয়ে যাচ্ছে তাদের।

ইভানজেলিক্যালদের এই সাফল্যের নানা রকম বিশ্লেষণ হয়েছে। এর মধ্যে তাদের ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব বিস্তারে বিশেষ দক্ষতা ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। তবে এই সাফল্যের পেছনে তাদের 'পণ্য' বাজারজাতকরণে যে অতৃপ্ত বাসনা এবং যে কোনো ইস্যু বা আদর্শিক উদ্দেশ্য পূরণে তাদের ঐকান্তিকতা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার আমেরিকান শিশুকে স্কুলে পৌঁছে দেয়া, অফিসে ড্রাইভ করে যাওয়া,

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী সম্মেলনে যোগ দিতে বিমানে চাপা, শপিংমলে কেনাকাটা, খাবার গ্রহণ ইত্যাকার দৈনন্দিন কাজে কিছু একটা বাদ পড়ে যাওয়ার উপলব্ধি সৃষ্টি করতে পারে তারা। তারা বলে, তাদের কাজ, তাদের পেশা, তাদের ড্রাইভিং, ব্যবসায়ী আলোচনাটাই যথেষ্ট নয়, একই সাথে তাদের জীবনে এমন কোনো আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হতে হবে, যা তাদের অব্যাহত একাকিত্বে স্বস্তি বয়ে আনবে, ব্যস্ততার ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দেবে, দৈনন্দিন জীবনে নির্মমতার বেদনা দূর করবে। প্রয়োজনে কেউ একজন অন্তরাল থেকে তাদের দেখবে, কথা শুনবে, তারা দীর্ঘ হাইওয়ে ভ্রমণে নিঃসঙ্গ একাকী ছুটে চলবে না, কোনো এক অবলম্বন থাকবে অদৃশ্যে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমেই গভীর হয়ে ওঠার ব্যাপারে আমার কোনো অন্তর্দৃষ্টি যদি থেকে থাকে তার কারণ– এটা এমন এক রাস্তা যে পথে ভ্রমণ করেছি আমি।

একটি ধার্মিক পরিবারে আমার জন্ম। আমার নানা-নানী কানসাসে শিশুকাল থেকে ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে বেড়ে ওঠেন। আমার নানার মা আত্মহনন করেছিলেন। এর পর তার পিতাও হঠাৎ করে কোন খোঁজ খবর না দিয়েই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ফলে একজন ব্যাপ্টিস্ট পালক পিতার কাছে বেড়ে উঠেছিলেন আমার নানা। অন্য দিকে আমার একটি ছোট্ট শহরে বসবাসকারী নানীর পিতা-মাতার অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও তারা সেই মহামন্দার শিকার হয়েছিলেন। নানীর পিতা একটি তেল শোধনাগার আর মা একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের ক্ষেত্রে তারা দুজনেই ছিলেন একনিষ্ঠ।

তবে আমার নানা-নানী হয়তো একই কারণে কানসাসে তাদের বসবাসের ইতি ঘটিয়ে হাওয়াইয়ে চলে যান। ধর্মীয় বিশ্বাস কখনো তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়নি। আমার নানী বরাবরই অধিক মাত্রায় যুক্তিপ্রবণ ছিলেন, যা তিনি দেখেননি, অনুভব করেননি, স্পর্শ করেননি অথবা গুনে দেখেননি তা সহজে গ্রহণ করতে চাইতেন না। আমাদের পরিবারের মূল স্বপ্নদ্রষ্টা আমার নানা ছিলেন একধরনের অস্থিরপ্রবণ মানুষ। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার মধ্যে বারবার পরিবর্তন আসে। তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে এটার কোনো মিল পাওয়া যেত না। যেমন তিনি স্বভাবজাতভাবে ছিলেন বিদ্রোহী মনোভাবের, খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মশৃঙ্খলা মানতেন না এবং অন্যের দুর্বলতা সহ্য করার ব্যাপারে ছিলেন উদার। সব কিছু বড়ভাবে নেয়ার ক্ষেত্রে তাকে এটি নিবৃত্ত করত।

পিতা-মাতার এ দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য হয়তোবা আমার নানাকে আমুদে মনোভাবের করেছে এবং নিজেকে বা অন্যদের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে তাকে খানিকটা অসমর্থ করে তোলে, যা আমার মায়ের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। কানসাস, ওকলাহামা ও টেক্সাসের ছোট শহরে বেড়ে ওঠার নিজের অভিজ্ঞতা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা তৈরি করে। আমার মায়ের তরুণী বয়সের খ্রিষ্টধর্মের

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি আমি জানতে পারিনি। তবে আমার কল্যাণের জন্য মাঝে মধ্যে তিনি আবেগময়ী উপদেশ দিতেন, যা বিশ্ব জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে অজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে খারিজ করে দিত। যারা পরকালে চিরন্তন সুখের জন্য সময় ব্যয় করছেন তাদের প্রতি মার সহানুভূতি দেখিনি। তিনি তখন জোর দিয়ে বলতেন পৃথিবী ও স্বর্গ সাত দিনে সৃষ্টি হয়েছে এ ধারণা ভূতাত্ত্বিক, জ্যোতি বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার যুক্তির সাথে একেবারেই মেলে না। অবশ্য তিনি চার্চে যাওয়া সেই মহিলাকে সম্মান করতেন, যিনি এড়িয়ে চলতেন অবৈধ সম্পদের মালিকদের। এমনকি যারা নিজেদের ক্ষুদ্র নেতিবাচক গোপন কোন কথা চাপা দেয়ার চেষ্টা করতো তাদেরও। চার্চের ফাদার যিনি কোনো রাখঢাক না করে তার কর্মচারীদের বর্ণবাদী কাজের জন্য গালমন্দ করতেন তাকেও তিনি পছন্দ করতেন।

আমার মা মনে করতেন, কঠোরতা এবং ন্যায়নিষ্ঠতাকে দমন করার মধ্য দিয়ে সংগঠিত ধর্ম বারবার বদ্ধ চিন্তার বিকাশ ঘটায়। বারবার পাল্টে যায় ধর্মানুরাগের লেবাস। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আমার জন্য ধর্মীয় কোনো পরামর্শ রেখে যাননি। তার চিন্তা অনুযায়ী বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মের কর্মজ্ঞান যেকোনো সুশিক্ষার অনিবার্য একটি অংশ। আমাদের গৃহসজ্জার মধ্যে গ্রিক, নরওয়েজীয় ও আফ্রিকান মাইথোলজির (পুরাণতত্ত্ব) পাশাপাশি সাজানো ছিল বাইবেল, কুরআন ও ভগবদ্‌গীতা। ইস্টার সানডে অথবা খ্রিস্টমাস ডে'তে আমার মা আমাকে চার্চে নিয়ে যেতেন। একইভাবে তিনি চীনা নববর্ষ উৎযাপন উপলক্ষে বৌদ্ধ মঠেও নিয়ে যেতেন। কিন্তু আমি বুঝলাম, এ ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমার সুনির্দিষ্ট কোনো অঙ্গীকারের প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না কোনো অন্তর্বীক্ষণ অথবা আত্মপ্রায়শ্চিত্তের। আমার মা ব্যাখ্যা করতেন, ধর্ম হলো মানব সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ, একমাত্র পরিমাপক নয়। এটি অনেক পথের একটি এবং এটিই সর্বোত্তম পথ হবে এমনটা নাও হতে পারে। মানুষ সব সময় অজানার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং আমাদের জীবন সম্পর্কিত গভীর সত্য বুঝতে চায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম সম্পর্কে আমার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গিটা নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখার মতো। হয়তোবা এটি সুবিধাজনক সম্মানের সাথে দেখার দৃশ্যপট, তবে সুবিধাজনক বিচ্ছিন্নতাও একই সাথে। অধিকন্তু শিশু হিসেবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভিন্নমত পোষণকারীদের সংস্পর্শে আমার আসা হতো কদাচিৎ। আমি শৈশবে বাবার সান্নিধ্য মোটেই পাইনি। আমার বয়স যখন দুই বছর তখন মায়ের সাথে বাবার বিচ্ছেদ ঘটে। আমার বাবা মুসলিম পরিবার থেকে এলেও আমার মায়ের সাথে যখন তার সাক্ষাত ঘটে তখন তিনি ছিলেন একজন নাস্তিক। তিনি মনে করতেন, ছোটকালে কেনিয়ার গ্রামে দেখা তান্ত্রিক কবিরাজ মামবো-জামবোর দেখানো তুকতাকের মতো অন্ধবিশ্বাস ছাড়া ধর্ম আর কিছুই নয়।

আমার মা যখন আবার বিয়ে করেন তার সেই ইন্দোনেশীয় স্বামীও ছিলেন ধর্মের ব্যাপারে একই ধরনের সংশয়বাদী। বাস্তব জীবনে কারো কাজে লাগার মতো কিছু বলে ধর্মকে মনে করতেন না তিনি। তিনি এমন এক দেশে বেড়ে ওঠেন যেখানে ইসলামি

www.pathagar.com

বিশ্বাসের সাথে হিন্দুত্ব, বৌদ্ধ ধর্ম এবং প্রাচীন গুহাজীবনের ঐতিহ্যের অবশিষ্টাংশ সহজে মিশিয়ে ফেলা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় আমার সৎ পিতার সাথে থাকার সময় প্রথমে আমাকে কাছাকাছি একটি ক্যাথলিক স্কুলে পাঠানো হয় এবং পরে একটি মুসলিমপ্রধান স্কুলে ভর্তি করা হয়। আমার মা কখনোই ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা অথবা মাগরিবের নামাজের মুয়াজ্জিনের আজানের অর্থ জানছি কি না তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না, বরং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন আমি গুণ-ভাগের অঙ্ক ঠিকমতো শিখছি কি না তা নিয়ে।

যদিও আমার মা আত্মস্বীকৃত সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী ছিলেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নৈতিক চেতনার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি দয়া, পরোপকার, ভালোবাসা ইত্যাদির ব্যাপারে সহজাতভাবে অবিচল ছিলেন। তার জীবনের বড় অংশ পেরিয়ে গেছে একান্ত সহজ-সরলভাবে। এতে কোনো কোনো সময় তার ক্ষতিও হয়েছে। তিনি কোনো ধর্মীয় বইপুস্তক অথবা কর্তৃপক্ষের সহায়তা ছাড়া রোববারের আমেরিকান ধর্মীয় স্কুলে সততা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ধারণ এবং কঠিন পরিশ্রমী হওয়ার মতো গুণগুলোর যে শিক্ষা দেয়া হয় তা আমার মধ্যে মূল্যবোধ আকারে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অসত্য ও অবিচারকে ঘৃণা করতেন এবং যারা তা করতেন তাদের এড়িয়ে চলতেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি অদ্ভুত এক চেতনা লালন করতেন। জীবন এবং এর সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তী প্রকৃতির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধাকে বর্ণনা করা যায় একান্ত নিবেদিত হিসেবে। সময়ের আবর্তনের নানা পর্যায়ে তিনি পেইন্টিং দেখতেন, কবিতার লাইন পড়তেন, গানের কলি শুনতেন এবং আমি দেখতাম তখন তার কপোল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি বেড়ে ওঠার সময় কোনো কোনো দিন তিনি আমাকে মধ্যরাতে জাগিয়ে দিতেন এবং সাথে নিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে স্থির নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। অথবা শেষ বিকেলে আমাকে সাথে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতেন আর গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি শুনতেন। তিনি যেকোনো শিশুকে ভালোবাসতেন। তিনি তাদের স্কুলে নিতেন, আদর করতেন, খেলা করতেন। তাদের চামড়া, হাড় পরখ করে দেখতেন, সত্য আবিষ্কার করতে চাইতেন। তিনি সব কিছুতে বিস্ময় দেখতেন, জীবনের বাঁকে বাঁকে নানা বিস্ময়ে আনন্দ পেতে চাইতেন।

অবশ্যই আমি বুঝতে পারি, মায়ের সেই পুরনো বিষয়গুলো আমার চেতনাকে কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিভাবে বাবার অনুপস্থিতিতেও আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি। কিভাবে সম্ভাব্য চড়াই উৎরাতে আমাকে সাহায্য করেছেন। কিভাবে শেষ পর্যন্ত যে পথ আমি খুঁজে পেয়েছি তা পেতে সহায়তা করেছেন। আমার উদ্দীপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়তো আমি বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার জানা, সাফল্য ও ব্যর্থতা, আমার কোনো অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা পাওয়ার কামনা এবং আমার রাগ ও ক্ষোভ সব কিছুতে আছেন তিনি। তবে আমার মা আমার বিশ্বাসের মৌলিক ভীত তৈরি করে দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণ এবং এটিই মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়ার শিক্ষা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন মানুষের কল্যাণের মধ্য

www.pathagar.com

দিয়েই হওয়া উচিত– এই শিক্ষা মায়ের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তার মূল্যবোধগুলোকে খুঁজে পেতে আমি রাজনৈতিক দর্শন পড়েছি, সমাজ বিনির্মাণে সাহায্য এবং প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে তার কাজ ও ভাষা দুটোকে অবলম্বন করেছি। এসব মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগ দেখার জন্য কলেজের শিক্ষা শেষ করার পর আমি শিকাগোতে কিছু দিন চার্চের জন্য কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ নিই। এ সময় বেকার, মাদকাসক্ত ও হতাশাগ্রস্তদের মাঝে এসব মূল্যবোধ সঞ্চারিত করার চেষ্টা আমি করেছি।

শিকাগোতে আমার কাজ কিভাবে জীবন গঠনে ভূমিকা রেখেছে তা আমার আগের বইয়ে আমি উল্লেখ করেছি। যাজক এবং সাধারণ মানুষের সাথে আমার কাজ কিভাবে গণজীবন নির্বাহে আমাকে গভীরভাবে অভ্যস্ত করেছে, কিভাবে তা আমার ব্যক্তিগত পরিচয়কে দৃঢ় করেছে এবং সাধারণ মানুষের মাধ্যমে অসাধারণ কিছু করার ব্যাপারে আমার প্রতীতিকে সুদৃঢ় করেছে তা সেই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে শিকাগোর আমার অভিজ্ঞতা আমাকে এমন এক উভয় সঙ্কটে ফেলে, যার সমাধান আমার মা তার সারা জীবনে করতে পারেননি। বস্তুত আমার একান্ত কোনো সম্প্রদায় অথবা বিনিময় করার মতো ঐতিহ্য ছিল না যা আমার বিশ্বাসকে গভীরতর করার ভিত্তি হতে পারে। আমি যাদের সাথে কাজ করেছি সেই খ্রিষ্টানদের একজন হিসেবে আমি নিজেকে স্বীকৃতি দিই, তারা দেখে যে আমি তাদের বই পড়ছি, তাদের মূল্যবোধ শেয়ার করছি, তাদের গান গাইছি। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে যে, আমার একটি অংশ তাদের কাছ থেকে যেন আলাদা ও বিচ্ছিন্ন, আমি তাদের মধ্যে থেকেও যেন কেবলই একজন পর্যবেক্ষক। আমি উপলব্ধি করি, আমার বিশ্বাসের জন্য একটি বাহন ছাড়া, কোনো সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের প্রতি দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার ছাড়া আমি একটি পর্যায় পর্যন্ত শুধু সমর্পিতই হয়ে থাকব, হয়ে থাকব উপাদানের মতো। মুক্ত থাকার পথ অবলম্বন করে আমার মা মুক্তই ছিলেন। তবে তিনি একই সাথে ছিলেন একাকীও। চূড়ান্তভাবেও একাকিত্বই ছিল তার সঙ্গী।

এ ধরনের স্বাধীনতার তুলনামূলক একটি মন্দ দিকও ছিল। তবে আমার মা বিশ্বের নাগরিক হিসেবে সুখে ছিলেন। যেখানেই তিনি গেছেন সেই কমিউনিটিতে বন্ধুত্বের বন্ধন তৈরী করেছেন। তার প্রয়োজন পূরণের জন্য, নিজের কাজকে অর্থবহ করার জন্য এবং সন্তানদের জন্য তিনি এ সম্পর্ক রচনা করেন। এ ধরনের একটি জীবনে আমি নিজেও সুনির্দিষ্টভাবে সনাতন কৃষ্ণাঙ্গ চার্চে না-ও যেতে পারতাম। এটি আমার পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতাকে থিতু করত এবং খ্রিষ্টান বিশ্বাসকে গ্রহণে সাহায্য করত আমাকে।

একটি বিষয়ে আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম– সেটি ছিল আফ্রিকান-আমেরিকানদের সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ক্ষমতা। একান্ত প্রয়োজন ছাড়াও কৃষ্ণাঙ্গ চার্চ সব ব্যক্তিকে সাহায্য করত। প্রয়োজন না হলেও কৃষ্ণাঙ্গ চার্চ কদাচিৎ সামষ্টিক কল্যাণ থেকে ব্যক্তির কল্যাণকে পৃথক করে দেখত। পুরো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং একই সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু

www.pathagar.com

হিসেবে ভূমিকা রাখত এই চার্চ। এটি ক্ষুধার্তকে খাদ্য দানে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দানে বাইবেলের আহ্বানের পথটি বুঝত এবং এর বিপরীত ক্ষমতা ও নীতিমালাকে প্রয়োজন হলে চ্যালেঞ্জ করত। এই সংগ্রামের ইতিহাসে আমি এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে শুধু ক্লান্তি দূর করায় স্বস্তি অথবা মৃত্যুর বিপরীতে রক্ষাকবচই নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু হিসেবেই দেখেছি। অধিকন্তু তা ছিল সব সময় সক্রিয় এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের বোধগম্য প্রতিনিধির মতো। নারী বা পুরুষের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও আমি প্রতিদিনই চার্চে গিয়েছি, 'পথহীনতার মধ্যেও পথ বের করা'র সামর্থ্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং তপ্ত মরুর মধ্যেও আশা ও মর্যাদার সঞ্চারণ দেখেছি। আমি সেখানে দেখি শব্দ প্রকাশের শক্তি। সেই শব্দ কিভাবে প্রকাশ হয় তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

সম্ভবত বিশ্বাস খুঁজে পাওয়ার সংগ্রামে আহরিত কষ্টকর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গ চার্চ আমার সামনে দ্বিতীয় একটি অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত করে দেয়। এ বিশ্বাসের অর্থ এ নয় যে আপনার কোনো সংশয় এতে থাকবে না অথবা এর ওপরই আপনার পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে দেবেন। বহু আগে ইভানজেলিস্টদের মধ্যে এটি একটি রীতিতে পরিণত হয়। আদর্শ কালো যাজকরা খোলামেলা স্বীকার করতেন যে, তারাসহ সব খ্রিষ্টান একই ধরনের লোভ-লালসা, ক্ষোভ, রাগ-অনুরাগ, জৈবিক কামনার শিকার হতে পারেন। বাইবেলীয় গান 'দি হ্যাপি ফিট' ও 'টিয়ার্স অ্যান্ড সাউটস' সব কিছুকে উপলব্ধি ও স্বীকৃতির কথা বলে এবং চূড়ান্তভাবে এসব আবেগকে প্রবাহিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপী ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্তের মধ্যকার রেখাটি অনেক নমনীয়। যারা চার্চে আসেন তাদের পাপ আর যারা চার্চে আসেন না বা চার্চ নিয়ে হাসি, তামাশা বা নিন্দা করেন তাদের পাপের মধ্যে পার্থক্য নেই। আপনার চার্চে আসার প্রয়োজন এ জন্য যে, আপনি এ পৃথিবীতেই আছেন, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নন। ধনী, গরিব, পাপী, পাপমুক্ত নির্বিশেষে আপনি খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করছেন, এ জন্য যে আপনার অনেক পাপ রয়েছে যা মুছে ফেলা দরকার– কারণ আপনি মানুষ ছিলেন এবং আপনার জটিল জীবন-সফরে মিত্র প্রয়োজন। এটি এ সফরের শিখর ও উপত্যকাকে আপনার জন্য সহজ করবে এবং বাঁকা পথকে সহজ করে দেবে।

আমার নতুন উপলব্ধি অনুসারে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা অঙ্গীকারের জন্য জটিল চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন থেকে বিরত হওয়া অথবা যে পৃথিবীকে আমি জানি ও ভালোবাসি তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার প্রয়োজন নেই। একদিন তা আমাকে ট্রিনিটি-ইউনাইটেড চার্চে যেতে সাহায্য করে এবং আমি ব্যাপ্টিটাইজড হই, দীক্ষা গ্রহণ করি। এটি আমার কাছে আসে একান্ত পছন্দ হিসেবে, চাপিয়ে দেয়া বিষয় হিসেবে নয়। তবে শিকাগোর দক্ষিণ প্রান্তের সে গির্জায় নতজানু হয়ে যখন বসি তখন আমি অনুভব করি ঈশ্বরের চেতনা যেন আমাকে ইশারায় ডাকছে। আমি তার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি এবং নিবেদিত করি নিজেকে তার সত্য আবিষ্কারের জন্য।

www.pathagar.com

বিশ্বাস নিয়ে গভীর আলোচনা আমেরিকান সিনেটে কদাচিৎ হয়ে থাকে। কেউ একজন অন্য কারো ধর্মীয় সম্পৃক্ততা নিয়ে কথা বলেন না। আমি সিনেটের ফ্লোরে বিতর্কের সময় ঈশ্বরের নাম খুব কমই শুনেছি। সিনেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক ব্যারি ব্ল্যাক একজন বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। সাবেক নৌবাহিনীর যাজকদের প্রধান এই আফ্রিকান-আমেরিকান বাল্টিমোরের এক কঠিন পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। প্রভাতের প্রার্থনা, বাইবেলের স্বেচ্ছা-অধ্যয়ন ক্লাসের আয়োজন, প্রার্থিতদের বাইবেলের আধ্যাত্মিক পরামর্শ দান ইত্যাকার সীমিত দায়িত্ব তিনি পালন করেন। উষ্ণ ও নিবেদিত প্রাণ নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এই যাজক। বুধবারের প্রভাতী প্রার্থনার প্রাতভোজন ছিল পুরোটাই ঐচ্ছিক, নির্দলীয় ও সার্বজনীন প্রতিনিধিত্বমূলক (সিনেটর নর্ম কোলম্যান ছিলেন ইহুদি– যিনি রিপাবলিকান পক্ষের বর্তমান প্রধান সংগঠক)। যারা এখানে হাজির হতে চাইতেন তারা বাইবেলালয়ের কোনো পথ বেছে নিয়ে গ্রুপ আলোচনায় অংশ নিতেন। মিস্টার সিক স্যান্টোরাম, শ্যাম ব্রাউনব্যাক অথবা টম কোরার্নের মতো অত্যন্ত ধার্মিক সিনেটরও সেখানকার সততা, সরলতা, নিগ্রহ নিয়ে ভালো কৌতুক শুনতেন এবং এই প্রাতভোজে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়-আশয়ে তারা মতবিনিময় করতেন। রাজনীতিতে বিশ্বাসের প্রভাবকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হচ্ছে বলে ধারণা করে কেউ ক্ষুব্ধ হতেন। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় একটি ভারসাম্য আনা এবং রাজনৈতিক কৌশলের জন্য রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাবের বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখতেন।

সিনেটের চার দেয়ালের বাইরে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা খানিকটা কম নাগরিকসুলভ মনে হতে পারে। ২০০৪ সালে আমার রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রদূত অ্যালান কেইস প্রচারকাজের সময় ভোটারদের সমর্থন লাভের জন্য একটি 'পবিত্র' যুক্তি তুলে ধরেন।

অ্যালান কেইস দাবি করেন, 'যিশুখ্রিষ্ট বারাক ওবামার পক্ষে ভোট দেবেন না। কারণ বারাক ওবামা এমন আচরণের পক্ষে ভোট দিয়েছেন যা যিশুর কাছে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।'

মিস্টার কেইস এ ধরনের দাবি যে প্রথমবারের মতো করেছেন তা নয়। আমার মূল রিপাবলিকান প্রতিপক্ষ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ায় প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ইলিনয়ের রিপাবলিকান পার্টি আর স্থানীয় কোনো প্রার্থীকে বেছে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত প্রার্থী হিসেবে অ্যালান কেইসকে বেছে নেয় রিপাবলিকানরা। মিস্টার কেইস বড় হয়েছেন মেরিল্যান্ডে। তিনি ইলিনয়ে কোনো দিন থাকেননি এবং এখানকার কোনো নির্বাচনেও জেতেননি। ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টির অনেকে ইলিনয়ের নেতৃত্বে এ ধরনের অতি উদ্যত একজনকে মনোনয়নদানে বাধা দেয়নি। রাজ্য সিনেটের একজন রিপাবলিকান সহকর্মী তাদের কৌশলের এক ধরনের বিশ্লেষণ দেন। তিনি বলেন, 'আমরা হার্ভার্ড শিক্ষিত একজন উদার কৃষ্ণাঙ্গের বিপরীতে হার্ভার্ড শিক্ষিত একজন রক্ষণশীল কৃষ্ণাঙ্গকে পেয়েছি। তিনি

www.pathagar.com

হয়তো জয়ী হবেন না, তবে তিনি অন্তত আপনার মাথা বরাবর একটি ঘুসি হাঁকাতে পারবেন।'

মিস্টার কেইস নিজেও বেশ আস্থাহীনতায় ভুগতেন। তিনি ছিলেন জিন কির্কপ্যাট্রিকের অনুগ্রহভাজন হার্ভার্ডের পিএইচডি-ধারী ব্যক্তি এবং রোনাল্ড রিগ্যানের সময় জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত। মেরিল্যান্ড থেকে তিনি দু'বার সিনেট সদস্যপদের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান এবং এরপর দু'বার রিপাবলিকান দল থেকে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হওয়ার জন্য লড়াই করেন। তবে চারবারই পরাজিত হন তিনি। তবে এই পরাজয় সমর্থকদের কাছে মিস্টার কেইসকে মোটেই খাটো করেনি। তাদের মতে, নির্বাচনী পরাজয় রক্ষণশীল নীতির প্রতি তার আপসহীনতাকেই নিশ্চিত করেছে।

তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, লোকটি কথা বলতে পারেন। মিস্টার কেইস যেকোনো বিষয়ে ব্যাকরণগত দুর্বলতা এড়িয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়ে দিতে পারেন। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে হাওয়াকে তিনি উত্তেজিত করতে পারেন, তার শরীর তখন দুলতে থাকে, তার ভ্রূ ওঠানামা করে, তার আঙুল বাতাসে নড়তে থাকে, তার কণ্ঠ আবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, তার সংগ্রাম শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার বুদ্ধিমত্তা অথবা বাকপটুতা কোনোটাই প্রার্থী হিসেবে তার কিছু দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেনি। অনেক রাজনীতিকের মতো মিস্টার কেইস যেটিকে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে স্পষ্টত বিবেচনা করেন তা গোপন ছিল না। তিনি তার আনুষ্ঠানিক নাটকীয় ভঙ্গিতে সোজাসাপ্টা এবং আবৃত স্থির দৃষ্টি নিয়ে প্রায়ই এমনভাবে কথা বলতেন যেন তাকে অন্তহীন ক্লান্ত মনে হতো। তিনি সপ্তম পরিবারের ধর্ম উপদেশক এবং উইলিয়াম এফ বাকলির ক্রস হিসেবে আবির্ভূত হন।

অধিকন্তু তার আত্মবিশ্বাস তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণে অসমর্থ করে তোলে। সাধারণত অধিকাংশ মানুষের অব্যাহত লড়াই-সংগ্রাম পৃথিবীকে নায্য করতে সাহায্য করে। মিস্টার কেইস বলতেন, তার মনে কিছু উদয় হলে এবং তার কাছে কোনো আইডিয়া এলে তিনি উঁচু খাড়া স্থান থেকে একতরফা যুক্তি দিয়ে তা বলে ফেলেন। দেরিতে প্রচার শুরু করায় এমনিতে নেতিবাচক অবস্থান ছিল তার। একই সাথে ছিল তহবিল সঙ্কট এবং বহিরাগত হওয়ার সুনাম-দুর্নাম। তার প্রচারণার তিন মাস সময়ে এমন কেউ ছিল না, যাকে তিনি আক্রমণ করেননি। তিনি ডিক চেনির কন্যাসহ সব সমকামীকে স্বার্থপর সুখবাদী বলে একচোট নেন। গে দম্পতিদের বলেন, তারা অগম্য গমনের ফল হিসেবে দুনিয়ায় এসেছেন। তিনি ইলিনয়ের প্রেস করপোরেশনকে জীবনমুখী এজেন্ডা-বিরোধীদের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি গর্ভপাতের পক্ষে আমার বক্তব্যকে দাস রক্ষাকারীর অবস্থান বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমার চিরন্তন স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সমর্থন একজন কট্টর একাডেমিক মার্কসবাদীর কাজ। এর সাথে আরো যোগ করে তিনি বলেন, আমি দাসদের ব্যাপারে ভিন্নমতপন্থী নই, আমি সত্যিকার আফ্রিকান-আমেরিকানও নই। সম্ভবত কালো ভোটারদের সমর্থন আদায়

www.pathagar.com

করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি ইলিনয়ে তার সমর্থক রক্ষণশীল রিপাবলিকানদেরও চটিয়ে দেন। তিনি বলেন, দাসদের উত্তর পরুষ হিসেবে কৃষ্ণাঙ্গদের সবধরনের আয়কর মওকুফ করে দেয়া হবে। (এটি ছিল তার জন্য সর্বনাশ! একজন তাকে ধিক্কার দিয়ে ইলিনয়ের হার্ড-রাইট ওয়েবসাইটে মন্তব্য করেন, ইলিনয়ের নেতা তাহলে সাদাদের জন্য কী করবেন!!!)

অন্যভাবে বলা যায়, অ্যালান কেইস ছিলেন একজন আদর্শ প্রতিপক্ষ। প্রচারাভিযানের এ সময়টায় আমি সব বিষয়ে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখি এবং মনে মনে শপথ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা শুরু করি। তখন পর্যন্ত প্রচারাভিযান যতটুকু এগিয়েছে তাতে দেখা যায়, তিনি শুধু আমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন– যে রকমটা অল্পসংখ্যক লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রচারাভিযান চলাকালে একে অপরকে অতিক্রম করার সময় আমি অনাকাঙ্ক্ষিত আহ্বান অথবা প্ররোচনা দেয়ার মতো বিষয় এড়িয়ে যেতাম। একদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে আমরা মুখোমুখি হয়ে যাই। আমার হাই স্কুলের সহপাঠীদের মতো তার সাথে বুক মেলাই আমি। টেলিভিশনের এক ক্যামেরাম্যান এই দৃশ্য ধারণ করেন। সেই বিকেলে টেলিভিশনে এই ছবি ধীরগতিতে দেখানো হয়। নির্বাচনের আগে আমাদের মধ্যে তিনটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আমি বরাবরই সব বিতর্কে নিজের মুখকে সংযত রাখি, উত্তেজিত ভাব এলেও নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখি। এতে দেখা যায়, মিস্টার কেইস আমাকে নিয়ে যেসব বিষয় অবতারণা করেছেন, সেসব বিষয়ের উত্তর পেতে সাধারণ দর্শকরা বঞ্চিত হয়। তবে এ কারণে আমার কিছু সমর্থক বেশখানিকটা বেদনাহতও হন। তারা আমাকে বলেন, কেন আমি এ লোককে আক্রমণ করার সুযোগ দিলাম। তাদের জন্য মিস্টার কেইস ছিলেন একজন দাম্ভিক, একজন চরমপন্থী এবং তার যুক্তিগুলো একেবারেই মূল্যহীন।

যা তারা বুঝতে চায়নি সেটি হলো, আমি কেইসকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে পারিনি। তিনি আমার ধর্ম নিয়ে কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে তার মুখ থেকে যা বের হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই নি আমি। আমি এটি স্বীকার করি যে খ্রিষ্টান চার্চগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুগামী রয়েছে।

তার যুক্তি ছিল অনেকটা এ রকম– আমেরিকা দু'টি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর একটি হলো ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা আর অপরটি খ্রিষ্টবিশ্বাস। পরপর কয়েকটি উদারপন্থী প্রশাসন ফেডারেল সরকার ছিনিয়ে নিয়ে ঈশ্বরহীন বস্তুবাদ যুক্তরাষ্ট্রে চাপিয়ে দেয় এবং এরপর ধীরে ধীরে এগোতে থাকে বিভিন্ন বিধিবিধান তৈরি, সমাজতান্ত্রিক ধরনের কল্যাণ কর্মসূচি, বন্দুক আইন, সরকারি স্কুলে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি এবং আয়কর আইন বাস্তবায়নের পথে। কেইসের মতে, আয়কর হলো আসলে 'দাস কর'। আয়কর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সনাতন মূল্যবোধে আঘাত আসে। উদারপন্থী বিচারপতিরা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সংবলিত প্রথম সংশোধনীর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি অবদান রেখেছেন। এসব বিচারপতি সব ধরনের বিচ্যুত আচরণ বিশেষত গর্ভপাত ও সমকামিতাকে বৈধতা দিয়ে আমাদের

www.pathagar.com

পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস করে দিয়েছেন। এর সমাধানের জন্য তার দেয়া ফর্মুলাও সহজ। এ জন্য সাধারণভাবে ধর্মকে বিশেষত খ্রিষ্টবাদকে সরকারি ও ব্যক্তিগত জীবনের যথাযথ স্থানে বসাতে হবে। ধর্মীয় আচরণবিধি সংশ্লিষ্ট আইনকে এক সারিতে এনে এসব ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলতে হবে যাতে সংবিধানের মূল চেতনা এবং ঈশ্বরের নির্দেশনার বাইরে কোনো আইন হতে না পারে।

অন্যভাবে বলা যায়, অ্যালান কেইস দেশে ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অভিষ্ঠ লক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। যাতে সমঝোতা অথবা ক্ষমাপ্রার্থনা করে বর্তমানে চলমান কার্যধারা মুলতবি করতে হয়। তিনি যেসব শর্ত ও পরামর্শ দিয়েছেন তাতে ওল্ড টেস্টামেন্টে নবীর বক্তব্যের সাথে কেইসের পরামর্শের পুরোটাই মিলে যায়। যখন আমি দেখলাম তার সাংবিধানিক ও নীতিসংক্রান্ত যুক্তিগুলোই যথেষ্ট তখন তার বাইবেলীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে আমি রক্ষণশীল অবস্থানে চলে যাই।

কেইস বলেন, মিস্টার বারাক ওবামা দাবি করেন তিনি একজন খ্রিষ্টান অথচ বাইবেল যেটিকে ঘৃণ্য বলেছে সেই জীবনধারাকে তিনি এখনো সমর্থন করেন। মিস্টার ওবামা বলেছেন, তিনি একজন খ্রিষ্টান কিন্তু তিনি নিরীহ-নিষ্পাপ জীবনের অবসানকে (গর্ভপাতের মধ্য দিয়ে) সমর্থন করেন।

এসব বক্তব্যে আমি কী বলতে পারি? বাইবেলের আক্ষরিক পাঠ কি হাস্যস্পদ না নির্বুদ্ধিতা? মিস্টার কেইস ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। তিনি কি পোপের শিক্ষার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করলেন? অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে এ ধরনের বিতর্কে আমি আমার চিরন্তন উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই জবাব দিই। আমি বলি, আমরা এক বহুমাত্রিক সমাজে বসবাস করি। আমার ধর্মীয় বিশ্বাস আমি অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি না। আমি আমেরিকান সিনেটে ইলিনয়ের সিনেটর পদে প্রার্থী হয়েছি, ইলিনয়ের মন্ত্রীর জন্য প্রার্থী নই। এমনকি আমি বলি যে, মিস্টার কেইস যে অভিযোগের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তাতে আমি আহত হয়েছি, আমার বিশ্বাস নিয়ে বিভ্রান্তিসৃষ্টি করা হয়েছে যে– আমি আসলেই খ্রিষ্টান কি না।

* * *

এক অর্থে, কেইসের আয়নায় আমার যে উভয়সঙ্কট তা, ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিবারেলরা যে আরো বড় অনেক বড় উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে তারই অংশ। উদারতাবাদ অন্যজনের ধর্মীয় অধিকারের প্রতি সহনশীলতা বা শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাস অন্য কারো ক্ষতির কারণ না হয় অথবা অন্যজনের ভিন্ন মতে বিশ্বাসের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করবে ততক্ষণ সেই বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল থাকতে হবে। এ ছাড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে সীমিত থাকবে এবং তাদের বিশ্বাস ব্যক্তিগত চেতনার বিষয় হিসেবে বজায় থাকবে। এ ধরনের সহিষ্ণুতা কতটুকু বাস্তবে প্রতিফলনযোগ্য তা অবশ্য পুরোপুরি যাচাই হয়নি।

বিচ্ছিন্নভাবে ধর্ম চর্চা করা হয় কদাচিৎ। সংগঠিত ধর্ম অন্তত একান্তভাবেই সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। ধর্মবিশ্বাসীরা যেখানে সুযোগ পায় তাদের ধর্মের প্রচার করে। তারা মনে করতে পারে যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যেসব মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় তা সরাসরি তাদের বিশ্বাসকে আঘাত হানে। তারা বৃহত্তর সমাজে তাদের মতামতকে বলবৎ বা কার্যকর করতে চাইতে পারে।

যখন ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা রাজনৈতিকভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তখন উদারপন্থীরা অস্বস্তিতে পড়ে। আমরা যারা সরকারি অফিসে আছি তারা যেকোনো ব্যক্তির জন্য উদ্বেগজনক হতে পারে এবং আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমন– গর্ভপাত ও স্কুলপ্রার্থনার মতো যেসব বিষয়ে সাংবিধানিক নীতি আমাদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে, সেসব বিষয়কে একসাথে সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করতে পারি। কয়েক প্রজন্মের ক্যাথলিক রাজনীতিকরা বিশেষভাবে সতর্ক, সম্ভবত এ কারণে যে তারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তখন দেখতে পেয়েছে– আমেরিকার বহু স্থানে প্রশ্ন রয়েছে জন এফ কেনেডি পোপের কাছ থেকে আদেশ নিয়েই বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছিলেন কি না। কিছু বামপন্থী (যারা সরকারি অফিসে আছে তারা ছাড়া) আরেকটু এগিয়ে বলেন, জনসাধারণের চলাচলের স্থানে ধর্মের চর্চা অযৌক্তিক, তা সহ্য করার মতো বিষয় নয় আর তা বিপজ্জনকও বটে। এতে শুধু ব্যক্তিগত নিষ্কৃতির প্রতি জোর দেয়া হয় এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অনেকটা দারিদ্র্য অথবা করপোরেট বৈষম্যের মতো জন-নৈতিকতার প্রশ্নে ধর্মীয় আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া হয়েছে এতে। এ ধরনের এড়িয়ে চলার কৌশল অ্যালান কেইসের মতো প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে। তবে আমার বিবেচনায় দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আমেরিকানদের বিশ্বাসের শক্তির স্বীকৃতি দিতে না পারা আমাদের জন্য ভুল হবে। আমাদের আধুনিক ও বহুমাত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসকে কিভাবে সমন্বিত করা যায় সে ধরনের গভীর বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া সঙ্গত নয়।

এর মন্দ রাজনৈতিক দিক নিয়ে শুরু হতে পারে। আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ডেমোক্র্যাটসহ বিপুলসংখ্যক ধার্মিক লোক রয়েছে। যখন আমরা ধর্মীয় আলোচনা পরিত্যাগ করি, যখন আমরা ভালো খ্রিষ্টান, মুসলিম অথবা ইহুদি বলতে কী বুঝায় এ বিতর্ক এড়িয়ে চলি, যেখানে আমাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্বের কথা বলা আছে– ধর্মের সেই ইতিবাচক দিকের পরিবর্তে আমরা যখন শুধু কোথায় কিভাবে এর খারাপ চর্চা হচ্ছে সেই নেতিবাচক অর্থেই ধর্মের আলোচনা করি– তবে তাতে কী ফল দাঁড়াবে তা আমরা ভাবতে পারি। আমরা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকলে অন্যরা সঙ্গত কারণেই এ শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসবে। যারা বিশ্বাসের ব্যাপারে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে অথবা যারা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করতে চায় তারা এর সুযোগ গ্রহণ করবে।

আরো মৌলিকভাবে বলতে গেলে, নৈতিক বিচারের ইস্যুগুলোকে আরো কার্যকরভাবে মোকাবেলার ক্ষেত্রে যেকোনো ধর্মীয় পরামর্শ বিবেচনার ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর অবস্থান নেয়া নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক কিছু সমস্যা হয়। ধর্মের

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয়াবলিতে কিছু দ্ব্যর্থ ভাষা দেখা যায়। কোটি কোটি আমেরিকান তাদের ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে বুঝতে পারে এমন প্রতিশব্দ ও তুলনা রাখা হয় না। লিংকনের দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণের কথা স্মরণ করুন– যেখানে 'ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের' কোনো উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি অথবা কিংসের 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' শীর্ষক ভাষণে 'ঈশ্বরের সন্তান'-এর উল্লেখ করা হয়নি। উচ্চতর স্তরের সত্যের আহ্বান অসাধ্য প্রতীয়মান হতে পারে তবে এটি একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায়। সংগঠিত ধর্ম অবশ্যই সত্যের স্বীকৃত একক নয়। আবার নৈতিক দাবি করার জন্য অথবা সাধারণের কল্যাণের আবেদন জানাতে কারো ধার্মিক হওয়ার একান্ত প্রয়োজনও নেই। তবে আমরা এ দাবি বা আবেদনকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করতে পারি না যে, কোনো অপরাধ পরিহারের জন্য আমাদের সমৃদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের উল্লেখের প্রয়োজন রয়েছে ।

প্রগতিশীল হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা হলো, আমাদের কাছে জাতির নৈতিক গুরুত্ব দানের বিষয়টি হয়ে গেছে শুধু আলঙ্কারিক। ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে আমাদের উৎকণ্ঠা আমাদের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি যে ভূমিকা রাখতে পারে সেটা থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছে।

দারিদ্র্য ও বর্ণবাদ সমস্যা, বীমার নিরাপত্তাহীনতা, বেকারত্ব এবং দশ দফা পরিকল্পনায় যেভাবে এর সমাধান খোঁজা হয়েছে, সে রকম বিষয় নয়। এ সমস্যা সামাজিক বৈষম্য ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার মধ্যে প্রোথিত। সমাজে যারা উচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন তারা যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তাদের সম্পদ ও মর্যাদা ধরে রাখতে চান। আর যারা সমাজের নিচে আছেন তাদের মধ্যে দেখা যায় আত্মবিধ্বংসী নানা কার্যক্রম।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন ব্যক্তির মন ও হৃদয়ের পরিবর্তন। আমি বিশ্বাস করি, শহরের অভ্যন্তরে বন্দুকের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে এবং একই সাথে আমাদের নেতাদেরও বন্দুক প্রস্তুতকারক লবির বক্তব্য শুনতে হবে। তবে একই সাথে আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, যখন বন্দুকধারী বেপরোয়াভাবে জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় তখন এর পেছনে কোনো কারণ সক্রিয় থাকে। হয়তো বা কেউ একজন তাকে নিগৃহীত করেছে যা তার ক্ষোভকে বেপরোয়া করে তুলেছে। সে ব্যক্তির অপরাধের জন্য শুধু তাকে শাস্তি দেয়াটাই পর্যাপ্ত হবে না। একই সাথে তার মনের মধ্যে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেটাকেও স্বীকার করতে হবে। শুধু সরকারি কর্মসূচি এ ক্ষত সারানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়। আমি আমাদের আইনের বৈষম্যহীন প্রয়োগ কামনা করি। একই সাথে আমি বিশ্বাস করি যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের মধ্যেও তাদের চেতনা ও অঙ্গীকারের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে– যাতে যেকোনো বিরোধ তাদের আইনজীবীরা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারে। আমি মনে করি আমাদের করের ডলারগুলোকে অধিক হারে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। একই সাথে তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চারণকে কমাতে পারবে এবং এতে

www.pathagar.com

গর্ভপাতের ঘটনাও হ্রাস পাবে। তখন প্রতিটি নবজাতকের আগমনকে স্বাগত জানানো হবে এবং তারা পৃথিবীর ভালোবাসা পাবে। একই সাথে আমি আরো ভাবি যে, বিশ্বাস একজন তরুণীকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে, একটি যুবকের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে। একই সাথে সব মানুষের মধ্যে জৈবিক কাজকর্মে শ্রদ্ধাবোধের চেতনা সৃষ্টি করে। আমি এর মাধ্যমে এটি বলছি না যে, সব প্রগতিশীল হঠাৎ করে ধর্মীয় পরিভাষাগুলো বুঝতে শুরু করবে। অথবা 'আলোকিত হওয়ার হাজার দফা'র পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের জন্য যে সংগ্রাম চলছে তা পরিত্যাগ করতে হবে। আমি এটা স্বীকার করি যে, কিভাবে ব্যক্তিগত ধারণা কাজ না করার বাহানা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাসের অসত্য ভাষণ থেকে অস্বচ্ছতা আর কিছু হতে পারে না– যেভাবে রাজনীতিবিদরা দেখানোর জন্য নির্বাচনের সময় কৃষ্ণাঙ্গ চার্চে গিয়ে হাজির হন এবং ধর্মীয় গান গাওয়া এবং শুকনো নীতিসংবলিত বাইবেলীয় উদ্ধৃতি পেশ করার সময় তালে তালে করতালি দেন।

আমার মনে হয়, আমরা প্রগতিশীলরা যদি আমাদের নিজস্ব কিছু পক্ষপাত পরিত্যাগ করতে পারি তাহলে দেশের স্বার্থে সঠিক ও বস্তুগত নির্দেশনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সেকুলার উভয়ের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সর্বসম্মত হয়ে আমরা কিছু মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিতে পারি। আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ ত্যাগ স্বীকারে রাজি হতে পারি। এ জন্য 'আমি' চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের 'হাজারো মানুষের' চিন্তা করতে হবে। সারাদেশে ধর্মীয় সমাবেশে যুক্তির প্রকাশ ঘটাতে হবে। অন্য দিকে আমাদেরকে শুধু ধর্মীয় অধিকারের সামনে বাদ সাধলে হবে না, ধর্মের বিশ্বাসকে গভীরভাবে নিতে হবে। তবে সবার বিশ্বাস হতে হবে বৃহত্তর আমেরিকান পুনর্জাগরণের প্রতি নিবেদিত।

এর কিছু কিছু প্রকাশ ইতোমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। রিক ওয়ারেন ও টি ডে জ্যাকসের মতো ভিন্ন মতের যাজক এইডস মোকাবেলা, তৃতীয় বিশ্বের ঋণ মওকুফ এবং দারফুরে গণহত্যা বন্ধের বিষয়ে প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে তাদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন। জিম ওয়ালিস ও টনি ক্যামপলোর মতো প্রগতিশীল ইভানজেলিক্যালরা সামাজিক কর্মসূচি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিরসনে বাজেট বরাদ্দ কমানোর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান এজেন্ডাকে প্রভাবিত করেছেন। এর মাধ্যমে দরিদ্রকে সহায়তার ওপর বাইবেলের নামে যে বিরোধিতা করে আসা হয়েছিল, তা তারা তুলে নেন। একই সাথে আমার নিজের চার্চসহ সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বহু চার্চ ডে-কেয়ার কর্মসূচি, বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য ভবন নির্মাণ, সাবেক অপরাধীদের পুনর্বাসনে সহায়তার মতো কর্মসূচিতে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়।

তবে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ পক্ষের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মীয়মান এ প্রচেষ্টাকে আরো কার্যকর করতে অধিকতর সক্রিয় পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে উভয় পক্ষের সংশয় ও উত্তেজনাকে সার্বিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং উভয় পক্ষের সহযোগিতার কিছু ভিত্তিকে গ্রহণ করে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

শুধু আমাদের গণতন্ত্রের উন্নয়নের জন্যই নয়, একই সাথে ধর্মীয় চর্চার গতিশীলতার জন্য কিছু ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানের প্রথম এবং সবচেয়ে জটিল পদক্ষেপ ছিল সমঝোতার দলিল তৈরি করা। চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে জোরালো

www.pathagar.com

প্রতিবাদকারী অনেক খ্রিষ্টানের দাবির মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা রয়েছে। তাদের অনেকে ষাটের দশকের উদারপন্থী বিচারপতিদের যুক্তি মেনে নিতে রাজি নন। এটি হলো বিল অব রাইটসের খসড়া প্রণয়নকারী আর এখনকার ইভানজেলিক্যাল চার্চের পূর্বসূরিদের মধ্যকার বিরোধ।

আমেরিকান বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ফ্রাঙ্কলিন ও জেফারসনের মতো অনেকেই ছিলেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারা খ্রিষ্টান চার্চের গোঁড়ামি নিয়েই কেবল প্রশ্ন তোলেননি, অধিকন্তু যিশুখ্রিষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীসহ খোদ সৃষ্টবাদের মূল বিশ্বাস নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বিশেষভাবে জেফারসন ও ম্যাডিসন চার্চ ও রাষ্ট্রের মাঝে দেয়াল নির্মাণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও চার্চের মধ্যে এই দেয়াল তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। এটি সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত থেকে রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন ও অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সংগঠিত ধর্মকে নিবৃত্ত করে।

এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের সব স্থপতি অবশ্য একমত হতে পারেননি। প্যাট্রিক হেনরি ও জন অ্যাডামসের মতো ব্যক্তিরা ধর্মকে এগিয়ে নিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহারের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হন। তবে জেফারসন ও ম্যাডিসন ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে যে ভার্জিনিয়া আইনের প্রস্তাব করেছিলেন সেটি প্রথম সংশোধনীর ধর্মসংক্রান্তঅনুচ্ছেদের মডেলে পরিণত হয়। তারা আলোকিত ধারার অনুগামীই শুধু ছিলেন না, গীর্জা ও রাষ্ট্রকে আলাদা করতে সবচেয়ে কার্যকর ব্যক্তি ছিলেন।

অধিকন্তু রিভারেন্ড জন লেল্যান্ডের মতো ব্যাপ্টিস্ট এবং অন্য ইভানজেলিক্যালরা এ বিধান অনুমোদন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় জনসমর্থন পেতে সাহায্য করেন। তারা এটি করেছিলেন এ কারণে যে, তারা ছিলেন বহিরাগত। এর কারণ, তাদের উচ্ছ্বসিত ধরনের প্রার্থনা নিম্ন শ্রেণীর ওপর বেশ আবেদন সৃষ্টি করে। এর কারণ দাসসহ আগত সবার ইভানজেলীকরণে বিদ্যমান ব্যবস্থা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ মর্যাদাবান ও অগ্রাধিকারভোগীদের প্রতি তাদের কোনো সম্মান ছিল না। এর কারণ তারা অব্যাহতভাবে দক্ষিণের প্রভাবশালী অ্যাংলিকান চার্চ আর উত্তরের উপাসকদের আদেশ-নির্দেশ দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত ও অবজ্ঞার শিকার হন। তারা যথার্থভাবেই ভীত ছিলেন যে, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ধর্মীয় ধারা সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের সামর্থ্যকে নষ্ট করে দেবে। তাদের বিশ্বাসের চর্চায় বাধা দেবে। তারা আরো মনে করতেন, ধর্মীয় মূল ধারাকে রাষ্ট্র সমর্থন করলে তা তাদের পক্ষে যাবে না। রিভারেন্ড লেল্যান্ডের বক্তব্য অনুসারে, 'এটি একক ভ্রান্তি, সরকারের এটা সমর্থন করা উচিত; এটা...ছাড়াই সত্য পারে এবং উত্তমভাবে পারে।'

জেফারসন ও লেল্যান্ডের ধর্মবিষয়ক ফর্মুলা বেশ কাজ করেছে। শুধু আমেরিকাই ধর্মীয় সঙ্ঘাত এড়ানোর এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়নি বরং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এ ধরনের উদ্যোগ। অবশ্য রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিশেষ গীর্জা না থাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অব্যাহতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। ধর্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবা

www.pathagar.com

ধরনের কাজ এতে দ্রুততর হয়। বেশিরভাগ আমেরিকান জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব কোনো সময় ব্যাপকতা লাভ করেনি। একসময় আমরা যা-ই থাকি না কেন আমেরিকানরা এখন শুধু একটি খ্রিষ্টজাতি নয়, আমেরিকানরা একই সাথে একটি ইহুদি জাতি, একটি মুসলিম জাতি, একটি বৌদ্ধ জাতি, একটি হিন্দু জাতি এবং একটি ধর্ম-অবিশ্বাসী জাতি।

আমরা যদি ধরে নিই যে, আমাদের সীমানার ভেতরে শুধু খ্রিষ্টানরা রয়েছে তাহলে কোন ঘরানার খ্রিষ্টবাদকে আমরা স্কুলে শিক্ষা দেবো? শ্যামস ডবসনের নাকি আল শারফটনের? বাইবেলের কোন ধারার শিক্ষা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করবে? আমাদের কি লেভিটিকাসের কাছে যেতে হবে যিনি দাসপ্রথাকে অনুমোদন করেছিলেন এবং ঘৃণ্য হিসেবে শিলমাছ খাওয়া অনুমোদন করেছিলেন। আর ডটারনোমির বিষয়ে কী হবে যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আপনার শিশু বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হলে তাকে পাথর মারতে হবে। অথবা আমরা কি সাবমনের মতকে গ্রহণ করতে পারব যিনি এতটাই প্রান্তিক মতের ছিলেন যে, আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগ এর লক্ষ্য অর্জনে টিকে থাকতে সক্ষম কি না তাতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এসব বিষয় আমাদের জটিল সঙ্কটের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। এ ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গণবিতর্কে এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশক হতে পারে কি না এ প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই আসে। অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যখন ধার্মিক ব্যক্তিদের কোনো গণমানুষের কর্মকাণ্ডে প্রবেশের আগে ধর্মের বিষয়-আশয় রেখে আসতে বলেন, তখন সেটাকেও গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যায় না। ফ্রেডলিক ডগলাস, আব্রাহাম লিংকন, উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান, ডরোথি দে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র– আমেরিকান ইতিহাসের এসব মহান সংস্কারক শুধু বিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধই ছিলেন না, তারা নিজেদের যুক্তি উপস্থাপনের সময় বারবার ধর্মীয় ভাষ্য ব্যবহার করেছেন। সরকারি নীতিসংক্রান্ত বিতর্কে কারো ব্যক্তিগত নৈতিকতা টেনে আনা বাস্তবেই অযৌক্তিক। আমাদের আইনে নৈতিকতার সংজ্ঞাটি প্রধানত ইহুদি-খ্রিষ্ট ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

আমাদের বহুমাত্রিক গণতন্ত্রের দাবি হলো ধর্ম প্রভাবিত বিষয়গুলোকে বিশেষ ধর্মের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি না করে চিরন্তন রূপ দেয়া। এ জন্য যেকোনো প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি থাকতে হবে এবং যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাথে সব প্রস্তাব মানানসই হতে হবে। আমি যদি ধর্মীয় কারণে গর্ভপাতের বিরোধিতা করি এবং এটা নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাস করতে চাই তাহলে শুধু এ জন্য চার্চের শিক্ষা অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বললে হবে না, অধিকন্তু শুধু এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে তা ভাবাও ঠিক হবে না। যদি অন্যরাও আমার কথা শুনবে তা আমি চাই– তবে আমাকে যুক্তি দিয়ে বলতে হবে যে গর্ভপাতের বিষয় কিভাবে সব ধর্মবিশ্বাসী এবং যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের মূল্যবোধ ও নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

অনেক ইভানজেলিক্যালের মতো যারা বাইবেলের অকাট্যতায় বিশ্বাসী তাদের কাছে এ সংক্রান্ত আইন ধর্মনিরপেক্ষতার নিপীড়নের একটি দৃষ্টান্ত এবং তাদের কাছে

www.pathagar.com

বস্তুবাদী দুনিয়া পবিত্র ও চিরন্তনের সীমানার বাইরে। কিন্তু বহুমাত্রিক গণতন্ত্রে আমাদের নির্দিষ্ট কোনো পছন্দ নেই। বিশ্বাস ও যুক্তি সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে কাজ করে এবং সত্যে পৌঁছার জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে। আমরা সবাই ধারণা করতে পারি যে, যুক্তি ও বিজ্ঞান বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে জ্ঞানকে সন্নিবেশ করে । ধর্ম হচ্ছে এমন যা সত্যের ওপর নির্ভরশীল, যা সাধারণের পক্ষে বোঝা বা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। বিশ্বাস হলো যা আপনি দেখেননি তার ওপর আস্থা স্থাপন। অর্থাৎ অদেখার ওপর বিশ্বাস। বিজ্ঞানের শিক্ষকরা তাদের শ্রেণিকক্ষে উদ্ভাবন অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক নকশার ওপর জোর দেন। তারা ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি থেকে বিজ্ঞানের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এমন কোনো দাবির ওপর জোর দেন না। তারা শুধু বলতে চান যে, জ্ঞানের প্রতিটি রাস্তা বিভিন্ন বিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এসব বিধি বিনিময়যোগ্য নয়।

রাজনীতি নামেমাত্র একটি বিজ্ঞান। যুক্তির ওপর খুব কমই নির্ভর করে এটিকে। তবে বহুমাত্রিক গণতন্ত্রে একই রকম পার্থক্য প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের মতো রাজনীতি সাধারণ বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে সাধারণ লক্ষ্যের বাইরে অন্য সত্য অনুসন্ধানে আমাদের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। অধিকন্তু রাজনীতি আপস করে, যা বিজ্ঞানের সাথে মেলে না। রাজনীতি হলো সম্ভাবনার একটি কলা। কিছু মৌলিক পর্যায়ে, ধর্ম আপস-সমঝোতাকে অনুমোদন করে না। এটি অসম্ভবের ওপর জোর দেয়। ঈশ্বর যদি কথা বলতেন তখন অনুসারীরা পরিবেশের ওপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের ডিক্রির আশা করতেন। এক জীবনের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের আপসহীন অঙ্গীকার মহিমান্বিত হতে পারে; তবে আমাদের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের অঙ্গীকারের ওপর নির্ভর করা হবে মারাত্মক বিষয়।

আব্রাহাম (ইব্রাহিম) ও আইজাকের (ইসহাক) কাহিনী এর একটি সাদামাটা কিন্তু শক্তিমান উদাহরণ। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে– আব্রাহামকে ঈশ্বর নির্দেশ দেন যে, তার ভালোবাসার একমাত্র সন্তান আইজাককে ঈশ্বরের উদ্দেশে বিসর্জন (কোরবানি) দিতে হবে। কোনো যুক্তি ছাড়াই আব্রাহাম পুত্র আইজাককে পাহাড়ের ওপর নিয়ে যান। তাকে বেদির সাথে বাঁধেন এবং তরবারি উন্মুক্ত করে ঈশ্বরের আদেশ পালনের কাজ শুরু করেন।

অবশ্য আমরা জানি যে, এ ঘটনার পরিণতি হয়েছিল সুখকর। একেবারে শেষ মুহূর্তে আইজাককে রক্ষার জন্য ঈশ্বর একজন দূত পাঠান। আব্রাহাম ঈশ্বরের ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি হন ঈশ্বরের আনুগত্যের পরীক্ষায় একটি মডেল বা নমুনা। তার মহান বিশ্বাসের জন্য তার উত্তরপুরুষ পুরস্কৃত হয়েছেন। এটি বলা যথার্থ হবে যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে কেউ যদি তার ভবনের ছাদে ছেলেকে জবাইয়ের জন্য তরবারি খুলতে আব্রাহামকে দেখতেন সাথে সাথে তিনি পুলিশে খবর দিতেন। আমরা তাকে জোর করে নামিয়ে আনতাম। এমনকি আমরা যদি একেবারেই শেষ মিনিটে বিষয়টি দেখতাম তাহলে চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস বিভাগ আইজাককে উদ্ধার করে নিয়ে যেত এবং আব্রাহামের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ আনত। আমরা এটি করতাম

www.pathagar.com

এ কারণে যে ঈশ্বর অথবা তার দূত আমাদের সবার সামনে নিজেকে প্রকাশ করেন না। আব্রাহাম যা শুনেছিলেন তা আমরা শুনি না, আব্রাহাম যা দেখেছিলেন তা আমরা দেখি না, যদিও সেসব ঘটনা হয়তো সত্যি ছিল। তাই আমরা সবচেয়ে ভালো যে কাজটি করতে পারি তা হলো– আমাদের পক্ষে যতটুকু অবহিত হওয়া সম্ভব ততটুকু জানা, আমরা যতটুকু সত্য বলে মনে করতে পারি তা উপলব্ধি করা, একজন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আমাদের জন্য ততটুকু সত্য হবে যতটুকু আমরা জানতে পারি।

চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক বহুমাত্রিকতার মধ্যে যেকোনো সমন্বয় বা সমঝোতার জন্য কিছু কিছু সাধারণ চেতনা বা ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মীয় মতবাদ বা ডকট্রিনের জন্য এর পুরোটাই আরোপিত হবে এমন নয়। এমনকি অনেকে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতির চর্চা বাইবেলের নির্দেশনার প্রতি অনুগতদের সাথে আধুনিক জীবনধারণকারীদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছে বলে মনে করেন। বাইবেলের অনুগতরা টেন কমান্ডমেন্টস বা খ্রিষ্টের আধ্যাত্মিক জীবনধারার ওপর ভিত্তি করে তাদের ধ্যানধারণা গড়ে তোলেন। আমেরিকান জনগণ বুঝতে চান কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক খ্রিষ্টান জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং তাদের কিছুসংখ্যক সম বিয়ের (একই লিঙ্গের মধ্যে) বিরোধিতা করেন যদিও এ জন্য সংবিধান সংশোধন করে তা নিষিদ্ধ করতে হবে বলে তারা মনে করেন না। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে এ ধরনের স্বাধীনতার বিষয়টিকে ধর্মীয় নির্দেশনার সময় অনুমোদন করতে হবে তা নয়, তারা তাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতাকে অনুমোদন করলে হয়।

খ্রিষ্ট কর্মকাণ্ডে যদি সাধারণ যৌক্তিক মাত্রা দিকনির্দেশনা দেয়, তাহলে যারা গীর্জা ও রাষ্ট্রের সীমানা তদারকিতে নিযুক্ত রয়েছেন এটি তাদেরও নির্দেশনা দেবে। জনগণের কাছে ঈশ্বরের যেকোনো বক্তব্য তুলে ধরা রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণকে ভেঙে দেবে মনে করার কারণ নেই। সুপ্রিমকোর্ট এ সংক্রান্ত বিষয়াবলি যথার্থভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিশুরা আনুগত্যের শপথ উচ্চারণ করলেই তারা ঈশ্বরের করতলে গিয়ে নিষ্পেষিত হতে থাকবে এমন মনে করাও উচিত নয়। আমি অন্তত তা মনে করি না। ছাত্রদের স্বেচ্ছাপ্রার্থনা গ্রুপের স্কুল অঙ্গনে সভা করার মধ্যে আমি কোনো হুমকি দেখি না। এটাকে হাইস্কুলের রিপাবলিকান ক্লাবকে ব্যবহার করে ডেমোক্র্যাটদের হুমকি দেয়ার মতো খারাপ কিছু মনে করি না। যে কেউ সাবেক অপরাধী অথবা অতীতে কোনো অনাচারে লিপ্তদের টার্গেট করে বিশ্বাসভিত্তিক কোনো কর্মসূচি নিতে পারেন– এটি সমস্যাকে সমাধান করার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার শক্তিমান রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে এবং সতর্ক বিচার-বিবেচনা করে এটাকে সমর্থন জানানো যেতে পারে।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপরে যে মোটা দাগের নীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে খুঁটিনাটি সব কিছু অন্তর্ভুক্ত নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সব ধরনের গণতান্ত্রিক চর্চায় ধর্মকে স্পর্শ করে এমন বিষয়গুলো নিয়ে যদি একটি বিতর্কের আয়োজন করা যায়, তবে তা এ ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণ হতে পারে। আমার মূল চেতনার

www.pathagar.com

সাথে সাংঘর্ষিক ক্ষতিকর বিশ্বাসের বিস্তৃতি আমরা প্রতিহত করতে পারি । বিভিন্ন নৈতিক দাবির বাস্তব প্রয়োগ কেমন হচ্ছে তার ওপর ভিত্তি করে এসব দাবির বিচার-বিবেচনার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি। সাধারণ নীতি হিসেবে অশ্লীল মিউজিক ভিডিও'র কারণে ভবঘুরে আশ্রয়হীনদের মধ্যে সন্ত্রাস-নিষ্ঠুরতা ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিতে চাই। আমাদের মূল্যবোধ কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবহার বন্ধের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি না তা চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করতে আমাদের কোনো কোনো সময় অধিকারের চেয়ে যুক্তির প্রতি কম গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হয়, অথবা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চেতনার জন্য এটাকে ছেড়ে দেয়া উচিত নাকি বিকাশমান রীতি-ঐতিহ্যের বিষয় হিসেবে তা গণ্য হবে সেটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

যদিও এসব নীতিমালা দৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হলে সব সঙ্ঘাতের হয়তো বা সমাধান হবে না। এমন অনেকেই আছেন যারা গর্ভপাতের বিরোধিতা করেন, কিন্তু যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন অথবা অগম্য-গমনের (নিষিদ্ধ সম্পর্ক) ঘটনা যেখানে ঘটেছে তাদের ক্ষেত্রে এ নীতি ব্যতিক্রমের পক্ষপাতী। তারা বাস্তবতা বিচার করে নীতির এ বিচ্যুতিকে সমর্থন করতে চান। এমনকি অনেক উৎসাহী 'পছন্দপন্থী' পরিণত গর্ভের ক্ষেত্রে গর্ভপাতে বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষে। এ ক্ষেত্রে বলা হয়, ভ্রূণের গঠন শরীরের অংশ তৈরির মতো হলে তাকে লালন করার ব্যাপারে সমাজের উৎসাহ থাকতে পারে। এখনো পর্যন্ত যারা বিশ্বাস করেন জীবনের শুরু হয় গর্ভসঞ্চারণের পর থেকে এবং যারা ভ্রূণকে জন্মের আগ পর্যন্ত নারীর জীবনের বর্ধিতাংশ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে সমঝোতা বা দূরত্ব কমানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে আমরা সহিংসতা অথবা ভীতি প্রদর্শনের পরিবর্তে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। একই সাথে আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চারণের সংখ্যা কমিয়ে আনতে আমাদের সহায়শক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদন করতে পারি– যার মধ্যে সংযমের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয় এমন জন্মনিরোধক অন্য যেকোনো কৌশলকে সহায়তা দেয়া যেতে পারে।

অনেক ধার্মিক খ্রিষ্টানের জন্য ছেলেদের সমবিয়ের ব্যাপারে সমঝোতায় আসা অসম্ভব বিষয়। আমি এ ধরনের এক বিব্রতকর পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি। বিশেষত যেখানে খ্রিষ্টান মেয়ে ও ছেলে ব্যভিচার বা অন্য কোনো সীমালঙ্ঘনকর্মে লিপ্ত থাকার বিষয় জানাজানি হওয়ার পর তা নিয়ে নাগরিক শাস্তির কোনো ব্যবস্থা না থাকলে তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমি একটি চার্চে শুনেছিলাম একজন ভিন্নমতের যাজক অভ্যর্থনা কক্ষে হালকা রসিকতা করে বলেন, 'আদম ও ঈভের কথা বলা হয়েছিল, আদম ও স্টিভের কথা তো বলা হয়নি।' সাধারণত তিরস্কারপূর্ণ অনুশাসনে কাজ না হলে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমেরিকান সমাজ সাধারণভাবে সন্তান লালনপালনের সংস্কৃতিগত ইউনিট হিসেবে ছেলেমেয়ের বসবাসের বিশেষ স্থান হয়ে থাকবে। আমি এটাও চাই না যে, রাষ্ট্র কোনো আমেরিকান নাগরিককে

www.pathagar.com

সমঅধিকার এবং হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা অথবা স্বাস্থ্যবীমা দিতে এ কারণে অস্বীকৃতি জানাবে যে লোকটি তার সমলিঙ্গের কাউকে ভালোবাসে। আমি এটাও গ্রহণ করতে রাজি নই যে, বাইবেল পাঠ করে খ্রিষ্টবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণে পর্বতের ধর্মীয় অনুশাসনের চেয়ে রোমানদের ব্যাখ্যাকে অধিক গ্রহণীয় মনে করতে হবে।

সম্ভবত এসব ইস্যুতে আমি এতটা স্পর্শকাতর এ কারণে যে, আমি নিজে অসতর্কতার মূল্য কতটা দিতে হয় তা দেখেছি। নির্বাচনের আগে মি. কেইসের সাথে বিতর্কের মাঝখানে আমার একজন কট্টর সমর্থকের কাছ থেকে টেলিফোন পাই। সেই মেয়েটি ছিল একটি ছোট দোকানের মালিক, একজন মা এবং এক চিন্তাশীল উদার রমণী। একই সাথে মেয়েটি ছিল সমপ্রেমী বা লেসবিয়ান। পূর্ববর্তী এক দশক ধরে মেয়েটি তার মেয়ে পার্টনারের সাথে বসবাস করে আসছেন।

মেয়েটি আমাকে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জানতে পারেন যে আমি সমলিঙ্গের বিয়ের বিরোধী। তিনি আমার যুক্তি শুনেছেন। আমি বলেছি যেকোনো অর্থবহ ঐকমত্যের অনুপস্থিতিতে সমবিয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব বাড়ানোর পরিবর্তে অন্য সমকামী পুরুষ ও নারীদের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া দরকার। মেয়েটি আমার একটি রেডিও সাক্ষাৎকার শুনেই আমাকে ফোন করেন। তিনি শুনেছেন যে, আমি আমার ধর্মীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ করে এই ইস্যুতে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি। মেয়েটি আমাকে বলে, আমার বক্তব্যে তিনি আহত হয়েছেন। মেয়েটি মনে করেন, এই ইস্যুতে ধর্মের বিষয়টি টেনে এনে আমি এটি বলতে চাচ্ছি যে, মেয়েটি এবং তার মতো অন্য যারা আছেন তারা ভালো মানুষ নন।

আমি বেশ বিব্রতবোধ করি এবং ফিরতি ফোনে তাকে বলি, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কতজন খ্রিষ্টান সমকামিতাকে বিরোধিতা করেছে সেটি কোনো বিষয় নয়। তারা বলতে পারেন পাপকে তারা ঘৃণা করেন, পাপিকে নয়। যারা ঈশ্বরের ছায়ায় নিজেদের গড়ে তুলতে চান এবং খ্রিষ্টের বার্তাকে প্রচার করেন, তারা এ ধরনের রায়ে আহত হতে পারেন। একই সাথে মেয়েটিকে আরো বলি, আমার দায়-দায়িত্ব শুধু একটি বহুমাত্রিক সমাজের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবেই নয়, একই সাথে একজন খ্রিষ্টান হিসেবেও আমার দ্বার এ সম্ভাবনায় খোলা থাকবে যে, সমবিয়েকে আমি সমর্থন করব ভুল রাস্তা হিসেবে; এটি হবে আমার অনিচ্ছাকৃত সমর্থন। আমি গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে আমার সমর্থনের ব্যাপারে এটি দাবি করিনি যে, এই সমর্থন ভুলভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি অবশ্যই স্বীকার করি, সমাজের পূর্ব সংস্কার এবং পক্ষপাতের দ্বারা আমি প্রভাবিত হতে পারি এবং ঈশ্বরের নামে তা আরোপ করা হয়ে থাকতে পারে। যিশুখ্রিষ্ট যে একে অন্যকে ভালোবাসতে বলেছেন তা ভিন্ন এক সিদ্ধান্তেও আমাদের উপনীত করতে পারে। বছরের পর বছর ধরে আমি দেখতে পারি, কোনো ব্যক্তি ইতিহাসের ভুল দিকে অবস্থান নিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, এ ধরনের সন্দেহ আমাকে একজন মন্দ খ্রিষ্টানে পরিণত করেছে। আমি বিশ্বাস করি, এটি আমাকে মানুষ বানিয়েছে, ঈশ্বরের বিষয়ে আমার উপলব্ধিকে নির্দিষ্ট করেছে এবং এরপর পাপবোধের প্রবণতা সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছে। যখন আমি বাইবেল পাঠ করি তা এ বিশ্বাস নিয়ে করি যে, এটি স্থবির কোনো গ্রন্থ নয়, এটি 'চলমান বিশ্ব' এবং আমি এখান থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করি। সেটি আমার কোনো লেসবিয়ান বান্ধবী অথবা গর্ভপাতবিরোধী ডাক্তার সম্পর্কেও হতে পারে।

এর অর্থ এই নয় যে, আমার বিশ্বাসে কোনো দৃঢ় অবস্থান নেই। উৎকৃষ্ট রীতি-নীতি, যুদ্ধের সর্বপ্রকার নির্মমতা, ভালোবাসার মূল্য এবং কল্যাণ, মানবতা ও দয়া– এ ধরনের কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ব্যাপারে আমার সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আছে।

দুই বছর আগে আমার এসব বিশ্বাসের কারণেই আমি শহরের সিভিল রাইট ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আলবামার বার্মিংহামে যাই। ১৯৬৩ সালে রোববারের স্কুল চলাকালে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের বোমায় যে চারটি শিশু নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল সেই সিক্সটিনথ স্ট্রিট ব্যাপ্টিস্ট চার্চ ইনস্টিটিউটটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নিহত সেই চার শিশু ছিল অ্যাডি মাথে কলিনস, ক্যাবোলে রবার্টসন, সিনথিয়া ওয়েসলি ও ড্যানিস ম্যাকনায়ার। অনুষ্ঠানের আগে আমি চার্চটি পরিদর্শন করি। একজন যুবক যাজক ও চার্চের কিছু কর্মী আমাকে স্বাগত জানান। তারা আমাকে শিশুদের ওপর বিস্ফোরিত হওয়া বোমায় ক্ষতির স্থানটি দেখান। আমি চার্চের ঘড়িতে সেই ১০টা ২২ মিনিটই স্থির হয়ে আছে দেখতে পাই। আমি সেখানে আত্মোৎসর্গকৃত চারটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রতিকৃতি দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণ করি।

পরিদর্শনের পর যাজক ও চার্চ কর্মীদের সাথে আমি ঈশ্বরের কাছে হাত উঠাই এবং প্রার্থনা করি। এরপর তারা আমাকে চার্চের একটি টুলে বসতে দেন এবং আনমনে আমি ফিরে যাই ভাবনার জগতে। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি, ৪০ বছর আগে সেই শিশুদের পিতা-মাতারা সহিংসতায় তাদের মেয়েদের জীবনদানের বিষয়টিকে কতটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পেরেছিলেন? কিভাবে তারা এই বেদনাকে সহ্য করলেন। তারা কি জানতেন এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। এই অপূরণীয় ত্যাগ স্বীকারে নিশ্চয়ই কোনো তাৎপর্য আছে। এসব পিতা-মাতা এ ঘটনায় পুরো জাতিকে শোকাচ্ছন্ন পেয়েছেন। গোটা বিশ্ব তাদের সহানুভূতি জানিয়েছে। লিন্ডন জনসন জাতীয় টেলিভিশনে যখন এ শোকাবহ ঘটনার কথা জানান, তখন জনগণ সে মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি অতিক্রম করার কথা ভাবেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার আইন অনুমোদন হয়। শিশুদের পিতা-মাতাদের বন্ধুবান্ধব ও আগত সুহৃদরা আশ্বস্ত করেন যে, তাদের কন্যারা মারা যাননি। তারা জাতির মধ্যে অনন্ত এক চেতনার সঞ্চার করে এবং তাদের মুক্তিতে সহায়তা করে বেঁচে আছেন। সেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ন্যায়বিচারের রুদ্ধ বাঁধ ভেঙে দিয়ে এর সুফল সবার জন্য ছড়িয়ে দিয়েছে। এ বিষয়টি পরম সান্ত্বনার যে, আপনারা না জানলেও শিশুরা উত্তম স্থানেই রয়েছেন।

এ সময় আমার ভাবনায় মায়ের শেষ দিনগুলোর কথা ভেসে ওঠে। ক্যান্সার তখন

www.pathagar.com

তার পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি নিশ্চিত হয় যে, তিনি আর ফিরে আসছেন না। তার অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি আমাকে বলেন, মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত নন। আকস্মিকতা তার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়– তিনি যে পৃথিবীকে এত ভালোবাসতেন সেটি যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। যদিও তিনি সাহসের সাথে লড়াই করেছেন এবং ধৈর্যের সাথে ক্যামোথেরাপির যাতনা ভোগ করেছেন। সেই বেদনা যে কতটা মারাত্মক ছিল একদিন তার চোখে এর প্রকাশ আমি দেখেছিলাম। এর চেয়ে অধিক অজ্ঞাত বেদনা অথবা ভয় যেটি তার মধ্যে ছিল সেটি হলো মৃত্যুর একাকিত্ব, যা তাকে ভীত করে তুলেছিল। আমি তার বিদায়যাত্রার সেই আবেগ-অনুভূতির কথা স্মরণ করি। শেষ যাত্রায় তিনি নিজের অনুভূতি কারো সাথে শেয়ার করতে পারেননি। তিনি যে বেদনা অনুভব করছিলেন তা উপলব্ধির মতো কেউ ছিল না অথবা যে মুহূর্তটিতে তার লালাগ্রন্থি শেষবারের মতো আবৃত হয়ে যায়, জীবনের সেই চূড়ান্ত সময় পেরিয়ে যায় একাকিত্বের মধ্যে।

চার্চে যে উপলব্ধি আমার হয়েছিল, আমার চিন্তায় এর যে প্রভাব পড়েছিল– তা ভাষণে আমি উল্লেখ করি। সে রাতে আমি শিকাগো ফিরে নৈশভোজের টেবিলে মেয়ে মালিয়া ও সাশাকে দেখি যে– তারা হাসাহাসি করছে আর গুরুত্বহীন নানা বিষয়ে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করছে। তাদের মা বাথরুমে নেয়ার আগে তাদের মৃদু বকাঝকা করেন। কিচেনে একা ডিশ ধুতে ধুতে আমি ভাবি আমার মেয়ে দু'টি বেড়ে উঠছে এবং আমি বেদনা অনুভব করি। প্রত্যেক পিতাই কোনো না কোনো সময় এ ধরনের বেদনা অনুভব করে থাকেন। তারা চান প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানরা যেন উপস্থিত থাকে এবং কোনো সময় চলে না যায়। সব সময় যেন তাদের বাঁকা চুল আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে তাদের অনুভব করা যায়। আমি সাশার একদিনের সেই প্রশ্নের কথা ভাবি। ও বলেছিল– আমরা যখন মারা যাই তখন কী হয়। সে আরো বলে, 'আমি মরতে চাই না, বাবা'। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'তুমি অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকবে। এসব বিষয় নিয়ে ভাবার অনেক সময় আছে মা।' আমার কথা ওকে সন্তুষ্ট করেছিল সে দিন। কিন্তু আমি ভাবি– তাকে কি আসলে সত্য কথাটি আমি বলেছিলাম? আমি তো জানি না কখন আমাদের মৃত্যু হবে। এটিও নিশ্চিতভাবে জানি না যে, সেই মহাপ্রলয়ের আগে আমাদের আত্মা কোথায় থাকবে বা রাখা হবে। আমি সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ভাবি, আমি জানি– কী আশা আমি করি। আমি আশা করি, আমার মা কোনো না কোনোভাবে সেই ছোট্ট চার শিশুর সাথে মিলিত হবেন এবং তাদের সাথে আলিঙ্গন করবেন, তাদের সাথে আনন্দ ও বেদনা ভাগ করে নেবেন।

আমি জানি, আমার মেয়েরা সেই রাতে পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া করেছে, তখন যেন আমি স্বর্গের সুবাস খানিকটা অনুভব করছিলাম।

www.pathagar.com

অধ্যায় : সাত

বর্ণ

www.amarboi.org

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিশাল এক চার্চে। জ্যামিতিক নকশায় গড়ে তোলা পরিপাটি করে সাজানো এই চার্চ নির্মাণে খরচ হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি ডলার। প্রতিটি ডলার যেন উঁকি দিচ্ছে দীপ্তি ছড়ানো চার্চটির গা থেকে। এখানে আছে বিশাল বাংকুয়েট হল ও কনফারেন্স সেন্টার। ১ হাজার ২০০ গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা, স্টেট অব আর্ট সাউন্ড সিস্টেম এবং ডিজিটাল এডিটিং সুবিধাসহ টেলিভিশন চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থাও আছে এখানে।

চার্চের সেঞ্চুয়ারিতে ইতোমধ্যে জড়ো হয়েছে ৪ হাজারের মতো মানুষ। সবাই শোকাভিভূত। তাদের বেশিরভাগ আফ্রিকান-আমেরিকান। ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, জমি কেনাবেচার মধ্যস্থতাকারী– সব পেশার মানুষ আছে এখানে। অন্য দিকে স্টেজে আছেন বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর, সিনেটর ও জেসি জ্যাকসনের মতো জাতীয় নেতারা। চার্চের বাইরে অক্টোবরের প্রখর রোদ উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন আরো কয়েক হাজার মানুষ। বৃদ্ধ দম্পতি থেকে শুরু করে তরুণী পথচারী আছেন তাদের মধ্যে। তাদের কেউ কেউ আবার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া গাড়ির যাত্রীদের দিকে হাত নেড়ে জবাব দিচ্ছেন তাদের কথার। অন্যরা মগ্ন গভীর নীরবতায়। তারা সবাই এসেছেন চার্চের বেদিতে রাখা কফিনের মধ্যে শায়িত শুভ্র কেশের নারীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নাগরিক আন্দোলনের জন্মদাত্রী হিসেবে পরিচিত রোজা পার্কস শুয়ে আছেন ওই কফিনের মধ্যে।

প্রার্থনা সঙ্গীতের পর প্রাথমিক কিছু কথা বললেন চার্চের যাজক। এরপর সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন দাঁড়ালেন কিছু বলার জন্য। তিনি বললেন, পঞ্চাশের দশকে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট করা বাসে চড়ে সিট ছাড়তে অস্বীকার করে রোজা পার্কস যে নাগরিক আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিলেন তা শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নয়, শ্বেতাঙ্গদেরও

www.pathagar.com

বর্ণবৈষম্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। সে জন্যই কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত দক্ষিণের রাজ্যগুলোতেও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য পৃথক বাসে চড়ার অধিকার পেয়েছিল শ্বেতাঙ্গরা। ক্লিনটন তার বক্তব্যে সমঝোতা, ক্ষমা, কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি ভালোবাসা, অতীতের বেদনাদায়ক ক্ষত উপশমের চেষ্টা করেন। মুক্ত বিশ্বের একজন সাবেক নেতা দক্ষিণে বেড়ে ওঠা এই মানুষটি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর কাছে ঋণী থাকার যে স্বীকৃতি দিলেন; রোজা পার্কস ছিলেন এমনই শ্রদ্ধা পাওয়ার মতো এক ব্যক্তিত্ব।

বিশাল এই চার্চের চমৎকারিত্ব, প্রভাবশালী কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের বিশাল সমাবেশ, সমবেত মানুষগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধির দ্যুতি, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটর হিসেবে সেখানে আমার উপস্থিতিও আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের সেই দিনটির কথা। যে দিন আত্মমর্যাদা ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই শুরু করেছিলেন রোজা পার্কস। তার পাশাপাশি আমরা দক্ষিণের এমন আরো শত-সহস্র নারী-পুরুষ-শিশুর প্রতি সম্মান জানাই, যাদের কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে যাদের নাম। অথচ তাদের সাহস ও বদান্যতা মুক্ত করেছিল একটি জাতিকে।

সাবেক প্রেসিডেন্টের পর একে একে মঞ্চের সামনে দাঁড়াচ্ছিলেন অনেকেই। কিন্তু আমার মনটি হারিয়ে যায়, মাত্র দুই মাস আগে হারিকেন ক্যাটরিনার আঘাতে বিপর্যস্ত গালফ কোস্ট ও নিউ অরলিয়েন্সের বিস্তীর্ণ জনপদে। আমার মানসপটে ভেসে ওঠে নিউ অরলিয়েন্সের সুপারডোমের সামনে টিনএজ মায়েদের বিলাপ ও আর্তনাদ; হুইল চেয়ারে বসা বৃদ্ধার সূর্যতাপ থেকে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা, কাদামাখা পোশাকের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছিল তাদের অস্থিচর্মসার পা। টিভি সংবাদে প্রচারিত, কোনো বাড়ির দেয়ালের পাশে শিশু কুড়িয়ে পাওয়া অথবা নোংরা পানির মধ্য দিয়ে উদোম গায়ে হেঁটে যাওয়া তরুণ দলের দৃশ্য আমার কল্পনায় ভেসে ওঠে। আশপাশের দোকানগুলোতে ছোটাছুটি করছে তারা। ছিনিয়ে নিচ্ছে হাতের কাছে যা পাচ্ছে। বিভ্রান্তি ঝিলিক দিচ্ছে তাদের চোখে-মুখে।

ক্যাটরিনা প্রথম যখন আঘাত হানে তখন আমি রাশিয়া সফরে। প্রাথমিক বিপর্যয় ঘটার এক সপ্তাহ পর আমি হিউস্টন যাই। সেখানে ক্লিনটন ও হিলারি এবং প্রেসিডেন্ট বুশ ও লরার সাথে যোগ দিই আমি। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং দুর্যোগকবলিত এলাকা থেকে সরিয়ে নেয়া লোকজনকে দেখতে তারা সেখানে গিয়েছিলেন। 'হিউস্টন অ্যাস্ট্রোডম'-এ অস্থায়ী শিবির তৈরি করে এসব মানুষকে আশ্রয় দেয়া হয়।

বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে চমৎকার দক্ষতা দেখায় হিউস্টন নগর কর্তৃপক্ষ। রেডক্রস ও ফেমা ছিল তাদের সাথে। আশ্রিতদের খাদ্য-পানীয় সরবরাহ ও চিকিৎসাসেবায় ঘাটতি ছিল না কোনো। সেখানে আমরা অনেকের সাথে কথা বলি। জানার চেষ্টা করি তাদের কাহিনী। তারা জানায়, আসলে ক্যাটরিনা আঘাত হানার অনেক আগে থেকেই তারা সব কিছু হারিয়ে বসে আছে। তারা হলো আমেরিকার যেকোনো শহরের দরিদ্র এলাকার প্রতিচ্ছবি, কৃষ্ণাঙ্গ-দরিদ্রদের সাক্ষী।

www.pathagar.com

বেকার, আধা বেকার, অসুস্থ বা আধা অসুস্থ, দুর্বল বা বয়স্ক এসব মানুষ। এক তরুণী মা বললেন অপরিচিত মানুষভর্তি একটি বাসের মধ্যে তার সন্তানদের ফেলে আসার কথা। এক বৃদ্ধা বললেন ঘূর্ণিঝড়ে ঘর হারানোর কাহিনী। তার চলার মতো কোনো বীমা বা সন্তানও নেই। একদল তরুণ অভিযোগ করেন, নিউ অরলিয়েন্সকে যারা কৃষ্ণাঙ্গমুক্ত করতে চায়, তারাই শহর রক্ষা বাঁধটি ভেঙে দিয়ে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এক মহিলা হাত ধরে আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, ঝড়ের আগে আমাদের তেমন কিছু ছিল না। আর এখন, সেটুকুও নেই।

আমি ওয়াশিংটনে ফিরে এসে পরের কয়েকটি দিন টেলিফোনে ব্যস্ত সময় কাটাই। ঘূর্ণিদুর্গত মানুষের ত্রাণ সরবরাহে যেন সমস্যা না হয় তার চেষ্টা করি। একই সাথে সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাই আমি। সিনেটে ডেমোক্র্যাট দলের ককাসে আমি ও সহকর্মীরা এ ব্যাপারে একটি আইন করারও চেষ্টা চালাই।

রোববার সকালের টিভি শোতে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, ক্যাটরিনায় ক্ষতিগ্রস্তরা মূলত কৃষ্ণাঙ্গ হওয়ায় ব্যবস্থা নিতে প্রশাসন দেরি করেছে কি না। এ অভিযোগ আমি নাকচ করে দিই। তবে বলি, প্রশাসনের পরিকল্পনার যে অভাব ছিল তা স্পষ্ট হয়েছে এ ঘটনার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি 'ইনার সিটি'র দারিদ্র্যের দিকে নজর দিতে হবে আমাদের।

পরে একদিন সন্ধ্যায় সরকারের এক গোপন ব্রিফিংয়ে রিপাবলিকান সিনেটরদের সাথে আমরা ডেমোক্র্যাটরাও অংশ নিই। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় কেন্দ্র কিভাবে সাড়া দিয়েছে সে সম্পর্কে জানানো হয় আমাদের। গোটা মন্ত্রিসভা উপস্থিত ছিল সেখানে। ছিলেন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান। কত মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, সেনাবাহিনীর খাদ্য বিতরণ, ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন– এসব প্রসঙ্গ আলোচনা হয় সেখানে। এর কয়েক রাত পরই দেখি প্রেসিডেন্ট বুশ, যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্যের ধারাটি থেকে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। নিউ অরলিয়েন্সের ট্র্যাজেডি একে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তবে শহরটি আবার উঠে দাঁড়াবে, এমন প্রত্যাশা করলেন বুশ।

ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর আমেরিকাজুড়ে ক্ষোভ ও নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে যায়। সভা-সমাবেশ, ই-মেইল চালাচালি ও ককাসের মিটিং হয় এন্তার। টিভি ও পত্রিকার পাতাজুড়ে ক্যাটরিনার ক্ষয়ক্ষতির খবর প্রকাশ হতে থাকে দিনের পর দিন। এর মাত্র দুই মাস পর আজ রোজা পার্কসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসে মনে হচ্ছে, ক্যাটরিনার মতো ঘটনাই যেন কখনো ঘটেনি। অথচ এখনো দুর্গত এলাকার বাড়ির ছাদে গাড়ি ঝুলে আছে, লাশ পাওয়া যাচ্ছে এখনো। এখন সংবাদমাধ্যমে ক্যাটরিনার কাহিনীর বদলে কোটি কোটি ডলারের বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের খবর। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিভাবে বর্তমান মজুরি ও ইতিবাচক সংরক্ষণ আইন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, খরচ কমাতে অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের কাজে নেয়া হচ্ছে– এসব খবর। ক্যাটরিনার পর, দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে ওঠা একটি জাতি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে বলে যেমনটা মনে হয়েছিল, দ্রুত সেই ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে।

www.pathagar.com

তার বদলে আমরা গীর্জায় বসে রোজা পার্কসের গুণকীর্তন করছি। অতীতের জয়ের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে সবাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি নস্টালজিয়ায়। ক্যাপিটাল ডোমে রোজা পার্কসের প্রতিকৃতি বসানোর ব্যাপারে ইতোমধ্যে সিনেটে বিল আনা হয়েছে। তার নামে স্মারক ডাকটিকিট ছাড়া হচ্ছে। তার নামে আমেরিকাজুড়ে অসংখ্য সড়ক, স্কুল ও পাঠাগার। এগুলো নিঃসন্দেহে বাঁচিয়ে রাখবে তার স্মৃতি। কিন্তু আমি ভাবছি, রোজা পার্কসের প্রতিকৃতি বা স্মারক ডাকটিকিট তার চেতনাকে কতটুকু ধারণ করতে পারবে, সেই কথা। তার স্মৃতি কি এর চেয়ে বেশি কিছু দাবি করে না?

www.amarboi.org

হিউস্টনে কানে কানে কথা বলা সেই মহিলার কথা আমার মনে পড়ে যায়। ভাবতে থাকি, বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পরের দিনগুলোকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব সে কথা। সিনেট নির্বাচনের প্রচারকাজে অংশ নিতে প্রথম যখন আমি জনগণের মুখোমুখি হই, তখন তারা আমাকে ২০০৪ সালে ডেমোক্র্যাট কনভেনশনে দেয়া বক্তব্যের একটি লাইন শোনায়। তা ছিল এমন, 'ব্ল্যাক আমেরিকা, হোয়াইট আমেরিকা বা ল্যাটিনো আমেরিকা বলতে কিছু নেই। আছে শুধু ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা।' এটা নাকি তাদের কাছে মনে হয়েছে অতীতের 'জিম ক্রো' তথা বর্ণবাদ ও দাসত্ব, জাপানি বন্দী ক্যাম্প, মেক্সিকান বর্বরতা, কর্মক্ষেত্রে উত্তেজনা এবং সংস্কৃতির সঙ্ঘাত থেকে চূড়ান্তভাবে আমেরিকাকে মুক্ত করার একটি স্বপ্ন বলে। যেখানে মার্টিন লুথার কিংয়ের স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ নেবে; এটা সেই আমেরিকার ডাক। যেখানে গায়ের রঙ দিয়ে কারো বিচার হবে না, বিচার হবে তার গুণে।

আসলে এই স্বপ্ন দেখা ছাড়া আমার কোনো উপায়ও নেই। কালো বাবা ও সাদা মায়ের ঘরে 'রেসিয়াল মেল্টিং পট' নামে খ্যাত হাওয়াই দ্বীপে আমার জন্ম। যার আছে আধা ইন্দোনেশিয়ান একটি বোন; যার শ্যালক ও ভাইয়ের মেয়েরা চীনাদের উত্তরসূরি, যার আত্মীয়দের অনেকের রক্তে মার্গারেট থ্যাচারের আভিজাত্য; ক্রিসমাসের ছুটিতে যার পরিবারের সদস্যরা কোথাও মিলিত হলে মনে হয় জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের কোনো সভা– আমি সেই মানুষটির জন্য বর্ণবাদী আনুগত্যের সুযোগ ছিল না কখনো। গোত্র বিচারে নিজেকে কখনো মূল্যায়নের সুযোগ হয়নি আমার।

তা ছাড়া আমি বিশ্বাস করি, আমেরিকার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের একটি দিক এখানে আগতদের আত্মস্থ করে নেয়। এর আছে উপকূলে তরী ভেড়ানো মানুষগুলোকে একটি জাতীয় পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষমতা।

এর প্রধান সহায়ক আমাদের সংবিধান, যার চোখে সব নাগরিক সমান। এখানে আছে এমন এক অর্থনীতি– যা বংশ, মর্যাদা, উপাধি নির্বিশেষে সবাইকে সুযোগ করে দেয়। যদিও বর্ণবাদ, আদিবাসী মনোভাব এই চেতনাকে বারবার খর্ব করেছে। ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগীরা প্রায়ই সুযোগ নিয়েছে শোষণের। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য উসকে দিয়েছে গোঁড়ামি। কিন্তু সংস্কারকদের হাতে পড়ে সমতার আদর্শক্রমে

www.pathagar.com

আমাদের আত্মপরিচয় উপলব্ধির সুযোগ করে দেয়। এটা এমন এক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতি গঠনের সুযোগ করে দিয়েছে আমাদের, পৃথিবীর কোথাও যার দ্বিতীয়টি নেই।

কনভেনশনে আমার বক্তব্যে ভবিষ্যৎ আমেরিকার জনসংখ্যার ধরনটিও তুলে ধরা হয়েছে। টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো, হাওয়াই ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার সংখ্যালঘুরাই এখন সংখ্যাগুরু। আরো ১২টি রাজ্যে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ, ল্যাটিনো বা এশিয়ান। ল্যাটিনো আমেরিকানদের বর্তমান সংখ্যা ৪ কোটি ২০ লাখের বেশি। জনসংখ্যার সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রুপ এরা। এশিয়ান আমেরিকানদের সংখ্যা অনেক কম হলেও তাদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০৫০ সালের পর আমেরিকা আর শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত দেশ থাকবে না।

এখনো আমি যখন কাউকে বলতে শুনি, আমরা একটি বর্ণবাদোত্তর রাজনীতিতে উপনীত হয়েছি বা আমরা বর্ণবৈষম্যহীন সমাজে বাস করছি; তখন আমাকে কিছুটা সতর্কবাণী শোনাতে হয়। বলতে হয়, আমরা এক জাতি– তার অর্থ এই নয় যে, বর্ণবাদ কোনো ব্যাপার নয়। সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াই এখানে জয়ী হয়েছে অথবা আজ দেশের সংখ্যালঘুরা যে সমস্যায় ভুগছে তা তাদেরই তৈরি– এ কথাও আমরা বলতে পারি না। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে, শিশুমৃত্যু থেকে গড় আয়ু, কর্মসংস্থান থেকে বাড়ির মালিক হওয়া ইত্যাদি আর্থসামাজিক সূচকের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদের তুলনায় কালো বা ল্যাটিনো আমেরিকানরা অনেক পেছনে। আমেরিকাজুড়ে করপোরেট বোর্ড রুমগুলোয় কালোদের প্রতিনিধিত্ব নেই বললেই চলে। মার্কিন সিনেটে মাত্র তিনজন ল্যাটিনো এবং দু'জন এশীয় (দু'জনই ওহাইয়ো বংশোদ্ভূত) সদস্য। এই আমি যখন লিখছি, তখন আমি সিনেটের একমাত্র আফ্রিকান-আমেরিকান সদস্য। আমি বলব, এই বৈষম্য সৃষ্টিতে কখনোই বর্ণবাদী মনোভাবের ভূমিকা ছিল না। এটা হয়েছে আমাদের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা এবং সব কিছু ঠিক করার দায়বোধ থেকে নিজেদের মুক্তি দেয়ার জন্য।

ভাগ্য ও পরিস্থিতির কারণে আফ্রিকান আমেরিকান সমাজের অভিজ্ঞতা আমার খুব সামান্যই। তার ওপর এমন এক পদে এখন আমি বসে আছি, যা সাধারণ কোনো মানুষের জীবনযাপনের অনেক বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত। এর পরও আমার ৪৫ বছরের জীবনে ডিপার্টমেন্ট স্টোরে গেলে সিকিউরিটি গার্ডের অনুসরণ, রেস্টুরেন্টের বাইরে অপেক্ষাকালে শ্বেতাঙ্গ দম্পতি এসে তাদের গাড়ির চাবিটি দিয়ে টস করতে বলা অথবা কোনো কারণ ছাড়াই টহল পুলিশের গাড়ি নেয়ার মতো বহু ঘটনা আমাকে চলার পথে নির্দেশনা দিয়েছে। আমি জানি এই কাজগুলোর অর্থ হলো এটা আমাকে বলা যে, আমি কিছু কাজ করতে পারব না আমার গায়ের রঙের কারণে। কালোদের কী তিক্ত ক্ষোভ গলাধঃকরণ করতে হয় তা আমি অনুভব করি। আমি ভালো করেই জানি, আমার মেয়েরা টিভি, মিউজিক বা বন্ধুদের কাছ থেকে অথবা রাস্তায় যেসব বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে আমাকে ও মিশেলকে। জানাতে হবে

www.pathagar.com

তারা যে পৃথিবী নিয়ে ভাবে সেটি কেমন; আর তারা যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখবে সেটি কেমন হওয়া উচিত।

বর্ণ নিয়ে স্পষ্ট ধারণার জন্য আমাদের উচিত একটি বিভক্ত স্ক্রিনে পৃথিবীটা দেখা। যে আমেরিকা আমরা দেখছি সে দিকে নিরপেক্ষদৃষ্টি রেখে আমরা যে আমেরিকা চাই তা নিয়ে ভাবতে হবে। নৈরাশ্য বা হতাশায় আক্রান্ত না হয়ে অতীতের কর্ম ও বর্তমানের চ্যালেঞ্জগুলো স্বীকার করে নিতে হবে। আমার জীবনেই বর্ণ সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছি আমি। অনুভব করেছি মানসিকতার পরিবর্তন। আমি নিশ্চিত প্রত্যেকেই এটা অনুভব করবে। শুনি কালোদের কেউ কেউ এই পরিবর্তন মেনে নিতে চায় না। তখন মনে হয়, এটা শুধু যারা আমাদের জন্য সংগ্রাম করেছে তাদের অসম্মান করাই নয়, তাদের শুরু করা কাজটি শেষ করার যে দায়িত্বটি আমাদের ওপর বর্তায় সেটাও অস্বীকার করা হচ্ছে। আমি জোর দিই আরো ভালো ভবিষ্যতের ওপর। ভালোর কোনো শেষ নেই– আমি মনে সব সময় লালন করি এই বিশ্বাস।

* * *

সিনেটের জন্য আমার নির্বাচনী প্রচার ছিল গত ২৫ বছরে ইলিনয়ের সাদা ও কালো সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আমার আগেই এই রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনে কালোদের বিজয়ী হওয়ার অনেক ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের কম্পট্রোলার ও অ্যাটর্নি জেনারেল রোনাল্ড বারিস, ফেডারেল সিনেটর ক্যারম মোজেলি ব্রাউন এবং বর্তমান রাজ্যসচিব জেসি হোয়াইট। মাত্র দুই বছর আগে রেকর্ডসংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছিলেন জেসি। নির্বাচনে এসব ব্যক্তির বিপুল বিজয়ে আমার প্রচারণায় নতুনত্ব কিছু ছিল না। আমি ফেবারিট ছিলাম না, তাই বলে আমার সম্ভাবনাও নাকচ করার মতো ছিল না। তা ছাড়া যেসব ভোটার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে উপেক্ষা করে চলেন, তারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমার প্রচারকাজে। আমেরিকান সিনেটে আমার প্রার্থিতা ঘোষণার দিনেই রাজ্য সিনেটের তিন শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী সমর্থন দেয় আমাকে। শিকাগোতে আমরা যাদের 'লেক ফ্রন্ট লিবারেল' বলে ডাকি, এরা সে রকম নয়। রিপাবলিকানরা এদের ভলবো ড্রাইভিং, লেটি সিপিং, হোয়াইট-ওয়াইন-ড্রিংকিং বলে উপহাস করে। আমার মতো 'হারুয়া' কাউকে সমর্থন দেয়ার জন্য কাউকে বিব্রত করতে বলা হয় এগুলো। কিন্তু আমাকে সমর্থনদানকারীরা ছিলেন মধ্যবয়সী ও শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ– লেক কাউন্ট্রির টেরি লিঙ্ক, কুয়াড সিটির ডেনি জ্যাকব এবং উইল কাউন্টির ল্যারি ওয়ালশ। এরা ছিলেন শিকাগোর বাইরের শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক শ্রেণী বা গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি।

ফলে এদের পক্ষে আমাকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয়েছিল। আগের সাত বছর আমরা চারজন একসাথে কাজ করেছি স্প্রিংফিল্ডে। পোকার খেলে আমরা অবসর কাটাতাম। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাধীন চিন্তা-চেতনার জন্য ছিলেন গর্বিত। ফলে শ্বেতাঙ্গ কোনো প্রার্থীর বদলে আমাকে সমর্থন দিতে মনের সাথে লড়তে হয়নি তাদের। শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই তারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন, এমনও নয়। লিংক,

www.pathagar.com

জ্যাকব ও ওয়ালশ– তিনজনই একরোখা ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। হুট করে কাউকে সমর্থন দিয়ে নিজের অবস্থানকে ঝুঁকিপূর্ণ করার মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না তাদের। তারা বুঝেছিলেন তাদের এলাকায় আমার পক্ষে সহজেই সমর্থন আদায় করা যাবে।

কোনো অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতেও তারা এ সিদ্ধান্ত নেননি। দীর্ঘ সাতটি বছর তারা আমাকে তাদের কমিউনিটির সাথে মেলামেশা করতে দেখেছেন। তারা দেখেছেন সাদা মায়েরা আমার সাথে ছবি তোলার জন্য তাদের সন্তানদের পাঠাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত সৈনিকদের কনভেনশনে বক্তব্য দেয়ার পর তাদের ভেতর থেকে শ্বেতাঙ্গ সেনারা কিভাবে আমার সাথে হাত মিলিয়েছেন, তা তারা দেখেছেন। জীবনভর আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তারা তা জানতেন। তারা জানতেন, যা-ই আমরা ভাবি না কেন, সময় দেয়া গেলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বর্ণবাদের উর্ধ্বে উঠে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারে।

তাই বলে কি বলা যাবে গোঁড়ামি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? সাদা, কালো, ল্যাটিনো বা এশিয়ান– আমরা কেউই আমাদের কমিউনিটির অপরাধপ্রবণতা, কালোদের দুর্বল মেধা অথবা কালোদের কর্মনৈতিকতার ব্যাপারে নেতিবাচক বদ্ধমূল ধারণাটি থেকে মুক্ত নই। সাধারণভাবে কোনো সংখ্যালঘু সদস্যকে আমরা বিচার করি তিনি আমেরিকান সমাজে কতটুকু একাত্ম হতে পেরেছেন তার মাত্রা দিয়ে। তার বাচনভঙ্গি, পোশাক অথবা চালচলন প্রভাবশালী সাদা সংস্কৃতির সাথে কতটা মিলছে আমরা তা বিচার করি। সংখ্যালঘু যে সদস্য এই একাত্ম হওয়া থেকে যতটা দূরে, তার প্রতি নেতিবাচক ধারণা ততই প্রবল। আমি মৌলিক শিষ্টাচারের কথা বলছি না। কিন্তু গত তিন দশকে বৈষম্যবিরোধী মানসিকতায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা অন্য বর্ণের মানুষের সাথে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সচেতনভাবে বর্ণবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটানো থেকে বিরত রাখছে বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গকে। কিন্তু কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই বদ্ধমূল ধারণাগুলোর সামষ্টিক প্রভাব পড়ছে না তা বিশ্বাস করা অবাস্তব। কর্মক্ষেত্রে কে সুযোগ পাচ্ছেন এবং কাকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, কে গ্রেফতার হচ্ছেন এবং কার বিচার হচ্ছে, আপনার স্টোরে যে কাস্টমারটি আসছে তার সম্পর্কে অথবা আপনার সন্তানদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের বর্ণ-গোত্রের অবস্থান নিয়ে আপনি কী ভাবছেন– সেখানে বদ্ধমূল ধারণাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি মনে করি, আজকের আমেরিকায় টিকে থাকা গোঁড়ামি অতীতের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হলেও সেগুলো নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ কোনো শ্বেতাঙ্গ দম্পতির মনে ভয় জাগাতে পারে। কিন্তু সেই তরুণটিই আবার ছেলের স্কুলের সহপাঠী হলে সে ডিনারের দাওয়াত পেতে পারে ওই শ্বেতাঙ্গ দম্পতির বাড়িতে। গভীর রাতে কোনো কালোর পক্ষে ক্যাব পাওয়া কঠিন। কিন্তু তিনি যদি হন মাইক্রোসফটের কোনো জাঁদরেল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার; তবে তাকে কাজে নেয়ার জন্য বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেতে পারে।

আমার এসব দাবি আমি প্রমাণ করতে পারব না। বর্ণবাদী মনোভাব নিয়ে জরিপ

www.pathagar.com

চালানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমার কথাগুলো সত্য হলেও অনেক কালোর জন্য তা বলা স্বস্তিদায়ক নয়। আসলে মানুষের মনোভাব নিয়ে আলোচনা একটি ক্লান্তিকর কাজ। অনেক সংখ্যালঘু, বিশেষ করে আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে এ রকম একটি অনুভূতি বিরাজ করছে যে, আমেরিকার ভাণ্ডারে গোষ্ঠীগতভাবে তাদের কোনো অবদান জমা নেই। আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন নতুনভাবে এর প্রমাণ দিতে হবে। আমরা 'বেনিফিট অব ডাউট' কদাচিৎ পেয়ে থাকি এবং আমাদের ভুলের ক্ষমাটিও প্রান্তিক। এমন পরিবেশে একটি কালো শিশু যখন প্রথম স্কুলে যায় তখন সাদা শিশুভর্তি ক্লাসরুমে অনেক বেশি দ্বন্দ্বে ভুগতে হয় তাকে। শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত কোনো কোম্পানিতে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া নিয়ে মনের বিরুদ্ধে অনেক বেশি লড়তে হয় একজন ল্যাটিন মহিলাকে।

এই লড়াই এদের বেশিরভাগকে বাধ্য করে তাদের অনেক ইচ্ছা দমিয়ে রাখতে। কিছু সংখ্যালঘুরা নিজেদের গুটিয়ে রাখলেও সাদারা অন্য বর্ণের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক না রেখেও যেভাবে চলতে পারবে, অন্যরা তা পারবে না। কিন্তু সংখ্যালঘুরা কেবল সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির কথা ভেবে নিজেদের রক্ষার জন্য মানসিক পর্দাটি টেনে দিতে পারেন। অনেক কালো আমাকে বলেছেন, 'সাদারা যখন আমাদের গণনায় ধরতে চান না, তখন আমি কেন তার সম্মান রক্ষার চেষ্টা করব? ৩০০ বছর এ চেষ্টা আমরা করেছি। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।'

আমি মনে করি, এর বিকল্প হলো আত্মসমর্পণ। কী হয়েছে– এটা তা নয়। এটা হলো কী হওয়া উচিত।

ইলিনয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে যে বিষয়টির সবচেয়ে মূল্য দিই আমি তা হলো বর্ণবাদী মনোভাবের ব্যাপারে আমার নিজস্ব ধারণা ভেঙে যাওয়ার বিষয়টিকে। সিনেট নির্বাচনকালে আমি প্রবীণ সিনেটর ডিক ডারবিনের সাথে দক্ষিণ ইলিনয়ের ৪৯টি শহর সফর করি। রাজ্যের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের একটি শহর কায়রো। মিসিসিপি ও ওহাইও নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত এই শহর। ষাট ও সত্তরের দশকে এ অঞ্চলের মধ্যে এখানেই সবচেয়ে ভয়াবহ জাতিগত সঙ্ঘাতগুলো ঘটেছিল। তখনই প্রথম সিনেটর ডিক যান এই শহরে। সে সময় ঘটনা তদন্তের জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর পল সাইমনের তরুণ এক অ্যাটর্নিকে পাঠানো হয় এই শহরে। পরিস্থিতি শান্ত করতে কী করা উচিত তা বের করার চেষ্টা করছিলেন এই তরুণ অ্যাটর্নি। আমরা গাড়িতে করে কায়রো যাওয়ার পথে ডিক শোনালেন পুরনো সেই কাহিনী। বললেন, সে সময় শহরে আসার পর তাকে বলা হলো তিনি যেন মোটেলের টেলিফোন ব্যবহার না করেন। কারণ টেলিফোন অপারেটর ছোকরাটি 'হোয়াইট সিটিজেন্স কাউন্সিল'-এর সদস্য। সে সময় শ্বেতাঙ্গদের বিভিন্ন দোকানে কালো কর্মচারী নিয়োগের দাবিতে কালোরা পণ্য বয়কট শুরু করে। কালোদের দাবি মেনে নেয়ার বদলে দোকানগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেয় সাদারা। সে সময় কালোরা ডিককে জানিয়েছিলেন কিভাবে স্কুলগুলোকে সমন্বিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন তারা, তাদের ভয় ও উদ্বেগ, উত্ত্যক্ত হওয়া, কারাগারে আত্মহত্যা,

www.pathagar.com

গোলাগুলির ঘটনা ও দাঙ্গার কাহিনী। সিনেটর আমাকে শোনালেন সেগুলো।

এরই মাঝে আমরা কায়রো পৌঁছি। সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনোই ধারণা ছিল না আমার। সময়টি দুপুর হলেও শহরটি ছিল নীরব। প্রধান সড়কের দু'ধারে কয়েকটি দোকান খোলা। কিছু প্রবীণ দম্পতিকে বেরিয়ে আসতে দেখে বোঝা গেল ওটি একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক। একটু পরেই কোণার দিকে বিশাল এক পার্কিং এরিয়ায় আমরা এসে থামি। কয়েক শ' মানুষ অপেক্ষা করছিল সেখানে। তাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কালো, বাকিরা সাদা। এদের সবার বুকে সাঁটা ছিল নীল রঙের বাটন। আর তাতে লেখা ছিল সিনেট নির্বাচনে ওবামাকে ভোট দিন।

আমাদের গাড়ি থামামাত্র আকর্ণবিস্তৃত এক হাসি দিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসেন এড স্মিথ। বিশাল হৃদয়ের এই মানুষটি লেবারার্স ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নের মিডওয়েস্ট অঞ্চলের ম্যানেজার। তিনি বড় হয়েছেন এই শহরেই।

আমরা গাড়ি থেকে নামলে হাসিমুখে স্বাগত জানান তিনি। বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। আমার মায়ের করা বারবিকিউ নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, খেয়ে নিন আগে।'

ওই দিন সেখানে উপস্থিত সাদা মানুষের মনে ঠিক কী ছিল, আমি তা অনুমানের চেষ্টা করিনি। তাদের বেশিরভাগ আমার সমান অথবা কিছুটা বেশি বয়সী। ৩০ বছর আগেকার সেই নির্মম দিনগুলোর কথা এদের মনে পড়ছিল কি না তা আমি জানি না। সন্দেহ নেই এদের অনেকেরই এখানে আসার কারণ, তাদের আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এড স্মিথের মতো প্রভাবশালী সিনেটর। অনেকেই সেখানে এসে থাকতে পারেন দুপুরের খাবারটি সেরে নেয়ার জন্য। আবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিনেটর এবং সিনেট নির্বাচনের একজন প্রার্থী তাদের শহরে আসায় তাদের দেখতে উৎসাহী হয়েও আসতে পারেন।

বারবিকিউটির স্বাদ ভয়াবহ হলেও আমাদের কথাবার্তায় আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল না। আমাদের দেখে দর্শকরাও সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছিল আমার। খাওয়া, ছবি তোলা এবং মানুষের কথা শোনা– এসব করে ১ ঘণ্টারও বেশি সময় আমরা কাটিয়ে দিই। এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী করা উচিত এবং এখানকার স্কুলগুলোর জন্য আরো অর্থ কিভাবে পাওয়া যায় সেসব নিয়ে আমরা আলোচনা করি। ইরাক যুদ্ধে যাওয়া বাবা-মায়ের কথা এবং শহরের পুরনো হাসপাতালটি ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা শুনি। শহরের কেন্দ্রস্থলে এই হাসপাতাল এখন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদায় নেয়ার আগে সেখানকার মানুষের সাথে আমার এক ধরনের মানসিক বন্ধন তৈরি হয়েছে বলে অনুভব করি আমি। এক ধরনের আস্থা গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে।

যদিও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে এ ধরনের আস্থাকে তাৎক্ষণিক বলে মনে করা হয়। অব্যাহত চেষ্টা না চালালে এই আস্থাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার এই আস্থা তত দিন টিকে থাকতে পারে যত দিন অবিচারের বিরুদ্ধে শান্ত ও নিশ্চুপ থাকবেন

www.pathagar.com

সংখ্যালঘুরা। 'ইতিবাচক সংরক্ষণ'-এর কারণে সাদা শ্রমিকরা স্থানচ্যুত হয়েছেন, এমন নেতিবাচক প্রচারণার কয়েকটি বিজ্ঞাপন এই আস্থাটি উড়িয়ে নিতে পারে। আবার কোনো নিরস্ত্র কালো বা ল্যাটিনোকে পুলিশ গুলি করেছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়লেও বিনষ্ট হতে পারে এই আস্থা।

কিন্তু আমার মতে, কায়রোতে জনগণের সাথে মেশার মতো ঘটনাগুলোর তাৎক্ষণিক কিছু ফল রয়েছে। সব বর্ণের মানুষই এসব ঘটনার অভিজ্ঞতা তাদের বাড়িতে, তাদের প্রার্থনার জায়গায় নিয়ে যায়। সন্তান বা বাড়ির কাজের লোকটির সাথে তার কথাবার্তায় এর প্রভাব পড়ে। এভাবে তা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার বিষবাষ্প ধীরে ধীরে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি ইলিনয়ের দক্ষিণাঞ্চলে বক্তৃতা ও সভা-সমাবেশে যোগদানের দীর্ঘ এক সফর শেষে ফিরছিলাম আমি। এ সময় আমার সাথে ছিলেন রবার্ট স্টিফেন নামের সে এলাকার এক তরুণ শ্বেতাঙ্গ অফিসার। সেটি ছিল বসন্তের একটি রাত। হাইওয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মিসিসিপির দুই তীর ঝিকমিক করছিল পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়।

নদীর মৃদুমন্দ ঢেউ আমাকে মনে করিয়ে দেয় এর উজান ও ভাটিতে থাকা অসংখ্য শহরের কথা। যেগুলোর মধ্যে কায়রোও ছিল। নদীর দুই তীর কত না ঘটনার সাক্ষী। কত বসতির উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছে এই নদী। কত বেদনা, কত নিষ্ঠুরতা জড়িয়ে আছে এসব ঘটনার সাথে। দাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াইয়ের পাশাপাশি দাসত্ব টিকিয়ে রাখার চক্রান্ত– এ সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী এই মিসিসিপি। আমি রবার্টকে জানালাম যে, কায়রো শহরের পুরনো হাসপাতালটি ভাঙা নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে আমার অফিস আলোচনা শুরু করেছে। সেই শহরে আমার প্রথম সফরের কথাও বললাম তাকে। রবার্টের জন্ম ও বেড়ে ওঠাও ইলিনয়ের দক্ষিণাঞ্চলে। কথা বলতে বলতে আমরা এক সময় তার প্রতিবেশী ও বন্ধুদের বর্ণবাদী মনোভাব প্রসঙ্গে এসে পড়ি। তিনি বললেন, এই আগের সপ্তাহেই স্থানীয় প্রভাবশালী কিছু লোক তাকে এলটনের একটি ছোট সোশ্যাল ক্লাবে আমন্ত্রণ জানান। ক্লাবটি তার বাড়ির কয়েক ব্লক পরেই। সে দিকে তিনি কখনো যাননি, তবে স্থানটি ভালোই মনে হচ্ছিল তার কাছে। তাকে আপ্যায়ন করা হলো। গ্রুপ করে বিভিন্ন আলোচনা করছিলেন ক্লাবের লোকজন। রবার্ট লক্ষ করেন সেখানে ৫০ জনের মতো সভ্য থাকলেও একজনও কালো নেই। অথচ এলটনের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই কালো। রবার্টের কাছে বিষয়টি বেখাপ্পা ঠেকে। তিনি একজনকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন।

তিনি জানালেন, এটি একটি প্রাইভেট ক্লাব। প্রথমে বুঝতে না পেরে রবার্ট জিজ্ঞেস করেন, কালো কেউ কি এ ক্লাবে যোগ দিতে চাননি কখনো? এ প্রশ্নে আশপাশের সবাইকে চুপ থাকতে দেখে আপন মনে বললেন রবার্ট– হায়, ঈশ্বর! এটা ২০০৬ সাল।

লোকগুলো কিছুটা শ্রাগ করল। বলল, এমনই হয়ে আসছে। এখানে কোনো

www.pathagar.com

কালোর অনুমতি নেই। এরপর আর কথা না বাড়িয়ে 'শুভ রাত্রি' বলে রবার্ট সেখান থেকে চলে আসেন।

আমার মনে হলো ক্লাবটিতে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসি। আমার মতো দেখতে মানুষের সাথে সাদা মানুষেরা কিভাবে শত্রুতা জিইয়ে রেখেছে তার একটি প্রমাণ দেখে আসি। কিন্তু গোঁড়ামির এই অনুসারীদের বেকায়দায় ফেলার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত আমার আর রইল না।

তার বদলে রবার্টকে নিয়ে ভাবলাম আমি। বয়সে ছোট হলেও তিনি তখন খুব কঠিন মনোভাবের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। রবার্টের মতো কেউ যদি সত্যকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে এই আচরণ ও ভয়ের স্রোত অতিক্রম করার চেষ্টা করেন তাহলে শপথ করে বলছি, আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব এবং তাকে সৈকতে টেনে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ইলিনয়ের শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে বর্ণবাদী মনোভাবের বিকাশ আমার নির্বাচনে সহায়ক হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটিগুলোর পরিবর্তনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই পরিবর্তন দেখা যায় আমার নির্বাচনী প্রচারকাজের প্রথম দিকে যে ধরনের সমর্থন আমি পেয়েছি সেখানে। প্রাইমারিতে অংশ নেয়ার পর আমার তহবিলে প্রথম যে ৫ লাখ ডলার জমা হয়, তার প্রায় অর্ধেকই আসে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের কাছ থেকে। শিকাগোর আকাশে আমার প্রার্থিতার প্রথম খবর ছড়ায় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির মালিকানাধীন রেডিও স্টেশন 'ডব্লিউভিওএন'-এ। কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'এনডিগো' প্রথম আমাকে নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপে। প্রচার চালাতে গিয়ে প্রথম যখন প্রাইভেট জেটের প্রয়োজন হয়েছিল, সেটিও ধার দিয়েছিলেন আমার এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধু।

এক প্রজন্ম আগেও কৃষ্ণাঙ্গদের এই ক্ষমতা ছিল না। যদিও কালো ব্যবসায়ীদের জন্য সব সময়ই একটি সুবিধাজনক জায়গা ছিল শিকাগো। ষাট বা সত্তরের দশকে 'ইবনি অ্যান্ড জেট'-এর প্রতিষ্ঠাতা জন জনসন, 'জনসন' পণ্যেও প্রতিষ্ঠাতা জর্জ জনসন, 'সফট শিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা এড গার্ডনারের মতো স্বপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। আমেরিকায় কালোদের মধ্যে প্রথম 'জিএম ফ্রানসাইজ'-এর মালিক হয়েছিলেন আল জনসন। আর এ রকম মালিক হলেই কেবল নিজেদের মানে কাউকে ধনী বলে স্বীকার করে নিতেন সাদারা।

এখন শহরটিতে ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, আইনজীবী, অ্যাকাউন্ট্যান্টসহ সব পেশায় কালোদের আধিপত্য। শিকাগোর বেশ কিছু করপোরেট হাউসের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক পদেও কালোরা বসে আছেন। এখন কালোরা চেইন রেস্টুরেন্ট বা ব্যাংকের মালিক। তাদের আছে পাবলিক রিলেশন্স এজেন্সি, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ও স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

তারা এখন পছন্দমতো অভিজাত এলাকায় থাকতে পারেন। সন্তানকে পাঠাতে পারেন সেরা প্রাইভেট স্কুলে। তারা নাগরিক সভারও সক্রিয় সদস্য। সব ধরনের দাতব্য কাজে উদারহস্তে দান করেন তারা।

তবে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে এখনো দেখা যাবে, আয়ের শীর্ষ পঞ্চম ধাপে আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। শিকাগোর যেকোনো কালো পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীর কাছে গেলে শোনা যাবে তাদের প্রতিযোগিতার পথ আগলে থাকা অসংখ্য বাধার কথা। যে গুটিকয়েক আফ্রিকান-আমেরিকান উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদের কেউ হয় উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক অথবা তাদের ব্যবসায় দৈবভাবে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন কেউ, নয়তো অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে আকস্মিকভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল ব্যবসাটি। সাদা হলে লক্ষ্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় আরো অনেক এগিয়ে থাকা যেত– এ ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহ নেই কোনো।

কিন্তু এখানে আপনি এমন কাউকে পাবেন না, যে তার ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে বৈষম্যের কথা উল্লেখ করবে। আসলে নতুন প্রজন্মের এই কালো পেশাজীবীদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা চান না তাদের অর্জনের লক্ষ্যটিকে কেউ বেঁধে দিক। আমার এক বন্ধু ছিলেন শিকাগোর 'মেরিল লিঞ্চ' অফিসের সেরা বন্ড সেলসম্যান। তিনি নিজেই বিনিয়োগ ব্যাংক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ মালিকানাধীন বিশাল কোনো ফার্ম প্রতিষ্ঠা তার লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল শুধু সেরা ফার্মের স্থানটি দখল করা। আরেক বন্ধু একইভাবে 'জেনারেল মোটরস'-এর নির্বাহী পদ ছেড়ে দিয়ে 'হায়াত'-এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিজস্ব পার্কিং সার্ভিস কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। তার মা ভাবলেন, ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বন্ধুটি আমাকে বললেন, 'জিএম কোম্পানিতে চাকরির চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে পারেন না আমার মা। কারণ তার সময়ে এ চাকরি ছিল দুর্লভ বস্তু। কিন্তু আমি নিজস্ব কিছু তৈরি করতে চাই।'

কারো স্বপ্ন সীমাবদ্ধ করা যায় না– এই সাধারণ কথাটি আমেরিকাকে বোঝার জন্য সবচেয়ে মৌলিক বিষয়। এই ভূখণ্ড একটি অভিন্ন জায়গা। কিন্তু কালোদের জন্য আমেরিকায় এই ধারণাটি হলো অতীত থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসা। 'জিম ক্রো' ও দাসত্বের মানসিক শেকলটি পুরোপুরি ছিন্ন করা। সম্ভবত নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারও সেটাই। এটা জন লুইস ও রোজা পার্কসের মতো ত্যাগী নেতাদের রেখে যাওয়া উপহার। মুক্তির ফটকটি উন্মুক্ত করতে জেল, জুলুম ও নির্যাতন সইতে হয়েছিল তাদের। এটা সেই প্রজন্মের আফ্রিকান-আমেরিকান বাবা-মায়েদের রেখে যাওয়া এক দানপত্র। যাদের বীরত্বে নাটকীয়তা না থাকলেও তা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এসব বাবা-মা জীবনভর স্বল্প মজুরির কাজ করেছেন। যেই আয়ে কার্পণ্য করে চলেও ছোট্ট একটি বাড়ি কেনার মতো সঞ্চয়ও তারা করতে পারেননি। এর জন্য তাদের কোনো অভিযোগও ছিল না। এসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের নাচের ক্লাস বা স্কুলের শিক্ষা ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেননি; এরা পারেননি সন্তানদের জন্মদিনের কেক কিনতে বা সন্তানটি ক্লাসে যেন ভালো কোনো প্রোগ্রাম নিতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের

www.pathagar.com

পেছনে লেগে থাকতে। এসব বাবা-মা তাদের সন্তানদের ভালো কিছু অর্জনের জন্য প্রেরণা দিতেন এবং বৃহত্তর সমাজের ছুড়ে দেয়া যেকোনো আঘাতের বিরুদ্ধে ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন তাদের।

এই হলো আমেরিকান সমাজে মধ্যবিত্ত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণীর বেড়ে ওঠার সার কথা। সেই সংগ্রামের পর এক প্রজন্মের ব্যবধানে এই শ্রেণী চারগুণ বেড়ে ওঠে। কালোদের মধ্যে দারিদ্র্য নেমে আসে অর্ধেকে। কঠোর পরিশ্রম ও পরিবারের প্রতি অঙ্গীকারের একই প্রক্রিয়ায় ল্যাটিনোরাও বেশ উন্নতি করে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে ল্যাটিনোদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা ৭০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। আশা ও প্রত্যাশার ক্ষেত্রে কালো ও ল্যাটিনো শ্রমিকদের সাথে সাদাদের কোনো পার্থক্য নেই। এরাও সেই সব মানুষ যারা আমাদের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন এবং আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছেন। শিক্ষক, মেকানিক, নার্স, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, নির্মাণশ্রমিক, বাসচালক, ডাক বিভাগের কর্মী, স্টোর ম্যানেজার, প্লাম্বার, রিপেয়ারম্যান– এরাই আমেরিকার প্রাণশক্তি।

গত চার দশকে সামাজিক এই অগ্রগতির পরও কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনো এবং সাদা শ্রমিকদের জীবনমানে এক বিশাল ব্যবধান রয়ে গেছে। একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকের গড় মজুরি একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের গড় আয়ের ৭৫ শতাংশ মাত্র। ল্যাটিনো শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৭১ শতাংশ। একজন কালোর প্রাথমিক সুরক্ষা যেখানে ৬ হাজার ডলার সেখানে ল্যাটিনোর ৮ হাজার এবং সাদার ৮৮ হাজার ডলার। চাকরি হারালে বা জরুরি প্রয়োজনের জন্য কালো ও ল্যাটিনোদের সঞ্চয় থাকে অনেক কম। এই বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেও কম সক্ষম। মধ্যবিত্ত কৃষ্ণাঙ্গ ও ল্যাটিনোদের বীমার জন্য বেশি ব্যয় করতে হয়। নিজের বাড়ি কেনার সম্ভাবনা এদের কম এবং গড়পড়তা আমেরিকানদের চেয়ে খারাপ স্বাস্থ্যের অধিকারী এরা। আমেরিকান স্বপ্ন নিয়ে বাস করা সংখ্যালঘুদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে পারে, কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণে তাদের সামর্থ্য ক্ষীণই থেকে যাবে।

এই ব্যবধান আমরা কিভাবে কমাব এবং এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারের ভূমিকা কী হবে– এটা আমেরিকান রাজনীতির একটি মৌলিক বিতর্ক হিসেবে থেকে যাবে। কিন্তু এই বিতর্কে সবাই একমত হব, এমন কিছু কৌশল অবশ্যই বের করতে হবে আমাদের। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। কর্মসংস্থান, গৃহায়ন ও শিক্ষার মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে বৈষম্য নিরোধক আইন প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শুরু করা যায়। কেউ যদি ভাবেন এই আইন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই, তবে তার নিজের এলাকার অফিস পার্কগুলোতে ঘুরে আসা উচিত। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ কর্মচারীর সংখ্যা গুনে দেখা উচিত। এমনকি তুলনামূলক অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যেও কালোরা সংখ্যায় কত, তা দেখা উচিত। তিনি স্থানীয় শ্রমিক সংগঠনের হলে গিয়ে খোঁজ নিতে পারেন শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামগুলোতে কালোদের সংখ্যা কত। রিয়েল এস্টেট মধ্যস্থতাকারীরা কিভাবে শ্বেতাঙ্গ বসতি থেকে দূরে কোথাও বাড়ি

www.pathagar.com

কিনতে কালোদের উদ্বুদ্ধ করেন, সে সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদনও আপনি দেখতে পারেন। কালো বসতিহীন কোনো রাজ্যে আপনি বাস না করলে ওপরের বিষয়গুলো বোঝার কোনো কারণ নেই আপনার।

বিগত রিপাবলিকান প্রশাসন নাগরিক অধিকার আইন প্রয়োগের কিছুটা প্রবণতা দেখালেও বর্তমান আমলে এর তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই। সুপ্রিমকোর্টের নাগরিক অধিকার বিভাগের আগ্রহে কেবল একটি ক্ষেত্রে 'রিভার্স ডিসক্রিমিনেশন' হিসেবে সংখ্যালঘুদের জন্য একটি বৃত্তিকে নির্দিষ্ট করা হয়। তা না হলে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থী থাকুক বা না থাকুক তাতে যেন কারো কিছু যায়-আসে না।

রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রতিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে উদ্বেগ থাকা উচিত ছিল। এমনকি যারা 'ইতিবাচক সংরক্ষণের' বিরোধিতা করেন তাদের মধ্যেও। সুচিন্তিতভাবে দাঁড় করানো গেলে 'ইতিবাচক সংরক্ষণ' কর্মসূচিগুলো সংখ্যালঘুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তা না হলে শ্বেতাঙ্গ ছাত্রটি সুযোগ পেলেও যোগ্য সংখ্যালঘু ছাত্রটির সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। গণিত বা পদার্থ বিজ্ঞানে কালো বা ল্যাটিনো পিএইচডি প্রার্থীর অভাবের কথাই ধরা যাক। সংখ্যালঘুদের জন্য মাঝারি মানের একটি বৃত্তিও তাদেরকে এসব বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এতে এসব প্রোগ্রাম থেকে শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা কিন্তু বাদ পড়বে না। ফলে প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য আমেরিকার যে বিপুলসংখ্যক মেধাবী মানুষ প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আইনজীবী হিসেবে নাগরিক অধিকারের ওপর কাজ করতে গিয়ে বড় করপোরেশন, ট্রেড ইউনিয়ন ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন শাখায় দীর্ঘ ও নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্যের যে অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছি, কেবল সংখ্যালঘু নিয়োগের লক্ষ্য ও সময়সীমা নির্ধারণের মাধ্যমেই তার অবসান ঘটানো যেতে পারে।

অনেক আমেরিকান এ ক্ষেত্রে আমার সাথে নীতিগতভাবে একমত নন। তারা বলেন, আমাদের সংবিধান কখনোই 'বর্ণ'কে বিবেচনায় নেয়নি। এমনকি অতীতে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন– এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও নয়। ভালো কথা– আমি তাদের যুক্তি মেনে নিলাম। তাই বলে এই বিতর্ক শিগগিরই বন্ধ হবে, সেটাও মনে করি না। কিন্তু এই অবস্থা মেনে নিয়ে বসে থাকলেও চলবে না আমাদের। সমযোগ্যতাসম্পন্ন দু'জন ব্যক্তি চাকরি, গৃহায়ন বা ঋণের জন্য আবেদন করলে সব সময় সাদা ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে না– সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, সরকারের একার পক্ষে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও সম্মিলিতভাবে সংখ্যালঘুদেরও দায়িত্ব আছে এ ক্ষেত্রে। অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান কালোদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেমন– অতিমাত্রায় টিভি দেখা (কালো পরিবারে দিনে গড়ে ১১ ঘণ্টা টিভি খোলা থাকে), অস্বাস্থ্যকর জিনিস অতিমাত্রায় গ্রহণ (কালোরা বেশি ধূমপান ও বেশি ফাস্ট ফুড খায়) এবং শিক্ষাগত অর্জনের প্রতি এরা কম জোর দেয়।

www.pathagar.com

কৃষ্ণাঙ্গ কমিউনিটিতে দুই অভিভাবকের (বাবা-মা) পরিবার সংখ্যাও মারাত্মকভাবে কমে গেছে। যৌনজীবন ও সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে কালোদের উদাসীন মনোভাবের প্রতিফলন এটা। এতে শিশুরা আরো নাজুক হয়ে পড়ছে। কোনো অজুহাতেই মেনে নেয়া যায় না এ অবস্থা। এই পরিস্থিতিও কালোদের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও সরকারের উদ্যোগ ব্যক্তির আচরণ পরিবর্তনে সহায়ক (কৃষ্ণাঙ্গ এলাকাগুলোতে সবজি বিক্রির দোকান খুলতে সুপার মার্কেট চেইনগুলোকে উৎসাহিত করা যায়। এতে মানুষের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাসে পরিবর্তন ঘটবে) হতে পারে, কিন্তু আচরণ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে তার বাড়ি, তার মহল্লা বা তার ধর্মীয় উপাসনালয়ে। কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে চার্চের মতো প্রতিষ্ঠান পরিবারগুলোকে সন্তানদের শিক্ষিত করার সুফল সম্পর্কে সচেতন, সুস্থ জীবনযাত্রা এবং সামাজিক আচার-ঐতিহ্য মেনে চলার প্রবণতা তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। সন্তানরাও যেন বাবা-মা হওয়ার আনন্দ ও বাধ্যবাধকতাকে ঘিরে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধটি শেখে।

সংখ্যালঘু ও শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করা প্রয়োজন তাতে 'বর্ণ' ইস্যুর তেমন কিছুই করার নেই। বর্তমান সময়ে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষ্ণাঙ্গ এবং ল্যাটিনোদের মৌলিকভাবে যে বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা শ্বেতাঙ্গদেরও একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রতিষ্ঠানে জনবল ছাঁটাই, বিদেশ থেকে কাজ করিয়ে আনা, অটোমেশন, মজুরি স্থির হয়ে থাকা, নিয়োগকর্তা বহন করেন এমন স্বাস্থ্যসেবা ও পেনশন পরিকল্পনা বিলোপ এবং বিশ্ব অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে ছাত্রদের গড়ে তুলতে স্কুলগুলোর ব্যর্থতা– সাদা-কালো নির্বিশেষে সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। (এই প্রবণতায় সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছেন কালোরা। কারণ তারা শ্রমঘন উৎপাদনশীল কাজের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল এবং প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে এরা অনেক পিছিয়ে)। আবার সংখ্যালঘু শ্রমিকদের জন্য যা সহায়ক হতে পারে সেখানে শ্বেতাঙ্গরা ভাগ বসাবেন। যেমন– জীবনধারণের মতো অর্থ উপার্জনের সুযোগ। এ সুযোগ তৈরির মতো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, জাতীয় সম্পদ বিতরণে ভারসাম্য আনে এমন শ্রম ও কর আইন, স্বাস্থ্যসেবা, শিশুর যত্ন এবং শ্রমজীবী মানুষ উপকৃত হন এমন পেনশন ব্যবস্থা।

সংখ্যালঘুদের টেনে তোলার এই ধারা অতীতেও কাজ করেছে। ল্যাটিনো ও আফ্রিকান-আমেরিকানদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম যে অগ্রগতি সাধন করেছে, তা হয়েছিল মূলত শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য তৈরি করা 'সুযোগের মইটি' সংখ্যালঘুদের জন্যও সহজলভ্য ছিল বলে। সব মানুষের মতো তারাও উপকৃত হয়েছেন দ্রুত বেড়ে ওঠা একটি অর্থনীতি থেকে। এসব মানুষের জন্য সরকারও বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল। শুধু শ্রমবাজারেই নয়, পুঁজিপ্রাপ্তি সহজ করা হয় এবং 'পেল গ্রান্ট' ও 'পারকিনস লোন' সরাসরি কালোদের উপকৃত করেছে। আয় বৃদ্ধি এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জোরদার হওয়ায় তারা সংখ্যালঘুদের সমতা দাবিগুলোর জোরালো বিরোধিতা

www.pathagar.com

করেননি।

আজকের দিনেও কার্যকর হতে পারে একই কৌশল। ১৯৯৯ সালে কালোদের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে এবং তাদের আয়ও রেকর্ড পরিমাণে দাঁড়ায়। এটা শুধু 'ইতিবাচক সংরক্ষণ নীতি'র কারণে নিয়োগ বৃদ্ধি বা কালোদের কাজ করার স্বভাবে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে হয়নি। এর কারণ ছিল অর্থনীতি জোরদার হওয়ার পাশাপাশি সম্পদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সরকার 'আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট'-এর মতো কিছু কর্মসূচি নিয়েছিল।

আর এটাই হলো আফ্রিকান-আমেরিকান তরুণদের মধ্যে বিল ক্লিনটনের জনপ্রিয়তার গোপন কথা। আজকে আমাদের মতো যারা বর্ণবৈষম্য দূর করতে আগ্রহী, একই পরিসংখ্যান তাদেরকে বর্তমান কৌশলগুলোর মূল্য ও সুবিধার একটি নিরপেক্ষ হিসাব করতে বাধ্য করবে। 'ইতিবাচক সংরক্ষণ'কে আমরা সংখ্যালঘুদের সুযোগ সম্প্রসারণের একটি অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরলেও প্রতিটি শিশু যেন হাইস্কুলের শিক্ষা শেষ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য আমেরিকাকে রাজি করাতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা আরো জোরদার করতে হবে আমাদের। এই লক্ষ্য অর্জন করা গেলে তা হবে 'ইতিবাচক সংরক্ষণের' চেয়েও বেশি এবং তা সেসব কালো ও ল্যাটিনো সন্তানদের সহায়তা করবে, যাদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। একইভাবে আমরা সংখ্যালঘু ও শ্বেতাঙ্গদের স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে সমর্থন দেবো (দেখা গেছে, আয় ও বীমার মাত্রা বিবেচনায় না আনলেও সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে খারাপ স্বাস্থ্যসেবাটি পেয়ে থাকেন)। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি না নিয়ে একটি সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা নেয়া গেলে শ্বেতাঙ্গ ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য অনেক কমে আসবে।

'সার্বজনীনতা'র ওপর গুরুত্ব দেয়া শুধু একটি ভালো নীতিই নয়, এটা একটি ভালো রাজনীতিও। একবার আমি ইলিনয় রাজ্য সিনেটে এক সহকর্মীর সাথে বসে আরেক আফ্রিকান-আমেরিকান ডেমোক্র্যাট সহকর্মীর বক্তব্য শুনছিলাম। মূলত স্বল্প আয়ের অঞ্চলগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ওই সিনেটরকে 'জন ডো' বলে আমি এখানে উল্লেখ করবো। কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি বাতিল করা হলে কিভাবে তা প্রকাশ্য বর্ণবাদের উদাহরণ হতে পারে তার ওপর দীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন তিনি। কয়েক মিনিট পর আমার সহকর্মী শ্বেতাঙ্গ সিনেটরটি আমার দিকে ফিরে বলেন, 'জনের সমস্যাটি কী জানেন? যখনই আমি তার কথা শুনি, নিজেকে সাদা ভাবার প্রবণতা আরো জোরালো হয়।'

আমি কালো সহকর্মীর পক্ষ নিয়ে বললাম, আসলে কি জানেন, কালো রাজনীতিকদের পক্ষে ঠিক সুরে কথা বলা সম্ভব হয় না। তার নির্বাচনী এলাকায় জনগণ যে দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কণ্ঠে এমনিতেই ক্ষোভ বেরিয়ে আসে। এর পরও আমার শ্বেতাঙ্গ সহকর্মীর মন্তব্যে শিক্ষণীয় দিক আছে। ঠিক হোক বা ভুল হোক, আমেরিকায় সাদাদের অপরাধবোধ অনেকটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমনকি সবচেয়ে উদারমনা সাদা লোকটি, যিনি সত্যিকার অর্থেই বর্ণবৈষম্যের অবসান

www.pathagar.com

ও দারিদ্র্য বিমোচন চান, তিনিও বর্ণবাদ প্রতিরোধের জন্য পরামর্শগুলো দূরে ঠেলে দেন।

ক্ষোভের রাজনীতি উসকে দিতে রক্ষণশীলদের যে সাফল্য, তার জন্যও এগুলো দায়ী। বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করে তারা। 'ইতিবাচক সংরক্ষণের' ফলে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ওপর কী 'বিরূপ' প্রভাব পড়েছে তারা তা প্রচার করে বেড়ায়। বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান বৈষম্যের মধ্যে জড়াতে চান না নিজেদের। তাদেরই উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। তারা আরো জানেন, ৯ ট্রিলিয়ন ডলার জাতীয় ঋণ এবং প্রতি বছর ৩০ হাজার কোটি ডলার বাজেট ঘাটতির পর তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্যও খুব কম সম্পদই থেকে যাবে।

ফলে শুধু সংখ্যালঘুদের সুবিধা দেবে এমন কোনো প্রস্তাব এবং আমেরিকাকে 'আমাদের' ও 'তাদের' এই দু'ভাগে ভাগ হওয়ার পরও তেমন ক্ষতি না দেখলে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে হয়তো সাময়িক কোনো ছাড় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা আমেরিকাকে নতুন রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় টেকসই ও ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে না। অন্য দিকে কোনো কর্মকৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে সব আমেরিকান সুফল ভোগ করবে– এমন সার্বজনীন আবেদনের পাশাপাশি আমাদের আইন সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং আমেরিকার বৃহত্তর আদর্শগুলো (বিদ্যমান নাগরিক অধিকার আইনের কার্যকর প্রয়োগ) সমুন্নত রাখা গেলে তা উপরিউক্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এমনকি এই কৌশল সব সংখ্যালঘুকে সমানভাবে সাহায্য না করলেও।

কৌশলের এই পরিবর্তন কোনো সহজ কাজ নয়। পুরনো অভ্যাস বদলানো যায় না সহজে। অনেক সংখ্যালঘুর মনে এই আশঙ্কাও কাজ করে, অতীত ও বর্তমানের বর্ণবৈষম্যগুলো দৃশ্যপটে না থাকলে অপরাধের শাস্তির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে অনেকে। কষ্টার্জিত সুফল উল্টোমুখীও হতে পারে। এই ভয় অনুভব করতে পারি আমি। কিন্তু ইতিহাস যে সোজাপথে চলবে, সেটা কেউ কখনো ঠিক করে দিতে পারেনি।

পূর্ববর্তী প্রজন্ম যা অতিক্রম করতে পেরেছিল, সে দিকে তাকালে আজো আমি আশাবাদী হয়ে উঠি যে, পরবর্তী প্রজন্মও অর্থনীতির মূল ধারায় তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারবে। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়ের 'সুযোগের মইয়ের' ধাপগুলো কালোদের জন্য ছিল অনেক পিচ্ছিল। করপোরেট স্যুইটে ল্যাটিনোদের প্রবেশপথ আগলে রাখা হয়েছে। কিন্তু এসবের পরও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগফল, ঊর্ধ্বমুখী সচলতা ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচিগুলোতে সরকারের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বৈষম্যহীনতার সাধারণ নীতি প্রয়োগের পরিমিত প্রতিশ্রুতিই ছিল যথেষ্ট। একটি প্রজন্মের মধ্যে কালো ও ল্যাটিনোদের বড় অংশকেই আর্থ-সামাজিকতার মূল স্রোতে টেনে তোলার জন্য এর প্রয়োজন ছিল।

আমাদের নিজেদেরকে এই অর্জনের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। মধ্যবিত্ত

www.pathagar.com

শ্রেণীতে কতজন সংখ্যালঘু উন্নীত হতে পারেননি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিরূপ পরিবেশে কতজন সফল হয়েছেন; গুরুত্বপূর্ণ সেটাই। পিতারা তার সন্তানদের মধ্যে কতটা বর্ণবাদের ক্ষোভ ও তিক্ততা সঞ্চার করেছেন, সেটাও বড় নয়; বড় হলো এই আবেগ কতটা প্রশমিত হয়েছে– সেই বোধ আমাদেরকে কিছু গড়ার প্রেরণা দেবে। এটা আমাদের বলে দেবে, এগিয়ে যাওয়া যায় আরো।

আমেরিকায় কালো, ল্যাটিনো ও সাদা মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনতে কোনো সার্বজনীন কৌশল গ্রহণ করতে হলে বর্ণ সম্পর্কের দু'টি দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। একটি হলো যা বর্ণবাদী সঙ্ঘাত উসকে দেয় এবং অন্যটি ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতিকে যা দুর্বল করে দেয়। আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটির ক্ষেত্রে ইস্যুটি হলো 'ইনার-সিটি'র মানুষের অবস্থার আরো অবনতি। ল্যাটিনোদের ক্ষেত্রে সমস্যা, অবৈধ শ্রমিক এবং অভিবাসন নিয়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঝড়।

শিকাগোতে আমার পছন্দের একটি রেস্টুরেন্ট 'ম্যাক আরথার্স'। মেডিসন স্ট্রিটের পশ্চিম প্রান্তে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে সাজানো, উজ্জ্বল আলোকিত জায়গার মধ্যে মোটামুটি ১০০ মানুষ একসাথে খাবার খেতে পারে সেখানে। সপ্তাহের যেকোনো দিন সেখানে গেলে দেখা যাবে, সব বয়সী মানুষ লাইন ধরে ক্যাফেটেরিয়া স্টাইলে বসে আছেন কখন খাবারের প্লেটটি হাজির হবে, সেই আশায়। এখানে আমেরিকান কালোদের প্রিয় বিশেষ কিছু খাবার পাওয়া যায়। তাই বসে থাকা যেকোনো মানুষের কাছে গেলে তিনি আপনাকে বলবেন, এই অপেক্ষার মূল্য আছে।

রেস্টুরেন্টের মালিক ম্যাক আলেকজান্ডারের বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে। এক নজরেই তার পেশাদার রূপটি যেকোনো গ্রাহকের চোখে ধরা পড়ে। তিনি সাবেক সেনাসদস্য। মিসিসিপি রাজ্যের লেক্সিনটনে তার জন্ম। ভিয়েতনাম যুদ্ধে গিয়ে বাম পা হারান। সামরিক চাকরি ছাড়ার পর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি শিকাগো চলে আসেন। এখানে একটি ওয়্যারহাউসে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসার ওপর কোর্স করেন তিনি। ১৯৭২ সালে ম্যাকস রেকর্ডস নামে একটি দোকান খোলার মধ্য দিয়ে তার ব্যবসা শুরু। পরে তিনি ওয়েস্ট সাইড বিজনেস ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতিও গড়ে তোলেন। তিনি শহরের এই প্রান্তটির নাম দেন 'লিটল কর্নার অন দ্য ওয়ার্ল্ড'।

যেকোনো বিচারেই তিনি সফল। তার সফলতার রেকর্ড ক্রমশই বাড়তে থাকে। এর পর তিনি খোলেন এই রেস্টুরেন্ট। তার প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় যুবকদের নিয়োগ দেন তিনি। পরিত্যক্ত বাড়ি কিনে মেরামতের পর সেগুলো ভাড়া দেয়া শুরু করেন তিনি। ম্যাকের মতো মানুষের চেষ্টায় ওয়েস্ট সাইডের কুখ্যাতির তুলনায় মেডিসন স্ট্রিটের অবস্থা এতটা হতাশাজনক আর থাকে না। এখানে কাপড়ের দোকান ও ফার্মেসি গড়ে ওঠে। প্রতিটি ব্লকেই চোখে পড়বে একটি গীর্জা। গলিপথ দিয়ে হেঁটে গেলে আপনার চোখে পড়বে ছোট ছোট বাংলো। সাথে পরিচ্ছন্ন লন, যত্নের সাথে সাজানো ফুলের

www.pathagar.com

বাগান। শিকাগোর অভিজাত এলাকাগুলোর এক-একটি টুকরো যেন এসব বাংলো।

কিন্তু এখান থেকে যেকোনো দিকে কয়েক ব্লক এগিয়ে যান আপনি, দেখবেন ভিন্ন এক জগৎ। রাস্তার কোণায় তরুণদের জটলা চোখে পড়বে। চোরাদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ কানে আসবে চড়া সুরের কোনো মিউজিক। নোংরা, কালো হয়ে যাওয়া ভবনের দেয়ালগুলোতে আঁকা নানা 'গ্যাং সাইন'। চার দিকে ময়লা-আবর্জনা শীতের দমকা বাতাসে উড়ছে। সম্প্রতি শিকাগোর পুলিশ বিভাগ মেডিসনের ল্যাম্পপোস্টগুলোতে স্থায়ীভাবে ফ্লাশলাইট ও ক্লোজসার্কিট ক্যামেরা বসিয়েছে। এর কারণ সবাই জানেন। তাই আপত্তি করেননি কেউ। সবাই জানেন, এই কমিউনিটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে ভেঙে পড়েছে– মাদক, গোলাগুলি আর হতাশায় ছেয়ে গেছে। ম্যাকের মতো কিছু মানুষের সর্বাত্মক চেষ্টার পরও এখানে ভাইরাস বাসা বেঁধেছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী।

একদিন বিকেলে ম্যাকের একটি বাড়ি দেখতে তার সাথে হাঁটতে বের হই। তিনি আমাকে বললেন, 'ওয়েস্ট সাইডে অপরাধ নতুন কোনো বিষয় নয়। আর পুলিশও কালোদের মহল্লাগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। যত দিন এখানকার সমস্যা সাদা মহল্লা পর্যন্ত না ছড়ায়, তত দিন তারা কেয়ার করে না। প্রথম আমি যখন দোকানটি খুলি তখন আমাকে আট-নয়বার বাধা পেতে হয়েছিল।'

'তবে এখন পুলিশ অনেক বেশি আন্তরিক'– বললেন ম্যাক। এখানকার পুলিশ কমান্ডারও ভালো মানুষ। আন্তরিকভাবে কাজ করেন। কিন্তু কাজের চাপে অন্য সবার মতো তিনিও ভারাক্রান্ত। ম্যাক বললেন– 'এই যে শিশুদের দেখছেন, এরা কারো পরোয়া করে না। পুলিশ বা জেল তাদের কাছে নস্যি। এখানকার অর্ধেক তরুণেরই কোনো না কোনো অপরাধের রেকর্ড আছে। রাস্তার কোণা থেকে পুলিশ ১০টি ছেলেকে তুলে নিয়ে গেলে ১ ঘণ্টার মধ্যে দেখা যাবে আরো ১০টি ছেলে এসে ওই কোণাটি দখল করে নিয়েছে।'

কথা বলতে থাকেন ম্যাক। 'শিশুদের এই মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করতে হবে। এদের দোষ দেয়া যায় না। কারণ বাসায় করার মতো কোনো কাজ তাদের নেই। তাদের মায়েরা কিছু বলতে পারেন না। এদের অনেকের মায়ের শিশুত্বও এখনো কাটেনি। বাবা জেলখানায়। তাদের স্কুলে নিয়ে যাবে, ভদ্র আচরণ শেখাবে এমন কেউ নেই। অপরাধী চক্রগুলো বা গ্যাংই তাদের পরিবার। মাদক বিক্রি ছাড়া আর কোনো কাজ তারা পায় না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। এখানে এখনো অনেক ভালো পরিবার আছে। তাদের প্রচুর অর্থ না থাকলেও তারা নিজেদের সন্তানদের এ অবস্থার বাইরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা সুযোগ পেলেই এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। ফলে দিন দিন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটছে।'

এক দমে কথাগুলো বলে বিরতি নেন ম্যাক। এরপর মাথা দুলিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, 'পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আমি। বারাক আপনার

www.pathagar.com

কাছে সত্য কথা বলছি– পরিস্থিতি এখনো নৈরাশ্যজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু তা সামাল দেয়া ক্রমেই আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে।'

বর্তমানে আফ্রিকান-আমেরিকানদের মধ্যে এ রকম মনোভাব আমি বেশ লক্ষ করেছি। সবাই স্বীকার করেছেন, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখানকার কালোদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার মালয়েশিয়ার সমান। কালোদের মধ্যে বেকারত্ব শিকাগোর যেকোনো মহল্লার চেয়ে তিনগুণ। প্রতি তিনজন কালোর একজন জীবনের কোনো পর্যায়ে অপরাধের জন্য সাজা খেটেছেন।

আমার সাথে আলাপচারিতায় শেষ পর্যন্ত সবাই ব্যক্তিগত কাহিনী তুলে ধরেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের একটি অংশের মধ্যে মানসিক বৈকল্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের সবার কণ্ঠে দুঃখ ও অবিশ্বাস মেশানো সুর। এক শিক্ষিকা বললেন, কিভাবে মাত্র আট বছরের একটি শিশু তাকে খারাপ ভাষায় গালাগালি করেছে এবং মারার হুমকি দিয়েছে। একজন শিশু বিশেষজ্ঞ জানালেন, তার কাছে আসা টিনএজ মায়েরা তাদের শিশুদের পটেটো চিপস খাওয়ানোর মধ্যে নাকি খারাপ কিছু দেখেন না। এদের অনেকেই তার পাঁচ-ছয় বছর বয়সী সন্তানটিকে একা ঘরে ফেলে বেরিয়ে যান কাজে।

এ হলো তাদের কাহিনী, যারা এখনো ইতিহাসের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কালো মহল্লাগুলোতে দারিদ্র্যপীড়িত ঘরগুলো এখনো দাসত্ব ও 'জিম ক্রো' যুগের সহিংসতার আধার।

এমন একটা সময় ছিল যখন এই গভীর আন্তঃপ্রজন্ম দরিদ্র জাতিকে নাড়া দিতে পারত। মাইকেল হ্যারিংটনের 'দি আদার আমেরিকা' অথবা 'মিসিসিপি ডেল্টা'য় ববি কেনেডির সফর জনমনের ক্ষোভ উসকে দিতে পারত এবং আহ্বান জানাতে পারত ব্যবস্থা গ্রহণের। সে অবস্থা এখন নেই। আজ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর উপস্থিতি সর্বত্র। আমেরিকার গণসংস্কৃতির স্থায়ী রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। চলচ্চিত্র ও টিভিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য এখন দেখানো হয় কালোদের। র‍্যাপ সঙ্গীত বা ভিডিওতে 'গ্যাংস্টার লাইফে'র গৌরব প্রচার করা হয়। দরিদ্র এলাকাগুলোতে লুটপাটের খবর বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয় সংবাদমাধ্যমে। এতে কালো মানুষগুলোর জীবনযাত্রার প্রতি আমাদের মনে দয়া বা করুণা না জেগে সেখানে তৈরি হয় ভয় ও প্রচণ্ড ঘৃণা। এটা কেবল কালোদের প্রতি নিস্পৃহ মনোভাবের বিস্তার ঘটায়।

আমাদের জেলখানাগুলো কালো মানুষে ভর্তি। কালো শিশুরা মূর্খ থেকে যাচ্ছে অথবা সন্ত্রাসীদের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে জীবন দিচ্ছে। গৃহহীন কালো মানুষেরা ফুটপাথ বা পার্কে রাত কাটাচ্ছে– আমরা যদি এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে প্রকৃতির নিয়ম বলে মেনে নিই, তাহলে হয়তো আমাদের কারো শান্তি হবে না, এর পরিণতি ভোগ করতে হবে সবাইকে।

কালোরা নিম্ন শ্রেণীর– তারা সমাজের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের আচরণ ও

www.pathagar.com

মূল্যবোধ ভিন্ন– আধুনিক আমেরিকার রাজনীতিতে এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটে। তাদের মনে প্রোথিত এই বদ্ধমূল ধারণাটির অন্যতম কারণ হলো প্রেসিডেন্ট জনসনের শাসনামলে দারিদ্রের বিরুদ্ধে কালো মানুষ অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া। রক্ষণশীলদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা একদল বুদ্ধিজীবী বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে বর্ণবাদ বা কাঠামোগত বৈষম্য নেই। যা আছে সেটা হলো সংস্কৃতিগত রোগ। কালোদের দারিদ্র্যের জন্য এটাই দায়ী। তারা আরো বলেন, সরকারের ওয়েলফেয়ার কর্মসূচির সুবিধাভোগের পাশাপাশি লিবারেল বিচারকরা অপরাধীদের প্রশ্রয় দেয়ায় এই রোগ আরো গুরুতর আকার ধারণ করেছে। টিভিতে পেটফোলা নিষ্পাপ কালো শিশুদের দেখানো হয় না। অথচ দেখানো হয় কালো লুটেরা ও ছিনতাইকারীদের ছবি। জীবিকার জন্য তাদের সংগ্রামরত কালো মায়েদের খবর প্রচার করা হয় না। প্রচার করা হয় ওয়েলফেয়ার সুবিধা পাওয়ার জন্য কে কত সন্তান নিয়েছে তার কাহিনী। রক্ষণশীলদের মতে, কালোদের ঠিক করার জন্য প্রয়োজন কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা– আরো পুলিশ, আরো জেল, তাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং ওয়েলফেয়ার কর্মসূচির বিলোপ। এর পরও কালোদের ঠিক করা না গেলে, তাদের অন্তত কোণঠাসা করে রাখা যাবে এবং খারাপ মানুষগুলোর পেছনে কষ্টার্জিত অর্থ (কর) ব্যয় করা থেকে রক্ষা পাবে ভালো মানুষগুলো।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে রক্ষণশীলদের এই মতবাদ শ্বেতাঙ্গরা সমর্থন করবে। তাদের এই যুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে 'যোগ্য' ও 'অযোগ্য' পার্থক্য করার জন্য। আমেরিকায় এর দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ইতিহাস রয়েছে। তাদের যুক্তিগুলো প্রায়ই বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিসম্পন্ন। সত্তর ও আশির দশকে যখন অর্থনীতিতে কঠিন সময় চলছিল, তখন এ ধরনের যুক্তি ব্যাপক প্রচার পায়। এর বিরুদ্ধে লিবারেল নীতিনির্ধারক ও নাগরিক অধিকার নেতারা অনেকটা নিশ্চুপ। তড়িঘড়ি করে বর্ণবাদের ইতিহাসের সাথে পরিস্থিতির মিল এড়াতে গিয়ে তারা সেসব প্রমাণও উপেক্ষা বা গুরুত্বহীন করে দেখতে চায়, যেসব আচরণ সত্যিকার অর্থেই প্রজন্ম-পরম্পরায় কালো দারিদ্র্যকে টিকিয়ে রেখেছে। (ষাটের দশকের শুরুতে ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ময়নিহান যখন কালো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিয়েবহির্ভূত সন্তান জন্মদানের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, তখন তার বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ আনা হয়েছিল।) একটি কমিউনিটির অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে মূল্যবোধ ব্যাপক অবদান রাখে– এ ধরনের ধারণা তারা বাতিল করে দিতে চান। কারণ, বেশিরভাগ লিবারেল নীতিনির্ধারক শহুরে বিশৃঙ্খলা থেকে অনেক দূরে থেকে জীবন কাটান।

বাস্তবতা হলো, দরিদ্র এলাকাগুলোর অবস্থার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান হতাশা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন না সাদারাও। কালোপ্রধান এলাকাগুলোতে কঠোর পরিশ্রমী অধিবাসীরা বহু দিন ধরে আইন মেনে চলা ও কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে আসছেন। কারণ অপরাধের প্রথম শিকার হওয়ার আশঙ্কা তাদেরই বেশি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়, খাবার টেবিলে, সেলুনে, এমনকি চার্চে গিয়েও শোনা যায় কালোরা

www.pathagar.com

আলাপ করছেন নৈতিকতার অবক্ষয়, বাবা-মায়ের অনুশাসনের অভাব এবং নৈতিক অধপতন– এসব নিয়ে।

সে বিচারে ক্রমাগত দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে কালোদের মনোভাব অনেক বেশি রক্ষণশীল। অথচ কালো রাজনীতিবিদরা তা সহজে স্বীকার করতে চান না। কালোদের অনেক কথাও পৌঁছায় না এদের কানে। একজন তরুণ 'গ্যাং মেম্বার'কে বুঝাতে 'শিকারি' শব্দটি ব্যবহার করে কালোরা। অথবা 'আন্ডারক্লাস' বলতে তারা বুঝায় যেসব মা সরকারের 'ওয়েলফেয়ার' কর্মসূচির ওপর নির্ভর করে। এই ভাষার মাধ্যমে কালোদের বিশ্বটিও ভাগ হয়ে গেছে। কালো আমেরিকানদের জন্য এভাবে দারিদ্র্য থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া কখনোই একটি বিকল্প হতে পারে না। এটা হতে পারে না কেবল আমাদের গাত্রবর্ণের জন্য। আমাদের বর্ণের বিষয়ে বৃহত্তর সমাজকে যে উপসংহার টানতে হবে, তা হলো আমরাও একই রকম স্বাধীন, একই রকম সম্মানিত।

এর আরো কারণ হলো কালোরা দারিদ্র্যপীড়িত জনপদ 'ইনার সিটি'র অতীত অসন্তোষের কাহিনী জানে। শিকাগোতে বেড়ে ওঠা বেশিরভাগ কালো মানুষের এখনো মনে আছে দক্ষিণ থেকে দলে দলে এখানে আগমনের সেই 'মহা অভিবাসনে'র ইতিহাস। তারা জানে, উত্তরে কিভাবে কালোদের নিম্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। বর্ণবাদী মনোভাব, নিবর্তনমূলক চুক্তি এবং যেনতেন সরকারি গৃহায়ন– এসব ছিল কালোদের জন্য। কালো এলাকার স্কুলগুলো নিম্ন মানের, পার্কগুলোতে অর্থায়নের অভাব, পুলিশি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং মাদক কেনাবেচার অবাধ সুযোগ রাখা। ভালো ভালো কাজ কিভাবে অন্য অভিবাসী গ্রুপগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, কালোরা তা ভোলেনি। এসব কারণে তখনো টিকে থাকা কালো পরিবারগুলো চাপে পড়ে ভাঙতে শুরু করে। এই ভাঙনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। তাদের সেই আশঙ্কাগুলো আবার সত্যি হতে চলেছে। আজ তারা জানে গৃহহীন মানুষটি কেন মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। লোকটি যে তাদের চাচা বা মামা। এখন যে অপরাধী, ছোটবেলায় তাকেই এরা দেখেছে প্রাণবন্ত ও ভালোবাসায় পূর্ণ এক কিশোর। সে যে তাদেরই চাচাতো বা মামাতো ভাই।

অন্য কথায় আফ্রিকান আমেরিকানরা জানে সংস্কৃতির গুরুত্ব কতটুকু। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের সংস্কৃতিকে বর্তমান রূপ নিতে বাধ্য করেছে। আমরা জানি, 'ইনার সিটি'র অনেকেই আত্ম-ধ্বংসাত্মক আচরণের শিকার। এই আচরণ তাদের মজ্জাগত নয়। কালো মানুষগুলো মনে করে, আমেরিকা এখনো যদি কিছু করে তাহলে 'ইনার সিটি'র দুষ্টচক্রে আটকে পড়া মানুষগুলোর অবস্থা বদল হতে পারে। তখন গরিব মানুষগুলোর মনোভাব বদলে যাবে। ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যাবে ধীরে ধীরে। এই প্রজন্ম না হলেও নিশ্চিতভাবে এর সুফল ভোগ করবে আগামী প্রজন্ম।

এই অনুধাবন আমাদেরকে আদর্শিক খুঁটিনাটি বিষয়ে বিরোধের বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং 'ইনার সিটি'র দারিদ্র্য সমস্যা সামাল দিতে নতুন করে প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। আমাদের স্বীকার করতে হবে, দারিদ্র্য কমিয়ে আনার জন্য

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগটি আমরা নিতে পারি তা হলো, টিনএজ মেয়েদের অন্তত হাইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করা ও বিয়ে ছাড়া সন্তান গ্রহণ না করতে উদ্বুদ্ধ করা। এ জন্য 'টিন-প্রেগন্যান্সি' প্রতিরোধে কার্যকর, স্কুল ও কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রোগ্রামগুলোর বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। পাশাপাশি বাবা-মা, ধর্মগুরু ও কমিউনিটি নেতাদেরও এই ইস্যুটির ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আগের ওয়েলফেয়ার কর্মসূচির গঠন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে রক্ষণশীল, এমনকি বিল ক্লিনটনের ধারণাও কিছুটা সঠিক ছিল। কারণ এই কর্মসূচিতে বিনা কাজে আয়, আমলাতন্ত্রের অনধিকার চর্চার মতো দু' একটি বিষয়ে উত্তর দেওয়া এবং নিশ্চয়তা দেওয়া যে, যে বাড়িটিতে মা ও শিশু থাকবে সে বাড়িতে শিশুর পিতা থাকবে না- এর বাইরে ওয়েলফেয়ার গ্রহণকারীর আর কোনো অঙ্গীকার ছিল না। এএফডিসি (নির্ভরশীল সন্তান রয়েছে, এমন পরিবারগুলোকে সহায়তা দান) কর্মসূচির বিনা কাজে ভাতা ও থাকা ইত্যাদি সুবিধা মানুষের উদ্যমী ক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং তাদের আত্মসম্মান নষ্ট করে দেয়। সুদূরপ্রসারী দারিদ্র্য বিমোচনের যেকোনো কর্মসূচি হতে হবে শ্রমভিত্তিক, ওয়েলফেয়ার-ভিত্তিক নয়। এটা শুধু এ কারণে নয় যে, কাজ মানুষকে স্বনির্ভর করে ও আয়ের সুযোগ করে দেয়– মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা, সংহতি, মর্যাদা ও সুযোগ সৃষ্টির জন্যও এটা প্রয়োজন।

আবার, আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে শুধু কাজ মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে পারে না। 'ওয়েলফেয়ার রিফর্ম' কর্মসূচি সরকারি ভাতার ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমিয়েছে এবং কর্মজীবী মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। পাশাপাশি এটা শ্রমবাজারে নারীদের এক কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। তারা নিম্ন মজুরির কাজগুলোতে আটকা পড়ে। শিশুর ভরণপোষণ, স্বচ্ছন্দে থাকার মতো একটি ঘর এবং চলনসই স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রতিদিন লড়াই করতে বাধ্য হয় তারা। মাসের শেষে পকেটে থাকা অল্প কয়েকটি ডলার দিয়ে খাবার খরচ, গ্যাস বিল ও সন্তানের কাপড় কেনার খরচ কিভাবে মেটানো যাবে– এই দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা হয় তাদের।

নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য খুবই সহায়ক 'সম্প্রসারিত আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট'-এর মতো কৌশল এসব নারী ও শিশুর জীবনেও উন্নয়ন ঘটাতে পারে। আমরা যদি আন্তঃপ্রজন্মগত দারিদ্র্যের চক্র ভাঙার ব্যাপারে আন্তরিক হই, তাহলে এসব নারীকে দিতে হবে কিছু বাড়তি মৌলিক সহায়তা। 'ইনার সিটি'র বাইরে থাকা দরিদ্র্যদের জন্যও এই সুবিধাটি নিশ্চিত করতে হবে। এদের এলাকাগুলোতে আরো পুলিশ এবং পুলিশি ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন এই মানুষগুলো এবং তাদের সন্তানরা যেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়। কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধায় প্রবেশ থাকতে হবে এদের। এই স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপর বেশি জোর দিতে হবে। এতে সুরক্ষামূলক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিমান সম্পর্কিত কাউন্সিলিং এবং বড় রকমের অপব্যবহারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের সন্তানদের স্কুলগুলো আগাগোড়া ঢেলে সাজানো

www.pathagar.com

প্রয়োজন। সাধ্যের মধ্যে চাইল্ডকেয়ার সুবিধা থাকতে হবে। যাতে শিশুর পিতা-মাতারা পূর্ণকালীন চাকরি করতে এবং শিশুদের পড়ালেখা দেখাশোনা করতে পারেন।

কিভাবে একজন কার্যকর অবিভাবক হওয়া যায় তা জানার জন্য এসব নারীর অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। দেখা যায়, 'ইনার সিটি'র শিশুদের যখন স্কুলে ভর্তির বয়স হয়, তখন তারা দেরি করে ফেলেছে। অনেক সময়ে দেখা যায় শিশুরা সংখ্যা চেনে না, রঙের নাম বলতে পারে না, অক্ষর চেনে না, শান্তভাবে বসে থাকতে অভ্যস্ত নয় বা অন্য শিশুর সাথে মিশতে পারে না। এরা প্রায়ই বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে। তাদের এ অবস্থা হওয়ার কারণ এটা নয় যে, এরা কম ভালোবাসা পায়। কারণ হলো, এদের মায়েরা জানে না শিশুটিকে কিভাবে তৈরি করতে হবে। প্যারেন্টাল কাউন্সিলিং, নিয়মিত শিশুরোগের চিকিৎসা, প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম এবং মানসম্পন্ন শিশুশিক্ষা কর্মসূচির মতো পরিকল্পিত সরকারি কর্মসূচি এসকল সমস্যাগুলো ভালোভাবে দূর করতে পারে।

সবশেষে, আমাদেরকে 'ইনার সিটি'র বেকারত্ব ও অপরাধের দুষ্টচক্রকে সামাল দিতে হবে। যাতে সেখানকার মানুষগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। অভিজ্ঞতা বলে, ইনার সিটির কোনো মানুষ সত্যিই যদি কাজ করতে চায়, তবে সে তা জোগাড় করতে সক্ষম। অবশ্যই তারা মাদক ব্যবসায় পছন্দ করে। কারণ তাদের দক্ষতা না থাকায় নিম্ন মজুরির কাজ ছাড়া কিছুই তাদের জোটে না। তাই ঝুঁকিপূর্ণ হলেও মাদক ব্যবসায় লাভ বেশি। কিন্তু এই ইস্যুগুলো নিয়ে যেসব অর্থনীতিবিদ গবেষণা করেন এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত রাস্তার তরুণরা আপনাকে বলবে যে, রাস্তার জীবনের মূল্য ও সুবিধা কখনোই বাইরে থেকে বোঝা যায় না। 'ইনার সিটি'র কেউ একটি সম্মানজনক কাজ খুঁজতে যায় না, এর কারণ রাস্তার জীবন থেকে মুক্তি পেতে তাকে উদ্বুদ্ধ করার অভাবই শুধু নয়, কোনো কাজের অভিজ্ঞতার অভাবটিও দায়ী। পাশাপাশি, তার কারাজীবনের রেকর্ডটিও একটি বড় বাধা এ ক্ষেত্রে।

কর্মসংস্থানের জন্য এলাকার তরুণদের একটি দ্বিতীয় সুযোগ দেয়াকে জীবনের মিশন হিসেবে নিয়েছেন ম্যাক। তার কর্মচারীদের ৯৫ ভাগই সাবেক কয়েদি। এদের মধ্যে একজন সেরা বাবুর্চিও রয়েছেন। মাদকসংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও সশস্ত্র ডাকাতির দায়ে ২০ বছরেরও বেশি কারাগারে কাটিয়েছেন এই বাবুর্চি। যারা নতুন কাজে আসে তাদের ঘণ্টায় ৮ ডলার মজুরি দেয় ম্যাক। পুরনোরা ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৫ ডলার পর্যন্ত আয় করে। ম্যাকের কাছে কর্মপ্রার্থীর অভাব নেই। তিনি স্বীকার করেন, তার কাছে এমন মানুষও আসেন যারা সময়মতো কাজ করতে অভ্যস্ত নয়। এরা সুপারভাইজারদের নির্দেশ মানতে চান না। এসব ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বলেন– আমাকে ব্যবসা চালাতে হবে। তুমি কাজ করতে না চাইলে আমার কাছে অনেক লোক আছে। এরপর দেখা যায়, সবাই নিয়মশৃঙ্খলার সাথে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একসময় তারা সময়সূচি মেনে চলা, একটি টিমের সাথে কাজ করা, নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা– এমন সাধারণ জীবনেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তখন তারা নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এমনকি

www.pathagar.com

কমিউনিটি কলেজেও একসময় নাম লিখিয়ে ফেলে তারা। ভালো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তাদের মনে।

ম্যাকের মতো হাজার হাজার মানুষ থাকলে কতই না ভালো হতো! শ্রম বাজার ইনার সিটির মানুষগুলোকে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারলে বদলে যেত একটি জাতির ভাগ্য। কিন্তু বেশিরভাগ মালিক জেলখাটা কাউকে কাজে নিতে চায় না। আর যারাও বা চায় তাদেরও তা করতে দেয়া হয় না। ইলিনয়ের কথাই ধরা যাক। এখানকার কোনো স্কুল, নার্সিং হোম বা হাসপাতালে জেলখাটা কাউকে নেয়া নিষিদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, অনেক সময় চুল কাটা বা নখ পরিচর্যার মতো কাজও করতে দেয়া হয় না এদের।

কিন্তু সরকার এ পরিস্থিতি বদলাতে পারে। কমিউনিটির জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর এমন প্রকল্পগুলোতে সাবেক আসামিদের নেয়া এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বেসরকারি ঠিকাদারদের সাথে সরকার চুক্তি করতে পারে। এসব কাজের মধ্যে থাকতে পারে অফিস ও বাড়িতে জ্বালানি সাশ্রয়ী করার জন্য ইনসুলেটিং বা ইন্টারনেট-ভিত্তিক কোনো কাজের প্রশিক্ষণ। যদিও এসব কর্মসূচির জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কারাগারে একজন অপরাধীর পেছনে যে অর্থ খরচ হয়, তার বদলে অপরাধপ্রবণতা কমে গেলে সেখান থেকেই চলে আসতে পারে ওপরের কর্মসূচির পেছনে ব্যয়ের অঙ্কটি। কঠোর বেকারত্বের শিকার সবাই যে রাস্তার জীবন ফেলে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করবে, তাও কিন্তু নয়। আবার এ রকম কর্মসূচি দিলেই কারাগারের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। অপরাধপ্রবণতা যাদের মজ্জায় মিশে গেছে, কোনোভাবেই তাদের ফিরিয়ে আনা যাবে না স্বাভাবিক জীবনে।

তবে আমরা বলতে পারি, মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত তরুণগুলোকে বৈধ কোনো কাজ দেয়া গেলে বহু কমিউনিটিতে অপরাধের হার ব্যাপকভাবে কমে আসত। তখন অনেক উদ্যোক্তা সেসব এলাকায় তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করবেন এবং একটি টেকসই অর্থনীতির শেকড় বিস্তৃত হতে শুরু করবে সেখানে। দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে বদলাতে শুরু করবে সেসব এলাকার জীবনধারা। নিজস্ব একটি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করবে যুবসমাজ । বিয়ের হার বেড়ে যাবে। বেড়ে ওঠার জন্য আরো স্থিতিশীল বিশ্বের সন্ধান পাবে শিশুরা।

আমাদের স্বপ্ন এমন এক আমেরিকা, যেখানে অপরাধের হার কম; আরো বেশি যত্নের সাথে লালিত হচ্ছে শিশুরা; নতুন জীবন লাভ করেছে নগরগুলো; পক্ষপাত, ভয় ও মতানৈক্যের যে বিস্তার ঘটিয়েছে কালো দারিদ্র্য– তা মুছে গেছে। ইরাকে বিগত বছরগুলোতে আমরা যে ব্যয় করেছি, তার কী মূল্য আছে? কিন্তু ওপরের পরিবর্তনগুলোর মূল্য নির্ধারণ সত্যিই কঠিন। সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে এই সুফল কোনো হিসাবেই পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

ইনার সিটির দারিদ্র্যের সমস্যাগুলো আমাদের বেদনাদায়ক অতীতকে ভুলতে না পারার কারণে সৃষ্টি হলে, নতুন অভিবাসনের চ্যালেঞ্জও একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক

www.pathagar.com

ছড়িয়ে দেবে। আমেরিকার জনসংখ্যার রূপ ও ধরনের পরিবর্তন ঘটছে নিরন্তর ও আলোর গতিতে। এখানকার সাদা ও কালোদের মধ্যে বৈষম্য ও প্রতিরোধ, অপরাধ ও পারস্পরিক দোষারোপের পরিবেশে নতুন অবিভাসীদের দাবিগুলো ভালোভাবে খাপ খাবে না। ঘানা ও ইউক্রেন অথবা সোমালিয়া ও রুমানিয়া থেকে যে কালো ও সাদা মানুষগুলো ভবিষ্যতে আসবে তাদেরকে কী মুখোমুখি হতে হবে না বিগত যুগের বর্ণবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার।

নির্বাচনী প্রচারকাজে গিয়ে প্রথম আমি এই নতুন মুখগুলো দেখি। ডেভন এভিনিউর ভারতীয় বাজার, দক্ষিণ-পশ্চিম উপশহরে দীপ্তি ছড়ানো নবনির্মিত মসজিদ, আর্মেনীয় বিয়ের অনুষ্ঠান, ফিলিপিনো নাচের উৎসব, কোরিয়ান-আমেরিকান লিডারশিপ কাউন্সিল এবং নাইজেরিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনে এসব নতুন মুখ আমি দেখেছি। আমি যেখানে গিয়েছি, সেখানেই দেখি সব রকম কাজে নিয়োজিত এসব অভিবাসী। তারা অর্থ জমিয়ে নতুন ব্যবসায় দাঁড় করাচ্ছে। তাদের হাত দিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে শহরতলিগুলো। অভিজাত কোনো এলাকায় চলে যাওয়ার আগে এখানেই তাদের সন্তানরা বেড়ে উঠছে, শিখছে তাদের পিতৃভূমির চেয়ে ভিন্ন একটি ভাষা, নিচ্ছে শিকাগোর জন্মসনদ। এদের তরুণরা র‍্যাপ সঙ্গীত শোনে, মলে গিয়ে শপিং করে, আর স্বপ্ন দেখে একজন ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, এমনকি একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে ওঠার।

দেশজুড়ে অভিবাসীদের গল্প এখন এটাই। উচ্চাশা ও অভিযোজনের গল্প। কঠোর শ্রম ও শিক্ষা, নতুন সমাজে একাত্ম হওয়া ও ঊর্ধ্বমুখী সচলতার গল্প। আমেরিকান জাতির সহনশীলতা ও অভিবাসীদের প্রতি বিনম্র আচরণের সুযোগে আজকের অভিবাসীরা অনেক আস্থার সাথে দিন কাটাতে পারছে এখানে। নিজেদের অধিকার ফলাতে পারছে অনেক দৃঢ়তার সাথে। এক প্রজন্ম আগেও এ অবস্থা ছিল না। সিনেটর হিসেবে এই নবাগতদের সম্পর্কে কথা বলার জন্য প্রচুর আমন্ত্রণ পাই আমি। সেখানে আমাকে পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, সাইপ্রাসের ব্যাপারে আমার অবস্থান কী অথবা তাইওয়ানের ব্যাপারে আমি কী ভাবছি। বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অভিবাসীদের বড় কোনো গোষ্ঠী জড়িত থাকলে সরকারের কোনো নীতিগত বিষয়ে এরা উদ্বিগ্ন থাকে বেশি। ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ফার্মাসিস্টরা যেমন মেডিকেয়ারের ব্যয় পরিশোধ নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন, তেমনি কোরিয়ান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লবি করতে পারে ট্যাক্স কোড বদলের জন্য।

কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি চায়, তা হলো নিজেদেরকে আমেরিকান হিসেবে তুলে ধরার নিশ্চয়তা। আমি কোনো অভিবাসীদের সমাবেশে বক্তব্য রাখার পর আমার স্টাফদের কাছ থেকে অনেক মজার বিষয় জানতে পারি। আমার বক্তব্য নাকি সব সময় তিনটি পয়েন্টের ওপর স্থির থাকে– 'আমি আপনাদের বন্ধু, এটাকে নিজের দেশ মনে করুন এবং এটা হলো সভ্যতার সূতিকাগার এবং আপনারাও আমেরিকার আমাকে কসরত করতে দেখে আমার হাত ধরে সেই প্রবীণ মহিলার হাসিতে ফেটে

www.pathagar.com

পড়া– এ সব কিছুর মধ্যেই আগ্রহ অনুভব করেছি আমি। এসব অভিবাসী মহল্লায় অনেক বন্ধু ও সহযোগী তৈরি করেছি আমি। সব সময় আমার মনে হয়েছে, কালো ও বাদামি মানুষগুলোর ভাগ্য চিরন্তনভাবে একই সুতায় গাঁথা। আর এটাই হলো আমেরিকাকে তার প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূল ভিত্তি।

ল স্কুলের শিক্ষা শেষ করে যখন আবার আমি শিকাগোয় ফিরি তখন এখানকার কালো ও ল্যাটিনোদের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপড়েন সবে মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে শিকাগোর স্প্যানিশ-ভাষী জনসংখ্যা ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। একই হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায় ল্যাটিনোরাও আর কালো-বাদামি কোয়ালিশনে জুনিয়র পার্টনার হিসেবে থাকতে উৎসাহী হয় না। হ্যারল্ড ওয়াশিংটনের মৃত্যুর পর রিচার্ড ডালির অনুসারী পুরনো রাজনৈতিক যন্ত্রের অবশেষ একদল নির্বাচিত ল্যাটিনো কর্মকর্তা দৃশ্যপটে হাজির হন। এসব লোক উচ্চমার্গের নীতিবোধ ও 'রেইনবো কোয়ালিশন'-এর চেয়ে ঠিকাদারি ও চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে নিজেদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে ছিল বেশি উৎসাহী। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কালোদের লড়াই করে চলতে হলেও জমজমাট হয়ে ওঠে ল্যাটিনোদের ব্যবসায়। জন্মভূমির সাথে আর্থিক সম্পর্ক এবং ভাষাভিত্তিক একটি ভোক্তাগোষ্ঠী এদের আংশিক সাহায্য করে। সবখানেই দেখা যায়, নিম্ন আয়ের কাজগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে মেক্সিকান বা মধ্য আমেরিকান দেশগুলোর নাগরিকরা। একসময় কালোরা এসব কাজ করত। হোটেল বয় থেকে বাসের হেলপার, ওয়েটার থেকে বেলম্যান সবখানেই ল্যাটিনো। দীর্ঘদিন কালোদের বঞ্চিত করে রাখা নির্মাণ শিল্পেও অভিবাসীরা হামলা চালায়। এতে কালোদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে এবং তারা হুমকি অনুভব করতে থাকে। নবাগতদের দ্বারা আরেকবার বঞ্চনার শিকার হওয়ার আতঙ্ক পেয়ে বসে তাদের।

তবে এই অবস্থাকে অতিরঞ্জিত করে আমি দেখাব না। কারণ উভয় কমিউনিটি একই রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। স্কুল ড্রপআউট থেকে শুরু করে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বীমা উভয়েরই অভিন্ন সমস্যা। তাই রাজনীতিতেও কালো ও ল্যাটিনোর অভিন্ন লক্ষ্যে চালিত হওয়া উচিত। কালো অধ্যুষিত মহল্লার কোনো নির্মাণাধীন বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন কৃষ্ণাঙ্গ যদি দেখে সেখানে সব মেক্সিকান শ্রমিক, তবে তার হতাশ হওয়ারই কথা। কিন্তু এর জন্য আমি কালোদের দেখিনি সেসব শ্রমিকের ওপর তাদের দোষ চাপাতে। তারা ক্ষোভটি জমা রাখে সেসব ঠিকাদারদের জন্য, যারা এসব শ্রমিককে ভাড়া করে এনেছে। ল্যাটিনো অভিবাসীদের কঠোর পরিশ্রম, নীতি ও পরিবারের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার, নিজের যেটুকু আছে সেটুকু নিয়েই একেবারে নিচ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার স্পৃহা– এসব গুণের প্রশংসা করতে দেখেছি অনেক কৃষ্ণাঙ্গকে।

আবার দক্ষিণ সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের স্রোত দেখে একজন শ্বেতাঙ্গের মতো কৃষ্ণাঙ্গরাও যে একই রকম উদ্বেগ বোধ করে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এর

www.pathagar.com

কারণ এখন যা ঘটছে তা অতীতের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রতি বছর এ দেশের শ্রমবাজারে অভিবাসীরা যে হারে যোগ হচ্ছে, ইতোপূর্বে কখনো এমনটা আর দেখা যায়নি। নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের এই বিপুল আগমন সার্বিকভাবে হয়তো আমাদের অর্থনীতির উপকার করছে। ইউরোপ ও জাপান যখন ক্রমেই বুড়িয়ে যাচ্ছে, তখন আমেরিকার শ্রমশক্তিতে প্রবেশ ঘটছে তারুণ্যের। কিন্তু এতে নিম্ন মজুরির কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আয় আরো কমে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অতিরিক্ত বোঝার ভারে নুয়ে পড়া 'নিরাপত্তা জালে' আরো বেশি টান তৈরি হয়েছে।

আমেরিকানদের অন্য ভীতিগুলো অনেকটা পরিচিত। যেমন একসময় ইতালিয়ান, আইরিশ বা বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে আসা লোকজন সম্পর্কে এদের ভীতি ছিল। কিন্তু এখন এদের ভয় হলো জন্মগত, স্বভাব, সংস্কৃতি ও মেজাজে ইউরোপীয়দের চেয়ে ল্যাটিনোরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা আমেরিকার জীবনধারায় পুরোপুরি মিশে যেতে পারছে। ভয় হলো, বর্তমানে জনসংখ্যার বিন্যাসে যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্তির হাত থেকে এদের দমানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

তাই বেশিরভাগ আমেরিকানের কাছে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে উদ্বেগ অর্থনৈতিক বিচ্যুতির আশঙ্কার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে। সাধারণ বর্ণবাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্মদর্শীর এই মনোভাব। অতীতে অভিবাসন ঘটেছে আমেরিকার প্রয়োজনে। আগতদের মধ্য থেকে শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা ও বর্ণের ভিত্তিতে বাছাই করার সুযোগ ছিল। সেই শ্রমিকটি চীনা হোক বা রাশিয়ান; অপরিচিত একটি দেশে নিজেকে একজন অপরিচিত বলেই ভাবত সে। কঠোর বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে চলে তাকে এমন আইনে অভ্যস্ত হতো, যা তার নিজের তৈরি নয়।

কিন্তু আজ আর এসব শর্ত প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। অভিবাসীরা এখন সীমান্তের বিভিন্ন ছিদ্রপথে এসে ভিড় করছে। সরকারের কোনো নিয়ম মেনে তারা আসছে না। মেক্সিকোর সাথে অভিন্ন সীমান্ত এবং সে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র্যের কারণে এই সীমান্ত অতিক্রম থামানো তো দূরের কথা, ধীর করাও সম্ভব হবে না। স্যাটেলাইট, কলিংকার্ড, ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের সাথে সাথে বর্ধিষ্ণু বিশালায়তন ল্যাটিনো মার্কেটের কারণে আজকের অভিবাসীরা তার জন্মভূমির ভাষা ও সংস্কৃতি সাথে নিয়েই নতুন দেশে বসবাস করতে পারছে। শিকাগোতে এখন স্প্যানিশ ভাষায় সংবাদ প্রচারের হার সবচেয়ে বেশি। তাই আমেরিকার আদি বাসিন্দারা দেখছে অভিবাসীদের নয় বরং তাদেরকেই এখন অভিবাসীদের সংস্কৃতি ও আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। তাই অভিবাসন বিতর্কের গুরুত্ব শুধু চাকরি হারানোর জন্যই নয়, সার্বভৌমত্ব হারানোর জন্যও। নাইন-ইলেভেন, এভিয়ান ফ্লু, কম্পিউটার ভাইরাস, কোনো কোম্পানির বিদেশ পাড়ি জমানো– কোনো কিছুতেই আমেরিকার ভাগ্য তার নিজের একার নিয়ন্ত্রণে নেই।

২০০৬ সালের বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ব্যাপকভিত্তিক অভিবাসন সংস্কার বিল অনুমোদন নিয়ে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। এর পক্ষে ও বিপক্ষে দু'দলের অবস্থানই বেশ মজবুত। রাস্তায় লাখ লাখ অভিবাসী বিক্ষোভ করছে। অন্য দিকে নিজেদের

www.pathagar.com

ভিজিল্যান্ট ঘোষণা করে একটি দল আহ্বান জানাচ্ছে দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষার। যা ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান ও প্রেসিডেন্টের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থের সাথেই জড়িত। উপায় না দেখে টেড কেনেডি ও জন ম্যাককেইনের নেতৃত্বে সিনেট একটি আপসমূলক বিল তৈরি করে। তিনটি প্রধান উপাদান ছিল এতে। এই বিলে অত্যন্ত কঠোর সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবৈধ অভিবাসীদের কাজে নিয়োগ দেয়া কঠিন করে তোলা হয়। এতে স্বীকার করে নেয়া হয়, এক কোটি ২০ লাখ ঠিকানাবিহীন অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো অত্যন্ত দুরূহ। তার পরিবর্তে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে চলবে এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হবে। সর্বশেষ এই বিলে একটি অতিথি শ্রমিক কর্মসূচি রাখা হয়। যার মাধ্যমে দুই লাখ বিদেশী শ্রমিককে অস্থায়ীভাবে কাজের জন্য এ দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।

এই ভারসাম্য আনার পর আমি ভাবি, এবার বিলটিকে সমর্থন দেয়া যায়। এর পরও বিলের 'অতিথি শ্রমিক' অংশটি আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছিল। কারণ এটা ছিল একান্তভাবে বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুশি করার জন্য। এর অর্থ, কোম্পানি বিদেশে স্থানান্তর ছাড়াই ব্যবসাগুলোকে 'আউট সোর্সিং'-এর সুফল ভোগের সুযোগ করে দেয়া। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি বিলে একটি বাক্য জুড়ে দিতে সক্ষম হই। তা হলো, কাজটি কোনো আমেরিকান শ্রমিককে প্রথমে অফার করা হবে এবং নিয়োগকর্তা 'অতিথি শ্রমিকের' মজুরি কমাতে পারবে না– একজন আমেরিকান শ্রমিককে যা দিতে হতো, অতিথি শ্রমিককেও তা দিতে হবে। কেবল শ্রমিক সঙ্কট হলেই যেন কাজটি কোনো বিদেশীকে দেয়া হয় তা নিশ্চিত করা ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই সংশোধনী একান্তভাবে ছিল আমেরিকান শ্রমিকদের সহায়তার জন্য। তাই সব শ্রমিক ইউনিয়ন দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানায় এটিকে। কিন্তু বিলে এই সংশোধনী যুক্ত করতে না করতেই সিনেটের ভেতর ও বাইরে একদল রক্ষণশীল আমার তীব্র সমালোচনা শুরু করে। আমি নাকি আমেরিকান শ্রমিকদের চেয়ে বিদেশী শ্রমকিদের বেশি মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

সিনেট ফ্লোরে এক দিন এক রিপাবলিকান সহকর্মী আমাকে আটকায়। সে একই অভিযোগ আনে আমার বিরুদ্ধে। আমি তাকে বলি, আমেরিকান শ্রমিকদের রক্ষার জন্যই আমার এই সংশোধনী আনা। নিয়োগকর্তা যদি দেখে অতিথি শ্রমিক নিয়ে কোনো বাড়তি লাভ হচ্ছে না, তবে সে আমেরিকান শ্রমিকই নেবে। এরপর অবৈধ অভিবাসীদের আইনগত মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে যেকোনো বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার আমার এই রিপাবলিকান বন্ধুটি মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন আমার কথায়।

কিন্তু বললেন, 'আমরা ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এখনো অভিবাসীদের কাজে নিচ্ছি। এই সংশোধনী তাদের আরো বেশি মজুরি দিতে বাধ্য করবে।'

আমি বলি, 'খরচ যদি একই হয় তাহলে কেন তারা আমেরিকানদের কাজে না নিয়ে অভিবাসীদের নেবে?'

www.pathagar.com

হেসে দিয়ে তিনি বললেন, 'এর কারণ আছে বারাক। আমেরিকানদের চেয়ে অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে আগ্রহী এই মেক্সিকানরা।'

অভিবাসন বিলের বিরোধীরা মনে এ ধারণাই পোষণ করে। যদিও বাইরে ভান করে আমেরিকান শ্রমিকদের জন্য তাদের দরদের শেষ নেই। আর অভিবাসী নিয়ে যে বিতর্ক, তার মধ্য দিয়ে এই ভণ্ডামি ও নৈরাশ্যবাদের মাত্রাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু জনগণের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। দেশজুড়ে রেডিও হোস্টরা আলোচনায় জনগণের মনে যে আতঙ্ক ও উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল, তাতে সমঝোতা বিলটি সিনেটে পাস না হয়ে হাউসে আটকা পড়ে গেলেও আমি বিস্মিত হতাম না।

আমি নিজেও যে এই বনেদি মনোভাব থেকে মুক্ত নই– তা স্বীকার করতে আমার বাধা নেই। অভিবাসীদের পক্ষে কোনো বিক্ষোভ সমাবেশে মেক্সিকান পতাকা উড়তে দেখলে দেশাত্মবোধ ঝিলিক দিয়ে ওঠে আমার মনে। যখন ট্যাক্সিভাড়া করতে গিয়ে দোভাষী ডাকতে বাধ্য হই, হতাশায় না ভুগে পারি না আমি।

অভিবাসী বিতর্কে ক্যাপিটল হিল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার মাঝে এক দিন এক দল অ্যাকটিভিস্ট আমার অফিসে আসে। তারা আমাকে ৩০ জন মেক্সিকান নাগরিকের অবস্থান বৈধ করার জন্য একটি 'প্রাইভেট রিলিফ বিল' স্পন্সর করতে বলে। এসব মেক্সিকানকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এদের স্ত্রী ও সন্তানরা এ দেশের বৈধ নাগরিক হওয়ায় তারা রয়ে গেছে এখানেই। ড্যানি সেপুলভেদা নামে আমার এক স্টাফ এই বৈঠকের আয়োজন করে। সেপুলভেদা আবার চিলির বংশোদ্ভূত। আমি গ্রুপটিকে বলি, যদিও এসব লোকের দুর্দশার প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে এবং সিনেট ইমিগ্রেশন বিলের মুখ্য স্পন্সর আমিই, তাই বলে লাখ লাখ মানুষের মধ্যে মাত্র ৩০ জনকে বেছে এ ধরনের একটি বিল স্পন্সর করার ব্যাপারে খুব একটা স্বস্তি বোধ করছি না আমি। এটা একটা নীতিগত প্রশ্ন। এতে অ্যাকটিভিস্টদের কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, আমি নাকি অভিবাসী পরিবার ও তাদের সন্তানদের বিষয়টি আমলে না নিয়ে সীমান্ত ও আইনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। একজন অ্যাকটিভিস্ট তো ড্যানিকে বলেই ফেললেন, তিনি যেন স্মরণ করেন তার পূর্বপুরুষরা কোথা থেকে এসেছেন।

এসব দেখেশুনে আমি কিছুটা ক্ষুব্ধ ও হতাশ হই। ভাবলাম, গ্রুপটিকে বলি যে, আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়া একটি সুবিধা, কোনো অধিকার নয়। কার্যকর কোনো সীমান্ত বা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে এখানে কেউ যেভাবেই আসুক না কেন, এখানে বসবাসকারী মানুষগুলো যত সুবিধা ও সুরক্ষাই ভোগ কক্ষক না কেন– তা মুছে যাবে। তবে আর যা-ই হোক, আমার কোনো স্টাফের সাথে দুর্ব্যবহার তো আমি সহ্য করতে পারি না। তাও আবার যে কিনা এদের জন্যই আমার কাছে সুপারিশ করেছে। তবে ড্যানি আমাকে বিরত রাখে এসব কথা বলা থেকে।

এর কয়েক সপ্তাহ পর, এক শনিবার সকালে আমি পিলসেনের সেন্ট পিয়াস চার্চে

www.pathagar.com

এক ন্যাচারালাইজেশন কর্মশালায় যোগ দিই। কংগ্রেস সদস্য লুইস গুটিয়ারেজ এই অনুষ্ঠানের স্পন্সর। তার সাথে সার্ভিস এমপ্লয়িজ ইন্টারন্যাশনাল এবং আমার অফিসে গিয়েছিল এমন বেশ কয়েকটি অভিবাসী অধিকার গ্রুপও ছিল সেখানে। চার্চের বাইরে প্রায় এক হাজার মানুষ দাঁড়িয়েছিল সারিবদ্ধভাবে। শিশু-বুড়ো সব বয়সী মানুষ ছিল সেখানে। সবার হাতে সংগঠকদের দেয়া ছোট ছোট আমেরিকান পতাকা। সবাই অপেক্ষা করছে স্বেচ্ছাসেবকরা কখন তার নামটি ডাকবে। এরপর দীর্ঘদিন চলে আসা রেওয়াজ ও প্রক্রিয়া অনুসরণের মধ্য দিয়ে একে একে তারা পরিণত হবে আমেরিকান নাগরিকে।

আমি যখন চার্চের ভেতরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, কিছু মানুষ আমার দিকে হাত নাড়ে। তাদের হাসিমাখা মুখ। অন্যরা স্বাভাবিকভাবে 'নড' করে আমাকে যখন আমিও হাত বাড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করি তাদের সাথে। আমি এমন এক মেক্সিকান মহিলার সাক্ষাৎ পাই যে একটি ইংরেজি শব্দও বলতে পারে না। অথচ তার একটি ছেলে যুদ্ধ করছে ইরাকে। স্থানীয় একটি হোটেলে 'বয়'-এর কাজ করে এমন একটি কলম্বিয়ান তরুণকে আমি চিনতে পারি। সে স্থানীয় কমিউনিটি কলেজে অ্যাকাউন্টিং পড়ছে বলে আমাকে জানায়। এক পর্যায়ে সাত-আট বছরের একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। তার বাবা-মা দাঁড়িয়ে ছিল পেছনেই। সে আমার অটোগ্রাফ চায়। স্থানীয় সরকারি স্কুলে সে পড়েছে। আমার অটোগ্রাফ নিয়ে স্কুলে সহপাঠীদের দেখাবে।

আমি মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করি। সে জানায়, ক্রিস্টিনা তার নাম। থার্ড গ্রেডে পড়ে। তার বাবা-মাকে বললাম, মেয়েকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন তারা। ক্রিস্টিনা আমার কথাগুলো তার বাবা-মাকে স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেয়। আমি ভাবতে থাকি, এদের নিয়ে ভয়ের কিছু নেই আমেরিকার। দেড় শ' বছর আগে যে কারণে এ দেশে অভিবাসীরা এসেছিল, আজো একই কারণে এরা এসেছে। সে সময় ইউরোপের দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ও পুরোহিততন্ত্র থেকে বাঁচতে যারা এসেছিল, তাদের কারো বৈধ কাগজ ছিল না। ছিল না ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগাযোগ অথবা কোনো কাজের দক্ষতা। তাদের অন্তরে শুধু একটি ভালো জীবনের স্বপ্ন ছিল।

সীমান্ত রক্ষা আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব। এখানে ইতোমধ্যে যারা অবস্থান করছে আমরা তাদের নাগরিকত্বের সাথে বাধ্যবাধকতাকে জুড়ে দিতে পারি। অভিন্ন ভাষা, অভিন্ন আনুগত্য, অভিন্ন উদ্দেশ্য এবং একটি অভিন্ন গন্তব্য হবে আমাদের। আমাদের মতো নয় এমন মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই যে আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে তা কিন্তু নয়। আসল বিপদটি দেখা দেবে আমরা যদি ক্রিস্টিনা ও তার পরিবারের মানবিকতাকে স্বীকৃতি দিতে না পারি। আমরা যেসব অধিকার ও সুযোগ নিশ্চয়তা হিসেবে নিয়েছি সেগুলো যদি তাদের দিতে ব্যর্থ হই। আমেরিকায় বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চললেও যদি আমরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকি তখন সাম্প্রদায়িক পথ ধরে আরো বৈষম্যের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং সেখান থেকে শুরু হবে বর্ণগত বিরোধ। আমাদের

www.pathagar.com

দেশটি যতই কালো আর বাদামি হয়ে উঠবে– এখানকার গণতন্ত্র ও অর্থনীতি ততই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

আমি ক্রিস্টিনার এ ভবিষ্যৎ চাই না। আমি আমার মেয়েদের জন্যও কামনা করি না এমন একটি ভবিষ্যৎ। সংস্কৃতি ও ভাষাগত দিক দিয়ে তাদের আমেরিকা হবে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। আমার মেয়ে স্প্যানিশ জানবে, কাজ করবে এর উন্নতির জন্য। ক্রিস্টিনা জানবে রোজা পার্কসের কথা এবং কোনো কালো দর্জি মহিলার সাথে কথা বলে অনুভব করবে তার জীবনের সংগ্রাম। আমার মেয়ে বা ক্রিস্টিনাকে হয়তো কালোদের জন্য পৃথক জীবনযাপন বা 'সেগ্রিগেটেড বাস'-এর যুগে ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে পরীক্ষা হবে তাদেরও– রোজা পার্কসের পরীক্ষা হয়েছিল যেভাবে, ফিডেমে রাইডার্সদের পরীক্ষা হয়েছিল যেভাবে, আমাদের সবারই পরীক্ষা হচ্ছে যেভাবে– যেসব কণ্ঠ আমাদের বিভক্ত করে দিচ্ছে, পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের।

তারা যখন এভাবে পরীক্ষিত হবে, আমার বিশ্বাস ক্রিস্টিনা ও আমার মেয়েরা যখন এ দেশের ইতিহাস জানবে, তখন তারা বুঝতে পারবে কতটা মূল্যবান সম্পদ এই জাতি তাদের দিয়েছে। তাদের সবার স্বপ্ন পূরণের মতো যথেষ্ট বড় এই আমেরিকা।

www.pathagar.com

অধ্যায় : আট

আমাদের সীমানার বাইরের বিশ্ব

www.amarboi.org

দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়া। ১৭ হাজার দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশটির অবস্থান ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় মধ্যবর্তী বিষুব রেখা বরাবর। দেশটি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ চীন সাগরের মাঝামাঝি স্থানে। অধিকাংশ ইন্দোনেশীয় মালয় জাতিগোষ্ঠীর এবং জাভা, সুমাত্রা, কালিমান্তান, সুলাভেজি ও বালি দ্বীপে প্রধানত তাদের বসবাস। দূর পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপ আমবোন ও নিউগিনির ইন্দোনেশীয় অংশের মানুষ মেলানেশীয় বংশোদ্ভূত। তাদের সাথে মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের সংস্কৃতিগত ব্যবধান অনেক। ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং এর বৃষ্টিপ্রধান ক্রান্তীয় বনভূমি ওরাংওটান ও সুমাত্রা বাঘের মতো বিরল বন্যপশুর আবাসস্থল। গাছ কাটা, খননকাজ এবং ধান, চা, কফি ও পামঅয়েল গাছের আবাদ বাড়ার কারণে এসব বনভূমি দ্রুত কমে আসছে। প্রাকৃতিক আবাস থেকে বঞ্চিত হয়ে বিলুপ্তির পথে ওরাংওটান প্রজাতি। একই কারণে আদি আবাসস্থলে এখন মাত্র কয়েক শ' সুমাত্রা বাঘ টিকে আছে।

২৪ কোটির বেশি মানুষ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া এখন বিশ্বের চতুর্থ জনবহুল দেশ। চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরই ইন্দোনেশিয়ার স্থান। দেশটির ভৌগোলিক সীমারেখায় সাত শতাধিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস। তারা ৭৪২টি ভাষায় কথা বলে। দেশটির ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলামে বিশ্বাসী। জনসংখ্যার দিক থেকে দেশটি পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। তেল রফতানিকারক দেশগুলোর সংস্থা 'ওপেক'-এর একমাত্র এশীয় সদস্য ইন্দোনেশিয়া। যদিও পুরনো অবকাঠামো, মজুদ ফুরিয়ে যাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ উচ্চ চাহিদার কারণে দেশটিকে এখন অশোধিত তেল আমদানি করতে হয়। দেশটির জাতীয় ভাষা 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া'। এর রাজধানী জাকার্তা আর মুদ্রার নাম রুপিয়া।

অধিকাংশ আমেরিকানই মানচিত্রে ইন্দোনেশিয়াকে চিহ্নিত করতে পারেন না।

www.pathagar.com

বিষয়টি ইন্দোনেশীয়দের অবাক করে। অথচ গত ৬০ বছর ধরে দেশটি নানাভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি দ্বারা প্রভাবিত। মুসলিম সালতানাত হিসেবে দীর্ঘদিন শাসিত হওয়ার পরবর্তী ইতিহাসের অধিকাংশ সময় ইন্দোনেশিয়া খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় রাজতান্ত্রিক শাসনে ছিল। পরে এ দ্বীপপুঞ্জ একসময় ছিল ডাচ কলোনি। ষোড়ষ শতক থেকে তিন শতাব্দীব্যাপী দেশটির পরিচয় ছিল 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ'। পর্যাপ্ত তেল মজুদ দেশটিকে জাপানি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। জাপানের সামরিক বাহিনী এবং এর শিল্পকারখানা সচল রাখতে প্রচুর জ্বালানি তেলের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু, অক্ষশক্তির পক্ষে থাকায় দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের পার্ল হারবার ঘাঁটি আক্রমণের পর জাপান দ্রুত ডাচ উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ দখল অব্যাহত থাকে।

১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর দেশটির বিকাশমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ডাচরা তাদের পুরনো উপনিবেশ আবার ফেরত পাওয়ার দাবি করলে চার বছর রক্তাক্ত যুদ্ধ-সঙ্ঘাত চলে। ডাচরা আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয় ইন্দোনেশিয়ার সার্বভৌমত্ব। আমেরিকান সরকার তখন উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ব্যানারে কমিউনিজমের বিস্তারে শঙ্কিত ছিল। তাই যুক্তরাষ্ট্র এ সময় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে না নিলে মার্শাল পরিকল্পনা থেকে নেদারল্যান্ডকে বাদ দেয়ার হুমকি দেয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নায়ক ছিলেন দেশটির অসাধারণ ক্যারিশম্যাটিক নেতা সুকর্ন। তিনি স্বাধীনতার পর ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সুকর্নের কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হতাশার সৃষ্টি করে। তিনি ভারতের জওহর লাল নেহরু এবং মিসরের জামাল আবদুল নাসেরকে নিয়ে উপনিবেশ থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোকে নিয়ে পশ্চিমা ও সোভিয়েত বলয়ের বাইরে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলার জন্য সৃষ্টি করেন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি কখনো ক্ষমতায় যেতে না পারলেও তাদের পরিসর ও প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সুকর্ন নিজেই পশ্চিমাবিরোধী তর্জন-গর্জন শুরু করেন। তিনি প্রধান প্রধান শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। পশ্চিমা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন । আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করেন। আমেরিকান বাহিনী তখন ভিয়েতনামে এক বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িত। ডমিনো-তত্ত্ব তখনো আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির মূল নির্দেশনা হিসেবে কার্যরত। সিআইএ তখন ইন্দোনেশিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তর্ঘাতী কার্যক্রমে গোপন সহায়তা দিতে থাকে। একই সাথে ইন্দোনেশিয়ার সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে গভীর যোগাযোগ গড়ে তোলে। এসব সামরিক কর্মকর্তার অনেকে একসময় যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী সুকর্ন সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে। এসময় জরুরি অবস্থা জারি করে কমিউনিস্ট ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। এ অভিযানে হত্যা করা হয় ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ। এর বাইরে

www.pathagar.com

আরো সাড়ে ৭ লাখ ইন্দোনেশীয়কে কারাবন্দী বা নির্বাসনে পাঠানো হয়।

এই শুদ্ধি অভিযান শুরুর দুই বছর পর ১৯৬৭ সালে সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। ওই বছরই আমার মা এক ইন্দোনেশীয়কে বিয়ে করার পর জাকার্তা পৌঁছান। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তার সাথে মায়ের পরিচয় হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল ৬ বছর আর মায়ের ছিল ২৪। পরবর্তী বছরগুলোতে আমার মা ওই সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় কী হয়েছিল সে বিষয়ে কখনো আলাপ করতেন না। কখনো আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারিনি। মা অবশ্য অভ্যুত্থানের পুরো কাহিনী জানতেনও না এবং শুদ্ধি অভিযানের বিষয়ে তখন আমেরিকান সংবাদপত্রে এক-আধটু ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দোনেশীয়রাও এ সম্পর্কে কোনো কথাই বলতো না। হাওয়াইয়ে থাকতেই আমার সৎ পিতার ছাত্র-ভিসা বাতিল হয়ে যায়। আমরা জাকার্তা পৌঁছার কয়েক মাস আগে তাকে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। তিনি রাজনীতি নিয়ে মায়ের সাথে আলোচনা করতেন না এবং কিছু বিষয় ভুলে যেতে পরামর্শ দিতেন মা'কে।

বস্তুত ইন্দোনেশিয়ায় অতীত ভুলে যাওয়াটা সহজই ছিল। তখনকার দিনে জাকার্তা ছিল একটি পশ্চাদপদ শান্ত শহর। চার বা পাঁচতলার কয়েকটি ভবন ছিল সেখানে। সাইকেল-রিকশার বাইরে শহরের কেন্দ্রস্থল এবং উপনিবেশ স্মৃতিবিজড়িত কিছু ধনী এলাকায় গুটিকতক গাড়ি চলতে দেখা যেত। এসব এলাকার বাড়িঘর ও লেনগুলো প্রশস্ত ছিল। এর পরপরই ছিল ছোট ছোট গ্রাম– যেখানে কাঁচা রাস্তা, উন্মুক্ত ড্রেন, নোংরা বাজার এবং মাটি, ইট, টিনের চালা ও কাঠ দিয়ে নির্মিত বাড়ি দেখা যেত। গঙ্গার তীর্থযাত্রীদের মতো অপরিচ্ছন্ন নদীতে গোসল ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজ করত লোকজন।

সেই দিনগুলোতে আমাদের পরিবার ততটা সচ্ছল ছিল না। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী তার সদস্যদের খুব বেশি বেতনভাতা দিত না। শহরের এক প্রান্তে মাঝারি মানের একটি বাড়িতে আমরা থাকতাম। এ বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, রেফ্রিজারেশন অথবা ফ্লাশ টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের ছিল না কোনো প্রাইভেট কার। আমার সৎ বাবার একটি মোটরসাইকেল ছিল। মা স্থানীয় জিটনি সার্ভিসে সকালে-বিকেলে আমেরিকান দূতাবাসে যাওয়া-আসা করতেন। তিনি সেখানে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। এই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে বেশিরভাগ প্রবাসী ছেলেমেয়েরা অবৈতনিকভাবে পড়ত। আমি স্থানীয় একটি ইন্দোনেশীয় স্কুলে যেতাম আর কৃষক, চাকুরে, দর্জি ও সরকারি ছোট চাকুরেদের ছেলেদের সাথে রাস্তায়-মাঠে-ঘাটে দৌড়ঝাপ-খেলাধুলা করতাম।

সাত-আট বছরের বালক হিসেবে এর কোনো কিছুই আমার কাছে খারাপ লাগত না। আমার মনে আছে, এ সময়টা আমার বেশ আনন্দেই কাটত। নানা রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়কর ঘটনার মধ্য দিয়ে সময় কাটত। মুরগির পেছনে ছোটা, মোষের সাথে দৌড়ানো, রাতে ভূত-প্রেতের গল্প শোনা আর দ্বারে দ্বারে হকারদের বিক্রি করা মিষ্টিমণ্ডা

www.pathagar.com

খেয়ে ভালোই কাটে আমার শৈশব। আমি প্রতিবেশীদের কাছে শুনতাম আমরা নাকি অনেকের তুলনায় ভালো আছি। আমরা সব সময় পর্যাপ্ত খাবার পেতাম।

আমার মনে হয় এর চেয়ে বড় বিষয় ছিল আমাদের পারিবারিক মর্যাদা। শুধু আমাদের সহায়সম্পদ দিয়েই নয়, একই সাথে পশ্চিমের সাথে আমাদের সম্পর্ক দিয়েও এই মর্যাদা বিবেচিত হতো। আমার মা জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ানদের প্রতি অন্য আমেরিকানদের অসৌজন্য দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনে ক্ষুব্ধ হতেন। এসব আমেরিকান দেশটি তাদের সামনে যা হাজির করেছে তা থেকে কোনো কিছুই শিখতে চাইতেন না। তবে ডলারে বেতন পাওয়ায় বিনিময় হারের কারণে স্থানীয় মুদ্রায় আমার মা ও তারা দূতাবাসের ইন্দোনেশীয় সহকর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ পেতেন। আমরা অবশ্য ইন্দোনেশিয়ানদের মতোই থাকতাম। তবে আমার মা আমাকে নিয়ে নিয়মিতভাবে আমেরিকান ক্লাবে যেতেন। আমি সেখানে সুইমিংপুলে ঝাপ দিতে পারতাম, দেখতে পারতাম কার্টুন আর খেতাম প্রিয় পানীয় কোকা-কোলা। আমার ইন্দোনেশীয় বন্ধুরা কখনো বাড়ি এলে আমি তাদের আমার নানীর পাঠানো ছবির বই দেখাতাম। যেখানে ছিল ডিসনিল্যান্ড অথবা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ছবি। কোনো কোনো সময় সিয়ার্স রোয়েবাক ক্যাটালগে আঙুল দিয়ে দেখাতাম। আমি জানতাম এ সব কিছু হলো আমার আমেরিকান উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য; যা আমি মায়ের জন্য এবং আমেরিকান নাগরিক হিসেবে পেয়েছি। আমেরিকার ক্ষমতা, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সুবিধা হিসেবে এটি আমি পেয়েছি।

এ ধরনের ক্ষমতা হারানো ছিল কঠিন। আমেরিকান সামরিক বাহিনী ইন্দোনেশীয় বাহিনীর সাথে যৌথ মহড়া দিত। প্রশিক্ষণ দিত ইন্দোনেশীয় সামরিক কর্মকর্তাদের। প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদকে দায়িত্ব দেন যেন এ পরিকল্পনায় মুক্তবাজার এবং বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ অবারিত থাকে। ইউএসএআইডি এবং বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে আসা ব্যাপক আর্থিক সহায়তা সামাল দেয়ার জন্য আমেরিকান উন্নয়ন পরামর্শকরা সরকারের মন্ত্রণালয়ের বাইরে আলাদা একটি ধারা তৈরি করেন। এ সময় সরকারের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য কাজের জন্যও পুলিশ বা আমলাদের ঘুষ দিতে হতো। তেল, গম থেকে শুরু করে গাড়ি পর্যন্ত সব ধরনের পণ্যের আমদানি-রফতানির সাথে যুক্ত কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো প্রেসিডেন্ট, তার পরিবার অথবা শাসক জান্তাদের দ্বারা। অবশ্য তেলসম্পদ ও বিদেশী সাহায্যের এক বড় অংশ স্কুল, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামোয় ব্যয় করার ফলে ইন্দোনেশীয় জনগণ তাদের জীবনমানের ব্যাপক উন্নয়ন দেখতে পায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫০ ডলার থেকে বেড়ে ৪ হাজার ৬০০ ডলারে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্রের আশানুযায়ী স্থিতিশীলতার একটি মডেলে পরিণত হয় ইন্দোনেশিয়া। একই সাথে কমিউনিজমের বিপরীতে নির্ভরযোগ্য এক শক্তিশালী মিত্র ও সহযোগী দেশে পরিণত হয় ইন্দোনেশিয়া।

আমি ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানকালে সমৃদ্ধির পথে দেশটির প্রাথমিক অগ্রযাত্রা

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ করি। সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর আমার বাবা একটি তেল কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। আমরা একটি বড় বাড়িতে গিয়ে উঠি। একটি গাড়ি ও ড্রাইভার, একটি রেফ্রিজারেটর ও একটি টিভি সেট পাই বাসায়। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমার মা আমার লেখাপড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সেই সাথে বাবার সাথে তার ক্রমবর্ধমান দূরত্বের কথা ভেবে আমাকে হাওয়াইয়ে নানা-নানীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এক বছর পর মা ও সৎ বোন আমার সাথে এসে যোগ দেন। এরপরও আমার মায়ের সাথে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক কোনো দিন শেষ হয়ে যায়নি। পরবর্তী ২০ বছর তিনি বারবার ইন্দোনেশিয়া সফরে গেছেন। পরে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় নারী উন্নয়ন ইস্যুর বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেয়ার পর তিনি প্রতি ৬ বা ১২ মাসে একবার ইন্দোনেশিয়া যেতেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ার গ্রামীণ মেয়েদের নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু এবং তাদের পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি তৈরির জন্য সেখানে যেতেন। তবে তরুণ জীবনে তিন বা চারবার সংক্ষিপ্ত সফরে ইন্দোনেশিয়া গেলেও আমার জীবন ও জীবনের গতিপ্রবাহ ক্রমেই অন্যমুখী হয়ে পড়ে।

ইন্দোনেশিয়ার পরবর্তী ইতিহাস আমি প্রধানত বই ও সংবাদপত্র পড়ে জেনেছি, আর আমার মায়ের কাছে শুনেছি। স্বাধীনতা পরবর্তী যাত্রা শুরুর ২৫ বছরের পরও ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতি বিকাশমান অবস্থায় থাকে। ৯০ লাখ মানুষের এক মহানগরীতে পরিণত হয় রাজধানী জাকার্তা। যেখানে গগনচুম্বি অট্টালিকা, বস্তি, ধোঁয়া আর ভীতিকর যানজট এক সাধারণ দৃশ্য হয়ে দাঁড়ায়। নারী-পুরুষ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে বিদেশী বিনোয়োগে প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার আশায় রাজধানীতে চলে আসে। এসব প্রতিষ্ঠান নাইকি'র জন্য কাপড়ের জুতা ও গ্যাপের জন্য শার্ট বানাত। সারফার ও রকস্টারদের প্রিয় লক্ষ্যে পরিণত হয় বালির সৈকত। সেখানে পাঁচতারা হোটেল, ইন্টারনেট সংযোগ, কেন্টাকির ফ্রাইড চিকেন সহজলভ্য হয়ে উঠে। নব্বইয়ের দশকের প্রথম ভাগের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়া বিবেচিত হতে থাকে একটি 'এশীয় ব্যাঘ্র' হিসেবে। বিশ্বায়িত পৃথিবীতে যাকে পরবর্তী সাফল্যের ইতিহাস বলে মনে করা হয়। ইন্দোনেশীয় জীবনে রাজনীতি ও মানবাধিকার পরিস্থিতির মতো অনেক তমসাচ্ছন্ন দিক থাকার পরও দেশটি পরিগণিত হয় অগ্রগতির নিদর্শনে। ১৯৬৭-উত্তর সুহার্তো আমলে ব্যাপক নির্মমতার ঘটনা ঘটলেও তা ইরাকের সাদ্দাম হোসেন আমলের সমপর্যায়ে পৌঁছায়নি। ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্টের নির্বিচার দমন নীতি পিনোশে অথবা ইরানের শাহের মতো লৌহমানবের ইমেজও তৈরি করেনি। যেকোনো বিবেচনায় সুহার্তোর শাসন ছিল নিপীড়নমূলক। ভিন্নমতাবলম্বীদের গ্রেফতার-নির্যাতন ছিল সেখানে সাধারণ বিষয়। মুক্ত গণমাধ্যমের উপস্থিতি সেখানে ছিল না। নির্বাচন ছিল নামকাওয়াস্তে। আচেহ'র মতো প্রদেশে জাতিগত বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়লে তাদের শাস্তি দিতে শুধু গেরিলাদেরই লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়নি, এর শিকার হয় সাধারণ জনগণও। হত্যা-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সত্তর ও আশির দশকের পুরোটা জুড়ে এসব ঘটনা ঘটে। আমেরিকান প্রশাসনের অনুমোদন না থাকলেও অন্তত তাদের জ্ঞাতসারেই এগুলো ঘটে চলে।

www.pathagar.com

স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের সাথে সাথে বদলে যেতে শুরু করে আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গি। আমেরিকান পররাষ্ট্র দফতর ইন্দোনেশিয়াকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বন্ধের জন্য চাপ দেয়। পূর্ব তিমুরের দিলিতে ইন্দোনেশীয় সামরিক ইউনিট একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নির্বিচার গুলি চালালে ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেয় আমেরিকান কংগ্রেস। ১৯৯৬ সালের মধ্যেই সংস্কারবাদীরা রাস্তায় নামতে শুরু করে। আমলাদের দুর্নীতি, সামরিক বাহিনীর বাড়াবাড়ি এবং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন দানা বেধে ওঠে।

এরপর ১৯৯৭ সালে আসে সেই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয়। কয়েক দশকের দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ইন্দোনেশীয় অর্থনীতি ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে আসছিল। এশীয় অর্থ বিপর্যয়ে মুদ্রার বিনিময় হার ও শেয়ারবাজারে ধস নামে। এক মাসের ব্যবধানে ইন্দোনেশীয় মুদ্রা রুপিয়ার মূল্য কমে ৮৫ শতাংশ। লেনদেনের ভারসাম্যের বিপর্যয় ঠেকাতে ইন্দোনেশীয় কোম্পানিগুলো ডলার ধার করে। ৪৩ বিলিয়ন ডলার ঋণের বিনিময়ে পশ্চিমা প্রভাবিত ঋণ দাতা সংস্থা আইএমএফ জাকার্তা সরকারকে ভর্তুকি কমানো আর সুদের হার বৃদ্ধির মতো কৃচ্ছ্রতার কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেয়। এসব পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে চাল ও কেরোসিনের মতো নিত্য প্রয়োজনী সামগ্রীর দাম দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার আগেই ইন্দোনেশীয় অর্থনীতির আকার ১৪ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। দাঙ্গা, সহিংসতা ও বিক্ষোভ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে পদত্যাগে বাধ্য হন সুহার্তো।

১৯৯৮ সালে দেশে প্রথমবারের মতো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৮টির মতো দল অংশ নেয় এবং ভোট দেয় ৯ কোটি ৩০ লাখ ভোটার। দৃশ্যত এ সময় কমপক্ষে দু'টি সঙ্কট উত্তরণ করে ইন্দোনেশিয়া। এর একটি হলো আর্থিক বিপর্যয় ঠেকানো আর অন্যটি গণতন্ত্রের ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনা। পরে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং কোনো বড় রকমের দুর্ঘটনা ছাড়াই দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরও সম্পন্ন হয় শান্তিপূর্ণভাবে। দুর্নীতি তখনো একটি রোগের মতোই বিরাজ করতে থাকে এবং সামরিক বাহিনীও থেকে যায় বড় রকমের শক্তি হয়ে। তবে অসন্তোষকে অবলোকন করে রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রেরও বিকাশ ঘটে এ সময়ে।

অন্য দিকে গণতন্ত্র দেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আনতে পারেনি। ১৯৯৭ সালের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ার মাথাপিছু আয় এখন ২২ শতাংশের মতো কমে গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সব সময়ই ছিল বিস্তর। এর আরো অবনতি ঘটে গণতন্ত্রের আমলে। গড়পড়তা ইন্দোনেশীয়দের বঞ্চনার বোধটি আরো বেড়ে যায় ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কারণে। এসব মিডিয়া লন্ডন, নিউইয়র্ক, হংকং ও প্যারিসের প্রাচুর্য তুলে ধরে। সুহার্তোর সময়ে সেখানে আমেরিকাবিরোধী চেতনা এক প্রকার ছিল না বললেই চলে। এখন তা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। নিউইয়র্কের ফটকাবাজ এবং আইএমএফ কর্তারা ইচ্ছা করেই এশীয় অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছিল– এ রকম একটা ধারণা আছে সেখানে। ২০০৩ সালের নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, তখন বেশিরভাগ ইন্দোনেশীয় নাগরিকের কাছে জর্জ বুশের চেয়ে ওসামা বিন লাদেনের কৃতকর্ম অধিক পছন্দনীয় ছিল।

এসব সম্মিলিতভাবেই সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ায় এ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এতে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদী ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে। ঐতিহ্যগতভাবে ইন্দোনেশীয়রা সহনশীল জাতি। মোটামুটি সব ধরনের ধর্মবিশ্বাসী রয়েছে সেখানে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ, হিন্দু ও গুহাবাসী ঐতিহ্যের লোকজন এখানে রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ সুহার্তো সরকারের কড়া নজরদারিতে মদ্যপান সেখানে বৈধ ছিল। অমুসলিমরা ধর্মীয় কারণে শত্রুতার শিকার হতো না এবং মেয়েরা স্পোর্টিং স্কার্ট অথবা সারং (ইন্দোনেশীয় লুঙ্গিসদৃশ পোশাক) পরে বাস অথবা স্কুটারে চলাচল করত। পুরুষরা যত অধিকার ভোগ করত একই অধিকার নারীর জন্যও স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে ইসলামি দলগুলো এক বৃহত্তম বলয় তৈরি করেছে যাদের অনেকে শরিয়া বা ইসলামি আইন বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে বীজ বপিত হয়ে ওয়াহাবি ধর্মীয় নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও মসজিদ এখন দেশটির আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ইন্দোনেশীয় মেয়ে উত্তর আমেরিকা ও পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মতো মাথায় ওড়না পরে চলাচল করে। ইসলামি জঙ্গিরা এবং আত্মস্বীকৃত 'ভাইস স্কোয়াড' চার্চ, নাইটক্লাব, ক্যাসিনো ও পতিতালয়ে হামলা চালায়। ২০০২ সালে বালি নাইটক্লাবে বোমা বিস্ফোরণে দুই শতাধিক মানুষ মারা যায়। ২০০৪ সালে জাকার্তায় এবং ২০০৫ সালে বালিতে একই রকম আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। আল-কায়েদার সাথে সম্পর্কিত ইসলামি চরমপন্থী সংগঠন জামা ইসলামিয়ার সদস্যদের এ বোমা হামলার জন্য বিচার করা হয়। এসব বোমা হামলার সাথে যুক্ত তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাদের আধ্যাত্মিক নেতা আবু বকর বশির ২৬ মাস কারাগারে বন্দী থাকার পর মুক্তি পান।

শেষবার আমি বালি ভ্রমণের সময় যেখানে ছিলাম তার কয়েক মাইল দূরেই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। আমি যখন সেই দ্বীপের কথা, পুরো ইন্দোনেশিয়ার কথা ভাবি– তখন সেই স্মৃতি স্মরণ করে নস্টালজিক হয়ে পড়ি। ধানক্ষেতে খালি পায়ে কাদা মাখামাখির স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আমার। আগ্নেয়গিরির চূড়াগুলোর পেছনে সূর্য ডোবার দৃশ্য, রাতে মুয়াজ্জিনের আজান, হুক্কার গন্ধ, রাস্তার ধারে ফলের গন্ধ, গ্যামেলান অর্কেস্ট্রার মিষ্টি সুর, জাদুকরের আগুনে পড়ার খেলা– সব কিছু মনে পড়ে। আমার সেই স্মৃতিময় জীবনের অভিজ্ঞতা দেখানোর জন্য মিশেল ও মেয়েদের নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যেতে বড় ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয় তাদের সাথে নিয়ে হাজার বছরের হিন্দু কীর্তি প্রেমবানানে আরোহণ করি, আর সাঁতার কাটি বালির পাহাড় থেকে নেমে আসা কোন নদীতে।

কিন্তু আমার এ ধরনের সফরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কেবলই বিলম্বিত হতে থাকে। আমি ক্রমেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পাশাপাশি ছোট মেয়েদের নিয়ে ভ্রমণ সব সময় জটিলই হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরেকটি বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন হই, তা হলো আমার সেই

www.pathagar.com

স্মৃতিগুলোকে এখন আর অবশিষ্ট পাবো কি না। সরাসরি বিমান সার্ভিস এবং মোবাইল ফোন কাভারেজ আর সিএনএন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবী ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। কিন্তু, ইন্দোনেশিয়াকে মনে হয় ৩০ বছর আগের তুলনায় এখন আরো দূরে সরে গেছে।

আমার আশঙ্কা দেশটিতে আমি হয়তো বা এক আগন্তুকে পরিণত হবো।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি একক দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি দেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি ও দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত ভিন্ন। তবুও আমাদের সীমানার বাইরে ইন্দোনেশিয়া অনেক দিক থেকেই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সেখানে বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতা, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য এবং আধুনিকতা ও পশ্চাদপদতার দ্বন্দ্বসঙ্ঘাত চলছে অব্যাহতভাবে।

গত ৫০ বছরে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে ইন্দোনেশিয়া। মোটা দাগে কমবেশি সব কিছু সেখানে ছিল। সাবেক উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভে সহায়ক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরির ক্ষেত্রে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা। স্নায়ুযুদ্ধের আয়নার মধ্য দিয়ে জাতি ও সঙ্ঘাতকে দেখার প্রবণতা ছিল আমাদের। আমেরিকান ধরনের পুঁজিবাদ ও বহুজাতিক করপোরেশনকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আমাদের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা ছিল। আমাদের স্বার্থের জন্য অসহিষ্ণুতা ও নিপীড়ন আর দুর্নীতি ও পরিবেশের অবনতি ঘটানোর মতো বিষয়কে আমরা কখনো কখনো উৎসাহিত করেছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী একসময় স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে। আমরা মনে করেছিলাম স্নায়ুযুদ্ধ অবসান হলেই, বিগ ম্যাকস এবং ইন্টারনেটই বাকি সকল ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের অবসান করার জন্য যথেষ্ট হবে– এশিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করবে এবং পৃথিবীর একক শক্তি হিসেবে আমেরিকার উত্থানের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জনঅসন্তোষ কমবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষাটি ক্ষণস্থায়ী হয়। গণতন্ত্রায়ন প্রসারিত না হয়ে বরং সীমিত হয়ে পড়ে, সম্প্রদায় ও ধর্মীয় সংঘাতের বৃদ্ধি ঘটে– এবং বিশ্বায়নের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক শক্তি এই গোলার্ধের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেমন আন্দোলিত করেছে তেমনি করেছে সন্ত্রাসবাদকেও।

অন্যভাবে বলা যায়, শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই নয়, পৃথিবীর অন্য স্থানেও আমাদের রেকর্ড মিশ্র ধরনের। এক সময়ে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে দূরদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে– যা আমাদের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের সাথে সাথে আমাদের আদর্শ এবং অন্য দেশের স্বার্থকেও সংরক্ষণ করেছে। অন্য সময় দেখা গেছে, আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতি ছিল অন্য দেশের মানুষের যৌক্তিক আবেগ-অনুভূতিকে উপেক্ষা করে ভুল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নেয়া। এতে আমাদের নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে পৃথিবীকে

www.pathagar.com

অধিক বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতিতে এ ধরনের অস্পষ্টতা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক সময় আবেগ-উদ্বেগ নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়। আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক দিনগুলোতে বারবার বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি নেয়া হয় এই উদ্বেগ থেকে যে, বিচ্ছিন্ন না থাকলে সবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিদেশী নানা ষড়যন্ত্রের মুখে পড়তে হতে পারে। জর্জ ওয়াশিংটন তার বিখ্যাত বিদায় সংবর্ধনার ভাষণে বলেছিলেন, 'কেন আমরা আমাদের লক্ষ্যকে ইউরোপের যেকোনো অংশের সাথে একই সূত্রে গেঁথে আমাদের শান্তি ও সমৃদ্ধিকে ইউরোপের উচ্চাভিলাষ, সঙ্ঘাতময়তা, স্বার্থ ও খেয়ালখুশির সাথে মিশিয়ে ফেলব?' জর্জ ওয়াশিংটন যেটাকে বিচ্ছিন্নতা ও দূরে থাকার পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা একটি নতুন জাতিকে বাইরের অশান্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করেছিল।

আমেরিকান বিপ্লবের মূল ধারা এবং রিপাবলিকান ধরনের সরকার অন্য যেকোনো স্থানের স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। তবে আমেরিকার প্রথম দিকের নেতারা আমাদের জীবনধারা বিদেশে রফতানির আদর্শবাদী উদ্যোগের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। জন কুইন্সি অ্যাডামসের মতে, 'ধ্বংস করার জন্য দানবের সন্ধানে আমেরিকার বাইরে দৌড়ানো সঙ্গত হবে না। অথবা উচিত হবে না বিশ্বের নির্দেশক হতে চাওয়া। পুরনোকে সংস্কার নয়, এক নতুন পৃথিবী নির্মাণই আমেরিকাকে উদ্দীপ্ত করেছে। একটি মহাসাগরের নিরাপত্তা ও একটি মহাদেশসম সীমানা নিয়ে নিজস্ব উন্নয়ন ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারবে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জনগণের জন্য আলোর সঙ্কেত হিসেবে পরিগণিত হতে পারব আমরা।'

তবে আমরা নিজেরাই যদি বিদেশী কোনো জটিলতায় জড়িয়ে পড়ি তখন ভৌগোলিকভাবে, বাণিজ্যিক ও আদর্শিকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এই প্রেরণা। টমাস জেফারসন মূল ১৩ রাজ্যের বাইরে সীমা ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে অনিবার্য সম্প্রসারণের কথা বলেছিলেন। লুইজিয়ানা ক্রয় এবং লুইজ ও ক্লার্ক অভিযান এতে দ্রুততর হয়। বিদেশে আমেরিকান রোমাঞ্চকর তৎপরতার বিরুদ্ধে যে কুইন্সি অ্যাডামস সতর্ক করেছিলেন, তিনিই আবার উপমহাদেশীয় সম্প্রসারণের ব্যাপারে একজন ক্লান্তিহীন প্রবক্তায় পরিণত হন। আর তিনি 'মনরো মতবাদে'র প্রধান স্থপতি হিসেবে ভূমিকা রাখেন। এ মতবাদ ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রতি পশ্চিম গোলার্ধের বাইরে থাকার জন্য একটি সতর্ক সংকেত। আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ও অভিবাসীরা ধীরে ধীরে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে থাকে। পরবর্তী প্রশাসনগুলো রাষ্ট্রের এই বিস্তৃতিকে 'অমোঘ নিয়তি' হিসেবে বর্ণনা করে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় এই সম্প্রসারণ পূর্বনির্ধারিত ছিল বলে বদ্ধমূল ধারণা প্রকাশ করা হয়। এন্ড্রু জ্যাকসন একে 'মহাদেশব্যাপী স্বাধীনতার বিস্তরণ' বলে উল্লেখ করেন।

অবশ্য এই 'অমোঘ নিয়তি'র বিষয়টি ছিল রক্তাক্ত ও সহিংস। এর মাধ্যমে আমেরিকান আদিবাসী উপজাতীয়দের জোর করে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা

www.pathagar.com

হয়েছে। মেক্সিকান সেনাবাহিনীকে নামতে হয়েছে তাদের ভূমি রক্ষার জন্য। এটি ছিল দাস ধরে আনার মতো এক বিজয় অভিযান যা আমেরিকার প্রতিষ্ঠাকালীন নীতির সাথে সাংঘর্ষিক এবং এর বর্ণবাদী ব্যাখ্যাকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। এটি এমন এক বিজয় যা আমেরিকান পৌরাণিক কাহিনীতে সব সময় জটিলভাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয় হিসেবে দেখা যায়। তবে অন্য দেশগুলো একে কাঁচাভাবে ক্ষমতার চর্চা হিসেবেই মনে করে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এবং বর্তমান আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের উপমহাদেশীয় অবয়ব সংহত হওয়ার পর এর ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকে না। এর পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং সমুদ্রতীরকে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত রাখতে বাইরের দিকে দৃষ্টি দিতে হয় জাতিকে। হাওয়াইকে অন্তর্ভুক্ত করার পর প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের পা রাখার জায়গা হয়। স্প্যানিশ-আমেরিকা যুদ্ধের পর পুয়ের্টোরিকো, গুয়াম ও ফিলিপাইন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকান নিয়ন্ত্রণ। সাত হাজার মাইল দূরের একটি দ্বীপে সামরিক দখলের বিষয়ে অনেক সিনেট সদস্য আপত্তি জানান। ফিলিপাইনের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য হাজার হাজার আমেরিকান সেনাকে সেখানে নিয়োজিত রাখতে হয়। একজন সিনেটর যুক্তি দেখান যে, এই দখলদারিত্ব আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রকে চীনের বাজারে প্রবেশের সুযোগ এনে দেবে এবং এর অর্থ হলো 'বিপুল বাণিজ্য, সম্পদ ও ক্ষমতা'র অধিকারী হওয়া। আমেরিকা কখনো ইউরোপীয় জাতিগুলোর মতো পদ্ধতিগত উপনিবেশ স্থাপনকে সমর্থন করেনি তবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব দেশে অনধিকার হস্তক্ষেপের বাসনা লালন করেছে সব সময়। উদাহরণ হিসেবে থিওডর রুজভেল্টের 'মনরো ডকট্রিনে' একটি অনুসিদ্ধান্ত যোগ করার কথা বলা যায়– যেখানে ঘোষণা করা হয় যে, ল্যাটিন আমেরিকা অথবা ক্যারিবীয় যেকোনো দেশের সরকার আমেরিকার পছন্দের ব্যাপারে সাড়া না দিলে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে সেসব দেশে। রুজভেল্ট যুক্তি দেখান যে, 'আমেরিকা বিশ্বের একটি বড় অংশে ভূমিকা রাখবে কি রাখবে না এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে কোনো বিকল্প নেই, আমেরিকাকে অবশ্যই বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। সেই ভূমিকাটি সে ভালোভাবে না বাজেভাবে করবে সেটি হলো বিষয়।'

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং এর পরবর্তী সময়ে অন্য বিশ্বশক্তির পররাষ্ট্র নীতির তুলনায় আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির দিকনির্দেশনার পার্থক্য ছিল নামমাত্র। এ সময় পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হতো বাস্তবতার নিরিখে এবং বাণিজ্য স্বার্থকে সামনে রেখে। বিচ্ছিন্ন থাকার চেতনা এ সময়ও প্রবল ছিল। বিশেষত ইউরোপে যখন সঙ্ঘাত ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন এ বিষয়ে নিজেকে জড়ায়নি আমেরিকা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকান স্বার্থে সরাসরি কোনো আঘাত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকে আমেরিকা। তবে প্রযুক্তি ও বাণিজ্যের বিকাশ বিশ্বকে সঙ্কুচিত করে আনে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, কোন্ স্বার্থটি প্রধান এবং কোনটি গৌণ তা বাছাই করা ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ইউ বোট আমেরিকান জাহাজ

www.pathagar.com

অব্যাহতভাবে ডুবিয়ে দিতে থাকলে এবং ইউরোপের পতন আসন্ন হয়ে দাঁড়ালে উড্রো উইলসনের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা বিশ্বে এক প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়– তবে উইলসন উপলব্ধি করেছিলেন, যে সমৃদ্ধি থেকে এই ক্ষমতা এসেছে তা দূরবর্তী এলাকার শক্তি ও সমৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত।

এ নতুন উপলব্ধি থেকে উইলসন আমেরিকার 'অমোঘ নিয়তি'র ধারণাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তিনি যুক্তি দেখান, একটি যুদ্ধে জড়িত হলেই শুধু বিশ্বের জনগণের জন্য পৃথিবী নিরাপদ হবে না। আমেরিকার স্বার্থে সব মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিশ্বকে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য একটি আইনি কাঠামো উপহার দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। জার্মানির আত্মসমর্পণের সময় করা ভার্সাই চুক্তির অংশ হিসেবে উইলসন বিভিন্ন জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত নিরসনের জন্য লিগ অব নেশন বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাব করেন। এর সাথে একটি আন্তর্জাতিক আদালত এবং সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রস্তাব করা হয় যাতে শুধু দুর্বলদের জন্য নয়, শক্তিমানদের জন্যও তা মানার বাধ্যবাধকতা থাকবে। উড্রো উইলসন বলেন, 'এটি হলো এমন এক সময় যখন সবার জন্য গণতন্ত্রই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে এবং এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকবে। গণতন্ত্রের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নেতৃত্ব দানই হবে আমেরিকার অমোঘ নিয়তি।'

প্রাথমিকভাবে উইলসনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। তবে আমেরিকান সিনেট এতে খুব একটা উৎসাহবোধ করতে পারেনি। রিপাবলিকান সিনেট নেতা হেনরি ক্যাবট লজ 'লিগ অব নেশন' এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক আদালত ও আইনের ধারাকে আমেরিকান সার্বভৌমত্বের সীমা লঙ্ঘন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন, বিশ্বের ওপর আমেরিকার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়ার সামর্থ্য সম্পর্কে উপলব্ধি থাকা উচিত। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলে সনাতন বিচ্ছিন্নপন্থীদের অবস্থান (তাদের অনেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন) এবং একই সাথে উইলসনের কোনো ধরনের আপস না করার একগুঁয়ে মনোভাবের কারণে লিগ অব নেশনসে আমেরিকান সদস্যপদ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন করতে সিনেট অস্বীকৃতি জানায়।

পরবর্তী ২০ বছর আমেরিকা দৃঢ়ভাবে অন্তর্মুখী ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র তার সেনা ও নৌবাহিনীকে সঙ্কুচিত করে আনে, বিশ্ব আদালতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আর ইতালি, জাপান ও নাজি জার্মানির যুদ্ধসাজের বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। বিচ্ছিন্নপন্থীদের মিলনস্থলে পরিণত হয় সিনেট। অক্ষশক্তির দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলোতে আমেরিকান ঋণসহায়তা বন্ধের জন্য নিরপেক্ষতা আইন পাস করা হয় এবং হিটলারের সেনাবাহিনীর ইউরোপ দখলের বিষয়ে প্রেসিডেন্টের আবেদনের প্রতি বারবার অবজ্ঞা প্রদর্শন করে সিনেট। পার্ল হারবারে জাপানের বোমা হামলার আগ পর্যন্ত আমেরিকা বুঝতে পারেনি কী ভুল তারা করছে। প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে বলেন, কোনো দেশ বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ উগ্রপন্থীদের দ্বারা পৃথিবী শাসিত হওয়ার চেয়ে বড়

www.pathagar.com

হুমকি আর কিছু হতে পারে না। জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি আরো বলেন, আমরা এখন আর মাইলের দূরত্ব অথবা মানচিত্র দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা পরিমাপ করতে পারব না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ শিক্ষাকে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইউরোপ ও জাপান বিপর্যস্ত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ইস্টার্ন ফ্রন্টে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করে, কিন্তু তার কমিউনিজমের বিস্তার যতটা সম্ভব ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আমেরিকাকে তখন বেছে নিতে হয় কোন দিকে এগোবে। ডান দিকে যারা আছেন তাদের যুক্তি ছিলো শুধু একটি এককেন্দ্রিক পররাষ্ট্র নীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর সরাসরি আক্রমণই কমিউনিস্ট হুমকিকে মোকাবেলা করতে পারে। যদিও এই ধরনের চিন্তা বিচ্ছিন্নভাবে পুরো ত্রিশের দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে চলে এসেছে তা কখনো সঠিক বলে মনে করা হয়নি। অন্য দিকে যারা বাম দিকে ছিলেন এবং সোভিয়েত আগ্রাসনকে খুব একটা বড় করে দেখতে চাচ্ছিলেন না তারা যুক্তি দেখান যে, মিত্র শক্তির বিজয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং যুদ্ধে সোভিয়েতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে স্টালিনকে কিছুটা আনুকূল্য দেখানো যেতে পারে।

আমেরিকা এ দু'টির কোনো পথই বেছে নেয়নি। এর পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, ডিন আবেসন, জর্জ মার্শাল ও জর্জ কেনানের মতো নেতৃত্ব যুদ্ধপরবর্তী সময়ের জন্য একটি নতুন কৌশল গ্রহণ করেন যাতে উইলসনের আদর্শবাদ ও কট্টরপন্থীদের বাস্তববাদের সমন্বয় ঘটে। এতে বিশ্বের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতার নীতি গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে– হ্যাঁ, বিশ্ব একটি মারাত্মক বিপদের স্থান এবং সোভিয়েত হুমকিও একটি বাস্তব বিষয়। এই কারণে আমেরিকার সামরিক প্রাধান্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে এবং পৃথিবীর যেখানে আমেরিকান স্বার্থ রয়েছে তা রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়োগে সামরিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। তবে একই সাথে এটিও ঠিক যে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা অসীম নয়। তাছাড়া কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একই সাথে আদর্শের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ। কোন আদর্শ বিশ্বের শত শত কোটি মানুষের আশা ও স্বপ্নের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন করতে পারে তার পরীক্ষা চলবে। শুধু সামরিক শক্তি দীর্ঘ মেয়াদে আমেরিকার সমৃদ্ধি বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না।

এরপর আমেরিকার যা প্রয়োজন হবে তা হলো স্থিতিশীল মিত্র। যারা স্বাধীনতার আদর্শ, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনে বিশ্বাসী হবে আর যারা বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে থাকবে তাদের মৈত্রী। এ ধরনের জোট সামরিক ও অর্থনৈতিক দুই ক্ষেত্রে মুক্তভাবে ও পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি ছাড়াই টিকে থাকবে। আমেরিকান সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত দেশের সমষ্টির চেয়ে এ ধরনের মিত্রজোট অনেক বেশি দিন কার্যকরভাবে টিকবে। আমেরিকার স্বার্থেই অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক রীতির উন্নয়নে কাজ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি জাতিগুলোর মধ্যকার সঙ্ঘাতের পুরোপুরি অবসান ঘটাবে

www.pathagar.com

অথবা আমেরিকার সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ইতি ঘটাবে এমন ধারণা থেকেই যে এর প্রয়োজন তা নয়। এটি এ কারণেই প্রয়োজন যে অধিকসংখ্যক আন্তর্জাতিক রীতি প্রতিষ্ঠিত হলে তা মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিয়ন্ত্রণ আনে। আর অধিকসংখ্যক আমেরিকান ক্ষমতা প্রয়োগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষপাতী। সঙ্ঘাতের অনেক ঘটনার মধ্যে অল্প ক'টি তখন সামনে আসবে। আর এসব ক্ষেত্রে আমরা সামরিক পদক্ষেপ নিলে এ পদক্ষেপ বিশ্বের দৃষ্টিতে অধিক যৌক্তিক মনে হবে।

এক দশকের কম সময়ে নতুন বিশ্বব্যবস্থার অবকাঠামো বাস্তবে রূপ লাভ করে। আমেরিকান একটি নীতি ছিল কমিউনিজমের বিস্তৃতি শুধু আমেরিকান সেনাবাহিনী দিয়েই নয় বরং একই সাথে ন্যাটো ও জাপানের সাথে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঠেকানো। এ জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে নেয়া হয় মার্শাল পরিকল্পনা। বিশ্বের অর্থবাজারে স্থিতি আনতে বিশ্ববাণিজ্য পরিকল্পনার জন্য ব্রেটন উড চুক্তি করা হয়। আর শুল্ক ও বাণিজ্যব্যবস্থার জন্য করা হয় সাধারণ চুক্তি– গ্যাট। একই সাথে সাবেক ইউরোপীয় উপনিবেশ দেশগুলোর স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা সহায়তা দেয়। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এসব দেশকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সমন্বিত হতে সহায়তা করে। আর সম্মিলিত নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য ফোরাম হিসেবে কাজ করে জাতিসঙ্ঘ।

ষাট বছর পর আমরা যুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে নেয়া পদক্ষেপগুলোর ফলাফল কী হয়েছিল তা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। স্নায়ুযুদ্ধের একটি স্বার্থক ফল হলো, এর মাধ্যমে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞকে এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আর সম্ভব হয়েছে দেশে-বিদেশে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যুগের সূচনা করা।

এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন। সম্ভবত ফ্যাসিবাদের ওপর বিজয় অর্জনের পর এটি একটি মহান প্রজন্মের মহত্তম অবদান। তবে মানুষের তৈরি যেকোনো ব্যবস্থার মতোই এর মধ্যে কিছু দুর্বলতা ও পরস্পরবিরোধিতাও আছে। এটি রাজনীতির বিকৃতির মুখে পড়ে। এটি মুখোমুখি হয় অহমিকার পাঁপ আর দুর্নীতিগ্রস্ততার ভয়ের। কারণ সোভিয়েত হুমকির ভীতি এবং চীন ও উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় যাওয়ার ফলে আমেরিকান নীতিনির্ধারকরা স্নায়ুযুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ব্যক্তিগত সংঘাত, সংস্কার প্রচেষ্টা অথবা বামধারার রাজনীতি, যেখানেই দেখা গেছে তার প্রতি গভীর নজর রেখেছেন। আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি যে অঙ্গীকার রয়েছে তার প্রতি নীতিনির্ধারকরা হুমকি অনুভব করেছেন। দশকের পর দশক ধরে মোবোতুর মতো চোর, নরিয়েগার মতো হিংস্র অপরাধীকে আমরা শুধু সহ্যই করিনি, কমিউনিজমকে ঠেকানোর জন্য তাদের সহায়তাও করেছি। এমনকি ইরানের মতো অনেক দেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের জন্য গোপন তৎপরতাও চালিয়েছি আমরা। এ নিয়ে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা এখনো আমাদের তাড়া করছে অনেক ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

আমেরিকার পলিসি অব কনটেইনমেন্ট বা সোভিয়েত ও চীনকে দমিয়ে রাখার নীতি দেশটিকে ব্যাপক সামরিক সাজসজ্জার দিকে নিয়ে যায়। এতে আমেরিকার সামরিক সক্ষমতা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমকক্ষ হয় অথবা ছাড়িয়ে যায়। এরপরের সময়গুলোতে পেন্টাগনের 'আয়রন ট্রায়াঙ্গালে'র প্রতিরক্ষা ঠিকাদার এবং কংগ্রেস সদস্যরা তাদের ক্ষেত্রগুলোতে বৃহত্তর সামরিক বাজেট দিয়ে একটি বৃহৎ পরাশক্তি হিসেবে তৈরি করতে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিকে বিন্যাস করে। আর পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকির কারণে আমাদের প্রতিপক্ষের সাথে সামরিক সঙ্ঘাত এড়ানো গেলেও আমেরিকান নীতিনির্ধারকরা বিশ্বের যেকোনো স্থানের সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক পদ্ধতির চেয়ে সামরিক সমাধানের ব্যাপারে ক্রমাগতভাবে মত দিতে থাকেন।

কাজের চেয়ে বেশি রাজনীতি কবচানোর ফলে যুদ্ধ-উত্তর আমেরিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি যুদ্ধের পর আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে অভ্যন্তরীণভাবে ব্যাপক মতৈক্য ছিল একটি বড় শক্তি। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু সাধারণত রাজনীতির এ সকল বিরোধের অবসান আলোচনার মাধ্যমে হয়ে যেত। হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন, পররাষ্ট্র দফতর অথবা সিআইএ-তে পেশাজীবীরা আদর্শ বা নির্বাচনের স্বার্থ বিবেচনার পরিবর্তে তথ্য-উপাত্ত ও সুবিবেচনা দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন বলে ধারণা করা হতো। অধিকন্তু মার্শাল পরিকল্পনার মতো কর্মসূচি যেখানে আমেরিকার বিপুল তহবিল বিষয়টিও ছিল, এমন সব ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়। সরকারের প্রতি আমেরিকান জনগণের মৌলিক আস্থা বা বিশ্বাস ছাড়া এ সময়ে এসব ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কঠিন ছিল। সরকারি কর্মকর্তাদেরও জনগণের প্রতি এই বিশ্বাস ছিল যে, তারা প্রয়োজনীয় কর দিতে অথবা তাদের সন্তানদের যুদ্ধে পাঠানোর মতো সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন করবে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় ঐকমত্যের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ফাটল ধরে। রাজনীতিবিদরা দেখতে পান, তারা প্রতিপক্ষের চেয়ে কমিউনিজমের প্রতি কঠোর বিরোধিতা দেখিয়ে অধিক ভোট বাগাতে পারছেন। চীনের ওপর কর্তৃত্ব হারানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের তীব্র সমালোচনা করা হয়। ম্যাককার্থিজম নিজ ক্যারিয়ার ধ্বংস করেন এবং একই সাথে ভিন্নমতকে শেষ করেন। কেনেডি রিপাবলিকানদের 'মিজাইল গ্যাপ'-এর জন্য অভিযুক্ত করেন– যেটি নিক্সনকে হারাতে কোনো কাজে আসেনি। তিনি শুধু তার প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেলে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করতে পেরেছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার, কেনেডি ও জনসন তাদের বিচার-বিশ্লেষণে কমিউনিজমের প্রতি নমনীয় বলে প্রচার পাওয়ার বিষয়টিকে ভয় করতেন। স্নায়ুযুদ্ধের কৌশল ছিল গোপনীয়তা, ছিদ্রান্বেষণ ও অপপ্রচার চালানো। বিদেশী সরকার ও জনগণের বিরুদ্ধে এ কৌশল কাজে লাগানো হতো। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এ কৌশলের ব্যবহার শুরু হয়। সমালোচকদের হেয় করা, প্রশ্নসাপেক্ষ নীতির পক্ষে মত তৈরি অথবা বড় রকমের ভ্রান্তিকে ঢেকে রাখতে এ ধরনের রাজনীতিকে কাজে লাগানো হয়। যারা আমাদের 'আদর্শ' বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ তারাই আমাদের নিজেদের ঘরে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

www.pathagar.com

ভিয়েতনামকে সামনে রেখে মূলত এসব প্রবণতা তৈরি হয়। এসব প্রবণতার মারাত্মক পরিণতি আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিদেশে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা নষ্ট করে, যা পুনরুদ্ধার করতে একটি প্রজন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। যুদ্ধে যারা লড়াই করেছে তারা সবাই ভালোভাবে পুরস্কৃত হয়। তবে যুদ্ধে সম্ভবত সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছিল আমেরিকান জনগণ এবং তাদের সরকারের মধ্যে আস্থার বন্ধন নষ্ট হওয়া। আর এতে আস্থার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায় আমেরিকান জনগণের নিজেদের মধ্যেও। আমেরিকানরা উপলব্ধি করতে শুরু করে, ওয়াশিংটনের তারকারা কী করছে তা সব সময় জানা যায় না, আর তারা সব সময় সত্য কথা বলেও না। বামপন্থীরা ক্রমবর্ধমান হারে শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধেরই বিরোধিতা করেনি, অধিকন্তু আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বৃহত্তর লক্ষ্যেরও বিরোধিতা করতে থাকে। তাদের মতে, প্রেসিডেন্ট জনসন, জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড, সিআইএ, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছু আমেরিকার অজ্ঞতা, যুদ্ধংদেহিতা, বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। যারা ডানপন্থী তারা এর জবাবে শুধু ভিয়েতনামের ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নয়, অধিকন্তু বিশ্ব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবস্থানের অবনতির জন্য প্রথমেই আমেরিকাকে দায়ী করার প্রবণতার সমালোচনা করেন। বিক্ষোভকারী, হিপ্পি, জেইন ফোন্ডা, আইভি লিগ বুদ্ধিজীবীরা এবং উদার গণমাধ্যমে যারা দেশপ্রেমকে মসিলিপ্ত করেন, আপেক্ষিকতাবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন তারা। আর ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন কমিউনিজমের সাথে সঙ্ঘাতে আমেরিকান সমাধানকে দুর্বল করেন।

এসব ছিল একটিভিস্ট ও রাজনৈতিক পরামর্শকদের ক্যারিকেচার। অনেক আমেরিকানের অবস্থান ছিল মধ্যবর্তী, যারা তখনো কমিউনিজমকে পরাজিত করতে আমেরিকান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। তবে এতে বিপুলসংখ্যক নাগরিকের জীবন ক্ষয় করার আমেরিকান নীতির ব্যাপারে ছিলেন সংশয়বাদী। পুরো ৭০ ও ৮০-এর দশকজুড়ে কেউ একজন ডেমোক্র্যাট বাজপাখি ও রিপাবলিকান শান্তির পায়রা দেখতে পারেন। তবে কংগ্রেসে অরিগনের মার্ক হ্যাটফিল্ড ও জর্জিয়ার স্যাম নানের মতো ব্যক্তি ছিলেন যারা দ্বিদলীয় পররাষ্ট্রনীতির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্বাচনকালে যেসব কর্মকাণ্ড ঘটে তাতে জনমনে এ ধারণা তৈরি করার চেষ্টা হয় যে, ডেমোক্র্যাটদের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দুর্বল হিসেবে তুলে ধরতে চান রিপাবলিকানরা। আর যারা বিদেশে ক্রমবর্ধমান সামরিক ও গোপন কার্যক্রমের ব্যাপারে সংশয়বাদী তাদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থন তৈরি হয়।

এ সকল কার্যকারণের ফলে– ঐকমত্যের পরিবর্তে বিভক্ত রাজনীতির ফলে এখন জীবিত অধিকাংশ আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে কোনো না কোনো মত নিজের মধ্যে তৈরি করেছেন। রিচার্ড নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জারের সময় পররাষ্ট্রনীতিকে কৌশলগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত মনে হলেও তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করেনি। আর কম্বোডিয়ায় বোমা হামলার বিষয়টি কোনো নৈতিকতার

www.pathagar.com

মধ্যেই পড়ে না। মানবাধিকার বিষয়টি যিনি প্রাধান্য দেন সেই ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময় শক্তিশালী প্রতিরক্ষার পাশাপাশি নৈতিক উদ্বেগগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তেল সঙ্কট, ইরানি পণবন্দী সঙ্কট এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন তাকে একজন সোজা সরল ও অকার্যকর ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে।

কমিউনিজমের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী স্পষ্টবাদী ছিলেন রোনাল্ড রিগ্যান। বিশ্বের অন্যান্য সঙ্কটের ব্যাপারে কমিউনিজম বিদ্বেষ তাকে অনেকটাই অন্ধ করে ফেলে। রিগ্যান প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের সময় এবং পরে শিকাগোতে কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে এটি আমি নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছি। এ সময় অনেক ডেমোক্র্যাটের মতো আমি তৃতীয় বিশ্বে রিগ্যানের নীতির প্রতিক্রিয়া দেখে মর্মাহত হই। রিগ্যান প্রশাসন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনকে সমর্থন করেন। এলসালভেদরের ডেথ স্কোয়াডের জন্য তিনি তহবিলের জোগান দেন। ছোট্ট একটি দেশ গ্রানাডায়ও অভিযান চালানো হয়। আমি তার পারমাণবিক অস্ত্র এবং তারকা-যুদ্ধ নীতির মধ্যে দুরভিসন্ধি দেখতে পাই। রিগ্যানের কথার ফুলঝুড়ি আর রুচিহীন ইরান কন্ট্রা কেলেঙ্কারি আমাকে নির্বাক করে দেয়।

বাম ধারার বন্ধুদের সাথে যুক্তিতর্কে আমার অনেক সময় রিগ্যানের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে অবস্থান হয়ে যায় কারণ লৌহযবনিকার আড়ালে ঘটে চলা নির্মমতার ব্যাপারে প্রগতিশীলরা কিভাবে নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন, আমি বুঝি না। অথচ তারা চিলি'র বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের জন্য আমেরিকান বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিধি এককভাবে দায়ী নয়, একথা আমি বলতে পারি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদেরকে সেখান থেকে অপহরণ করে নিয়ে আসতে পারে না আমেরিকা। রিগ্যানের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করার ধরন ও আকার নিয়ে আমার প্রশ্ন থাকতে পারে, তবে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনকে সামনে রেখে সামরিক শক্তিতে এগিয়ে থাকার প্রতিযোগিতার যুক্তি অবশ্যই আছে। আমাদের জাতীয় সম্মান আর সামরিক বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং একই সাথে আমাদের সীমান্তের বাইরের চ্যালেঞ্জ বা বিপদ মোকাবেলার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এ কথা বলতে পারি যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সহজ কোনো উপায় ছিল না– তাই এসব ক্ষেত্রে রিগ্যানের সাথে আমার কোনো দ্বিমত নেই। বার্লিনের দেয়াল যখন ভাঙে তখন এই প্রবীণ প্রেসিডেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই, যদিও আমি কোনো দিনই তাকে ভোট দেইনি। বেশ কয়েকজন ডেমোক্র্যাটসহ অনেকেই রিগ্যানকে ভোট দিয়েছেন।

নেতৃস্থানীয় রিপাবলিকানদের যুক্তি ছিল, রিগ্যানের প্রেসিডেন্সি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঐকমত্য এনেছে। অবশ্য সেই ঐকমত্যকে কোনো দিন যাচাই করা হয়নি। কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রিগ্যানের যুদ্ধটি মূলত করা হয়েছে অন্যদের ব্যবহারের মাধ্যমে এবং তা করা হয়েছে ঘাটতি অর্থায়নের মাধ্যমে। এ যুদ্ধে আমেরিকান সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর রিগ্যানের কর্মসূচি বিশ্বব্যবস্থায়

www.pathagar.com

সেভাবে আর টেকসই থাকেনি। জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আবার নৈতিক ঐতিহ্যে ফিরে আসেন। তার এই বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। আর উপসাগরীয় যুদ্ধ পরিচালিত হয় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে। কিন্তু আমেরিকার সাধারণ জনগণের দৃষ্টি ছিল এ সময় অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রতি। তার আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন গঠনে দক্ষতা অথবা আমেরিকান ক্ষমতাকে উচ্চে তুলে ধরা এসব কোনো কিছুই দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য তার প্রেসিডেন্সিকে রক্ষা করতে পারেনি।

বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্টের দফতরে বসার পর সাধারণভাবে ধারণা ছিল যে, আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ-উত্তর পররাষ্ট্রনীতি ট্যাঙ্ক-কেন্দ্রিক না হয়ে বাণিজ্যিক বিষয়গুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেবে। আমেরিকান জীবনের চেয়েও আমেরিকার কপি রাইট বেশি গুরুত্ব পাবে। অথচ ক্লিনটন নিজে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিশ্বায়ন শুধু নতুন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জই নিয়ে আসেনি, একই সাথে নতুন নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া এবং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থাকে সংহত করার সাথে সাথে ক্লিনটন প্রশাসন বলকানের সংঘাত ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের দীর্ঘদিনের সংঘাতের অবসানে কাজ করে। একই সাথে পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে ভূমিকা রাখে। তবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অন্তত নব্বইয়ের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখযোগ্য কোনো তত্ত্ব অথবা বড় ধরনের কোনো সাফল্যের মাইলফলক ছিল না। আমেরিকান সামরিক তৎপরতার পুরোটাই ছিল প্রয়োজনের চেয়েও ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এটি আমাদের দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের অবসানের আকাঙ্ক্ষার কারণেও হতে পারে। অথবা সোমালি, হাইতিয়ান অথবা বসনিয়ানদের বা অন্যান্য দুর্ভাগাদের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণেও হয়ে থাকতে পারে।

এরপর আসে সেই ১১ সেপ্টেম্বর। আর আমেরিকানরা অনুভব করেন তাদের পৃথিবীটা উল্টে গেলো।

২০০৬ সালের জানুয়ারিতে আমি একটি সি-১৩০ কার্গো বিমানে চড়ে প্রথমবারের মতো সফরে যাই ইরাকে। সেই ভ্রমণে সাথে ছিলেন আমার দু'জন সহকর্মী। তারা হলেন ইনডিয়ানার সিনেটর ইভান বায়াহ আর টেনেশির কংগ্রেসম্যান হ্যারল্ড ফোর্ড জুনিয়র। তারা এর আগেও ইরাক সফর করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা জানালেন, এই ইরাক সফর কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে। ইরাকের রাজধানী শহরের ভেতরের ও বাইরের সম্ভাব্য বৈরী পরিস্থিতি এড়াতে আমাদের সামরিক বিমানটি কয়েক দফা তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল ভেদ করে অবতরণ করে আমাদের বিমান। তাই অবতরণকালের উদ্বেগটি কিছুটা কম ছিল। আমার বেশিরভাগ সহকর্মী যাত্রী সিটে ঘুমিয়ে ছিলেন। বিমানের ওঠানামার সাথে তাদের বেল্ট বাঁধা শরীরের মাথাটি দুলছিল। একজন ক্রুকে দেখি– ভিডিও গেম খেলছেন, আরেকজন আমাদের ফ্লাইটপ্লান উল্টে-পাল্টে দেখছেন।

www.pathagar.com

নিউইয়র্কে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে বিমানের মর্মান্তিক আঘাত হানার ঘটনার খবরটি শোনার সাড়ে চার বছর পেরিয়ে গেছে। সে সময় আমি ছিলাম শিকাগোতে। রাজ্য সিনেটের শুনানিতে যোগ দিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার গাড়ির রেডিওতে খবরটি পুরোপুরি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো না। আমার ধারণা হয়েছিল কোনো ছোট বিমান দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে আঘাত হানায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে আমি শিকাগোর সভায় হাজির হই। আর দ্বিতীয় বিমানটিও এর মধ্যে আঘাত হানে। আমাদের বলা হয়, ইলিনয় রাজ্য ভবনটি যেন আমরা তখনই ত্যাগ করি। রাস্তার সব দিকে মানুষের ভিড় ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। তারা তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে আর শিকাগোর সর্বোচ্চ ভবন সিয়ার্স টাওয়ারের দিকে। পরে আমার আইন অফিসে আমরা অনেকে টিভি স্ক্রিনে দুঃস্বপ্নের সেই চিত্রগুলো দেখি। একটি বিমান অস্পষ্ট ছায়ার মতো এসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের গ্লাস ও স্টিলে আঘাত করে, নারী-পুরুষ ছিটকে পড়ে। যন্ত্রণাকাতর আর্তচিৎকার ভেসে আসে। শেষে ঘূর্ণায়মান ধুলিমেঘে ঢাকা পড়ে যায় সূর্য।

অন্য অনেক আমেরিকানের মতোই আমিও পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসিতে আমার বন্ধুবান্ধবের খোঁজখবর নিয়ে, চাঁদা পাঠিয়ে, প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনে কাটাই। শোক প্রকাশ করি অপরিমেয় মৃত্যুক্ষতির জন্য। অন্য সবার মতো আমার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর এক গভীর ব্যক্তিগত বিষাদ নিয়ে আসে। ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতাই শুধু আমাকে আক্রান্ত করেনি অথবা নিউইয়র্কে আমার পাঁচ বছর অবস্থানের নানা স্মৃতিময় স্থাপনা টুকরো টুকরো হওয়ার দৃশ্য কল্পনার কারণেই শুধু নয়, অধিকন্তু আমি তাদের কথা ভাবি– যারা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রতি দিনের মতো তাদের দিবস শুরু করেছিলেন। আধুনিক পৃথিবীর ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসেবে দ্রুততার সাথে তারা হয়তো বিমানে আরোহণ করেন, ধাক্কাধাক্কি করে কমিউটার ট্রেন ধরেন আর কফি হাতে নিউজপেপার স্ট্যান্ড থেকে সকালের পত্রিকা নিয়ে কথা বলতে বলতে ভবনের ওপরে কর্মস্থলে ওঠেন। অধিকাংশ আমেরিকানের জন্য এ ধরনের জীবনযাত্রার রুটিনই বিশৃঙ্খলার ওপর তাদের শৃঙ্খলার বিজয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। এতে আমাদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। আমরা সিট বেল্ট বাঁধি। সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরি করি। কিছু প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিবেশ এড়িয়ে চলি। আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। পরিবার থাকে নিরাপদে।

এখন গোলযোগ-বিশৃঙ্খলা আমাদের দোরগোড়ায়। এ অবস্থায় আমাদের কাজ করতে হবে ভিন্নভাবে। বিশ্বকে উপলব্ধি করতে হবে অন্যভাবে। জাতির একটি প্রশ্নের জবাব আমাদের দিতে হবে। হামলার এক সপ্তাহের মধ্যে যেসব ব্যক্তি, দেশ ও সংস্থা এ হামলার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্টকে নিরঙ্কুশ এখতিয়ার দেয়ার একটি প্রস্তাব সিনেটে ৯৮-০ এবং প্রতিনিধি সভায় ৪২০-১ ভোটে অনুমোদন হয়। দেশব্যাপী আমেরিকান তরুণরা তাদের দেশের জন্য সামরিক বাহিনী ও সিআইএতে যোগদানের আবেদন করে। আমরা আমেরিকানরা শুধু একা নই। প্যারিসের 'লা মঁদে' পত্রিকায় ব্যানার হেডলাইন করে 'নাউ সমে তো আমেরিকেইন'

www.pathagar.com

(আমরা সবাই আমেরিকান)। কায়রোতে স্থানীয় মসজিদে আমেরিকার এ ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য দোয়া করা হয়। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো সংস্থার সনদের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করা হয়। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ন্যাটোর কোনো এক সদস্যদেশ সামরিকভাবে আক্রান্ত হলে সব সদস্য দেশই সামরিক হামলার শিকার বলে মনে করা হবে। এ ধারা অনুযায়ী ন্যাটো সদস্যরা আমেরিকার পাশে দাঁড়ায়। ন্যায়বিচার আমাদের সহায়তা করে, আর বিশ্ব আমাদের পাশে দাঁড়ায়। মাত্র এক মাসের কিছু সময়ের মধ্যে কাবুল থেকে আমরা তালেবান সরকারকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হই। আল-কায়েদার অপরাধীরা হয় পালিয়ে যায়, না হয় ধরা পড়ে।

আমেরিকান প্রশাসনের জন্য এটি ছিল শুভসূচনা। আমি ভাবি ধীরে-সুস্থে হিসাব-নিকাশ করে আর ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হলো। (তবে পরে জানা যায়, তোরাবোরা পাহাড়ে আল-কায়েদা বাহিনীর ওপর পর্যাপ্ত সামরিক চাপ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ওসামা বিন লাদেন পালিয়ে যেতে সক্ষম হন!)। বিশ্বের অন্যান্যের মতো আমিও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য অপেক্ষা করি। একবিংশ শতাব্দীর আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। যেখানে সন্ত্রাসীদের হুমকি মোকাবেলায় শুধু আমাদের সামরিক পরিকল্পনা, গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে না অধিকন্তু এতে বহুজাতিক হুমকির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কিভাবে নতুন আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা যায় তারও নির্দেশনা থাকবে।

সে পরিকল্পনা আর কখনো করা হয়নি। এর পরিবর্তে আমরা যা দেখেছি তা হলো অতীতের বাসি নীতির রকমারি সমাবেশ, যা আবর্জনা হয়ে গেছে তাকে একসাথে করে নতুন লেবেল লাগানো হয়েছে। রিগ্যানের 'শয়তানের সাম্রাজ্য' এখন হয়েছে 'শয়তানের অক্ষশক্তি'। থিওডর রুজভেল্টের 'মনরো ডকট্রিন' পরিণত হয়েছে 'বুশ ডকট্রিনে'– যেখানে বলা হয়েছে যেসব সরকারকে আমাদের পছন্দ হবে না তাদের আমরা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারব। মনরো ডকট্রিনে এটি পশ্চিম গোলার্ধ বা উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকায় সীমিত ছিল বুশ ডকট্রিনে তা বাইরে ছড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়। পুরনো 'অমোঘ নিয়তি তত্ত্ব' আবার ফিরে এসেছে। বুশের ধারণা আমাদের নিরাপত্তার জন্য যা প্রয়োজন সেগুলো হলো, আমেরিকান সমর ক্ষমতা, আমেরিকান সমাধান এবং আমেরিকার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নের জন্য একটা আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন।

সম্ভবত সবচেয়ে বাজে জিনিসটা হলো স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর যা দেখা যায়নি বুশ প্রশাসন যে রাজনীতির নতুন জন্ম দিয়েছে। সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করা বুশের 'আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিরোধ যুদ্ধ' মতবাদের একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। যারা ইরাকে আগ্রাসনের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাদের আখ্যা দেয়া হয় 'সন্ত্রাসবাদের প্রতি দুর্বল' অথবা 'আন-আমেরিকান' হিসেবে। সামরিক অভিযানের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলোকে সততার সাথে মূল্যায়ন করার পরিবর্তে বুশ প্রশাসন এক

www.pathagar.com

আক্রমণাত্মক তথ্য প্রচার অভিযান শুরু করে। বুশের পরিকল্পনা বা কাজের সমর্থনে গোয়েন্দা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সামরিক পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও খরচের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত না দিয়ে মোটা দাগের একটি ধারণা প্রচার করা হয়। আর সেই সাথে আমেরিকার আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখানো হয়।

২০০২ সালের শেষ দিকে বুশ প্রশাসনের তথ্যকৌশল কাজ দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকানের মনে ধারণা জন্মে যে, সাদ্দাম হোসেনের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। আর ৬৬ শতাংশ আমেরিকান বিশ্বাস করে বসে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলায় সাদ্দাম হোসেনের হাত ছিল। ইরাকে হামলা করার ব্যাপারে বুশের প্রস্তাব অনুমোদনের পক্ষে জনমত ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি রেখে রিপাবলিকানরা ইরাক আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। আর সাদ্দাম হোসেনের সরকারকে উৎখাতের জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে ভোট গ্রহণ করে। ২০০২ সালের ১১ অক্টোবর ২৮ জন ডেমোক্র্যাট সিনেটরের মধ্যে ১৫ জন বুশকে ইরাক আক্রমণের ক্ষমতাদানের পক্ষে ভোট দেন আর একজন রিপাবলিকান এতে অস্বীকৃতি জানান।

ভোটাভুটির দৃশ্যটি আমাকে চরমভাবে হতাশ করে। যদিও যে ধরনের চাপের মুখে পড়ে ডেমোক্র্যাটরা এ কাজ করেছে তার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল। এ ধরনের কিছু চাপের মুখোমুখি আমি নিজেও হয়েছি। ২০০২ সালের শরতে সিদ্ধান্ত নিই যে, আমেরিকান সিনেটের সদস্য হওয়ার জন্য আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। ইরাকের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের বিষয়টি জেনে আমি ব্যাপক কোনো প্রচারকাজ শুরু করিনি। শিকাগোর অ্যাকটিভিস্টদের একটি দল অক্টোবরে যুদ্ধবিরোধী একটি বড় সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। এ ধরনের একটি স্পর্শকাতর ইস্যুতে জনমতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে অনেক বন্ধু আমাকে সতর্ক করে দেন। ইরাকে অভিযান চালানোর বিষয়টি ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। তবে একই সাথে যুদ্ধ খুব সহজ কাজ হবে বলে মনে হয়নি। অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতো আমারও ধারণা ছিল সাদ্দামের হাতে রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্র থাকতে পারে। আর পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার প্রবল বাসনাও তার থাকতে পারে। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, সাদ্দাম বারবার জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবকে এবং অস্ত্র পরিদর্শকদের অবজ্ঞা করেছে। আর এ ধরনের আচরণের জন্য পরিণতি ভোগ করা উচিত। সাদ্দাম তার দেশের জনগণের প্রতি যে নির্মম ছিলেন তার ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই। সাদ্দামকে ছাড়া ইরাক চললে দেশটির জনগণ এবং বিশ্ব স্বস্তিতে থাকবে– আমার মনে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এত কিছুর পরও আমার যুক্তি ছিল সাদ্দামের হুমকি আসন্ন কোনো বিষয় নয়। প্রশাসন যুদ্ধের জন্য নাটকীয় ও আদর্শতাড়িত যুক্তির সন্ধান না করে আগে আফগানিস্তানে অভিযানকে শেষ করতে পারে। কিন্তু কূটনীতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে এ রকম একতরফা সামরিক পদক্ষেপই শেষ পর্যন্ত নেয়া হলো। আমার মত ছিল, তা না করে অস্ত্র পরিদর্শনে অনুমতি দিতে বাধ্য করার পদক্ষেপ নেয়া আর অবরোধকে

www.pathagar.com

আরো কঠোর করা। এভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার নীতির পক্ষে বাইরের বড় ধরনের সমর্থনপ্রাপ্তির যে সুযোগ ছিল তা নষ্ট করেছে।

শিকাগোর ফেডারেল প্লাজায় দুই হাজার লোকের সমাবেশে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরি। আপনাদের কারো মত সকল যুদ্ধের বিরোধী আমি নই। আমি সব ধরনের যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমার নানা পার্ল হারবারে জাপানি বোমা আক্রমণের পর সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন। তিনি 'প্যাটন সেনা' হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আমি আরো বলি, ১১ সেপ্টেম্বরের হত্যা ও ধ্বংসলীলা আর কান্না দেখার পর আমি যারা প্রতিহিংসার নামে নিরপরাধ মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে তাদের মূলোৎপাটনে বুশ প্রশাসনের অঙ্গীকারকে সমর্থন করেছিলাম। একই সাথে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় অস্ত্র তুলে নেয়ার কথা বলেছিলাম।

কিন্তু আমি একটি অপরিণামদর্শী যুদ্ধ অথবা একটি বাজে ধরনের যুদ্ধ করতে পারি না– যে যুদ্ধ কোনো যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নয়, করা হচ্ছে আবেগের ওপর নির্ভর করে। কোনো নীতির ভিত্তিতে এ যুদ্ধ নয়, এটি করা হচ্ছে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে। আমি আরো বলি :

আমার মনে হয় ইরাকের বিরুদ্ধে একটি সফল যুদ্ধের জন্য অনির্দিষ্টকাল আমেরিকান দখলদারিত্ব বজায় রাখতে হতে পারে। এতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়তে পারে। আর সৃষ্টি হতে পারে অজানা এক দৃশ্যপট। আমি জানি সুস্পষ্ট যুক্তি এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া ইরাক যুদ্ধ অশান্তির আগুনকে মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে। পরিস্থিতির উন্নয়নের বদলে অবনতিকেই তা উৎসাহিত করবে। তা আরব বিশ্বকে আবেগতাড়িত করবে আর আল কায়েদার জনবল সংগ্রহ তৎপরতাকে চাঙ্গা করবে।

আমার বক্তব্য বেশ প্রশংসিত হয়। বক্তব্যের বিষয়গুলো অ্যাকটিভিস্টরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় এবং আমি একটি কঠিন ইস্যুতেও ভালো বক্তব্য রাখার সুনাম অর্জন করি। এটি অত্যন্ত কঠিন এক ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে জয়ী হতে আমাকে সহায়তা করে। তবে আমার পক্ষে তখনো নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না যে, ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে আমার ধারণা ঠিক না বেঠিক। যখন চূড়ান্তভাবে ইরাক অভিযান শুরু হয়, আমেরিকান বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করে, যখন আমি দেখি সাদ্দামের ভাস্কর্য উপড়ে ফেলা হচ্ছে। আমি দেখি, প্রেসিডেন্ট ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনের ওপরে 'অভিযান সমাপ্ত' লেখা ব্যানারের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন তখন আমার সংশয় হতে থাকে যে, আমি মনে হয় ভুল চিন্তায় ছিলাম। আর অল্পসংখ্যক আমেরিকানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অভিযানের সমাপ্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করলাম।

এখন তিন বছর পর নিহত আমেরিকানের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৬ হাজার। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার কোটি

www.pathagar.com

ডলারে আর ভবিষ্যতে প্রদেয় ঋণের সুদ এবং যুদ্ধাহতদের জন্য ব্যয়ের হিসাব করা হলে এ জন্য আরো কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয় হবে। দু'টি ইরাকি জাতীয় নির্বাচন, একটি ইরাকি শাসনতান্ত্রিক গণভোট আর লাখ লাখ ইরাকির মৃত্যু এবং বিশ্বব্যাপী আমেরিকাবিরোধী জনমত অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আফগানিস্তানের সঙ্ঘাত আবার নতুন রূপে সামনে এসেছে।

সিনেটের সদস্য হিসেবে আমি বাগদাদের উদ্দেশে আকাশে উড়তে উড়তে, কিভাবে এ বিপর্যয় থেকে উত্তরণ ঘটা যায় সে কথাই ভাবছিলাম। আর এ জন্যই সফরটির আয়োজন করা হয়েছিল।

বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমাদের অবতরণ ততটা খারাপ হয়নি, যদিও আমরা সি-১৩০ বিমানের জানালা দিয়ে উড়োজাহাজটির বাঁক নেয়া, ওঠানামা বা মাটি স্পর্শ করা– কোনোটাই দেখতে পাইনি। পররাষ্ট্র দফতরের এস্কর্ট অফিসার আমাদের স্বাগত জানান। একই সাথে বিভিন্ন পদমর্যাদার সামরিক সদস্যরা সশস্ত্র সালাম দিয়ে স্বাগত জানান আমাদের। নিরাপত্তা ব্রিফিং, ব্লাড গ্রুপ রেকর্ড এবং নিরাপত্তা হেলমেট ও জ্যাকেট পরার পর আমরা একটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা হই বাগদাদের গ্রিন জোনের উদ্দেশে। মাইলের পর মাইল কর্দমাক্ত ভূমি, উষর জমি, এঁকেবেঁকে চলা রাস্তা এবং মাঝে মধ্যে ছোট ছোট খেজুর গাছের বাগান ও ভাঙাচোরা বাড়িঘর পেরিয়ে হেলিকপ্টারটি বেশ নিচু দিয়ে এগিয়ে যায়। এসব বাড়িঘরের অধিকাংশকেই মনে হয়েছে শূন্য। আবার কিছু মনে হয় ভেঙে ফেলা পরিত্যক্ত ভবন। ওপর থেকে দেখতে বাগদাদকে চক্রাকারের সাজানো মরুভূমির মতো ধূসর রঙা এক মেট্রোপলিটন শহর বলে মনে হয়। ট্রাইগ্রিস নদী ঠিক মাঝ বরাবর বাগদাদকে দু'ভাগ করেছে। আকাশ থেকে একে মনে হয় জীর্ণ ও বিধ্বস্ত এক নগরী। মাঝে মধ্যে রাস্তায় ট্রাফিক দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি বাড়ির ছাদে স্যাটেলাইট ডিশ এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকলেও আমেরিকান কর্মকর্তারা মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক নতুনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আমি ইরাকে ছিলাম মাত্র দেড় দিন। এর বেশিরভাগ সময় কাটে গ্রিন জোনের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে। ১০ বর্গমাইলের এই এলাকাটি বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সাদ্দাম হোসেনের আমলে ইরাক সরকারের কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র ছিল এটি। এখন তা পুরোপুরি আমেরিকান বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন জোনের চার দিকে আমেরিকার কড়া সামরিক পাহারা এবং দেয়াল ও কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। ইরাক পুনর্গঠন টিম আমাদের জানায়, ইরাকি আত্মঘাতীদের তৎপরতার কারণে বিদ্যুৎ ও তেল উৎপাদন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জঙ্গিদের ক্রমবর্ধমান হুমকির বর্ণনা দেন। আর ইরাকি নিরাপত্তা বাহিনীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলিশিয়াদের উদ্বেগজনক অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আবহিত করেন। পরে আমরা ইরাকি নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তারা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে উচ্চ হারে ভোটার অংশগ্রহণের বিষয়টি বেশ উৎসাহের সাথে উল্লেখ করেন। এরপর আমরা প্রায় এক ঘন্টা ধরে ইরাকে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

www.pathagar.com

খালিলজাদের বক্তব্য শুনি। অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এ আমেরিকান কূটনীতিক বিশ্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। তিনি শিয়া, সুন্নি ও কুর্দি উপদলগুলোকে একটি কার্যকর ঐকমত্যের সরকারে সমবেত করতে তার জটিল শাটল ডিপ্লোমেসির বর্ণনা দেন।

দুপুরে সুইমিং পুলের উল্টোদিকে সুপরিসর মেস হলে আমরা সৈনিকদের সাথে এক ভোজে মিলিত হই। এই ভবনটি এক সময় ছিল সাদ্দাম হোসেনের প্রাসাদ। মধ্যাহ্নভোজে নিয়মিত বাহিনী, রিজার্ভ ফোর্স ও ন্যাশনাল গার্ড ইউনিটের সদস্যদের মিশ্রণ ছিল। ছোট-বড় শহর থেকে আনা এসব সৈনিকের মধ্যে সাদা-কালো, ল্যাটিনো সব ধরনেরই ছিল। তাদের অনেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো দায়িত্ব পালন করতে ইরাকে আসেন। তারা এখানে যে দায়িত্ব পালন করছেন তা গর্বের সাথে উল্লেখ করেন। তারা কিভাবে স্কুল তৈরি করছেন, বিদ্যুৎ স্থাপনা রক্ষা করছেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন ইরাকি সৈনিকরা পাহারা এবং দেশের প্রত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রসদ সরবরাহ লাইন কিভাবে বজায় রাখছেন তার বর্ণনা দেন। তারা বারবার আমাদের কাছে একই বিষয় জানতে চান যে, কেন আমেরিকান গণমাধ্যম ইরাকের বোমাবাজি ও হত্যার ঘটনার বিষয়েই শুধু রিপোর্ট করে? এখানে অনেক উন্নয়ন ও অগ্রগতি হচ্ছে তার খবরাখবর আমাদের দেশের মানুষের জানার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে তারা বুঝতে পারেন এখানে আমাদের আসাটা নিষ্ফল হচ্ছে না।

এসব মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের হতাশার বিষয়টিও উপলব্ধি করা যায়। ইরাকে সামরিক বা বেসামরিক যত আমেরিকানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের ত্যাগ, তাদের দক্ষতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। তারা যে ভুলগুলো করেছে তা সহজভাবে স্বীকার করে। তবে একই সাথে এটাও বলে, এখনো সামনে যে কাজ পড়ে আছে তা সম্পাদন কতটা দুরূহ হতে পারে। ইরাকে যে অবকাঠামো বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার পুরোটা আমেরিকান দিকনির্দেশনা, সম্পদ এবং কারিগরি প্রযুক্তিতে। এসব হচ্ছে গ্রিন জোনের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে অথবা ইরাক ও কুয়েতের সামরিক ঘাঁটির আশপাশে। এর মধ্য দিয়ে একটি বৈরী পরিবেশে একটি পুরো শহরের সুবিধাদি গড়ে তোলায় আমাদের সরকারের সামর্থ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। নিজস্ব বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন, কম্পিউটার লাইন ও ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক, বাস্কেটবল কোর্ট ও আইসক্রিম স্ট্যান্ড তৈরি করেছে তারা। একজন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এসব কাজের মধ্য দিয়ে আমেরিকার চমৎকার গুণগত মানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উন্নাসিকতা বা দৈবদুর্বিপাক সত্ত্বেও তাদের কারো মধ্যে হতাশা দেখা যায় না। এর ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের এ কাজের কারণে একটি দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। আমরা জানি এটি অর্জন করতে হচ্ছে কত কঠিনভাবে।

আমার সফরকালের তিনটি আলোচনার কথা আমার মনে আছে। ইরাকে আমরা কতটা উপকার করছি তা এসব আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি। এখন পর্যন্ত দৃশ্যত যা সেখানে গড়ে উঠছে তা আমেরিকানদের রক্ত, অর্থ এবং শুভ ইচ্ছার বিনিময়ে। আমার প্রথম আলোচনাটি হয় বিকেলে বাগদাদে কর্মরত বিদেশী সাংবাদিকদের সাথে।

www.pathagar.com

আমাদের এই সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আমি রিপোর্টারদের বলি, তারা ইচ্ছা করলে একটি অনানুষ্ঠানিক ও 'অব দ্য রেকর্ড' অধিবেশনে বসতে পারেন। আমি বলি, গ্রিন জোনের নিরাপত্তা বলয়ের বাইরের জীবন সম্পর্কে আমি জানতে আগ্রহী। তারা আমার সাথে এসব বিষয়ে আলাপ করতে চাইলেও তবে জানায়, ৪৫ মিনিটের বেশি তারা এখানে থাকতে পারবেন না। কারণ তারা সূর্য ডোবার পর বাগদাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার ঝুঁকি নিতে চান না।

গ্রুপ হিসেবে সাংবাদিকরা সবাই ছিলেন যুবক। তাদের বয়স বিশ বা ত্রিশের কোটায় হবে। তারা সবাই নৈমিত্তিক পোশাক পরা, সবাইকে কলেজ ছাত্র হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়। তাদের চেহারায় লক্ষ করার মতো এক ধরনের স্নায়বিক চাপ ছিল। এরই মধ্যে ইরাকে ৬০ জনের মতো সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। আমাদের আলোচনার শুরুতে তারা এক ভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ক্ষমা চান। সবেমাত্র তারা জানতে পারেন, তাদের এক সহকর্মী খ্রিষ্টান সায়েন্স মনিটর পত্রিকার সাংবাদিক জিল ক্যারল অপহৃত হয়েছেন। তার ড্রাইভারকে রাস্তার পাশে মৃত পাওয়া গেছে। এখন তারা সবাই যার যার সূত্রের সাথে যোগাযোগ শুরু করছেন এ বিষয়ে কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় কি না। তারা জানান, এ ধরনের ঘটনা ইরাকে এখন অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। যদিও ইরাকিরা এসব নিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। শিয়া ও সুন্নির মধ্যে লড়াই ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করছে। যা কৌশলগত ও সংহতির দিক থেকে নেতিবাচক এবং পরিস্থিতির অধিকতর অবনতির লক্ষণ। তাদের কারো কাছ থেকে এমন কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি যে, নির্বাচন নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন এনেছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে উত্তেজনা কমবে কি না। আমি আশা করেছিলাম, তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক জবাব পাব। কিন্তু তারা এর পরিবর্তে মাথা নেড়ে নেতিবাচক জবাব দেন। একজন রিপোর্টার আমাকে বলেন, তার ধারণা, এতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে দেশটি ভেঙে পড়বে। এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হবে। তার মতে, আমরাই এ দেশটিকে একত্রে রাখতে পারি।

সেই রাতে রাষ্ট্রদূত খালিলজাদসহ আমাদের প্রতিনিধিদলের সাথে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানির নৈশভোজের কর্মসূচি ছিল। আমাদের কনভয় গ্রিন জোন পার হওয়ার পর ব্যারিকেডের জালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এক ব্লক পরপর আমেরিকান সেনার প্রহরা। আমাদের বলা হয়, আমরা যেন গাড়িতে হেলমেট ও নিরাপত্তা জ্যাকেট পরি।

১০ মিনিটের মধ্যে আমরা একটি বড় ভবনে এসে পৌঁছি। এখানে প্রেসিডেন্ট এবং ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন সদস্য আমাদের স্বাগত জানান। তাদের সবাই ভার-ভারিক্কি ধরনের মানুষ। বয়স হবে ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। তাদের মুখে ছিল গালভরা হাসি, কিন্তু চোখের মধ্যে ছিল আবেগহীন বিশ্বাসঘাতকতার আমেজ। আমি তাদের মধ্যে শুধু একজনকে চিনতে পারি। তার নাম ছিল আহমদ ছালাবি। পশ্চিমা

www.pathagar.com

শিক্ষিত শিয়া। ইরাকি ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রবাসী গ্রুপের একজন নেতা ছিলেন তিনি। আহমদ ছালাবি যুদ্ধের আগে আমেরিকান গোয়েন্দা ও বুশ প্রশাসনের নীতিনির্ধারকদের কাছে অনেক তথ্য পৌঁছে দিতেন। যার ভিত্তিতে ইরাকে আমেরিকান হামলা সংঘটিত হয়। ছালাবি ও তার দল এসব তথ্যের বিনিময়ে কোটি কোটি ডলার পেতেন। পরে এসব তথ্যের অধিকাংশ ভুয়া প্রমাণিত হয়। এরপর লোকটি আমেরিকানদের সুদৃষ্টি হারায়। ছালাবি আমেরিকার গোপন তথ্য ইরানিদের কাছে পাচার করতো বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। জর্ডানে অর্থ আত্মসাৎ, চুরি, অন্যের সম্পদ তছরুপ ও মুদ্রা দর নিয়ে ফটকাবাজির জন্য তার অনুপস্থিতিতে বিচার হয়। জর্ডানে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। এখানে এক কিশোরী কন্যাকে সাথে নিয়ে তিনি বুক ফুলিয়ে চলছেন নিষ্কলঙ্ক পোশাকে। অন্তর্বর্তী সরকার তাকে তেল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে। নৈশভোজের সময় ছালাবির সাথে আমি বেশি কিছু বলতে পারিনি। বরং আমি একটু সামনে এগিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রীর পাশে গিয়ে বসি। তাকে আমার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং ইরাকি অর্থনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ মনে হয়েছে। তিনি ইরাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং আইনি কাঠামোকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। পরে তার সম্পর্কে আমার ধারণা দূতাবাসের একজন স্টাফের কাছে বলি।

স্টাফ বলেন, তিনি বেশ স্মার্ট তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একই সাথে তিনি সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইসলামিক রেভলিউশন অব ইরাক-এর নেতাদের একজন। পুলিশ নিয়ন্ত্রণকারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের হাতে। আর হ্যাঁ, এই পুলিশের সমস্যাটি হলো তাদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলিশিয়ার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অভিযোগ রয়েছে, তারা যে সুন্নি নেতাদের সাথে ওঠাবসা করেন পরদিন সকালে তাদের অনেকের লাশ পাওয়া যায়। ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটছে। স্টাফের কণ্ঠ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং কাঁধ বাঁকিয়ে বলেন, আমাদের এসব লোকের সাথেই কাজ করতে হচ্ছে, এরাই আমাদের সাথে আছেন।

সে রাতে ঘুম আসে না আমার। না ঘুমিয়ে সাদ্দাম ও তার অতিথিদের জন্য এককালের সংরক্ষিত পুল হাউজের স্যাটেলাইটে ডেডস্কিন খেলা দেখি। বেশ কয়েকবার আমি টিভির শব্দ বন্ধ করে মর্টারের আওয়াজ শুনি। পরদিন সকালে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে করে ফালুজার মেরিন ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। শুষ্ক মরু এলাকার বাইরে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলকে বলা হয় আনবার প্রদেশ। আনবারের সুন্নি অধ্যুষিত অঞ্চলে আত্মঘাতীদের সাথে কয়েক দফা লড়াই হয়। গ্রিন জোনের তুলনায় এই ক্যাম্পের পরিবেশ অনেক থমথমে। এর ঠিক আগের দিন রাস্তার ধারে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ও গুলিতে পাঁচ মেরিন সেনা নিহত হয়। এখানকার সেনাদের বেশ অনভিজ্ঞ মনে হয়। তাদের অনেকের বয়স ২০-এর কোঠায়। কারো কারো তরুণ বয়সের দাগ দেখা যায় চোখে-মুখে।

ক্যাম্পের জেনারেল ইনচার্জ এক ব্রিফিংয়ের আয়োজন করেন। আমরা ক্যাম্পের

www.pathagar.com

এক সিনিয়র কর্মকর্তার কাছে আমেরিকান বাহিনীর তৎপরতার কথা শুনি। তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে প্রতিদিনই অধিক থেকে অধিকতর আত্মঘাতী ধরা পড়ছে। কিন্তু এখানেও শিকাগোর রাস্তার ধারের দুর্বৃত্ত দলের মতো একজন আত্মঘাতীকে আটক করার পর তার স্থান নিতে আরো দু'জন তৈরি থাকে। শুধু রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও আত্মঘাতী হতে প্রেরণা জোগাচ্ছে তাদের। কেন্দ্রীয় সরকার আনবারের প্রতি চরমভাবে অবহেলা প্রদর্শন করছে। এখানকার পুরুষ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই বেকার।

একজন অফিসার জানান, শুধু দুই বা তিন ডলারের জন্য একজন বোমা পুঁতে আসে। এটাই তাদের কাছে অনেক অর্থ।

ব্রিফিং শেষ হওয়ার পরও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের জন্য আমাদের কিরকুকের বিমান বিলম্বিত হয়। বিমানের জন্য অপেক্ষায় থাকাকালে আমার বৈদেশিক নীতি বিষয়ক কর্মকর্তা মার্ক লিপার্ট সামরিক ইউনিটের একজন পদস্থ কর্মকর্তার সাথে আলাপ করেন। আমি এ অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের কৌশল নিরূপণের দায়িত্বে থাকা এক মেজরের সাথে আলাপ করি। লোকটি ছিলেন মৃদুভাষী বেঁটেখাটো চশমা পরা এক ভদ্রলোক। তাকে দেখে মনে হবে, একজন স্কুলশিক্ষক। বস্তুত তিনি মেরিন সেনায় যোগদানের আগে আমেরিকান পিস কোরের সদস্য হিসেবে কয়েক বছর ফিলিপাইনে কাটান। সেখানে তিনি অনেক শিক্ষা পেয়েছেন, যা ইরাকে সামরিক কার্যক্রমে প্রয়োগ করার মতো বলে মেজর আমাকে জানান। তিনি কাছাকাছি কোনো আরব দোভাষী পাননি, যাতে তারা স্থানীয় লোকজনের সাথে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করতে পারেন। তার মতে, আমাদের আমেরিকান বাহিনীর মধ্যে সংস্কৃতিসংক্রান্ত স্পর্শকাতরতার ব্যাপারে শিক্ষা বাড়ানো প্রয়োজন। স্থানীয় নেতাদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। পুনর্গঠন টিমে যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী রাখা প্রয়োজন– যাতে ইরাকিরা দেখতে পারেন তারা আমেরিকান বাহিনী থেকে কী ধরনের উপকার পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এসবের জন্য সময়ের প্রয়োজন। তবে সারাদেশে এসব রীতি গ্রহণের পর ইতোমধ্যে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন।

আমাদের নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবার জানান, যাত্রা শুরুর জন্য তৈরি হয়ে আছে হেলিকপ্টার। আমি মেজরকে বিদায় জানাই। মার্ক আমার পাশে এসে বসেন এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে তিনি কী শিখতে পারলেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'পরিস্থিতির সর্বোত্তমভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমরা কী চিন্তা করতে পারি।'

'তিনি কী বললেন'– আমি জানতে চাইলাম।

'ছুটি'– এক কথায় তার জবাব।

www.pathagar.com

আগামী আরো অনেক বছর ইরাকে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতার কাহিনী নিয়ে বিশ্লেষণ ও বিতর্ক চলবে। এটি এমন এক কাহিনী যা এখনো লেখা হয়নি। এক সময় মনে করা হয়েছিল ইরাক পরিস্থিতি হালকা ধরনের গৃহযুদ্ধের পর্যায় পর্যন্ত থাকবে। বাস্তবে তা থেকে অবস্থার এখন অনেক বেশি অবনতি ঘটেছে। আমার বিশ্বাস ইরাক আক্রমণের মূল সিদ্ধান্তের সময় যার যে মতই থাকুক না কেন এখন সব আমেরিকানই এ পরিস্থিতি থেকে শান্তিপূর্ণ প্রস্থান কামনা করেন। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমি স্বল্পমেয়াদে ইরাকে ভালো কিছু আশা করতে পারছি না।

আমি জানি বর্তমান পর্যায়ে এটি হবে রাজনীতি। কঠিন ও আবেগমুক্ত যেসব ব্যক্তির সাথে আমি নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলাম তাদের হিসাব অনুযায়ী এখন ইরাকে যা ঘটছে তার সবকিছুর ওপর আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার বিশ্বাস ঠিক বর্তমান মুহূর্তে আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে নির্ধারণ প্রয়োজন। লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে ইরাকে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা। ইরাকে যারা ক্ষমতায় থাকবে তারা আমেরিকার প্রতি বৈরী হবে না এ বিষয়টি নিশ্চিত করা। আর ইরাককে সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি হওয়া থেকে রক্ষা করা। আমার বিশ্বাস আমেরিকান এবং ইরাকি উভয়ের স্বার্থে ২০০৬ সালের পর থেকে আমেরিকার সৈন্য ইরাক থেকে প্রত্যাহার শুরু করা যেতে পারে। কত দিনের মধ্যে আমেরিকান সৈন্য পুরোপুরি প্রত্যাহার করা যাবে সেটি চূড়ান্তভাবে এ মুহূর্তে ঠিক করা যাবে না। এটি নির্ভর করবে কত সময়ের মধ্যে ইরাকি সরকার নিজ দেশের জনগণের জন্য মৌলিক নিরাপত্তা ও সেবাগুলো দিতে সক্ষম হবে তার সর্বোত্তম অনুমানের ওপর। এটি নির্ভর করবে ইরাকে অন্তর্ঘাতবিরোধী আমাদের অভিযান এবং আমেরিকান সেনার অনুপস্থিতি কোন মাত্রার গৃহযুদ্ধের মতো ঘটনা ঘটাতে পারে তার ওপর। যুদ্ধে কষ্টসহিষ্ণু হওয়া মেরিন কর্মকর্তা যখন আমাকে বলছিলেন, আমাদের প্রত্যাহার হয়ে যাওয়া উচিত আর সংশয়পন্থী বিদেশী সাংবাদিকরা তখন বলছিলেন আমাদের থাকা উচিত। এই দ্বিমুখী বক্তব্যে বোঝা যায় এই সঙ্কটের সহজ কোনো জবাব নেই।

ইরাকে আমাদের কাজ সম্পর্কে পুরো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় এখনো পুরোপুরি আসেনি। সেখানে যে বৈরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শুধু আমাদের কার্যক্রমের জন্য হয়েছে তা-ও নয়। এখানে আসলে ঘটেছে ধারণা বা অনুমানের ব্যর্থতার প্রতিফলন। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পাঁচ বছর এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার ১৫ বছর পর আমেরিকায় এখনো সমন্বিত জাতীয় নিরাপত্তা নীতি নেই। দিকনির্দেশক নীতির পরিবর্তে আমরা একের পর এক অ্যাডহক বা নৈমিত্তিক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছি। যার ফল হচ্ছে অনিশ্চিত অবস্থা। আমরা ইরাকে আক্রমণ করেছি কিন্তু হামলা করিনি উত্তর কোরিয়া অথবা মিয়ানমারে? বসনিয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করেছি কিন্তু কেন করলাম না দারফুরে? ইরানের কি সরকার উৎখাতের লক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, নাকি ইরানের আণবিক ক্ষমতার বিস্তৃতি বন্ধ করা হবে, অথবা পারমাণবিক দ্রুত বিস্তৃতি রোধ করা হবে– নাকি তিনটিই একসাথে করা হবে? জনগণকে সন্ত্রস্ত করছে এমন সব

www.pathagar.com

স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার করব? যদি তাই করি তবে চীনের মতো দেশ যে অর্থনীতিকে উদার করলেও রাজনীতিকে করেনি তার প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে? আমরা কি সব ইস্যু নিয়ে জাতিসঙ্ঘের সাথে কাজ করব নাকি জাতিসঙ্ঘ আমাদের কোনো সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করলেই তখন পদক্ষেপ নেব?

সম্ভবত হোয়াইট হাউসের ভেতরের কারো এসব প্রশ্নের জবাব পরিষ্কার করা দরকার। তবে আমাদের মিত্ররা এবং আমাদের শত্রুদের ব্যাপারে কী ধরনের জবাব সুনির্দিষ্টভাবে আসবে তা আমাদের জানা নেই। এর জবাব ছাড়া আমেরিকানরা কিছু করতে পারবে না।

সুস্পষ্ট কৌশলের প্রকাশ ছাড়া জনসমর্থন এবং বিশ্ব সমঝোতা আসবে না– যা আমেরিকার পদক্ষেপের আইনানুগ বৈধতার সঙ্কট সৃষ্টি করবে। আমেরিকাকে এখনকার চেয়ে অধিক নিরাপদ করতে ক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের একটি সংশোধিত পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো প্রয়োজন রয়েছে– যেখানে বলিষ্ঠতা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ট্রুম্যানের নীতির সমন্বয় থাকবে। যেখানে নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ ও সুবিধা দুটোকে দেখা হবে। যা আমাদের শক্তি প্রয়োগ, আমাদের গভীরতর আদর্শ এবং অঙ্গীকারের দিকনির্দেশ করবে।

আমি আশা করি না যে, সব সময় বুক পকেটে মজুদ থাকবে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি মহাকৌশল। তবে আমি যা বিশ্বাস করি এবং আমি যে পরামর্শ দিতে চাই তা হলো, কিছু কিছু বিষয় থাকে যেগুলোতে আমেরিকান জনগণের সম্মত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর নতুন ঐকমত্যের জন্য তা হতে পারে সূচনা বিন্দু।

প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে, আবার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে যাওয়া অথবা কখনো কখনো আমেরিকান সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন নেই– পররাষ্ট্রনীতির এমন ধারণা কাজ করবে না। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট, দুই দলের মধ্যেই বিশ্ব থেকে নিজেদের গুটিয়ে না নেয়ার পক্ষে জোরালো মত রয়েছে। বিশেষত যদি কোথাও আমেরিকান স্বার্থ বিপন্ন হয় অন্তত সে ক্ষেত্রে। ১৯৯৩ সালে মোগাদিসুর রাস্তায় আমেরিকান সেনাদের যখন ডেগারবিদ্ধ লাশ পড়েছিল তখন রিপাবলিকানরা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে অশুভ উদ্দেশে আমেরিকান বাহিনীর অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে সমালোচনা করেছিলেন। সোমালিয়ার অভিজ্ঞতার কারণেই জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০০ সালের নির্বাচনে 'জাতি গঠন' এর জন্য আমেরিকান সেনাবাহিনী আর পাঠানো হবে না বলে উল্লেখ করেছিলেন। এটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, সেই বুশ প্রশাসন ইরাকে যে ভূমিকা নিয়েছে তা অনেক বেশি মাত্রায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে এসেছে। নিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপ অনুসারে, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পাঁচ বছর পর ৪৬ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন– যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে আন্তর্জাতিক কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে তার নিজস্ব স্বার্থের বিষয়টাকে মাথায় রাখা এবং এরপর অন্য দেশগুলো তাদের নিজেদের জন্য উত্তম যেটি মনে করে সেটি করার সুযোগ তাদের জন্য অবশিষ্ট রাখা।

www.pathagar.com

যে উদারপন্থীরা ইরাক আক্রমণকে ভিয়েতনামের ভুলের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন তদের মধ্যে এ প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে বেশি। ইরাক নিয়ে হতাশা এবং প্রশাসনের যুদ্ধের বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলা অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও পারমাণবিক বিস্তৃতির বিপদকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছে। ২০০৫ সালের জানুয়ারির এক জরিপ অনুসারে রক্ষণশীল পরিচয়দানকারীদের ২৯ শতাংশ বলেছেন, আল কায়েদাকে নিশ্চিহ্ন করা আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ মতের পক্ষে বেশি ছিলেন উদারপন্থীদের চেয়ে রক্ষণশীল পরিচয়দাতারা। আর ২৬ শতাংশ বলেছেন, শত্রু দেশ বা গোষ্ঠীর হাতে পারমাণবিক অস্ত্র না যাওয়ার বিষয়টি বেশি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। অন্য দিকে উদারপন্থীদের মত অনুযায়ী, সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রনীতির তিন লক্ষ্য হওয়া উচিত– ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, এইডসের বিস্তৃতিরোধ আর মিত্রদের সাথে অধিক ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা।

উদারপন্থীরা যেসব লক্ষ্যম অর্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলোর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে তাদের এ সকল মতকে জাতীয় নিরাপত্তা নীতির সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ বলা যাবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার, ওসামা বিন লাদেন কিন্তু হো চি মিন নন এবং আমেরিকা এখন যে হুমকির মোকাবেলা করছে তা একেবারে বাস্তব, ক্রমবর্ধমান এবং খুবই বিপজ্জনক। ইরাক বিষয়ে আমাদের সাম্প্রতিক নীতিগুলো পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। তবে আমরা যদি কালকেই ইরাক থেকে আমেরিকান সৈন্য সরিয়ে আনি তাহলেও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তার প্রাধান্য বিস্তারকারী ভূমিকার জন্য আমেরিকা লক্ষ্যবস্তু হয়েই থাকবে। রক্ষণশীলরা যদি ভাবেন আমরা শয়তানি শক্তির মূলোৎপাটন করতে পারব এবং এরপর বিশ্ব নিজের প্রতিরক্ষা নিজেই করতে পারবে, তবে এটি হবে ভুল ধারণা। বিশ্বায়ন আমাদের অর্থনীতি, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের নিরাপত্তা সব কিছুই এখন একা আমাদের ওপর নির্ভর করে না, পৃথিবীর পরিবর্তন অগ্রগতির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আমরা ছাড়া পৃথিবীতে আর অন্য কোনো দেশ নেই যার বিশ্বব্যবস্থাকে বিন্যাস করার মতো বড় রকমের শক্তি সামর্থ্য রয়েছে। অথবা স্বাধীনতা, ব্যক্তি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মঙ্গলের বলয় বিস্তৃত করে নতুন কোনো আন্তর্জাতিক বিধিমালা সম্মতভাবে তৈরি করতে পারে। এটা পছন্দ হোক বা না হোক আমরা যদি আমেরিকাকে অধিক নিরাপদ করতে চাই তাহলে, পৃথিবীকে অধিকতর নিরাপদ করার কাজে সহায়তা দিতে হবে আমাদের।

দ্বিতীয় একটি বিষয় আমাদের স্বীকার করতে হবে, বর্তমানে যে নিরাপত্তা পরিবেশ বিরাজ করছে তা আজ থেকে ৫০, ২৫ অথবা এমনকি ১০ বছর আগের অবস্থার চেয়েও আলাদা। যখন ট্রুম্যান, আচেসন, কেনান ও মার্শাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ব্যবস্থার নকশা তৈরি করেছিলেন তখন তাদের কাঠামো ছিল বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতাভিত্তিক যা উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সে দিনের বিশ্বে আমেরিকার সামনে সবচেয়ে বড় হুমকি আসে সম্প্রসারণবাদী নাজি জার্মানি অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। যারা আমাদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং

www.pathagar.com

বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাকে নির্দেশিত করার জন্য বিপুলসংখ্যক সেনা ও সমর সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে মুখ্য এলাকাগুলোতে অভিযান চালানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই পৃথিবী এখন আর নেই। মুক্ত বিশ্বে জার্মানি ও জাপানের বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে উদার গণতান্ত্রিক ও মুক্তবাজার অর্থনীতির দেশ হিসেবে সমন্বয় বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের সেই হুমকির অবসান ঘটিয়েছে। বার্লিন প্রাচীর ভাঙার আগেই পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তৃতি বন্ধ করে এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করার মাধ্যমে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের ঝুঁকি দূর করতে কার্যকরভাবে সফল হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো (ক্রমবর্ধমান শক্তির দেশ চীনসহ) এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ এসব দেশে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক নীতি, আইনি কাঠামো এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে কূটনৈতিক সমাধানের মতো আন্তর্জাতিক আইন ও বিধিমালার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনকি তাদের নিজস্ব সীমানার মধ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাপকভাবে না হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকারের প্রতি তাদের আনুগত্য রয়েছে।

এরপর ক্রমবর্ধমান হুমকি প্রাথমিকভাবে আসতে পারে বিশ্ব অর্থনীতির প্রান্তিক এলাকা থেকে যেখানে আন্তর্জাতিক বিধিমালার পথ গ্রহণ করা হয়নি, যেখানে দুর্বল বা অকার্যকর রাষ্ট্র রয়েছে, কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ততা রয়েছে আর আছে অব্যাহত সহিংসতা। যেসব দেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির উন্নত অগ্রগতি থেকে বিচ্ছিন্ন– সেখান থেকে। আর সেসব স্থান থেকে যেখানে বিশ্বায়নে ক্ষমতা হারানোর ভয় রয়েছে, ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিপন্নবোধ করে অথবা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হবে বলে ভীতি আছে।

অতীতে এ রকম একটি ধারণা ছিল যে, আমেরিকা ইচ্ছা করলেই এসব বিচ্ছিন্ন থাকা অঞ্চলের রাষ্ট্র বা মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টিকে উপেক্ষা করে থাকতে পারবে। তারা হয়ত বা আমাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে শত্রুতা পোষণ করতে পারে; তারা আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে জাতীয়করণ করতে পারে; পণ্যমূল্য কমার কারণ হতে পারে; তারা সোভিয়েত অথবা চীনা কমিউনিস্ট কক্ষপথে পড়ে যেতে পারে অথবা বিদেশে আমেরিকান দূতাবাস বা সামরিক ব্যক্তিবর্গের ওপর আঘাত হানতে পারে– তবে আমরা যেখানে বাস করি সেখানে তারা আঘাত হানতে আসবে না। ১১ সেপ্টেম্বর দেখা যায়, বিষয়টি আর সে রকম নেই। নানা ধরনের সংযোগ বা কানেকটিভিটি বিশ্বকে যেমন ক্রমাগতভাবে এক সূত্রে বাঁধছে, তেমনি আবার সন্ত্রাসীদের করে তুলছে শক্তিশালী। যারা একতরফা ভাবনাচিন্তার মানুষ তাদের মধ্যে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক নিজেদের মতবাদের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। তারা বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে। তারা জানে, লন্ডন অথবা টোকিওতে হামলা চালালে এর প্রতিক্রিয়া নিউ ইয়র্ক বা হংকংয়েও হবে। একটি জাতি রাষ্ট্রের বিশেষ প্রদেশের অস্ত্র ও প্রযুক্তি যা তাদের একেবারেই নিজস্ব ছিল এখন তা কালোবাজারে কিনতে পাওয়া যায়। অথবা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করা যায় এগুলোর ডিজাইন। মুক্তভাবে পণ্য ও মানুষের

www.pathagar.com

সীমান্ত অতিক্রম বিশ্ব অর্থনীতির জীবন রক্তের মতো। রক্তপিপাসুরা কাজে লাগাতে পারে একে।

কোনো জাতি রাষ্ট্রের যদি একচেটিয়া গণসহিংসতা করার সুযোগ না থাকে; বস্তুতপক্ষে কোনো জাতি রাষ্ট্র আমাদের সরাসরি আক্রমণ করবে এমন সম্ভাবনাও কম। তারপরও এ রকমটি যদি হতো তাহলে সন্ত্রাসীদের একটি নির্ধারিত ঠিকানা থাকতো যাকে আমরা প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্যবস্তু করতে পারতাম। যদি এর পরিবর্তে বহুপাক্ষিক সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে বিশ্বায়নের শক্তির কাজে ব্যত্যয় ঘটায় বা তাড়িয়ে বেড়ায়, অ্যাভিয়ান ফ্লুর মতো দেশব্যাপী সংক্রমক রোগের বিস্তার ঘটায় অথবা পৃথিবীর পরিবেশে বিপর্যয় ঘটায় সে ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলকে এর সাথে সমন্বিত করব?

এসব সমাধানে শুরুতেই আমাদের প্রতিরক্ষাব্যয় এবং সামরিক বাহিনীর কাঠামোর ব্যাপারে নতুন বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর প্রতিটি দেশের আগ্রাসন বন্ধের বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির প্রতি সকল জাতি-রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের একান্ত প্রয়োজন। আমেরিকান নৌবাহিনী শুধু সাগরেই পৃথিবীব্যাপী টহল দিতে পারে। আমাদের নৌবহরগুলো জাহাজ চলাচলের জন্য সমুদ্রপথগুলোকে উন্মুক্ত রাখতে পারে। আমাদের পারমাণবিক ছাতা ইউরোপ ও জাপানকে স্নায়ুযুদ্ধের সময় অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রেখেছিল। আর সাম্প্রতিককালে অন্তত বেশির ভাগ দেশকেই দেখা গেছে তারা আর আণবিক বোমা তৈরির প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত জড়িত হতে চায় না। যত দিন পর্যন্ত রাশিয়া ও চীন তাদের বিপুল সামরিক বাহিনী ধরে রাখবে, আর তাদের বিশ্বব্যাপী ভূমিকা রাখার ইচ্ছা নেই এ বিষয়টি সহজভাবে বোঝা না যাবে এবং যত দিন পর্যন্ত ১৯৯১ সালে ইরাকের কুয়েতে হামলা চালানোর মতো অন্য সার্বভৌম দেশের ওপর আক্রমণ করতে পারে এমন দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র অবশিষ্ট থাকবে– তত দিন পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্বের শেরিফের (আইন প্রয়োগের অভিভাবক) ভূমিকায় থাকতে হবে। এ ভূমিকা পরিবর্তন হবে না অথবা হওয়া উচিত নয়।

আবার এমন সামরিক কৌশলও আমরা গ্রহণ করতে পারি না যে কৌশল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মোকাবেলার মতো সক্ষমতা অর্জনের চিন্তা রেখে করা হবে। আমেরিকান প্রতিরক্ষা বাজেট ২০০৫ সালে ৫২ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌছেছে। যা পরবর্তী ৩০টি দেশের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা বাজেটের চেয়েও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র আকার বিশ্বের দুই বৃহত্তম জনসংখ্যা ও দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ চীন ও ভারতের সম্মিলিত জিডিপি'র চেয়েও বেশি। আমাদের একটি কৌশলগত বাহিনী রাখার প্রয়োজন রয়েছে যা আমাদের উত্তর কোরিয়া ও ইরানের মতো দুর্বৃত্ত দেশের হুমকি মোকাবেলা করতে পারে। আর চীনের মতো সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামলে দিতে পারে। ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের কারণে আমাদের বাহিনীর প্রস্তুতি বজায় রাখা ও

www.pathagar.com

প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের পুনঃস্থাপনের জন্য এখন বা ভবিষ্যতেও বড় আকারের বাজেটের প্রয়োজন হতে পারে।

তবে চীনের চেয়ে এগিয়ে থাকাটাই আমাদের সামনে সবচেয়ে জটিল সামরিক চ্যালেঞ্জ নয় (আমাদের সামনে চীনের বড় চ্যালেঞ্জ সামরিক দিকের চেয়েও অর্থনৈতিক দিক থেকে আসার সম্ভাবনা বেশি), চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসীদের লালনকেন্দ্র, অনিয়ন্ত্রিত বা বৈরী এলাকা থেকেও আসবে। এর জন্য প্রয়োজন তা হলো আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর নারী-পুরুষদের জন্য আমরা যা ব্যয় করছি তার মধ্যে ভারসাম্যের। যা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার এমন পর্যায়ে রাখবে যাতে তা যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন স্থানে পুনঃ মোতায়েন রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। আর তা যেন আমাদের সৈনিকদের যথাযথভাবে সুসজ্জিত রাখতে এবং ভাষা শিখতে, পুনর্গঠন কার্যক্রম ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের প্রশিক্ষণ নিয়ে শান্তি রক্ষায় যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়। ক্রমাগতভাবে জটিল ও কঠিন মিশনগুলোর সফলতার অর্জনের জন্য প্রয়োজন এ সকল দক্ষতার।

আমাদের সামরিক বাহিনীর কাঠামোর পরিবর্তন যথেষ্ট হবে না। ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ও তাদের সহায়তাকারী বেয়াড়া রাষ্ট্র থেকে যে অসম হুমকি আসবে তা মোকাবেলার জন্য সামরিক বাহিনীর কাঠামো নয় বরং আমরা যেভাবে এটাকে ব্যবহার করতে চাই সেটাই বড় বিষয়। আমেরিকা স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছে শুধু এ জন্য নয় যে সোভিয়েতের তুলনায় আমাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। বরং আমেরিকার মূল্যবোধগুলো আন্তর্জাতিক জনমতের আদালতে অধিক গ্রহণীয় হয়েছে। এমনকি তাদের মধ্যেও তা গ্রহণীয় হয়েছে যারা কমিউনিস্ট শাসনের অধীনে ছিল। স্নায়ুযুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন এটি সত্যি তেমনি ইসলামভিত্তিক সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রেও তা সত্যি ছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু সামরিক কার্যক্রম ছিল না অধিকন্তু মুসলিম বিশ্বে এবং আমাদের মিত্র দেশে ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনমতের প্রচারণা ছিল লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম বিষয়। ওসামা বিন লাদেন উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনি গতানুগতিক যুদ্ধে আমেরিকাকে পরাজিত বা দুর্বল করতে পারবেন না। তিনি এবং তার মিত্ররা উসকানি দিয়ে ক্ষোভ ও বেদনাকে জাগিয়ে দিতে পেরেছেন। ইরাকের মতো একটি মুসলিম দেশে কদর্য ও বাজে পরামর্শের ভিত্তিতে আমেরিকার সামরিক হামলা পরিচালিত হওয়ায় এ ধরনের ক্ষোভ ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই ক্ষত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা আর জাতীয় অহমিকাকে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া অন্তর্ঘাতে রূপান্তর হয়। এর ফলে আমেরিকাকে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল দখলদারিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য করছে ইরাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর জীবনক্ষয়ের সাথে সাথে ইরাকের বেসামরিক জীবনহানিও বৃদ্ধি করছে। এ সবকিছু মুসলিম বিশ্বে আমেরিকাবিরোধী জনমতকে উসকিয়ে দিচ্ছে আর সন্ত্রাসবাদী জনবল সংগ্রহের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। একই সাথে এটি শুধু আমেরিকানদের সামনে যুদ্ধের প্রয়োজনকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়নি সে সাথে ইসলামি বিশ্বকে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার দানকেও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমরা গুহায় বসে অন্ধকারে থেকে যুদ্ধ জয়ের পরিকল্পনা তৈরি করছি। এ যাবত তা-ই করে আসছি। আর এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য সীমান্তের বাইরে যেকোনো আমেরিকান সামরিক তৎপরতার আগে নিশ্চিত করতে হবে তা যেন আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে সহায়ক হবে– এ তৎপরতা সম্ভাব্য সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করবে এবং বিশ্বব্যাপী আদর্শের যুদ্ধে জয় এনে দেবে।

বাস্তবতার নিরিখে এর অর্থ কী দাঁড়াবে? অন্য সকল সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো ধরনের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। আল-কায়েদা শিবির ধ্বংস এবং তালেবান শাসনের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে যে প্রচারাভিযান ছিল তা যুক্তিসঙ্গত হিসেবে প্রমাণ করা গিয়েছিল। এমনকি ইসলামি দেশগুলোতেও সন্ত্রাসীদের লালনকারী হিসেবে আল-কায়েদা ও তালেবানবিরোধী অভিযানের পক্ষে জনমত ছিল। এ ধরনের সামরিক হামলার ব্যাপারে আমাদের মিত্রদের সমর্থনকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। তবে আন্তর্জাতিক ঐকমত্যের জন্য আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয় নিয়ে জিম্মি হয়ে থাকা যাবে না। যদি প্রয়োজন অনিবার্য হয় সে ক্ষেত্রে একাই পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপর আমেরিকানরা তাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য যেকোনো ধরনের মূল্য বা ত্যাগ স্বীকার করবে।

আমার আরো যুক্তি হলো, আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আজ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন ক্ষেত্রে একতরফা সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের সবধরনের অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। কোনো জাতি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি কোনো আমেরিকান লক্ষ্যবস্তুতে (যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে এমন মিত্রদের ক্ষেত্রেও) আঘাত হানতে যাচ্ছে মনে হলে এবং এমন কোনো প্রমাণ যদি মেলে যে অদূরভবিষ্যতে এমন হামলা চালাবে তাহলে একতরফা সামরিক পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আল-কায়েদা এ বিবেচনায় হামলার জন্য যৌক্তিকতা অর্জন করেছিল। যেখানেই সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে আগাম প্রতিরোধ হামলা আমরা চালাতে পারি। সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বাধীন ইরাকে এ ধরনের বাস্তবতা ছিল না। এ কারণে সেখানে যে হামলা ঘটেছে তা ছিল বড় ধরনের কৌশলগত ভুল। যদি এ ধরনের একতরফা পদক্ষেপ নিতেই হয় তা হলে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল।

আমরা আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো অনেক কিছু পেতে পারি, এর পরও আমি মনে করি– বিশ্বের যেকোনো স্থানে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হলে একপক্ষীয়ভাবে এগোনোর পরিবর্তে বহুপক্ষীয়ভাবে অগ্রসর হলে, আমাদের সব সময় কৌশলগত স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে। এর মানে আমি এটি বুঝাতে চাই না যে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আমাদের সব কাজে ভেটো দেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। জাতিসঙ্ঘের কাঠামো ও বিধানে যে ভেটো দানের ক্ষমতা রয়েছে তার প্রয়োগের কারণে স্নায়ুযুদ্ধের সময় অনেক কিছুই হিমাগারে চলে যেত। এর মাধ্যমে আমি এটাও বুঝাতে চাই না যে, যুক্তরাজ্য থেকে টোগো পর্যন্ত ঘুরে এসে আমার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করবো।

www.pathagar.com

জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ উপসাগীয় যুদ্ধে যেভাবে একটি টিম নিয়ে কাজ করেছিলেন বহুপক্ষীয়ভাবে কাজ করার জন্য, সেই পদ্ধতিকে বুঝাতে চাচ্ছি। সে সময় আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে অধিকাংশ বিশ্বের সমর্থনলাভের জন্য ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এর সাথে নিশ্চিত করা যায় যথা সম্ভব আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন রক্ষা করার।

কেন আমাদেরকে এভাবে কাজ করতে হবে। এর কারণ এই যে, আন্তর্জাতিক আইনের রাস্তা অনুসরণ হলে সবচেয়ে বেশি লাভবান আমরাই হবো। আমরা যদি এসব আন্তর্জাতিক আইনকে শুধু অন্যদের জন্যই অনুসরণযোগ্য আমাদের জন্য নয়– এমনটা প্রতিপন্ন করি তাহলে আমাদের জয় আসবে না। যখন বিশ্বের একক পরাশক্তি তার ক্ষমতা ও আনুগত্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত আইনের কাছে সমর্পণ করে তখন এর মাধ্যমে এই বার্তাই যায় যে, এসব আইন অনুসরণের জন্যই করা হয়েছে। আর সন্ত্রাসবাদী ও একনায়করা এসব আইন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার বলে যে যুক্তি তুলে ধরে তার যৌক্তিকতাও আর থাকবে না।

সামরিক পদক্ষেপের যখন প্রয়োজন পড়বে তখন বিশ্বজনমত নিজের পক্ষে নেয়ার জন্য কিছুটা চাপ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পড়বে। আর এতে সাফল্যের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাবে। আমাদের বেশির ভাগ মিত্রের তুলনামূলকভাবে মাঝারি প্রতিরক্ষা বাজেট রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সামরিক বোঝার অংশবিশেষ বহন করতে হতে পারে তাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনে। তবে বলকান (বসনিয়া-সার্বিয়া) ও আফগানিস্তানে আমাদের ন্যাটো অংশীদাররা ঝুঁকি ও খরচের অংশও বহন করেছে। অধিকন্তু সজ্ঘাতের ধরনের যৌক্তিকতার কারণে আমাদের মিত্রদের বেশির ভাগই তাতে অংশ নিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক সামরিক অভিযান অপেক্ষাকৃত কম জটিল ও কম ব্যয়বহুল ছিল। এরপর স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল করা, একটি কার্যকর বিচারব্যবস্থার পত্তন, স্বাধীন গণমাধ্যমের সৃষ্টি, একটি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা তৈরি ও নির্বাচনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরবর্তী পর্যায়ের কাজগুলো অধিক জটিল ও ব্যয়বহুল ছিল। মিত্র দেশগুলো এসব জটিল কাজে তাদের দক্ষতা ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে পারে। তারা তা বলকান অঞ্চলে এবং আফগানিস্তানে করেছে। তবে এ কাজে আন্তর্জাতিক সমর্থন না থাকলে তাদের সহায়তা কম পাওয়া যেত। সামরিক ক্ষেত্রে আইনানুগ বৈধতা ও বিশ্বমত পেলে সামরিক শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।

সস্তার তেল কি যুদ্ধের রক্ত ও সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান? বিশেষ একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণগত বিরোধে আমাদের সামরিক হস্তক্ষেপ কি একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান নিয়ে আসবে অথবা এটি কি আমেরিকান সেনাবাহিনীর অনির্দিষ্ট অঙ্গীকার হতে পারে? একটি দেশের সাথে আমাদের বিরোধ নিরসন কি কূটনৈতিকভাবে অব্যাহত সমন্বিত অবরোধের মাধ্যমে হতে পারে? আমরা যদি বৃহত্তর আদর্শের লড়াইয়ে জয়ী হতে চাই, বিশ্বজনমতকে অবশ্যই হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। আর ইউরোপীয় মিত্রদের পক্ষ থেকে যখন আমেরিকাবিরোধী মনোভাব উচ্চারিত হয় তখন তা হতাশাজনক মনে হতেই পারে। এই ইউরোপীয় মিত্ররা আমাদের নিরাপত্তা বলয়ে থাকে অথচ

www.pathagar.com

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিভ্রান্তিকর, বিক্ষিপ্তচিত্ত অথবা অকার্যকর বক্তব্য শোনা যায় তাদের পক্ষ থেকে। তারপরও তাদের শব্দমালা বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে এবং আমাদের অধিকতর কৌশলী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

চূড়ান্তভাবে আমাদের মিত্রদের সন্ত্রাসীদের ক্ষমতা খর্ব ও ধ্বংস করার কাজে যুক্ত করে আমরা তাদেরকে জটিল, পদ্ধতিগত, প্রধান ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক কাজের যৌথ মালিকানা দিতে পারি। এসব কাজের মধ্যে সন্ত্রাসীদের আর্থিক নেটওয়ার্ক বন্ধ করা এবং সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের সন্ধানে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় আর সন্ত্রাসীদের সেলে অনুপ্রবেশ ঘটানো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বিভিন্ন আমেরিকান এজেন্সির গোয়েন্দা তথ্যের কার্যকর সমন্বয় করতে আমাদের অব্যাহত ব্যর্থতার পাশাপাশি রয়েছে কার্যকর মানব গোয়েন্দা সক্ষমতার বড় রকমের ঘাটতি– যা একেবারে ক্ষমার অযোগ্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সন্ত্রাসীদের হাতে যাতে কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্র না পৌঁছতে পারে তার জন্য যৌথ বাহিনীর প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশকে সহযোগিতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ইন্ডিয়ানার সিনেটর ডিক লুগার ও জর্জিয়ার সাবেক ডেমোক্র্যাট সিনেটর স্যাম নান। তারা দু'জনই উপলব্ধি করেন যে, সঙ্কট আঘাত হানার আগেই আমাদের কোয়ালিশনকে চাঙ্গা করতে হবে। আর তারা তাদের এই উপলব্ধিকে পারমাণবিক বিস্তৃতির সঙ্কট রোধে কাজে লাগিয়েছিলেন। নান-লুগার কর্মসূচির বিষয়টি ছিল খুবই স্পষ্ট। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকার সামনে সবচেয়ে বড় হুমকি গর্ভাচেভ বা ইলেৎসিনের আঘাত হানার আদেশ থেকে আসবে না। তা আসবে পারমাণবিক উপকরণ বা প্রযুক্তি-সন্ত্রাসী আর দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের কাছে সম্ভাব্য হস্তান্তর থেকে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, সামরিক বাহিনীর মধ্যে দুর্নীতি, রুশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনৈতিকতার বিস্তার এবং নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে এটি ঘটতে পারে। নান-লুগারের কর্মসূচির অধীনে আমেরিকা এসব ব্যবস্থা সংহত করার জন্য সহায়তা দেয়। যারা স্নায়ুযুদ্ধের চিন্তায় অভ্যস্ত ছিলেন, এ কর্মসূচির বিষয়ে তাদের নতুন করে ভাবতে ও মনোযোগ দিতে হয়। পরে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা সেখানে যে বিনিয়োগ করেছিলাম তা ছিল বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৫ সালের আগস্টে সিনেটর লুগারের সাথে আমি তাদের যৌথ কর্মসূচির কার্যক্রম দেখতে যাই। রাশিয়া ও ইউক্রেনে এটি হলো আমার প্রথম সফর। ৭৩ বছর বয়সী শক্তসমর্থ আপাদমস্তক ভদ্রলোক ডিকের চেয়ে ভালো গাইড আমি পাইনি। বিদেশী কর্মকর্তাদের সাথে আমাদের বৈঠকের সময় তার নির্বিকার ভদ্রতা ও রহস্যঘন হাসি চমৎকার এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। রাশিয়ার সারাটভে আমরা দু'জন একসাথে পারমাণবিক প্রকল্প পরিদর্শন করি। সেখানে রাশিয়ান জেনারেলরা সদ্য সমাপ্ত প্রকল্পের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তাব্যবস্থার বিষয়টি গর্বের সাথে বর্ণনা দেন। এরপর তারা আমাদের জন্য বিটস্যুপ, ভদকা, আলুসিদ্ধ ও জেলফিশের মোন্ড দিয়ে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করেন। পার্মে এসএস-২৪ ও এসএস-২৫ কৌশলগত ক্ষেপণাস্ত্র খোলা যন্ত্রাংশ আকারে রক্ষিত দেখতে পাই। আমরা ৮০ ফুট খালি ক্ষেপণাস্ত্র আচ্ছাদনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাই আর সেখানকার গুমশাম নীরবতা লক্ষ করি। চকচকে এখনো সক্রিয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিরাপদ ওয়্যারহাউজে রাখা হয়েছে। একসময় এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোকে প্রয়োজনে আঘাত হানার মতো করে ইউরোপের বিভিন্ন শহরের দিকে তাক করে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিয়েভের এক শান্ত-সৌম্য আবাসিক এলাকায় আমাদের স্বাগত জানানো হয় ইউক্রেন সফরের শুরুতে। রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের ইউক্রেন অফিস ছিল সেটি। অনেকটা হাইস্কুলের মতো দেখতে মাঝারি আকারের তিনতলা ভবন। আমাদের সফরের সময় দেখি ভবনটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অকেজো হয়ে যাওয়ায় জানালাগুলো খুলে রাখা হয়েছে। আমাদের একটি ফ্রিজার দেখানো হলো যেটিতে একটি তারের সিল ছাড়া তেমন কিছু ছিল বলে মনে হলো না। ল্যাব কোট ও মাস্ক পরা এক মধ্যবয়সী রমণী ফ্রিজ থেকে কয়েকটি টেস্টটিউব বের করে আনেন। আমাদের সামনে টিউব ঝাঁকিয়ে ইউক্রেনীয় ভাষায় কী যেন বললেন তিনি। দোভাষী ব্যাখ্যা করে জানালেন 'এটি হলো অ্যানথ্রাক্স'। মহিলাটি ডান হাতে শিশিটি ধরে আছেন। তিনি আরো জানান, বাম হাতে যেটি ধরে আছেন 'সেটি হলো প্লেগ'।

আমি পেছনে তাকাই, দেখি লুগার রুমের একেবারে পেছনেই দাঁড়ানো। কয়েক কদম পেছনে গিয়ে বলি– 'ডিক, আপনি কি আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে দেখতে চান?'

তিনি হেসে বললেন 'না থাকুক, তাদের যা করার করতে দিন।'

সফরকালে আমরা পুরনো স্নায়ুযুদ্ধের দিনগুলোর কথা স্মরণ করি। উদাহরণস্বরূপ– পার্ম বিমানবন্দরে একজন সীমান্ত কর্মকর্তা আমাদের তিন ঘণ্টার জন্য হয়তো আটক করে রাখলেন। কারণ বলা হলো আমরা তাকে আমাদের বিমান অনুসন্ধান করতে দেয়নি জানাইনি। এরপর আমাদের সাথের স্টাফকে আমেরিকান দূতাবাসে এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করতে হলো। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তে এখন আমরা সব দেখতে পাচ্ছি, সব শুনছি। রেড স্কয়ারের মলের ক্যালভিন ক্লেইন স্টোর অথবা মাজেরাটির শো রুম সবই দেখতে এখন কোনো বাধা নেই। রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে এসইউবি'র মোটর গাড়ি দুর্বল ফিটিংয়ের স্যুট পরা এক স্থূলকায় ব্যক্তি চালিয়ে নিয়ে গেলেন, হয়তো এক সময় ক্রেমলিনের কর্মকর্তার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াতেন। এখন এ ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকতে পারে একজন বিলিয়নিয়ার ক্ষমতাধর রুশের। টিশার্ট এবং লো-রাইডিং জিনসের জন্য বিষণ্ন তরুণীদের ভিড়। সিগারেট ও আইপডে গান শুনছে একে অপরকে ভাগাভাগি করে। এর পাশাপাশি কিয়েভের বৃক্ষরাজির দৃশ্য বিস্ময়কর। পূর্ব ও পশ্চিমের রাজনৈতিক সমন্বয় না হলে আপাতদৃষ্টিতে এখানকার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে উল্টোমুখী ফেরানো হয়তো সম্ভব হবে না।

আমার ধারণা, কেন লুগার ও আমি বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় উষ্ণভাবে সংবর্ধিত হয়েছি তার একটি কারণ ছিল। আমাদের উপস্থিতির সাথে নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষণ ও মনিটরিংয়ের মতো কাজের জন্য আমেরিকান অর্থপ্রাপ্তির অঙ্গীকারের

www.pathagar.com

বিষয়টিই শুধু সংশ্লিষ্ট ছিল না। একই সাথে এসব স্থাপনায় যারা কাজ করেন সেসব ব্যক্তির জন্যও ছিল তা গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করেছেন, সম্মান অর্জন করেছেন এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। এখন তারা নিজেদেরকে অতীতের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট হিসেবে দেখছেন। তাদের প্রতিষ্ঠান জাতির কাছে এখন নামকাওয়াস্তে প্রয়োজনীয়। এখানকার মানুষগুলো তাদের দৃষ্টি এখন দ্রুত ডলার কামানোর প্রতিই নিবদ্ধ করেছে।

ডোনেটস্কে যেয়েও আমার একই অনুভূতি হয়। ইউক্রেনের এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শিল্পনগরীতে একটি স্থাপনা পরিদর্শনে আমাদের সফরের আয়োজন করা হয়। প্রচলিত অস্ত্র নষ্ট করার স্থাপনা এটি। এখানকার রাস্তাঘাট ইত্যাদি অবকাঠামো একেবারেই ভাল নয়। শহরের সংযোগ রাস্তাগুলো সঙ্কীর্ণ। মাঝে মাঝে এসব রাস্তায় ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে। আমরা যে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এসেছি তার পরিচালক একজন নাদুসনুদুস উৎফুল্ল মানুষ। তাকে দেখে শিকাগোর একজন ওয়ার্ড সুপারের কথা স্মরণ হয়। তিনি আমাদের কয়েকটি অন্ধকার ওয়্যারহাউজ ধরনের ভাঙাচোরা কাঠামোতে নিয়ে যান। যেখানে শ্রমিক-কর্মচারীরা বিভিন্ন রকমারী ভূমি মাইনের দ্রুত ধ্বংসের কাজ করছে। মাইনের খালি খোলস এক স্থানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এই স্তূপ আমার কাঁধ পর্যন্ত উঁচু হয়েছে। পরিচালক ব্যাখ্যা করে বলেন, তাদের এ কাজের জন্য আমেরিকার আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। স্নায়ুযুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট করার মতো অর্থ ইউক্রেনের হাতে এখন নেই। এখন যে গতিতে ধ্বংস করছেন– এ গতিতে চললে ৬০ বছর সময় লাগবে অস্ত্র ধ্বংসের এ কাজ শেষ করতে। এর মধ্যেই এসব অস্ত্রশস্ত্র সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তালাবন্ধ ছাড়াই অনেক উপকরণ রাখা হয়েছে। যেগুলো শুধু সাধারণ গোলাবারুদই নয়, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক এবং কাঁধ থেকে আকাশে নিক্ষেপণের ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে তাতে। এগুলো ধ্বংস করা না গেলে তা হয়তো একদিন সোমালিয়ার যুদ্ধবাজ অথবা শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগার অথবা ইরাকের অন্তর্ঘাতীদের হাতে পৌঁছাবে।

তার বক্তব্যের মধ্যেই আমাদের দল আরেকটি ভবনে প্রবেশ করে। সেখানে মেয়েরা সার্জিক্যাল মাস্ক পরে একটি টেবিলে দাঁড়িয়ে সামরিক গ্রেডের বিস্ফোরক 'হেক্সোজেন' বিভিন্ন সামরিক গোলাবারুদ থেকে সরিয়ে একটি ব্যাগের মধ্যে রাখছেন। অন্য একটি রুমে আমি হঠাৎ দেখি গেঞ্জি পরা দু'জন লোক একটি পুরনো বয়লারের শন শন শব্দের মধ্যে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। তাদের সিগারেটের ছাই ফেলছেন কমলা রঙের পানির এক নালায়। এ সময় আমাদের দলের একজন আমাকে ডেকে দেয়ালে লাগানো একটি হলুদ রঙের পোস্টার দেখান। এটি আফগান যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বলে আমাদের জানানো হয়। যেখানে কিভাবে খেলনার মধ্যে বিস্ফোরক ভরে গ্রামে রাখা হয় এবং সন্দেহ করা যায় না এমন শিশুদের দিয়ে তা বহন করা হয় তার উল্লেখ রয়েছে।

আমি ভাবি, একজন মানুষের পাগলামির শেষ ইচ্ছাপত্র এটি।

একটি সাম্রাজ্য নিজেকে কিভাবে ধ্বংস করে এটি তারও একটি দলিল।

www.pathagar.com

আমেরিকান পররাষ্ট্র নীতির একটি চূড়ান্ত দিক নিয়ে এখানে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এটি হলো যুদ্ধ পরিহার করে শান্তিকে উৎসাহিত করার নীতি। আমি যে বছর জন্মগ্রহণ করি, সে বছর প্রেসিডেন্ট কেনেডি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'সেই সব মানুষ যারা পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়ে গ্রাম ও পর্ণকুটিরে রুটির জন্য সংগ্রাম করে কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তাদের সর্বোচ্চভাবে সাহায্য করার অঙ্গীকার রয়েছে আমাদের । এটি এ কারণে নয় যে, কমিউনিস্টরা তা করছে অথবা আমরা তাদের সমর্থন চাই বলেও তা নয়। কারণ এটি তাদের অধিকার। যত সময় লাগুক না কেন তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করব। যদি একটি মুক্তসমাজ দরিদ্রদের সাহায্য করতে না পারে তাহলে অল্পসংখ্যক ধনী লোকের নিরাপত্তাও সে সমাজ দিতে পারবে না।' ৪৫ বছর পর এখনো সেই জনগণের সেই দুর্দশা রয়েই গেছে। আমরা যদি কেনেডির প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করতে পারি এবং আমাদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষা করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের সামরিক শক্তির সর্বোত্তম পরিণামদর্শী ব্যবহার করতে পারব। আমাদের নীতিগুলোকে এক লাইনে এনে সমগ্র বিশ্বের নিরাপত্তাহীনতা দারিদ্র্য ও সহিংসতাকে জয় করতে পারব। আর অধিকসংখ্যক মানুষকে যদি বিশ্বব্যবস্থার একই সীমায় নিয়ে আসতে পারি তবে তা আমাদের জন্য অনেক বেশি কল্যাণকর হবে।

অবশ্য কেউ কেউ আমার এই বক্তব্য নিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন কোন বিশ্ব ব্যবস্থায়, আমেরিকার অবস্থান দরিদ্র দেশগুলোর দুর্দশা দূর করতে পারবে? এ সমালোচনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কেমন হবে এ বিষয়ে আমেরিকান ভাবনার কথা বলতে চাই। মুক্তবাণিজ্য, খোলাবাজার, তথ্যের অবাধ প্রবাহ, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক নির্বাচন এবং এ ধরনের সহজ বিষয়াবলিকে বলা হয়। সস্তা শ্রমকে শোষণ করা এবং অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট আর অ-পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ক্ষিহ্ণু বিশ্বাসের মাধ্যমে কলুষিত করার জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। আরো যুক্তি দেখানো হয় যে, অন্য দেশগুলোর উচিত হবে আমেরিকান আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাকে প্রতিহত করা। এর পরিবর্তে তারা নিজেদের উন্নয়নের পথ অনুসরণ করতে পারেন। ভেনিজুয়েলার হুগো শ্যাভেজের মতো বাম ধারার নেতৃত্বকে অনুসরণ করতে পারেন অথবা ইসলামিক আইনের মতো অধিক ঐতিহ্যগত সমাজ সংগঠনের নীতিমালার দিকে ফিরে যেতে পারেন।

আমি তাদের সমালোচনাকে এড়িয়ে যেতে পারি না। আমেরিকা ও তার পশ্চিমা অংশীদাররাই আসলে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নকশা তৈরি করেছেন। এটি আমাদের কর্মপ্রণালী, আমাদেরই হিসাব মান, আমাদের ভাষা, আমাদের ডলার, আমাদের মেধাস্বত্ব আইন, আমাদের প্রযুক্তি এবং আমাদের লোকসংস্কৃতি তৈরি করেছে– যা পৃথিবী গত ৫০ বছরে গ্রহণ করেছে। যদি সার্বিকভাবে এই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত দেশের জন্য ব্যাপক সমৃদ্ধি এনে থাকে তবে একই সাথে এ ব্যবস্থা যে বহু মানুষকে পেছনেও ফেলে দিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তব অবস্থা হলো, পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা কোনো কোনো সময় এমন ব্যবস্থা করেছেন

www.pathagar.com

যাতে অনেক মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। তারা মাঝে মাঝে অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছেন।

যদিও চূড়ান্তভাবে আমি বিশ্বাস করি যে সমালোচকরা এ চিন্তা করে ভুল করছে যে, মুক্তবাজার ও উদার গণতন্ত্রের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে বিশ্বের গরিব মানুষেরা লাভবান হবেন। যখন বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কর্মীরা আমার অফিসে আসেন এবং তাদের বিশ্বাসের জন্য বন্দী বা নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা বলেন, তখন তারা আমেরিকান ক্ষমতার এজেন্ট হিসেবে কথা বলেন না। কেনিয়ায় আমার চাচাতো ভাই যখন অভিযোগ করেন, ক্ষমতাসীন দলের কিছু কর্মকর্তাকে ঘুষ না দিয়ে কাজ পাওয়া অসম্ভব বিষয় তখন তার মগজ নিশ্চয়ই পশ্চিমা চিন্তা দিয়ে ওয়াশ করা ছিল না। উত্তর কোরিয়ার জনগণকে যদি বসবাসের জন্য পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় তবে দেশটির বেশির ভাগ মানুষ দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকতে চাইবেন অথবা কিউবার লোকদের সুযোগ দেয়া হলে তারা মিয়ামিতে থাকা যায় কি না একবার চেষ্টা করে দেখবেন না।

যেকোনো সংস্কৃতির ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় থাকতে চায়। কোনো ব্যক্তি ভয়ভীতি বা আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে চান না কারণ তারা স্বাধীন ভাবনাচিন্তা করতে চান। তবে কোনো ব্যক্তি দরিদ্র বা ক্ষুধার্তও থাকতে চান না। কোনো ব্যক্তি এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় থাকতে চান না যেখানে নিজের শ্রমের মূল্য পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ উন্নত দেশে মুক্তবাজার ও উদার গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হয়তো নিখুঁত নয়। হতে পারে সেখানে ক্ষমতাহীনদের ওপর ক্ষমতাশালীদের স্বার্থ অধিক প্রাধান্য পায়। তবে এ ব্যবস্থায় অব্যাহত পরিবর্তন ও উন্নয়ন করার সুযোগ রয়েছে এবং পরিবর্তনের এই উন্মুক্ত সুযোগের কারণে মুক্তবাজারভিত্তিক উদার গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী উন্নত জীবনযাপনের সর্বোচ্চ সুযোগ এনে দিয়েছে।

এরপর আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো আমেরিকান নীতিগুলোকে এমন করা যাতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সুসমতা, ন্যায়বিচার ও সমৃদ্ধিকে বৃহত্তর পরিসরে নিশ্চিত করতে পারে। এটি করতে হবে আমেরিকানদের নিজেদের স্বার্থেই আর একই সাথে সংগ্রামী বিশ্বের জনগণের স্বার্থে। এটি করার জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। যারা বিশ্বাস করে যে আমরা এককভাবে দুঃখদুর্দশা থেকে জনগণকে মুক্ত করে দিতে পারব সে ধারণা দূর করতে হবে আমাদের। আমি জর্জ ডব্লিউ বুশ যে দাবিটি তার দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণে করেছিলেন, সেটির ব্যাপারে একমত। তিনি বলেছিলেন, মুক্ত থাকার ইচ্ছাটি হলো মানুষের চিরন্তন। তবে ইতিহাসে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তও রয়েছে যেখানে মুক্ত নারী-পুরুষ বাইরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। বিগত শতাব্দীর সব ক'টি সফল সামাজিক আন্দোলন সেটি ব্রিটিশবিরোধী গান্ধীর প্রচারাভিযান হোক অথবা পোল্যান্ডের সলিডারিটি আন্দোলন হোক অথবা হোক দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন– সব ক্ষেত্রে জাগরণের চূড়ান্ত ফল হিসেবে গণতন্ত্র এসেছে।

আমরা অন্য মানুষকে স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত ও আমন্ত্রণ জানাতে পারি। অন্যদের অনুসরণ করার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক ফোরাম ও চুক্তি তৈরি করতে পারি। আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে অবাধ

www.pathagar.com

নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং গণঅংশগ্রহণের বীজ বপনে আর্থিক সহায়তা দান করতে পারি। আমরা স্থানীয় নেতাদের পক্ষে কথা বলতে পারি যাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমরা সেসব দেশের ওপর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে পারি যারা নিজ দেশের জনগণের অধিকারকে বারবার হরণ করে।

কিন্তু যদি বন্দুকের নল দিয়ে গণতন্ত্র চাপিয়ে দিতে চাই, আর সেই দেশগুলোকে অর্থের জোগান দিই যাদের অর্থনৈতিক নীতি ওয়াশিংটনের বন্ধুভাবাপন্ন, আর ছালাবির মতো নির্বাসিত নেতাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিই– স্থানীয় জনগণের মধ্যে যাদের কোনো ধরনের গ্রহণযোগ্য নেই– তাহলে এসব পদক্ষেপ আমাদেরকে ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার দিকেই নিয়ে যাবে। আমরা বিদেশী ক্ষমতাকে গণতন্ত্রের জন্য সক্রিয় কর্মীদের ওপর নির্যাতনকারী শাসকদের সহায়তায় লাগালে মাটি থেকে উত্থিত প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভাবনাকে দমন করা হবে।

এখান থেকে একটি অনুসিদ্ধান্তে আসা যায় যে, স্বাধীনতা মানে নির্বাচনের চেয়েও অধিক কিছু। ১৯৪১ সালে ফেডরিক ডিয়ালো রুজভেল্ট (এফডিআর) বলেছিলেন, তিনি এমন এক বিশ্ব গড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন যেটি চারটি আবশ্যিক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকবে। এগুলো হলো– কথা বলার স্বাধীনতা, ধর্মীয় প্রার্থনার স্বাধীনতা, দারিদ্র্য থেকে স্বাধীনতা আর ভয়ভীতি থেকে স্বাধীনতা। আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলে, দারিদ্র্য থেকে স্বাধীনতা আর ভয়ভীতি থেকে স্বাধীনতা– এ শেষ দু'টি অন্যগুলোর পূর্বশর্ত। এখন বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেক তথা ৩০০ কোটির মতো মানুষ প্রতি দিন দুই ডলারের চেয়ে কম আয় করে। নির্বাচন সর্বোচ্চ একটি মাধ্যম হতে পারে কিন্তু তা চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে না। এটি হতে পারে একটি সূচনাবিন্দু, ফলাফল নয়। কম আয়ের এসব মানুষ নির্বাচন ও ভোটের অধিকারের চেয়ে তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি আগে চায়। যাতে তারা খাদ্য, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশুদের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্তির মাধ্যমে একটি স্বস্তিকর জীবনযাপন করতে পারেন। এটি তাদের দুর্নীতি, সহিংসতা ও একচ্ছত্রমুক্ত একটি পরিবেশে সুস্থির জীবনযাপনের সুযোগ এনে দেবে। আমরা কারাকাস, নাইরোবি, জাকার্তা অথবা তেহরানের মানুষের হৃদয়মন যদি জয় করতে না পারি তবে তাদের জন্য মুক্ত নির্বাচনের ব্যালট বাক্সের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট হবে না। আমাদের এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, জনগণের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে সহায়তা করা হবে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের ভূমিকা আয়নায় দেখার প্রয়োজন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য উন্নত অর্থনীতির দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি অব্যাহতভাবে দাবি জানাচ্ছে তারা যেন বাণিজ্যের বাধাগুলো দূর করে। এসব দেশ হয়তোবা নানা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা থেকে নিজস্ব বাজারকে আড়াল করে রেখেছে। অথচ আমরা উন্নত বিশ্বও আমাদের নিজস্ব বাজারকে দরিদ্র দেশগুলোর পণ্যের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করিনি। দরিদ্র দেশগুলোর পণ্য রফতানিতে বাধা

www.pathagar.com

ধীরগতিতে তুলে নিচ্ছি। অথচ দরিদ্র দেশগুলো অবাধে পণ্য রফতানি করতে পারলে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সহায়ক হতো। আমাদের উৎসাহ আমেরিকান ওষুধ কোম্পানিগুলোর মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে। অথচ ব্রাজিলের মতো দেশকে জেনেরিক এইডসের ওষুধ উৎপাদনে আমরা নিরুৎসাহিত করছি, যা লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে পারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। এ সংস্থা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোর আর্থিক সঙ্কটের সময় বেদনাদায়ক কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বারবার বাধ্য করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে দ্রুত সুদের হার বৃদ্ধি, সরকারের সামাজিক কর্মসূচিতে ব্যয় হ্রাস, প্রধান প্রধান শিল্পে ভর্তুকি প্রত্যাহার প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজাতীয় 'চিকিৎসা' আমাদের আমেরিকানদের জন্যও জটিল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় আরেকটি ঋণদাতা সংস্থা হলো বিশ্বব্যাংক। বড় অঙ্কের ঋণদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের সুনাম থাকলেও সহায়তাপ্রাপ্ত এসব প্রকল্প হয় ব্যয়বহুল এবং প্রকল্পগুলোর সুবিধা চলে যায় উচ্চবেতনধারী পরামর্শক ও ঊর্ধ্বতন মহলে যোগাযোগ থাকা স্থানীয় অভিজাত লোকদের কাছে। এসব প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ নাগরিকরা খুব কমই পেয়ে থাকে। অথচ ঋণ যখন পরিশোধের সময় আসে তখন এসব সাধারণ মানুষকেই এর ভার বহন করতে হয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ওয়াশিংটনের বিকাশমান শিল্পগুলোর প্রতিরক্ষণের জন্য কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্র ও আগ্রাসী শিল্পনীতিকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক সব দেশের উন্নয়নের জন্য একই ফর্মুলা দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। কোনো একক ফর্মুলা যে সব দেশের জন্য কাজ করবে না, বিষয়টি তাদের উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

দরিদ্র দেশগুলোকে যখন উন্নয়ন সহায়তা দেয়া হয় তখন তাদের কল্যাণ করার ইচ্ছার মধ্যে ভুল কিছু আছে তা হয়তো নয়। অনেক দরিদ্র দেশ সে কেলে, এমনকি সামন্ততান্ত্রিক সম্পদ ও ব্যাংকিং আইনের দ্বারা বিপর্যস্ত। আগে বহু বিদেশী সাহায্য কর্মসূচি শুধু স্থানীয় অভিজাতদের পকেটে চলে যেত। এ অর্থ তাদের সুইস ব্যাংকের হিসাবে জমা হতো। দীর্ঘ মেয়াদের আন্তর্জাতিক সাহায্যনীতির ক্ষেত্রে এ সাহায্য কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর জন্য আইনের শাসন ও স্বচ্ছতার নীতিমালার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তা এক সময় অবজ্ঞা করা হতো। পরে এক সময় আসে যখন আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বাসযোগ্যতা ও চুক্তির বাস্তবায়নযোগ্যতা। কেউ একজন আশা করতে পারেন যে, বিশ্ববাণিজ্য আইনি সংস্কারের পর ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। তবে ভারত, নাইজেরিয়া ও চীনের মতো দেশ বাস্তবিকপক্ষে দুই ধরনের আইনি কাঠামো তৈরি করেছে। এর একটি হলো বিদেশী ও এলিট শ্রেণীর জন্য এবং অপরটি সাধারণ মানুষের জন্য– যারা সামনে এগোতে চাচ্ছেন।

সোমালিয়া, সিয়েরালিয়ন অথবা কঙ্গোর মতো দেশে তেমন কোনো কার্যকর আইনি

www.pathagar.com

কাঠামো নেই। এক সময় ছিল যখন আফ্রিকার দুর্দশা হিসেবে গণ্য করা হতো লাখ লাখ মানুষের এইডসে আক্রান্ত হওয়া, অব্যাহত খরা-দুর্ভিক্ষ, একনায়কত্ব, ব্যাপক দুর্নীতি, ২০ বছর বয়সের গেরিলার নৃশংসতা যে হয়তো একে-৪৭ রাইফেল চালানো ছাড়া আর কিছুই জানে না। আমি নিজে দেখেছি, এদের হতাশায় ডুবে থাকতে। মাত্র তিন ডলারের একটি মশারি তাদের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে পারে। আর তিন বা চার ডলারের এইচআইভি পরীক্ষা নতুন এইডসে আক্রান্ত হওয়ার হারকে অনেক কমাতে পারে। শুধু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে রুয়ান্ডার গণহত্যা বন্ধ করা সম্ভব। জনগণকে রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েন করার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা নেয়া যায়। আর মোজাম্বিকের মতো এক সময়ে নেয়া কঠিন পদক্ষেপ সংস্কারের ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগতি নিয়ে আসতে পারে।

ফ্রেডরিক রুজভেল্ট যথার্থই বলেছিলেন, 'জাতি হিসেবে আমরা গর্ব করতে পারি যে আমরা মূলত নরম হৃদয়ের মানুষ। তবে নরম মাথার মানুষ হলে আমাদের চলবে না।' আফ্রিকা যদি নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে না চায় তাহলে আমরা আফ্রিকাকে সাহায্য করতে পারব সেটি আশা করা উচিত হবে না। তবে আফ্রিকার বেশ ইতিবাচক খবরও রয়েছে যা হতাশার বিষয়কে ভুলিয়ে দেবে। গণতন্ত্র সেখানে বিস্তৃত হচ্ছে। অনেক স্থানে অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে। আমাদের এই ক্ষীণ আশার আলোকে উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত করতে হবে এবং আফ্রিকার প্রতিশ্রুতিবান নেতা ও নাগরিকদের তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে– যাতে কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা তারা পূরণ করতে পারেন।

অধিকন্তু আমরা একটি বিষয় চিন্তা করলে নিজেদের বোকা মনে করব। একজন বিশ্লেষক বিষয়টিকে এভাবে বলেছিলেন, আমাদের অন্যের প্রশান্তির মৃত্যু দেখে শিক্ষা নেয়া উচিত। আর ফলাফল নিয়ে বেশি আশা করা উচিত নয়। বিশৃঙ্খলা অধিকতর বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। আমাদের মূর্খতা অন্যদের মধ্যে এ প্রবণতার বিস্তার ঘটায়। আর যদি নৈতিক দাবি আমাদের সংযতভাবে এগিয়ে যেতে পর্যাপ্ত না হয় তাহলে এর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু টেকনিক্যাল কারণ থাকতে পারে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ব্যর্থ রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে নির্বিকার থেকে যেসব দেশ তাদের সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, মহামারী প্রতিরোধ করতে পারে না আর গৃহযুদ্ধ ও নৃশংসতার ইতি ঘটাতে পারে না– তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না । এটি এমন এক পর্যায়ের আইনশৃঙ্খলাহীনতা যা তালেবানরা আফগানিস্তানে নিয়ে এসেছিল। সুদান হলো এমন এক স্থান যেখানে এখন ধীরে নীরবে গণহত্যার ঘটনা ঘটছে। ওসামা বিন লাদেন সেখানে কয়েক বছরের জন্য তার ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কিছু ঘিঞ্জি বস্তির দুঃখদুর্দশা রয়েছে যা ঘাতক ভাইরাসের মতো বিস্তৃত হতে পারে।

আফ্রিকা বা অন্য যেকোনো স্থানে আমরা অবশ্যই একা এ ধরনের ভয়াবহ অবস্থার মোকাবেলা করতে পারব না। এ জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে অধিক অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হবে যাতে তারা আমাদের জন্য এ

www.pathagar.com

কাজ করে। এটি না করে আমরা এর উল্টোটি করছি। বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলরা জাতিসঙ্ঘে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মতো সঙ্কট তৈরি করে রেখেছে। ইসরাইলকে নিন্দা ও একঘরে করার প্রস্তাবের ব্যাপারে হিপোক্রেসির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনে জিম্বাবুয়ে ও লিবিয়ার মতো দেশগুলোকে নির্বাচন করা এবং অতি সম্প্রতি খাদ্যের জন্য তেল কর্মসূচি নিয়ে দুর্নীতির বিষয়গুলোও উল্লেখযোগ্য এ ক্ষেত্রে।

জাতিসঙ্ঘের সব সমালোচনা যথার্থ নয়। ইউনিসেফের মতো জাতিসঙ্ঘের অঙ্গগুলো ভালো কাজ করছে। আর কিছু অঙ্গসংস্থা রয়েছে যেগুলো সম্মেলন অনুষ্ঠান, রিপোর্ট বানানো আর মর্যাদা আছে দায়িত্ব নেই এমন তৃতীয় ধাপের আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভেন্ট তৈরি ছাড়া কোনো কাজই করছে না। তবে এসব ব্যর্থতা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে আমাদের সংশ্লিষ্টতা কমানোর কোনো যুক্তি হতে পারে না। আর এটি আমেরিকার একতরফা পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষেও কোনো যুক্তি হতে পারে না। জাতিসঙ্ঘের অধিক কার্যকর শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের অস্থির ও সঙ্ঘাতপ্রবণ অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ ও গোষ্ঠীগত সঙ্ঘাত দমনে কাজ করছে। বিশ্ব পুলিশের ভূমিকা কমিয়ে দিয়ে যেসব অঞ্চলকে আমরা স্থিতিশীল দেখতে চাই সেখানে তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা যে তথ্য সরবরাহ করে সেটি হয় অধিক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। এ ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা মিত্রদের নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। আমরা নিজেদের দেশে ফ্লুর বিস্তৃতি রোধে যা করছি তার চেয়ে অধিক কিছু করার সামর্থ্য রয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশি দায়িত্ব কারো নেই যাতে এসব প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ স্থানে যেতে পারে। আর কেন আমরা এগুলোর উৎকর্ষসাধনে উদ্যোগী ভূমিকা নেবো না?

চূড়ান্তভাবে আমরা যেসব সঙ্কট মোকাবেলা করছি তার সমাধানে মিত্রদের সাথে কাজ করার সম্ভাবনাকে যারা নষ্ট করছে তাদের প্রতি আমার বক্তব্য হলো– অন্তত একটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আমরা এককভাবে কাজ করতে পারি এবং বিশ্বে আমাদের অবস্থানকে উন্নত করতে পারি। সেটি হলো– আমাদের নিজস্ব গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করা এবং এটিকে উদাহরণ হওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। যখন আমরা হাজার হাজার কোটি ডলার মূল্যমানের অস্ত্রবাজির পেছনে খরচ করি অথচ প্রধান প্রধান শহরে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল প্লান্ট প্রতিরক্ষণে অর্থ ব্যয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করি, তখন অন্যান্য দেশের পরমাণবিক প্লান্টের সেফগার্ড নির্মাণের দাবির বিষয়টি জটিল হয়ে পড়ে। যখন আমরা অনির্দিষ্ট কারণে সন্দেহভাজনদের বিচার ছাড়াই আটক করে রাখি অথবা তাদের দেশের উদ্দেশে জাহাজে তুলে দিই যেখানে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে তারা নির্যাতনের শিকার হবে– তখন আমরা মানবাধিকারের এবং স্বৈরাচারী শাসকের অধীনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগে আমাদের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলি। যখন আমরা বিশ্বের ধনী দেশ হিসেবে পৃথিবীর জীবাশ্ম জ্বালানির ২৫ শতাংশ ব্যবহার

www.pathagar.com

করি তখন আমরা জ্বালানির দক্ষতামান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি না। এমনকি সৌদি তেলক্ষেত্রের ওপর যতক্ষণ আমাদের সামান্য নির্ভরশীলতাও থাকবে ততক্ষণ আমরা চীনকে ইরান বা সুদানের তেলের ওপর নির্ভর না করার আহ্বান জানিয়ে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারব না। আমাদের উপকূলবর্তী তীর পরিদর্শনের পর পরিবেশ ইস্যুগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে খুব বেশি সহযেগিতা চীন থেকে পাওয়ার আশা করতে পারি না।

আমাদের এসব অনিচ্ছা বা দুর্বলতাগুলো আমাদের অগ্রাধিকারের পছন্দগুলোর বাস্তবায়নকে কঠিন করছে না, সেই সাথে আমাদের আদর্শগুলোকে অবমূল্যায়িত করছে এবং একই সাথে বিশ্বের সামনে আমেরিকার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আমেরিকান সরকার এবং আমেরিকান জনগণের গ্রহণযোগ্যতা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বহু মূল্যবান সম্পদ আমেরিকার জনগণ এবং স্থপতিদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বশাসন ব্যবস্থাকে কতটা উত্তমভাবে কাজে লাগাতে পারব তার ওপর যেকোনো পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য নির্ভর করবে। পৃথিবীব্যাপী নানা বিপত্তি ও জটিলতা রয়েছে, এর পুনর্গঠনের কাজ হবে সময়সাপেক্ষে ও কঠিন। আর এ জন্য প্রয়োজন হবে কিছু ত্যাগ স্বীকারেরও। আমেরিকান জনগণ তাদের সামনে যেসব বিকল্প বা পছন্দ রয়েছে তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারলে এ ত্যাগ স্বীকার আসবে । ফ্রেডরিক রুজভেল্ট এটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং পার্ল হারবার আক্রমণের পর তিনি বলেছিলেন, 'তার সরকারের আস্থা রয়েছে আমেরিকান নাগরিকদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর।' ট্রুম্যানও এটা উপলব্ধি করেছিলেন। এ কারণে ডিন আচেসনের সাথে কাজ করে তিনি প্রধান নির্বাহী, একাডেমিক ব্যক্তি, শ্রমিক নেতা, ধর্মযাজক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের নিয়ে 'মার্শাল প্লান কমিটি' গঠন করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় আমেরিকান নেতৃত্বকে এখন নতুন করে অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

আমি মাঝে মধ্যে বিস্মিত হই মানুষ আসলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে সক্ষম কি না– যখন আমরা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে অগ্রসর হই তখন ভালো কোনো স্তরে পৌঁছাই নাকি গর্জন আর বিস্ফোরণ, শাস্তি ও যুদ্ধ, আরোহণ ও অবরোহণের চক্রে আবর্তিত হই। যে সময় আমি বাগদাদ যাই, সেই একই সফরে আমি ইসরাইল ও পশ্চিম তীরেও এক সপ্তাহ কাটাই। এ সময় উভয় পক্ষের কর্মকর্তাদের সাথে আমি বৈঠক করি। আমি আমার নিজস্ব মনন থেকে এ বিবাদটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আমি সেসব ইহুদির সাথে কথা বলি যারা হলোকাস্টে তাদের পিতা-মাতাকে হারিয়েছেন আর ভাইদের হারিয়েছেন আত্মঘাতী বোমায়। আর আমি ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ের কথা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি চেক পয়েন্টে প্রতিনিয়ত যাদের অসম্মানের শিকার হতে হয় এবং স্মৃতিচারণ করে তাদের আবাসভূমি হারানোর। আমি হেলিকপ্টারে করে দুই জনগোষ্ঠীকে পৃথক করা রেখা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি ইহুদি শহর ও আরব শহরের মধ্যে সেভাবে কোনো পার্থক্য করতে পারিনি। সবুজ আর পাথুরে পাহাড়ের বিপরীতে এসবকে ভঙ্গুর আউটপোস্ট মনে হয়েছে। জেরুসালেমের ওপর দিয়ে ওড়ার

www.pathagar.com

সময় আমি নিচের পুরনো শহরটিকে গভীরভাবে দেখেছি। পাথরের গম্বুজ, পশ্চিমের দেয়াল আর পবিত্র স্মৃতিবিজড়িত চার্চ আমি অবলোকন করেছি। এ ক্ষুদ্র জায়গাটি নিয়ে ২ হাজার বছর ধরে যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ডঙ্কা চলে এসেছে কারা এর প্রতিনিধিত্ব করবে তা নিয়ে। আমি ভাবি, বিশ্বাসের অন্তসারশূন্যতা থেকে সৃষ্ট সঙ্ঘাতের অবসান আমাদের সময় কিভাবে করা যেতে পারে অথবা আমেরিকা তার সব ক্ষমতা দিয়ে কিভাবে বলতে পারে, পৃথিবীর সঙ্ঘাতের এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আমি এ চিন্তায় দীর্ঘ সময় আর মগ্ন থাকিনি। এসব চিন্তা হয়তো মানাবে একজন প্রবীণ লোকের। তবে যত জটিলই হোক না কেন সমাধান করা যেতে পারে। আমি বিশ্বাস করি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। শুধু এ অঞ্চলের মানুষের স্বার্থেই নয়, একই সাথে আমাদের নিজেদের শিশুদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও এর সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে।

আর সম্ভবত বিশ্বের ভাগ্য শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনার ওপর নির্ভর করে না; সম্ভবত আমরা শান্তি বজায় রাখতে যে এলাকায় কাজ করছি তার ওপরও পর্যাপ্তভাবে তা নির্ভর করে না। আমার মনে পড়ে ২০০৪ সালে পূর্ব এশিয়ায় যখন সুনামি আঘাত হানে তখনকার এক সংবাদ প্রতিবেদনের কথা। ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম উপকূল তখন সুনামিতে একেবারে ভেসে যায়। উপকূলের হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে যায় সমুদ্রের পানিতে। এরপর পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে আমি গর্বের সাথে লক্ষ করি যে, ১০০ কোটি ডলারের বেশি ত্রাণসামগ্রীসহ আমেরিকানদের সেখানে পাঠানো হয়েছে। একই সাথে আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনকাজে সহায়তার জন্য কয়েক হাজার মেরিন সেনা পাঠানো হয় উপদ্রুত এলাকায়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ সময় জরিপভুক্ত ৬৫ শতাংশ ইন্দোনেশীয় বলেছেন, এ সহায়তায় আমেরিকার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমি অবশ্য মনে করি যে, দুঃসময়ে সহায়তার একটি ঘটনা দশকের পর দশক ধরে চলে আসা অবিশ্বাস দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়।

তবে এর মাধ্যমে সূচনা তো অন্তত হলো।

www.pathagar.com

অধ্যায় : নয়

পরিবার

www.amarboi.org

সিনেটে আমার দ্বিতীয় বর্ষে পা দেয়ার পর জীবনটা অনেক গোছানো হয়ে আসে। সিনেটে ভোটিং শিডিউলের ওপর নির্ভর করে আমি সোমবার রাতে বা মঙ্গলবার সকালে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হতাম। ওয়াশিংটনে গিয়ে পরের তিনটি দিন দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সিনেটের জিমে যাওয়া বা মাঝে মধ্যে বন্ধুদের সাথে দুপুর বা রাতের খাবার খাওয়া ছাড়া প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। আগে থেকেই এসব কাজ একের পর এক নির্ধারণ করা থাকে– বিভিন্ন কমিটির বৈঠক, ভোট দেয়া, ককাসের কোনো মধ্যাহ্নভোজ, বিভিন্ন বিবৃতি-বক্তৃতা দেয়া, বিভিন্ন শিক্ষানবিশদের সাথে ছবি তোলা, সন্ধ্যায় তহবিল সংগ্রাহকদের সাথে কাটানো, বিভিন্ন ফোনকলের জবাব দেয়া, জরুরি চিঠিপত্র লেখা, বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা, বিভিন্ন অপপ্রচারের জবাব তৈরি করা, ইন্টারনেটে পোস্টিং দেয়ার জন্য রেকর্ডিং, দলীয় সভায় অংশ নিয়ে কোনো নীতির ব্যাপারে ব্রিফিং নেয়া, নির্বাচনী এলাকা থেকে আসা লোকজনকে আপ্যায়নের মতো শত শত কাজ করতে হয়। এর বাইরেও অংশ নিতে হয় মিটিংয়ে। যার কোনো অন্ত নেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিনেটের ক্লার্ক রুমে গিয়ে জেনে আসতে হয় সর্বশেষ ভোটিং কখন হবে। নির্ধারিত সময়ে সিনেট সহকর্মীদের সাথে আমিও গিয়ে লাইনে দাঁড়াই আমার ভোটটি দেয়ার জন্য। এরপর কোনো ফ্লাইট ধরার আশায় ক্যাপিটল হিলের সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা দৌড়ে নামি, যেন মেয়েরা বিছানায় যাওয়ার আগেই তাদের সামনে গিয়ে হাজির হতে পারি।

মাঝে মধ্যে বিরক্তি ধরে গেলেও এমন কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতি আনন্দ ও আকর্ষণ অনুভব করি আমি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে, সিনেটে বছরে বড়জোর দুই ডজনের মতো বিলের ওপর ভোট নেয়া হতে পারে। আর এগুলো বলতে গেলে কোনোটিই বিরোধী দল থেকে আনা হয় না। কিন্তু বাস্তবতা ঠিক এর

www.pathagar.com

উল্টো। পাবলিক স্কুল ইনোভেশন ডিস্ট্রিক্ট গঠন, জ্বালানিসাশ্রয়ী ইঞ্জিন তৈরির বিনিময়ে অবসরগ্রহণকারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার পেছনে ব্যয়ের জন্য আমেরিকান গাড়ি নির্মাতা কোম্পানিগুলোকে সহায়তা দানের পরিকল্পনা, কলেজের ক্রমবর্ধমান 'টিউশন ফি' সামাল দিতে নিম্ন আয়ের ছাত্রদের সহায়তা দানের জন্য পল গ্রান্ট কর্মসূচির বিস্তার– এগুলো ছিল আমারই উদ্যোগ। এর জন্য বিভিন্ন কমিটিতে অসংখ্যবার বক্তব্য দিতে হয়েছে আমাকে।

আমার স্টাফদের ধন্যবাদ দিতে হয়। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আমি সিনেটে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সংশোধনী পাস করাতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা পেরেছিলাম, গৃহহীন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সামরিক সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা দিতে। যেসব গ্যাস স্টেশন ইথানলভিত্তিক জ্বালানির পাম্প বসাবে তাদের জন্য কর মওকুফ সুবিধা দান, অ্যাভিয়ান ফ্লু'র সম্ভাব্য মহামারী প্রতিরোধ ও এ ব্যাপারে নজরদারির লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য অর্থসহায়তা আদায় করতে সক্ষম হই আমরা। সিনেটের বাইরেও আমরা ক্যাটরিনা-বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে পুনর্গঠনের কোনো কাজ 'দরপত্র' ছাড়া করা যাবে না এমন একটি বিলে সংশোধনী আনতে সক্ষম হই। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কাছে অধিক অর্থ পৌঁছা নিশ্চিত হয়। এই সংশোধনীগুলোর কোনোটিই হয়তো গোটা দেশকে বদলে দেবে না; কিন্তু আমি এটা ভেবে তৃপ্তি পাই যে, এতে অন্তত মাঝারিগোছের উপকার পাবে কিছু মানুষ; অথবা আইনের গতি এমন দিকে নির্ধারিত হবে, যা অধিকতর অর্থসাশ্রয়ী, অধিকতর দায়িত্বশীল অথবা অধিকতর ন্যায্য হিসেবে মানুষের কাছে বিবেচিত হবে।

ফেব্রুয়ারির একদিন আমার মেজাজ বেশ ফুরফুরে হয়ে গেল। একটি বিলের শুনানি সেরে সবে ফিরেছি। ডিক লুগার ও আমি এই বিলের স্পন্সর। বিলটি ছিল অস্ত্রবিস্তার রোধ ও কালোবাজারে অস্ত্র কেনাবেচা সম্পর্কিত। আমার খুশি হওয়ার কারণ ছিল ডিক। তিনি অস্ত্রবিস্তার রোধ ইস্যুতে একজন বিশেষজ্ঞ সিনেটেরই শুধু নন, তিনি সিনেট পররাষ্ট্র সম্পর্কবিষয়ক কমিটিরও চেয়ারম্যান। তাই বিলটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই উজ্জ্বল। এই সুখবরটি মিশেলের সাথে শেয়ার করার ইচ্ছে হলো আমার। তাই ওয়াশিংটন অফিস থেকে টেলিফোন করলাম তাকে। এই বিলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলি– কিভাবে কাঁধে বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র কোনো ভুল হাতে পড়লে তা বাণিজ্যিক যাত্রীবিমানগুলোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে; স্নায়ুযুদ্ধ ক্ষুদ্র অস্ত্রের যে পাহাড় রেখে গেছে তা এখন বিশ্বজুড়ে অব্যাহত সঙ্ঘাত-সহিংসতার কারণ। কথার মাঝে আমাকে থামিয়ে দিলো মিশেল। বলল,

'আমাদের সাথে পিঁপড়াও আছে।'

'কী বললে?'

'আমি রান্নাঘরে পিঁপড়া দেখেছি। বাথরুমের ওপরেও।'

'বুঝতে পেরেছো।'

www.pathagar.com

'তুমি যখন কাল বাড়ি আসবে তখন কিছু পিঁপড়া তাড়ানোর ওষুধ কিনে নিয়ে এসো। আমি নিজেই আনতে পারতাম, কিন্তু কালই স্কুল ছুটি হলে মেয়েদের নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তুমি কি আমার জন্য এই কাজটুকু করবে?'

'ঠিক আছে। পিঁপড়া তাড়ানোর ওষুধ।'

'হ্যাঁ, পিঁপড়া তাড়ানোর ওষুধ। ভুলো না যেন, ঠিক আছে লক্ষ্মীটি?

কয়েকটি এনো। আর শোনো, আমাকে এখন একটি মিটিংয়ে যেতে হবে। লাভ ইউ...।'

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখি। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় টেড কেনেডি বা জন ম্যাককেইনও পিঁপড়া মারার ওষুধ নিয়ে যায় কি না সে কথা ভাবতে থাকি।

মিশেলের সাথে মেশার পর সবার মনে দ্রুত এমন অনুভূতি সৃষ্টি হয়, সে একটি চমৎকার মেয়ে। এতে তাদের কোনো ভুল নেই– সে স্মার্ট, মজার ও আগাগোড়াই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। এমনিতেও সে খুব সুন্দর। এই সৌন্দর্য কোনো ম্যাগাজিনের চকচকে প্রচ্ছদে ছাপানো ছবির মতো নয়। তার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে একজন স্নেহময়ী মা ও ব্যস্ত পেশাজীবীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য। কোনো অনুষ্ঠানে তার কথা শুনে অথবা তার সাথে কাজ করা মানুষেরা যখন আমার কাছে আসে, তখন তারা বলে, 'তুমি তো তোমার জগৎ নিয়ে আছো, বারাক, কী বলব, তোমার বউটি না ...ওয়াও!'

আমি মাথা নুইয়ে সম্মতি দিই তাদের কথায়। আমি জানি, তার বিরুদ্ধে কোনো নির্বাচনে দাঁড়ালে, আমাকে হারাতে তেমন কোনো বেগ পেতে হবে না।

আমার জন্য সৌভাগ্য যে, মিশেল রাজনীতিতে নামেনি। কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'আমার ধৈর্য নেই।' আসলেই সে সত্য কথা বলে।

১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে মিশেলের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। শিকাগোর একটি বিশাল করপোরেট ল ফার্ম 'সিডলে অ্যান্ড অস্টিনে' আমরা দু'জনই কাজ করি তখন। আমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট হলেও তখনই মিশেল আইন প্র্যাকটিস করছিল। কলেজ থেকে বেরিয়েই সে হার্ভার্ড ল স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়। অন্য দিকে সবে ল স্কুলে প্রথমবর্ষ শেষ করেছি আমি এবং গ্রীষ্মকালে কাজ করার জন্য এই ফার্মে একজন সহকারী হিসেবে যোগ দিই আমি।

আমার জীবনের এই অন্তর্বর্তী সময়টুকু বেশ কঠিন ছিল। তিন বছর কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে কাজ করার পর ল স্কুলে নাম লেখিয়েছি। পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না আমি। মনে হচ্ছিল অর্থ ও ক্ষমতার কঠোর বাস্তবতার কাছে আমি আমার তরুণ বয়সের আদর্শগুলো হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আমার বিশ্বটি যেমন হবে বলে ভেবেছিলাম, বর্তমান বিশ্বটি সে দিকে নিয়ে যাচ্ছে না আমাকে।

www.pathagar.com

একটি করপোরেটের ল ফার্মে কাজ করার সুযোগ আমার হাতের কাছেই। অথচ এই কাজ দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলো থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেবে। এসব এলাকায় এখনো আমার বন্ধুরা পরিশ্রম করে মরছে। আমার মনটিকে বিষণ্ন করে তুলছিল এসব ভাবনা। পাশাপাশি, আমার ছাত্রঋণও বেড়ে যাচ্ছিল দ্রুত। ফলে 'সিডলে' তিন মাসের জন্য আমাকে যে বেতন দিতে চেয়েছিল তা কোনোমতেই প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমি একটি সস্তা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করি। তিন সেট পোশাক ও একজোড়া নতুন জুতা কিনতে হয় আমাকে। নতুন পোশাক ও জুতা পরে বেশ সঙ্কুচিত অবস্থায় একদিন সকালে আমি আমার নতুন কর্মস্থলে গিয়ে হাজির হই। এটা ছিল এক তরুণ অ্যাটর্নির অফিস। আমার ভার ছিল এই অফিসের তদারকির।

www.amarboi.org

মিশেলের সাথে প্রথম কী কথা হয়েছিল সেসব আমার মনে নেই। আমার শুধু মনে আছে, সে লম্বায় প্রায় আমার সমান এবং বেশ আকর্ষণীয়া। পোশাকটিও ছিল নিখুঁত মাপের এবং আচরণ ছিল হৃদ্যতা ও পেশাদারিত্বপূর্ণ। এখানে কিভাবে কাজ দেয়া হয়, বিভিন্ন কাজের ধরন, আমাদের বিলযোগ্য সময়ের হিসাব কিভাবে রাখতে হবে, আমাকে সে এগুলো বুঝিয়ে দেয়। আমাকে লাইব্রেরিটি ঘুরিয়ে এনে আমার অফিস দেখিয়ে দেয়ার পর বলল, দুপুরে খাবারের সময় আমার সাথে আবার দেখা করবে সে।

পরে মিশেল আমাকে বলেছিল, আমি যখন অফিসে তার কক্ষে প্রবেশ করি, আমাকে দেখে সে নাকি বিস্মিত হলেও মুগ্ধ হয়। কোনো একটি ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে তোলা আমার যে ছবিটি জীবনবৃত্তান্তের সাথে জুড়ে দিয়েছিলাম, সেখানে আমার নাকটি দেখতে স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা লম্বা। তাই সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় আমাকে দেখে তার সেক্রেটারি এসে যখন বলল, আমি নাকি বেশ 'কিউট', তখন কিছুটা সন্দিহান হয়েছিল সে। আমি মনে করি, আসলে সুসজ্জিত পোশাকে এ রকম কোনো কাজে একজন কালো মানুষকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল তারা। কিন্তু মিশেল যদি সত্যিই তেমন মুগ্ধ হতো তাহলে দুপুরে খাবারের জন্য যাওয়ার সময় হাতটি শুধু আলতো করে ছোঁয়াত না সে। আমি জানলাম, আমি শহরের যে এলাকায় সংগঠকের কাজ করেছি তার ঠিক উল্টো দিকে একটি মহল্লার ছোট্ট বাংলোতে বেড়ে উঠেছে সে। তার বাবা ছিলেন শহরের একজন পাম্প অপারেটর। ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করাতেই কেটে যেত তার মায়ের সময়। তবে এখন একটি ব্যাংকে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছে। মিশেল ব্রায়ান পাবলিক ইলিমেন্টারি স্কুলে পড়ালেখার পর ভাইয়ের সাথে প্রিন্সটনে চলে যায়। তার ভাই সেখানকার বাস্কেটবল টিমের তারকা খেলোয়াড়। এ সময় ধীরে ধীরে মিশেল 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ গ্রুপ'-এর সদস্য হয় এবং বিনোদন আইনে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। নিজের ক্যারিয়ারের জন্য এক সময় সে লস অ্যাঞ্জেলেস বা নিউইয়র্কে চলে যাওয়ার কথাও নাকি ভেবেছিল।

প্রথম সেই দিন নাকি কাজের অনেক পরিকল্পনা ছিল মিশেলের। কোনো পুরুষ দেখে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর মতো অবস্থা ছিল না তার। কিন্তু সে জানে, কিভাবে

www.pathagar.com

সহজভাবে প্রাণখুলে হাসতে হয়। আমি তার মধ্যে অফিসে ফিরে যাওয়ার কোনো তাড়া দেখলাম না। তার মধ্যে অন্য রকম কিছু ছিল। কোনো স্বর্গীয় দ্যুতি খেলা করছিল তার চোখে মুখে। তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো কিছুটা বিভ্রান্ত সে। তার মনে কী খেলা করছিল তখনো জানি না। তার এই মনোভাব আমার মনকেও ছুঁয়ে যায়। আমিও তাকে জানতে উৎসাহী হয়ে উঠি।

এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে লাইব্রেরি বা ক্যাফেটেরিয়া অথবা এমন অনেক জায়গায় প্রতি দিনই আমাদের দেখা হতে থাকে। সে আমাকে দু-একটি পার্টিতেও নিয়ে যায়। আমার পোশাকস্বল্পতা দেখেও কৌশলে না বোঝার ভান করত। তার কয়েকজন বন্ধুর সাথেও আমাকে ভিড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তখনো কোনো নির্দিষ্ট দিনে আমার সাথে বাইরে কোথাও যেতে রাজি হচ্ছিল না সে। এটা শোভনও নয়। আমাকে বলে সে, বিশেষ করে সে যখন আমার উপদেষ্টা।

'তোমার যুক্তি খুব দুর্বল।' আমি বললাম।

'দেখো, তুমি তো আমাকে উপদেশ দিচ্ছো কিভাবে কপিয়ার মেশিন চালাতে হয়। তুমি বলছো, কোনো রেস্টুরেন্টের খাবার পরখ করে দেখা উচিত।

সহযোগীরা যদি কোনো বিশেষ দিন নিজেদের জন্য বেছে নেয় তাহলে এতে প্রতিষ্ঠানের নীতি খুব একটা লঙ্ঘন হবে বলে আমি মনে করি না।

উত্তরে সে মাথা নাড়ল, বলল, 'স্যরি'।

'ঠিক আছে', বলে ক্ষান্ত দিলাম আমি। 'তোমার কথাই মেনে নিলাম। তুমি আমার উপদেষ্টা। তাহলে এবার বলো কার সাথে আমাকে কথা বলতে হবে।'

এরপর আমি আর এ নিয়ে কথা বাড়ালাম না। একদিন অফিসের একটি পিকনিকের পর তার গাড়িতে আমাকে অ্যাপার্টমেন্টে নামিয়ে দিতে আসছিল। সেদিন বিকেলে খুব গরম পড়ছিল। গাড়ি থেকে নামার সময় আমি তাকে আইসক্রিম খাওয়াতে চাই এবং রাস্তার ওপাশের বাসকিন-রবিনসন দোকান থেকে তার জন্য কোণ আইসক্রিম কিনে আনি। তরুণ বয়সে এই দোকানটিতেই আমার কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা তাকে বললাম। বাদামি রঙের অ্যাপ্রন ও ক্যাপ পরার পর কী রকম অদ্ভুত দেখাত সেটা বললাম।

সে আমাকে বলল, শিশুকালে দুই-তিন বছর পর্যন্ত সে নাকি বাদাম, মাখন বা জেলি ছাড়া আর কিছু খেতে চাইত না।

আমি তার পরিবারের সাথে দেখা করতে চাই বলে জানালাম তাকে। উত্তরে সে বলল, সে-ও তা-ই চায়।

আমি ওকে চুমু খেতে চাইলাম। এটা চকলেটের মতোই মজার।

গোটা গ্রীষ্মকাল একসাথে কাটালাম আমরা। আমি তাকে আমার সাংগঠনিক

www.pathagar.com

জীবন, ইন্দোনেশিয়ার জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কথা বললাম। সেও আমাকে তাদের ছোটবেলার বন্ধুদের কথা, প্যারিস যাওয়া, হাইস্কুলে ভর্তির কথা, স্টিভ ওনডারের গান তার খুব পছন্দ– এসব কথা জানাল। এভাবে আমাদের জানাশোনা বেড়ে চললেও তার পরিবারের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়ে উঠছিল না। রবিনসন পরিবারটি ছিল ১৯৫০ বা ষাটের দশকে আমেরিকার আদর্শ পরিবারগুলোর প্রতিমূর্তি। সেখানে ছিল ক্রীড়মোদি, কোমল হৃদয়ের এবং কৌতুকপ্রিয় একজন বাবা। যিনি কাজের একটি দিনও অলস কাটাতেন না বা ছেলের একটি খেলাও দেখা বাদ দিতেন না। সেখানে ছিলেন ম্যারিয়ান– চমৎকার, আকর্ষণীয়া ও আত্মবোধ সম্পন্ন একজন মা। ছেলেমেয়েদের জন্মদিনের কেক তৈরি থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি দেখেশুনে রাখা এবং ছেলেমেয়েরা স্কুলে কে কেমন করছে, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিকমতো চলছে কি না– সব কিছুর দিকে খেয়াল ছিল তার। আর ছিল বাস্কেটবল তারকা ক্রিগ– দীর্ঘদেহী ও বন্ধুবৎসল, বিনয়ী ও কৌতুকপ্রিয়। একটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে কাজ করলেও ভবিষ্যতে বাস্কেটবল প্রশিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এ ছাড়া সেখানে চাচা-চাচী, চাচাতো ভাইবোন ছিল অনেক। রান্নাঘরে খাবার টেবিলে সবাই গোল হয়ে বসে খেতে খেতে গল্প-গুজবে মেতে ওঠে। ছোটরা তাদের গ্রান্ডপা'র জাজ কালেকশনের গল্প শুনতে ভালোবাসে। মাঝে মধ্যে সবার দম ফাটানো হাসিতে ভেঙে যায় রাতের শুমশাম নীরবতা।

এত কিছু থাকলেও সে বাড়িতে কোনো কুকুর নেই। বাড়িতে কুকুর পোষা পছন্দ করেন না ম্যারিয়ান। বাড়ির এই সুখী পরিবেশের পেছনে আসল কারণ ছিল রবিনসনকে অনেক কষ্টের পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। বর্ণবাদের মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল তখন। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে মিশেলের বাবা-মায়ের জন্য ছেলেমেয়েদের গড়ে তুলতে শিকাগোর পরিবেশ অনুকূলে ছিল না। বর্ণবাদের টানাপড়েন ও আতঙ্কের তাড়নায় অনেক শ্বেতাঙ্গ পরিবার কালো এলাকাগুলো ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। রাস্তাঘাটে সহিংসতা, তহবিলস্বল্পতায় হিমশিম খেতে থাকা স্কুলগুলোতে সন্তানদের পাঠানো– এসব কারণে স্বল্প আয়ের কালো পরিবারগুলোকে অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়েছে টিকে থাকার জন্য।

কিন্তু আরো বড় দুর্ভোগ অপেক্ষা করছিল রবিনসনের পরিবারের জন্য। ত্রিশ বছর বয়সে, জীবনের একেবারে মুখ্য সময়ে মিশেলের বাবার 'মাল্টিপল স্কেলেরোসিস' রোগ ধরা পড়ে। পরের পঁচিশটি বছর তার অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। এর পরও নিজের রোগের প্রতি না তাকিয়ে পরিবারের প্রতি সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করে যান তিনি। প্রতি দিন তাকে অতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টা খাটতে হতো। জামার বুতাম লাগানো থেকে শুরু করে গাড়ি ড্রাইভ পর্যন্ত সব কাজ করতে হতো তাকেই। একসময় খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো তাকে। এরপর লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। তার পরও মাঠে গিয়ে ছেলের খেলা দেখা কিংবা অন্য ঘরে গিয়ে মেয়েটিকে একটু আদর করে দিয়ে আসতে সামান্যতম আলস্য তার মধ্যে দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

আমাদের বিয়ের পর মিশেল আমাকে বুঝিয়েছে, কিভাবে পরিবারের জন্য নীরব ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার বাবার অসুস্থতা। তার মা কতটা অমানসিক পরিশ্রমের বোঝা নিজের পিঠে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন; কতটা সতর্কতার সাথে তাদের জীবনের একটি গণ্ডিরেখা টেনে দেয়া হয়। ক্ষণিকের জন্য বাইরে যেতে হলেও যেন কোনো রকম সমস্যা সৃষ্টি না হয় বা নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরা যায়, তার জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা তৈরি হতো। বাইরের হাসিমাখা মুখ ও আনন্দঘন পরিবেশের পেছনের জীবন কতটা আতঙ্কের ছিল আমাকে তা বুঝতে শেখায় মিশেল।

এটা ছাড়া রবিনসন গৃহে আমি কেবল আনন্দ দেখেছি। আমার মতো অনেকেই তার বাবা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। যিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন। চার দিকে ছড়িয়ে আছে তার রক্তের ধারা। নিজ ও নিজেদের সন্তানদের জন্য ফ্রাসিয়ার ও ম্যারিয়ান রবিনসন যে বাড়িটিতে সবাই স্থিতিশীলতার কামনায় উন্মুখ। এমন একটি বাড়ি সেখানে থাকতে পারে তা আমি ধারণা করতে পারিনি। মিশেল আমার মধ্যে দুর্গম পথে চলার মতো একটি অ্যাডভেঞ্চার ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন খুঁজে পায়। এ জীবনটি ছিল তার অতীত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, দিগন্তবিস্তৃত একটি জীবন।

আমাদের প্রথম দেখার প্রায় ছয় মাস পর আকস্মিকভাবে মিশেলের বাবা মারা যান। খবর পেয়ে আমি শিকাগো ছুটে যাই। আমি যখন তার কবরের পাশে দাঁড়ালাম মিশেলও এসে দাঁড়াল আমার পাশে। সে তার মাথাটি আমার কাঁধে রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলছিল। ফ্রাসিয়ার রবিনসনের কফিনটি যখন কবরে নামানো হচ্ছিল, তখন আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করি তার মেয়ের দায়িত্ব গ্রহণের। মুখে প্রকাশ বা এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলেও মনের দিক থেকে অনেক আগেই আমরা একটি পরিবার হয়ে গিয়েছি– এই অনুভূতি জেগে ওঠে আমার মনে।

আমেরিকান পারিবারিক জীবনের অধঃপতন নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। সোশ্যাল কনজারভেটিভরা বলে, পারিবারিক ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হানছে গে প্রাইড প্যারেড ও হলিউডের ছায়াছবি। লিবারেলরা অর্থনৈতিক কার্যকারণের যুক্তি দেখায়। তারা বলে, মজুরি এক জায়গায় স্থবির হয়ে থাকায় জীবনধারণের মতো পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান করতে পারছে না পরিবারগুলো। এতে ক্রমাগত একটি কষ্টকর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে তারা। আমাদের গণসংস্কৃতিতে বহুমুখী হুমকির অনুপ্রবেশ ঘটছে। নারীরা আজীবন একাকিত্বকে বেছে নিচ্ছে। বিয়ের বন্ধন দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখার মতো অঙ্গীকারের অভাব পুরুষদের মধ্যে। তরুণ-তরুণীরা উচ্ছৃঙ্খল অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছে। অতীতের মতো গোছানো কোনো কিছুই নেই এখন। আমাদের ভূমিকা ও সম্পর্ক সব কিছুই যেন একরকম ছিনিয়ে নেয়ার মানসিকতায় পূর্ণ।

'বিয়ে' নামক প্রতিষ্ঠানটি অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এমন কথা কিন্তু আমরা এখনো

www.pathagar.com

বলতে পারছি না। এর পরও এ কথা সত্য যে, ১৯৫০-এর দশকের পর থেকে বিয়ের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। আমেরিকানরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা পেশাজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে বেশি বয়সে বিয়ে করছে– এটাও বিয়ের হার কমে যাওয়ার একটি কারণ। বর্তমানের ৪৫ বছর বয়সী নারীর ৮৯ শতাংশ এবং পুরুষের ৮৩ শতাংশ জীবনে অন্তত একবার বিয়ে করেছেন। এখনো ৬৭ শতাংশ আমেরিকান পরিবারে বিবাহিত দম্পতিরা পরিবারের প্রধান। এখনো বেশির ভাগ আমেরিকান মনে করেন, বিয়ে হলো ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সন্তান লালনের সবচেয়ে উত্তম ভিত্তি।

তবে গত ৫০ বছরে পরিবারের প্রকৃতিতেও যে পরিবর্তন এসেছে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরুর দিকে বিয়েবিচ্ছেদের হার যেভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তা সেখান থেকে ২১ শতাংশ কমে এসেছে। এর পরও প্রথম বিয়েগুলোর অন্তত অর্ধেকের সমাপ্তি ঘটছে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। আমাদের পিতামহদের তুলনায় আমরা বিয়েপূর্ব যৌন সংসর্গের ব্যাপারে অনেক বেশি উদার। বিয়ে ছাড়াই ছেলেমেয়েরা এক সাথে থাকতে অনেক বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। অনেক বেশি একাকিত্বপ্রবণ হয়ে উঠছে তারা। আমাদের সন্তানরা অধিক হারে বেড়ে উঠছে অপ্রচলিত পারিবারিক ব্যবস্থায়। বিয়েবিচ্ছেদ হওয়া ৬০ শতাংশ পরিবারে শিশু রয়েছে। ৩৩ শতাংশ শিশু জন্ম নিচ্ছে বিয়ে ছাড়াই। 'ঔরসজাত পিতা'র সাথে থাকার সুযোগ পাচ্ছে না ৩৪ শতাংশ ছেলেমেয়ে।

বিশেষ করে, আফ্রিকান আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে তীব্র। এদের মধ্যে সনাতন পারিবারিক ধারণা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে– এ কথা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। ১৯৫০ সালের পর থেকে কালো মেয়েদের মধ্যে বিয়ের হার ৬২ থেকে ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে বিয়ে হয়েছে এমন বাবা ও মা'র সাথে থাকা আফ্রিকান শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। আজ ৫৪ শতাংশ আফ্রিকান শিশু একক অভিভাবকের কাছে লালিত হচ্ছে। অন্য দিকে শ্বেতাংশ শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ২৩ শতাংশ মাত্র।

প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও এই চিত্র কিছুটা মিশ্র। গবেষণায় দেখা গেছে, বিবাহিত দম্পতিরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ, সচ্ছল এবং সুখী জীবনযাপন করে। বিয়ে ছাড়াই নারী-পুরুষ একত্রে জীবন কাটানো বা বিয়ের প্রতি অবজ্ঞা-তাচ্ছিল্য করার মধ্যে কোনো সুফল আছে এটা কেউ দেখাতে পারবে না। যদিও অধিকসংখ্যক মানুষের বিয়ে বিলম্বিত করার কারণ কিছুটা বোঝা যায়। পড়াশোনার পেছনে অনেক বেশি সময় ব্যয়ের দাবি করে আজকের তথ্যপ্রযুক্তির অর্থনীতি। ত্রিশের কোটায় বা তারচেয়ে বেশি বয়সে বিয়েগুলো, তরুণ বয়সে বিয়ের চেয়ে বেশি টেকসই হয় বলে গবেষণায় দেখা গেছে।

বিয়ের এই প্রবণতা বয়স্কদের মধ্যে যে প্রভাবই ফেলুক না কেন, এটা আমাদের সন্তানদের জন্য শুভ নয়। সন্তানদের লালন করতে গিয়ে আমার মায়ের মতো অনেক 'সিঙ্গেল মম' বীরত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন। কিন্তু এর পরও পিতা-মাতা দু'জনের কাছে বড় হওয়া সন্তানের চেয়ে মাত্র একজনের কাছে বড় হওয়া সন্তান পাঁচ গুণ বেশি

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে। আয় বিবেচনায় না নিলেও একক অভিভাবকের সন্তানদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়া এবং তরুণ বয়সেই বাবা-মা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। দেখা যায়, যে সন্তানটি তার 'জৈবনিক' বাবা ও মা উভয়ের সাথে বসবাস করছে সে, একক অভিভাবক বা ভাঙা পরিবারের সাথে থাকা সন্তানটির তুলনায় অনেক ভালো করছে।

এ বাস্তবতার আলোকে আমাদেরকে বিয়ের প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী করতে হবে। পাশাপাশি নিরুৎসাহিত করতে হবে বিয়েবহির্ভূত সন্তান ধারণকে। এর জন্য উপযুক্ত লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে আমাদের। যেমন– ফেডারেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম বা কর আইনে কোথাও বিয়ে করা দম্পতির জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না রাখা। বিয়ে করা দম্পতিদের জন্য শাস্তি কমাতে, ক্লিনটনের আমলে ওয়েলফেয়ার সংস্কার কর্মসূচির বিভিন্ন আইন এবং বুশের কর পরিকল্পনার অনেক উপাদান কংগ্রেসে উভয় পক্ষের জোরালো সমর্থন পেয়েছিল।

'টিন প্রেগন্যান্সি' প্রতিরোধের কথা বলেন অনেকে। এটা যে সব ক্ষেত্রেই মা ও শিশুর জন্য গুরুতর হুমকি, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। ১৯৯০ সাল থেকে 'টিন প্রেগন্যান্সি'র হার ২৮ শতাংশ কমেছে। এটি একটি নির্ভেজাল সুখবর। কিন্তু এখনো বিয়েবহির্ভূত যত সন্তান জন্মদানের ঘটনা ঘটছে, তার তিন ভাগের এক ভাগই 'টিন' মায়েদের। এ রকম টিন মায়েদের বয়স যত বাড়ে তাদের আরো অধিকসংখ্যক বিয়েবহির্ভূত সন্তান গ্রহণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এমন কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ এবং এগুলোর প্রতি ব্যাপক সমর্থন আদায় করতে হবে।

শেষ কথা হলো, গবেষণায় দেখা গেছে বিয়েসংক্রান্ত শিক্ষামূলক কর্মশালা বিবাহিত দম্পতিদের সম্পর্ক দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এ ধরনের কর্মশালা, বিয়ে ছাড়াই একত্রে থাকছে এমন জুটিগুলোকে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অধিকতর টেকসই বন্ধন তৈরিতে উৎসাহিত করে। নিম্ন আয়ের জুটিগুলোকে পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানকালে উপরি উক্ত সেবা প্রদান, চিকিৎসা সুবিধা এবং লভ্য অন্যান্য সেবা দেয়া গেলে অবস্থার যে পরিবর্তন আসবে এ ব্যাপারে সবাই একমত হতে পারেন।

কিন্তু অনেক সোশ্যাল কনজারভেটিভের মাথায় এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও খেলে না। তারা পুরনো যুগে ফিরে যেতে চায়। যখন বিয়েবহির্ভূত যৌনাচার শাস্তিযোগ্য ও ঘৃণার বিষয় ছিল। বিয়েবিচ্ছেদ আদায় করা ছিল অনেক কঠিন। এবং বিয়ে কেবল ব্যক্তিগত পূর্ণতাই প্রদান করে না, এটা নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকাটিও স্পষ্টভাবে জানান দিয়ে দেয়। পুরস্কৃত করা হচ্ছে বলে মনে হয় সরকারের এমন কোনো নীতি– তাদের দৃষ্টিতে অনৈতিক এমন আচরণের প্রতি নিরপেক্ষতা প্রকাশ– তা তরুণদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী জোগান দেয়াই হোক বা হোক নারীদের গর্ভপাত সেবা প্রদান; বিয়ে হয়নি এমন মায়েদের কল্যাণমূলক সহায়তা, অথবা সমলিঙ্গ বিয়ের আইনগত স্বীকৃতি– এ সবকিছুই

www.pathagar.com

বিয়ের বন্ধনকে ক্রমাগত শিথিল করে দিচ্ছে বলে তারা মনে করেন। এর পাল্টা যুক্তি দেয়া হচ্ছে এভাবে– এসব নীতি আমাদের একটি সাহসী নতুন পৃথিবীর দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে, যেখানে লিঙ্গ-বৈষম্য বলতে গেলে মুছে গেছে, যেখানে যৌনতা পুরোপুরি বিনোদনমূলক, বিয়ে হলো ব্যবহারের পর পরিত্যাগের মতো বস্তু, মাতৃত্ব পীড়াদায়ক এবং স্থান বদল করছে এমন বালুকাবেলার ওপর আজকের সভ্যতার অবস্থান।

নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে এমন সংস্কৃতিকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার প্রণোদনা অনুভব করি আমি। নৈতিক দিক দিয়ে অশুভ এমন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নিজ সন্তানদের জন্য একটি রক্ষাকবজ পেতে বাবা-মায়ের আকাঙ্ক্ষারও প্রশংসা করি আমি। রেডিওতে গান শুনে আমার যে অনুভূতি হয়– এই অনুভূতিও ঠিক তেমনি।

কিন্তু যারা যৌন-নৈতিকতা সৃষ্টির দায়িত্ব কেবল সরকারের ওপর চাপাতে চান তাদের বিপক্ষে আমি। বেশির ভাগ আমেরিকানের মতো আমিও মনে করি, যৌনতা, বিয়ে, বিচ্ছেদ ও সন্তান-লালন পালন একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়– এ উপলব্ধি আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চেতনার গভীরে নিহিত। শিশু নির্যাতন, অনাচার, বহুগামিতা, গৃহে সহিংসতা অথবা সন্তানদের সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার মতো যেসব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অন্যের জন্য বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়– সেখানে হস্তক্ষেপ করার একটি দায়িত্ব রয়ে গেছে সমাজের (যারা ভ্রূণের ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাস করেন, তারা গর্ভপাতকেও এই শ্রেণীতে ফেলেন)। এর বাইরে আমেরিকার শয়নকক্ষগুলোতে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে তা দেখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস বা সরকারি আমলাদের কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

মানুষকে ভয় দেখিয়ে বা জোর করে শক্তিশালী পরিবার গঠন করা যাবে বলে আমি মনে করি না। যৌনশুদ্ধতা সম্পর্কিত মান বজায় না রাখতে পারলে কাউকে শাস্তি দিয়েও টেকসই পরিবার গঠন করা যাবে না। আমি চাই যৌনতা ও ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে তরুণদের মনে অধিকতর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে। এই বার্তাটি বহন করে এমন বাবা-মা, ধর্মগুরু বা কমিউনিটি কর্মসূচিগুলোর প্রশংসা করি আমি। তাই বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে কোনো 'টিনএজ' মেয়েকে আজীবনের জন্য সংগ্রামের পথে ঠেলে দেয়ার পক্ষপাতী আমি নই। আমি চাই, যুগলরা প্রতিশ্রুতি এবং এর পরবর্তী বিয়ের মধ্যে ত্যাগের মূল্যটি অনুধাবন করুক। তাই বলে আমি, কোনো যুগলের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি বিবেচনায় না এনে তাদেরকে একসাথে রাখতে আইন প্রয়োগেরও পক্ষপাতী নই। কারো নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গেলে আমি দেখি মানুষের মন অত্যন্ত বিচিত্র এবং আমার জীবনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। তাই চৌদ্দ বছরের বিয়ের জীবনে মিশেলের সাথে আমার বৈবাহিক জীবন নিয়ে কখনোই কথাকাটাকাটি হয়নি।

আমাদের মধ্যে তর্ক হয় কেবল মিশেলের জন্য সহনশীল এবং আমাদের সন্তানদের জন্য মঙ্গল হয় এমন বিষয় নিয়ে। এ জন্য আমাদের কাজ ও পরিবারের মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য আনা যায় তা নিয়ে তর্ক হয়। এ রকম তর্ক কেবল আমাদের মধ্যেই নয়, ষাট

www.pathagar.com

বা সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে যে রকম পরিবারে মিশেল বড় হয়েছে সেগুলোতেও এটাই ছিল একধরনের মানদণ্ড। তখন ৭০ শতাংশ পরিবারেই মায়েরা ঘরের কাজ করতেন এবং তারা নির্ভরশীল ছিলেন একমাত্র জীবিকা উপার্জনকারী বাবার ওপর।

আজ এই সংখ্যাটি পুরোপুরি উল্টে গেছে। এখন ৭০ শতাংশ পরিবারে বাবা-মা উভয়েই উপার্জন করেন অথবা একক অবিভাবকের পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও সেই তিনি। আমার পলিসি ডিরেক্টর এবং কর্ম ও পরিবারবিষয়ক বিশেষজ্ঞ কারেন কর্নবুলাহ এ ধরনের পরিবারের নাম দিয়েছেন 'জাগলার ফ্যামিলি'।

যেখানে বাবা-মা বিল দেয়ার জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য, পরিবারের বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে, এমনকি নিজেদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্যও নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন। এই সংগ্রামের প্রভাব পারিবারিক জীবনেও পড়ছে। নিউ আমেরিকা ফাউন্ডেশনের কর্ম ও পরিবার কর্মসূচির পরিচালক থাকাকালে সিনেটের শিশু ও পরিবারবিষয়ক সাব কমিটিতে সাক্ষ্য দানকালে কারেন বলেন, '১৯৬৯ সালের তুলনায় বর্তমানে আমেরিকানরা সপ্তাহে তাদের সন্তানদের সাথে ২২ ঘণ্টা কম সময় কাটাচ্ছেন। প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুকে নিবন্ধনহীন ডে-কেয়ার সেন্টার বা বাসায় টিভি সেটের সামনে বসিয়ে রেখে বাবা-মায়েরা কাজে বেরিয়ে যান। পরিবার সামলাতে গিয়ে কর্মজীবী মায়েরা প্রতিদিন তার ঘুম থেকে ১ ঘণ্টা হারান। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, স্কুলবয়সী সন্তানের বাবা-মায়েদের মধ্যে অত্যধিক চাপের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের উৎপাদনশীলতা ও কাজের ওপর প্রভাব পড়ছে এই চাপের।'

এটা কি খুব সুখের কথা?

অনেক সোশ্যাল কনজারভেটিভ বলেন, ঘরের বাইরে ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের এই সংখ্যাধিক্য 'নারীবাদী দর্শন'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব। নারীরা যদি এটা বুঝতে পেরে তাদের সনাতন গৃহকর্মের ভূমিকায় ফেরত আসেন, তাহলেই কেবল পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। এটা ঠিক নারীদের ব্যাপারে সাম্যের ধারণা কর্মক্ষেত্র রূপান্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু বেশির ভাগ আমেরিকান মনে করেন, ক্যারিয়ার এগিয়ে নেয়া, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এবং পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে নিজের মেধাকে কাজে লাগাতে পারা আধুনিক জীবনের অন্যতম বৃহৎ একটি অর্জন।

কিন্তু বেশির ভাগ আমেরিকান নারীর জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া কেবল মনোভাব পরিবর্তনের বিষয় নয়। এটা হলো প্রয়োজন পূরণের বিষয়।

বাস্তবতার দিকে তাকালে আমরা দেখব, গত ৩০ বছরে মুদ্রাস্ফীতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমেরিকান পুরুষদের গড়পড়তা আয় বেড়েছে ১ শতাংশেরও কম। অথচ এই সময়ের মধ্যে থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে অব্যাহতভাবে। ফলে এই কর্মজীবী মায়েদের আয়, বিপুলসংখ্যক আমেরিকান পরিবারকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিচে নেমে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। এলিজাবেথ ওয়ারেন ও অ্যামেলিয়া তিয়াগি তাদের 'দ্য টু ইনকাম ট্রাপ' বইয়ে দেখিয়েছেন, মায়েরা যে

www.pathagar.com

অতিরিক্ত আয় করছেন তা বিলাসদ্রব্য কেনায় ব্যয় হচ্ছে না। এর প্রায় সবটুকুই ব্যয় হচ্ছে তাদের সন্তান বা পারিবারিক নিত্যপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায়। ব্যয় হচ্ছে প্রি-স্কুল এডুকেশন, কলেজের বেতন অথবা ভালো একটি পাবলিক স্কুল আছে এমন কোনো নিরাপদ মহল্লায় বাড়ি কেনা– এসবের পেছনে। নির্ধারিত খরচ ও কর্মজীবী মায়ের কিছু বাড়তি ব্যয় (বিশেষ করে দ্বিতীয় আরেকটি গাড়ি)– এর ফলে দুই আয়ের পরিবারগুলোর হাতে ইচ্ছেমতো খরচ করার অর্থ থাকে না। ফলে ৩০ বছর আগের এক ব্যক্তির আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর চেয়েও এরা আর্থিকভাবে কম নিশ্চিত। তাই সাধারণ পরিবারগুলোর পক্ষে কি আর একক আয়ের জীবনে ফেরত যাওয়া সম্ভব?

ওয়ারেন ও তিয়াগি দেখিয়েছেন, বর্তমানে গড়পড়তা একক আয়ের কোনো পরিবার যদি মধ্যবিত্ত জীবনধারণ করতে চায় তাহলে তার ইচ্ছেমাফিক খরচ করার মতো আয় হবে ১৯৭০-এর দশকের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম। অন্য কথায়, বেশির ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রে মায়ের ঘরে থাকার অর্থ হলো কম নিরাপদ মহল্লায় বসবাস এবং তাদের সন্তানদের স্বল্প প্রতিযোগিতামূলক স্কুলে পড়ানো।

স্বেচ্ছায় এই পছন্দ বেছে নেবেন না কোনো আমেরিকান। তার বদলে পরিস্থিতির আলোকে সবচেয়ে ভালো উপায়টি বেছে নেবেন তারা। ফ্রেশিয়ার ও ম্যারিয়ান রবিনসন যে ধরনের পরিবেশে সন্তানদের লালন করেছেন, তার চেয়ে এখন সন্তানদের গড়ে তোলার পরিবেশ অনেক অনেক বেশি কঠিন, বর্তমানের বাবা-মায়েরা তা জানেন।

নারী-পুরুষ উভয়কেই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হচ্ছে। কিন্তু মিশেল যখন যুক্তি দেখায় আধুনিক পরিবারের বোঝা অনেক বেশি মাত্রায় নারীর কাঁধে চেপেছে, তখন আমার বলার কিছু থাকে না।

আমাদের বিয়ের প্রথম কয়েক বছর অন্য দম্পতিদের মতো মিশেল ও আমি পরস্পরকে বোঝার পেছনে সময় ব্যয় করি। পরস্পরের মনোভাব কিভাবে বুঝতে হয় তা শিখি; পরস্পরের অভ্যাস ও মুদ্রাদোষগুলোর ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস মিশেলের, রাত ১০টার পর কদাচিত জেগে থাকে সে। অন্য দিকে আমি হলাম নিশাচর এবং সকালে সহজে বিছানা ছাড়তে চাই না। এটা অংশত এ কারণে যে আমি এখনো আমার প্রথম বইয়ের কাজটি শেষ করতে পারিনি আর আমি আমার জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছি মায়ের একমাত্র সন্তান হিসেবে। আমি বেশির ভাগ সন্ধ্যা কাটাই আমাদের রেল রোড অ্যাপার্টমেন্টের অফিসে। এতে মিশেল অনেকটাই একাকী সময় কাটাতে বাধ্য হয়। ফলে সকালের নাশতার সময় মনের ভুলে প্লেটে মাখন রেখে দিই এবং রুটির ব্যাগের মুখটি বেঁধে রাখতে ভুলে যাই।

আমাদের বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর সাধারণ আনন্দ যেমন– সিনেমায় যাওয়া, বন্ধুদের সাথে ডিনার খাওয়া কিংবা মাঝে মধ্যে কনসার্টে যাওয়া– এসবের মধ্য দিয়ে আমরা কাটিয়েছি। আমরা দু'জনই কঠোর পরিশ্রম করতাম। ছোট্ট একটি

www.pathagar.com

মানবাধিকারবিষয়ক ল ফার্মে প্র্যাকটিস করতাম আমি। সে সময় আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলেও পড়ানো শুরু করি। অন্য দিকে মিশেল আইন পেশা ছেড়ে দিয়ে 'পাবলিক অ্যালাইজ' নামে একটি জাতীয় সেবামূলক কর্মসূচির শিকাগো শাখায় যোগ দেয়। আমি যখন রাজ্য আইনসভায় নির্বাচনে নামি তখন আমাদের দু'জনের একসাথে সময় কাটানো সংক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতি ও রাজনীতির প্রতি তার জোরালো অপছন্দ থাকার পরও মিশেল আমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। সে আমাকে কেবল বলত, 'আমি জানতাম তুমি এ কাজটি করবে'। স্প্রিংফিল্ডে থাকার সময় রাতের বেলা আমরা ফোনে কথা বলতাম দীর্ঘ সময়। এ সময় হাস্য-কৌতুকও করতাম। আর ভাগ করে নিতাম সারা দিনের উদ্বেগগুলো। এভাবে শেষ পর্যন্ত ভালোবাসায় পূর্ণ একটি মন নিয়ে ঘুমোতে যেতাম আমি।

এরপর জন্ম নিলো মালিয়া। চতুর্থ জুলাইয়ের শিশু সে। অত্যন্ত সুন্দর ও শান্ত; মোহ সৃষ্টি করে এমন বড় বড় চোখ তার। মনে হলো খোলার মুহূর্ত থেকে চোখ দু'টি যেন পৃথিবীর সব কিছু পড়ছে। মালিয়ার জন্মটি আমাদের দু'জনের জন্যই ছিল আদর্শ সময়ে। এ সময় রাজ্যসভার অধিবেশন ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যায়ের গ্রীষ্মকালীন সেশনেও আমাকে ক্লাস নিতে হবে না। তাই প্রতিটি মুহূর্ত বাড়িতে কাটানোর সুযোগ ছিল আমার। অন্য দিকে সন্তানের সাথে যেন বেশি সময় দেয়া যায় সে জন্য শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি খণ্ডকালীন চাকরি নেয় মিশেল। অক্টোবরের আগে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে হবে না তার। জাদুমন্ত্রের মতো এই তিনটি মাস আমরা দু'জন আমাদের সন্তানের দেখভাল করে কাটিয়ে দিই। আমরা দুজনই পালা করে ডায়াপার বদলানো, দুধ খাওয়ানো এমনকি ঘুমিয়েছি পর্যন্ত। দোল দিতে দিতে আমার কোলে যখন সে ঘুমিয়ে পড়ত তখন আমি আমার মেয়ের মৃদু নিঃশ্বাসটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতাম। চেষ্টা করতাম তার কচি মনের স্বপ্নটি কল্পনা করতে।

বসন্ত এসে গেল। আমার ক্লাস শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। রাজ্যসভার অধিবেশনও শুরু হলো। মিশেল যোগ দিলো তার কাজে। এবার আমাদের সম্পর্কে টানাপড়েন দেখা দিতে শুরু করে। এমনকি যখন শিকাগো আসতাম তখনো সন্ধ্যায় নানা আলোচনা সভায় যোগ দিতে হতো আমাকে। অনেক কাগজপত্র দেখতে হতো অথবা লেখা তৈরি করতে হতো। খণ্ডকালীন চাকরিটিও কিভাবে লম্বা হতে থাকে সেটা দেখতে পায় মিশেল। এরপর একসময় আমরা কাজে গেলে বাসায় মালিয়াকে দেখাশোনার জন্য একজন বেবি সিটার নিয়োগ করে ফেললাম। হঠাৎ করে একজন পূর্ণ বেতনভোগী মানুষ ভাগ বসাল আমাদের দু'জনের আয়ের ওপর। পকেটে টান পড়ল আমাদের।

ক্লান্তি ও চাপের কারণে আমরা কথা বলার সময় পেতাম খুব কম। রোমাঞ্চ তার চেয়েও কম। আমি যখন কংগ্রেসের জন্য নির্বাচনে নামি তখন এতে খুশি হওয়ার ভান করত না মিশেল। আমার রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন করতে ব্যর্থতা হঠাৎ করেই মিশেলের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। ইতোমধ্যে জন্ম নিলো শাশা। সেও তার বোনের মতো সুন্দর

www.pathagar.com

ও শান্ত। এরপর আমার প্রতি আমার স্ত্রীর ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ল।

সে আমাকে বলত, 'তুমি কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবো। আমাকে একা একটি পরিবার লালন-পালন করতে হবে, এটা আমি কখনো ভাবিনি।'

এ ধরনের অভিযোগ শুনে আমি কিছুটা হতভম্ব হই। সে ঠিক কথা বলেনি, ভাবলাম আমি। এটা এমন নয় যে প্রতি রাতে বাইরে গিয়ে আনন্দফুর্তি করে আমি কাটাই। মিশেলের কাছেও আমার চাওয়া খুব কম। সে আমার মোজা সেলাই করে দিক এটা যেমন আমি চাই না, তেমনি আমার বাড়ি ফেরার আশায় ডিনারের টেবিলে অপেক্ষা করুক সেটাও আমার কামনা নয়। সুযোগ পেলেই সন্তানদের নিয়ে খেলা করে সময় কাটাই। আমার এসব কাজে সহানুভূতি পাওয়ার বদলে আমি দেখি ঘর সামলানোর প্রতিটি কাজে অন্তহীন আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছি। দেখি, আমাকে করতে হবে বা করতে ভুলে গেছি এমন কাজের দীর্ঘ তালিকা। এতে স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ বিগড়ে যেত। আমি মিশেলকে মনে করিয়ে দিতাম যে অন্য যেকোনো পরিবারের তুলনায় আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাকে বলতাম আমার সব রকম ত্রুটি সত্ত্বেও আমি যেকোনো কিছুর চেয়ে তাকে ও আমার মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আমি ভাবতাম, আমার ভালোবাসাই যথেষ্ট। আমার ব্যাপারে তার অভিযোগ করার কিছুই নেই।

আমাদের সন্তানরা বড় হয়ে উঠছে। একসময় তারা স্কুলে যেতে শুরু করে। আমি উপলব্ধি করতে শুরু করি কতটা ঝড়ো সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল মিশেলকে। এই সংগ্রাম খুবই সাধারণ একটি বিষয় আজকের কর্মজীবী মায়েদের জন্য। আমি নিজেকে কতটা উদারভাবে দেখতে চাই অথবা আমি যতই বলি না কেন– মিশেল ও আমি সমঅংশীদার, তার স্বপ্ন ও উচ্চাশা আমার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ– এসব কোনো বিষয় নয়। আসল কথা হলো যখন সন্তানের প্রশ্ন আসে তখন দৈনন্দিন কাজের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে হচ্ছে মিশেলকে, আমাকে নয়। অবশ্যই আমি তাকে সাহায্য করেছি। কিন্তু এই সাহায্য করা সব সময় আমার সুযোগ-সুবিধা মতো। অন্য দিকে কিন্তু এটা করতে গিয়ে তাকে তার ক্যারিয়ার স্থগিত রাখতে হয়। সন্তানরা ঠিকমতো খাচ্ছে কি না বা গোসল করেছে কি না সে ব্যাপারে তাকেই নিশ্চিত হতে হয়। মালিয়া বা শাশা অসুস্থ হলে বা বেবি সিটার কোনো কারণে কাজে না এলে কর্মক্ষেত্রের সাপ্তাহিক মিটিংটি বাতিল করার জন্য তাকেই ফোনের রিসিভারটি তুলতে হয়।

নিজের কাজ ও সন্তান সামলাতে গিয়ে নিরন্তর হুড়োহুড়ির মধ্যে মিশেলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এতে তার কোনো কাজই সুষ্ঠুমতো করা হয় না বলে মনে করত সে। কিন্তু এটা সত্য ছিল না। তার নিয়োগকর্তা তাকে পছন্দ করত এবং প্রত্যেকেই বলত যে সে একজন ভালো মা। কিন্তু এই দ্বিমুখী ভূমিকা নিয়ে তার মনের মধ্যে সব সময় দ্বন্দ্ব চলতে দেখতাম আমি। নারিত্ব তাকে একজন দৃঢ়, নির্ভরযোগ্য, স্বস্তিদায়ক এবং সব সময় সন্তানের দেখাশোনায় ব্যস্ত মায়ে পরিণত করতে চাইত। অন্য দিকে পেশাদারিত্ব তাকে পৃথিবীতে বিখ্যাত একজন হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায় এবং

www.pathagar.com

আমাদের সাক্ষাতের একেবারে প্রথম দিন যে পরিকল্পনা তার মনে ছিল, সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা থেকে সামান্যও বিচ্যুত হয়নি সে।

এই টানাপড়েন সামাল দিতে মিশেলের ইচ্ছেশক্তি এবং আমি ও আমার সন্তানদের প্রতি তার আত্মত্যাগ থেকে আমাদের কঠিন সময়গুলো পাড়ি দেয়ার শক্তিকে ধার করেছি আমি। উপরন্তু আমাদের আয়ত্তে এমন সুযোগ ছিল, যা অনেক আমেরিকান পরিবারের কাছেই নেই। আমরা যখন শুরু করি, মিশেল ও আমি দু'জনই পেশাজীবী। এর অর্থ, কর্ম হারানোর ঝুঁকি ছাড়াই যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি নতুন করে সাজাতে পারি। কিন্তু ৫৭ শতাংশ আমেরিকান শ্রমিকের এই বিলাসিতাটুকু নেই। তারা মজুরি না হারিয়ে বা হিসাবের ছুটির দিন না খুইয়ে সন্তানের দেখভাল করার জন্য একটি কর্মহীন দিবসও কাটাতে পারে না। যেসব বাবা-মা তাদের নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী দিনের কর্মসূচি সাজাতে চান, তাদেরকে খণ্ডকালীন বা অস্থায়ী কাজ বেছে নিতে হবে। যেখানে ক্যারিয়ার বলতে কিছু নেই। নেই তেমন কোনো সুবিধা।

আমার ও মিশেলের আয় সব রকম প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হওয়ায় দুই কর্মজীবী অভিভাবক হিসেবে আমাদের ওপর চাপ কিছুটা কম ছিল। আমরা সন্তানদের ভালোভাবে দেখাশোনা করা, সন্তানদের দেখাশোনার প্রয়োজনে কাজের লোক রাখা, যখন রান্নার সময় বা ইচ্ছা দুটোরই অভাব তখন বাইরে গিয়ে ডিনার সেরে আসা, সপ্তাহে এক দিন কেউ এসে বাড়িটি পরিষ্কার করে দিয়ে যাওয়া, প্রাইভেট প্রি-স্কুল এবং একটু বড় হওয়ার পর সন্তানদের সামার ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া– এসব কাজ সহজেই করতে পেরেছি। বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারের জন্য এসব কাজ করা আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে। বিশেষ করে 'ডে-কেয়ার'-এর খরচ বলার মতো নয়। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্র সরকারই তার শ্রমিকদের 'ডে-কেয়ার' সেবা প্রদানের জন্য কোনো ভর্তুকি দেয় না।

এ ছাড়া আমাদের বাসা থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে থাকত আমার শাশুড়ি। মিশেলের জন্মও সেই বাড়িতে। আমার শাশুড়ি ম্যারিয়ানের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু তাকে দেখলে বয়স ১০ বছর কম মনে হতো। গত বছর মিশেল যখন পূর্ণকালীন চাকরিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন ম্যারিয়ান তার ব্যাংকের সময় কমিয়ে দেয়। এই সময়ে সে আমার মেয়েদের স্কুল থেকে নিয়ে এসে প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাদের সাথে কাটাত। বেশির ভাগ আমেরিকান পরিবারের জন্য এই সাহায্যটুকু পাওয়া এক কথায় অসম্ভব। বরং তাদের ক্ষেত্রে উল্টোটাই ঘটে। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পরও পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিটিকে দেখতে হয় একজনকে।

অবশ্য কাছাকাছি বাস করেন এমন আধা অবসর জীবনযাপনকারী, চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী, আমার শাশুড়ির মতো একজন করে মানুষ প্রতিটি পরিবারকে জোগান দেয়া ফেডারেল সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি পারিবারিক মূল্যবোধের ব্যাপারে আন্তরিক হই, তাহলে আমাদের জন্য এমন পথ বের হয়ে যাবে যা

www.pathagar.com

আমাদের কাজ ও সন্তান লালন-পালন একসাথে সামলাতে গিয়ে যে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে কিছু শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য সহজে উচ্চ মানসম্পন্ন ডে-কেয়ার সুবিধা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা সবচেয়ে বিশৃঙ্খল। ডে-কেয়ারের অনুমতি দান ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা, শিশু রয়েছে এমন পরিবারগুলোর জন্য ফেডারেল ও রাজ্যগুলোতে কর মওকুফ সম্প্রসারণ এবং মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে ধরন বুঝে ভর্তুকি দিতে হবে। এতে বাবা-মায়ের কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির হার কমে যাওয়ায় নিয়োগকর্তারাও উপকৃত হবে।

আমাদের স্কুলগুলোও নতুন করে সাজানোর সময় এসেছে। শুধু কর্মজীবী বাবা-মায়ের জন্য নয়, একটি শিশুকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যও এর প্রয়োজন। ভালো প্রি-স্কুল প্রোগ্রাম কতটা উপকারী হতে পারে তা বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে। স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পেছনেও দায়ী ভালো প্রি-স্কুল প্রোগ্রামের অভাব। স্কুলে শিক্ষার্থীদের বেশি সময় ব্যয়, গ্রীষ্মকালীন স্কুল, আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম– এগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সব শিশুকে এসব সুবিধা দিতে অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু স্কুল কর্মসূচির ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারের অংশ হিসেবে এই ব্যয় বহনের সদিচ্ছা থাকতে হবে আমাদের সমাজকে।

আমাদের অধিকাংশ পিতা-মাতার কাজের সময় অধিকতর নমনীয় করতে নিয়োগকর্তার সাথে আলোচনা করা উচিত। এ লক্ষ্যে ক্লিনটন প্রশাসন ফ্যামিলি অ্যান্ড মেডিক্যাল লিভ অ্যাক্ট (এফএমএলএ)-এর মাধ্যমে একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এই আইনে কেবল পারিশ্রমিকবিহীন ছুটির কথা উল্লেখ থাকায় এবং কেবল ১৫ জনের বেশি কর্মচারী রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় এই আইনের সুবিধা পাচ্ছে না বেশিরভাগ আমেরিকান শ্রমিক। যদিও একটি দেশ ছাড়া অন্য সকল ধনী দেশগুলো পূর্ণ বেতনসহ বিভিন্ন সুবিধাসহ 'অভিভাবকত্ব ছুটি' দেয় কিন্তু এখানকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের ছুটির তীব্র বিরোধী। ছোট ব্যবসায়গুলোর ওপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা।

উদ্ভাবনী ক্ষমতার সামান্য প্রয়োগের মাধ্যমেই আমরা এই অচলাবস্থার নিরসন ঘটাতে পারি। ক্যালিফোর্নিয়া সম্প্রতি প্রতিবন্ধী বীমা তহবিলের মাধ্যমে সবেতনে ছুটির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ব্যয়ের বোঝা শুধু নিয়োগকর্তাকে যেন বহন করতে না হয় সে জন্য এই ব্যবস্থা।

আমরা অভিভাবকদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে নমনীয়তা দিতে পারি। অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কাজের সময় নমনীয় করে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এতে কর্মীর মনোবল বেড়ে যায় এবং উৎপাদনশীলতাতেও তেমন ক্ষতি হয় না বলে রিপোর্টে দেখা গেছে। যুক্তরাজ্য এ সমস্যার সমাধানের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। এর নাম দেয়া হয়েছে 'কর্মজীবন ভারসাম্য' প্রচারণা। বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এই প্রচারণা। ছয় বছরের কম বয়সী শিশু আছে এমন অভিভাবকরা

www.pathagar.com

তাদের কাজের সময় সুবিধামতো পরিবর্তন করে নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ রাখতে বাধ্য নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এ বিষয়ে ওই কর্মচারীর সাথে কথা বলতে হবে। এ পর্যন্ত এ রকম এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ অভিভাবক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় সফল হয়েছেন এবং উৎপাদনশীলতায় কোনো ঘাটতি ছাড়াই তারা কাজের জন্য নিজেদের পরিবারের সহায়ক সময়টি বেছে নিতে পেরেছেন। এ ধরনের উদ্ভাবনী নীতি গ্রহণ, কারিগরি সহায়তা এবং বৃহত্তর গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য এ ধরনের সুবিধা করে দিতে পারে সরকার। আবার এই নীতি যেন অভিভাবকদের একজনকেও বাড়িতে না রাখার ব্যাপারে পরিবারগুলোকে উৎসাহী না করে তোলে, সে দিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

সোশ্যাল কনজারভেটিভদের কথায় যদি কোনো সত্য থাকে তা হলো আমাদের আধুনিক সংস্কৃতি বাড়িতে থাকা মায়েদের অসাধারণ আবেগ ও আর্থিক অবদান-আত্মত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমকে পুরোপুরি মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া। কিন্তু তাদের ভুলটি হলো মায়েদের এই সনাতন ভূমিকা সহজাত এবং এটাই মাতৃত্বের একমাত্র ও সবচেয়ে ভালো উপায়– এই বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র না সরা। আমার মেয়েদের বেলায় আমি চাই, নিজেদের এবং তাদের পরিবারের জন্য সবচেয়ে ভালো কোনটি তা বাছাইয়ে তাদের নিজস্ব একটি পছন্দ থাকবে। তাদের এ ধরনের পছন্দ থাকবে কি না তা কেবল তাদের নিজস্ব চেষ্টা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই নির্ভর করবে না। তার সঙ্গী পুরুষটি ও আমেরিকান সমাজ এই পছন্দের কতটা সম্মান দিচ্ছে এবং কিভাবে মেনে নিচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করবে। মিশেল আমাকে এ শিক্ষাই দিয়েছে।

'হাই, ড্যাডি।'

'হাই, সুইটি-পাই'।

এক শুক্রবার সন্ধ্যায়। চুলের পরিচর্যার জন্য মিশেল বাইরে গিয়েছে। তাই মেয়েদের দেখাশোনার জন্য আগেই ঘরে ফিরি আমি। আমার ডাকে মালিয়া দৌড়ে এসে লাফিয়ে আমার কোলে চড়ে বসে। তাকে কোল থেকে নামানোর পর পেছন ফিরে দেখি সোনালি চুলের একটি মেয়ে রান্নাঘর থেকে উঁকি দিচ্ছে। বড় বড় কাচের চশমা তার চোখে। আমি জিজ্ঞেস করি, ও কে?

মালিয়া বলল, 'ও স্যাম, আজ আমাদের খেলার দিন। তাই ও এসেছে।'

'হাই, স্যাম' বলে, আমার হাতটা বাড়িয়ে দিই স্যামের দিকে। দেখি, আমার হাত ধরে আলতো নাড়া দেয়ার আগে অনেকটা হতাশ ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক সে তাকাচ্ছে। মালিয়া আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

'শোনো, ড্যাডি... তুমি কখনো শিশুদের সাথে হ্যান্ডশেক করবে না।'

www.pathagar.com

'তুমি করো না?'

'না', মালিয়ার উত্তর। 'টিনএজাররাও এখন হ্যান্ডশেক করে না। তুমি হয়তো খেয়াল করোনি। কিন্তু এটা একবিংশ শতাব্দী।' মালিয়া স্যামের দিকে তাকাল। মনে হলো, মেয়েটি অনেক কষ্টে হাসি দমিয়ে রাখছে।

'তুমি শুধু বলবে– হাই'। মাঝে মধ্যে হাত নাড়াতে পারো। এটাই যথেষ্ট।'

'আচ্ছা, আমার মনে থাকবে। তোমাকে আর কখনো বিব্রতকর অবস্থায় ফেলব না।'

হেসে দিয়ে মালিয়া বলল, 'ঠিক আছে, ড্যাডি। তুমি জানতে না। তুমি তো বড়দের সাথে হ্যান্ডশেক করতে অভ্যস্ত।'

'তুমি ঠিক বলেছো। তোমার বোন কোথায়?'

'সে ওপরতলায়।'

ওপরে উঠে দেখি শাশা একটি প্যান্টি ও গোলাপী রঙের টপস পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করার জন্য টেনে বসাল। এরপর বলল, সে পরার মতো কোনো শর্টস নাকি খুঁজে পাচ্ছে না। আমি তার ক্লজেট খুলেই একজোড়া নীল রঙের শর্টস দেখে তা বের করি।

তাকে বলি, এই নাও।

দেখি শাশা ভ্রূ কুঁচকে তবুও দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার কোলে চড়ে বসল। বলল, এই শর্টস পরা যাবে না, ড্যাডি। আমরা আবার ক্লজেটের কাছে গিয়ে ড্রয়ার খুললাম। আরেক জোড়া পেলাম। ওটাও নীল রঙের। 'এটা হবে?' আমি জিজ্ঞেস করি।

শাশা আবার আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। সে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার মায়ের তিন ফুটি সংস্করণ। ঘরে কী ঘটছে তা দেখার জন্য মালিয়া ও স্যাম এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল।

এবার মালিয়া বলল, 'শাশা এগুলো পছন্দ করবে না।'

আমি শাশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, ' কেন?'

সে বেশ হতাশভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে যেন আমাকে বুঝতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত বলল, 'গোলাপির সাথে নীল, মেলে কিভাবে?'

মালিয়া ও স্যাম ফিকফিক করে হাসছিল। আমার মনে হলো আমি কঠোর হই এবং ওই শর্টটিই পরতে বলি। মিশেলও এ রকম অবস্থায় থাকলে তা-ই বলতো। আমি বললে মেয়ে অবশ্য আমার কথা শুনতো। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, আমার বোকামিতে সে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে।

আমি যখন আমার মেয়েদের কাছে আসি, আমার কঠোর মনোভাবটি কোথায় যেন

www.pathagar.com

হারিয়ে যায়।

আজকের অনেক সন্তানের মতো একটি পিতৃহীন গৃহে আমি বেড়ে উঠি। আমার বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন আমার বাবা ও মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বাকি জীবনে আমি তাকে জেনেছি তার পাঠানো চিঠিপত্র, আমার মা এবং নানা-নানীর কাছে গল্প শুনে। এরপর আমি সৎ বাবা পেয়েছি। তার সাথে শৈশবের চারটি বছর কাটে আমার। এরপর বাকি জীবন আমি মানুষ হই নানা-নানীর কাছে। এরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত ভালো মানুষ। তাদের স্নেহমমতায় লালিত হই আমি। এর পরও তাদের সাথে আমার সম্পর্কটি ছিল আংশিক ও অসম্পূর্ণ। আমার সৎ বাবার সান্নিধ্যও তেমন আমি পাইনি। অন্য দিকে স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন রাশভারী ধরনের। এ দুই কারণে তার সাথে খুবই অল্প সময় আমি কাটিয়েছি। অন্য দিকে নানার সংস্পর্শে দীর্ঘদিন কাটালেও তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এবং আমাকে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যেতেন।

আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন আমার নানী। মূলত তিনিই টিকিয়ে রেখেছিলেন নানার সংসারটি। অন্য দিকে আমার ওপর প্রভাব ছিল আমার মায়ের। তার ভালোবাসা এবং সুস্পষ্ট মনোবল আমার ও আমার বোনদের পৃথিবীকে একটি বিন্দুতে আটকে রাখতে পেরেছিল। তাদের ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। তাদের কাছ থেকে আমি মূল্যবোধ আত্মস্থ করেছি। যে মূল্যবোধ আমাকে আজকে পর্যন্ত আসার দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

এখনো আমার বয়স যতই বাড়ছে আমি অনুধাবন করতে পারছি ঘরে একজন দায়িত্বশীল পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া আমাদের বড় করা আমার নানী ও আমার মায়ের জন্য কতটা কষ্টকর ছিল। একজন বাবার অনুপস্থিতি সন্তানের ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা আমি জানি এবং অনুভব করি। সন্তানের প্রতি আমার বাবার দায়িত্বহীনতা, আমার সৎ বাবার দূরত্ব এবং আমার নানা-নানীর ব্যর্থতা– এ সব কিছুই আমার জন্য ছিল প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তাই আমার সন্তানেরা এমন এক বাবাকে পেয়েছে যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারে।

পরিবারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সফল। আমার বিয়ে টিকে আছে। পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার আমার ওপরই। আমি সন্তানদের স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক সম্মেলনে যাই। যোগ দিই মেয়েদের নাচের অনুশীলন ক্লাসে। মেয়েরাও আমার সান্নিধ্য উপভোগ করে বেশ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন স্বামী ও একজন বাবা হিসেবে আমার কর্তব্য যতটা সম্ভব পালনের চেষ্টা করি আমি।

আবার অন্য বাবাদের মতো অনেক ক্ষেত্রে আমিও একই রকম পরস্পরবিরোধী আবেগে ভুগি। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি এ অবস্থার জন্য দায়ী। আমি পঞ্চাশের দশকের একজন পিতার প্রতিচ্ছবি অন্তরে লালন করি এখনো। যদিও এই লালন করাটা দুরূহ হয়ে উঠছে ক্রমেই। যে পিতা ৯টা-৫টা চাকরি করে তার পরিবার চালাতেন, প্রতি

www.pathagar.com

রাতে স্ত্রী-পরিজনদের নিয়ে একসাথে রাতের খাবার খেতেন, ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন নিজেই। তখনকার সংস্কৃতিতে ঘর সামলানো একজন মায়ের চেয়ে বাবার এই ভাবমর্যাদা কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

পরিবারের একমাত্র জীবিকা উপার্জনকারী হতে না পারা, আজকের অনেক পুরুষের জন্য নৈরাশ্য, এমনকি লজ্জারও কারণ। উচ্চ বেকারত্ব ও নিম্ন মজুরি যে আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের মধ্যে বিয়ের নিম্ন হার ও পিতৃত্বের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ তা বোঝার জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কর্মজীবী পুরুষদের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের শর্ত তেমন পরিবর্তন হয়নি। নারীদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। একজন পিতা উচ্চ বেতনভোগী পেশাজীবীই হোন বা হোন একজন কারখানা শ্রমিক; এখন তাকে অতীতের চেয়ে অনেক দীর্ঘ সময় দিতে হয় কর্মক্ষেত্রে। তিনি চাইলেও তার নিজের বাবার মতো এখন নিজের সন্তানদের বেশি সময় দিতে পারছেন না।

বিগত 'পিতা দিবসে' শিকাগোর দক্ষিণ উপকণ্ঠে সালেম ব্যাপ্টিস্ট চার্চে বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পাই আমি। এর জন্য আমি কোনো প্রস্তুতি নিয়ে যাইনি। একজন পরিপূর্ণ পুরুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য যা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, কেবল সে বিষয়ে কথা বলি আমি। আমি বললাম, সাধারণভাবে সব এবং বিশেষভাবে কালো পুরুষদের পরিবারের কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন না করার পেছনে অজুহাতগুলো ভুলে যাওয়া উচিত। উপস্থিত দর্শকদের আমি মনে করিয়ে দিই, একজন বাবার অর্থ সন্তানের মুখে বাবা ডাক শোনার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যারা শারীরিকভাবে ঘরে থেকেও অনুপস্থিত থাকেন পরিবারের কাছে। এটা হয়েছে, আমাদের বেশির ভাগ বাড়িতে বাবাকে না পাওয়ার কারণে। এই দুষ্ট চক্র ভাঙার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করতে হবে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের মনে উচ্চ প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের নিজেদের প্রত্যাশা তার চেয়েও উঁচুতে তুলতে হবে।

পরে আমার বলা কথাগুলো নিয়ে আমি আবার ভাবি। নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমি যে উপদেশগুলো দিয়ে এলাম সেগুলো আমি নিজেই বা কতটুকু পালন করতে পারছি। যদিও আজ যাদের সাথে আমি কথা বলেছি তাদের অনেকের মতো টেবিলে খাবার আনার জন্য আমাকে দু'টি চাকরি বা রাতের শিফটে ডিউটির মতো প্রাণপণ লড়াই করতে হয় না। রাতে আমাকে বাসায় থাকার সুযোগ দেবে এমন কাজ আমি সহজেই জোগাড় করে নিতে পারি। আমি এমন কাজও খুঁজে নিতে পারি যা আমাকে আরো বেশি অর্থ দেবে। যে অর্থ আমার পরিবারে আরো সচ্ছলতা আনবে; মিশেল তার বাইরের কাজ কমিয়ে আরো বেশি সময় ঘরে থাকতে পারবে অথবা আমার সন্তানদের জন্য একটি মোটা অঙ্কের সঞ্চয় গড়া যাবে।

কিন্তু আমি এমন এক জীবন বেছে নিয়েছি যেখানে নিরন্তর ছুটে বেড়াতে হচ্ছে

www.pathagar.com

আমাকে। এটা এমন এক জীবন যা মিশেল বা সন্তানদের কাছ থেকে আমাকে দীর্ঘ সময় দূরে রাখছে। সংসারের সব রকম ঝক্কিঝামেলা একা মিশেলকেই সামলাতে হচ্ছে। আমি হয়তো এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি– আমার রাজনীতি তো মালিয়া ও শাশার জন্যই। এই পৃথিবী যেন তাদের জন্য একটি ভালো জায়গায় পরিণত হয়, সে চেষ্টাই তো আমি করছি। কিন্তু যখন দেখি সিনেটে ভোটের কারণে মেয়েদের স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারছি না অথবা অধিবেশনের মেয়াদ বাড়ায় এবার আমাদের বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে না– আর এ কথা বলার জন্য মিশেলকে ফোন করি, তখন ওই যুক্তি খুব দুর্বল এবং দুঃখজনকভাবে বিমূর্ত বলে মনে হয়। রাজনীতিতে আমার সাম্প্রতিক সাফল্যও এই অপরাধবোধকে উপশম করতে পারেনি। মিশেল একবার মেয়েদের উদ্দেশে কৌতুক করে বলেই ফেলল, তোমাদের বাবার ছবি পত্রিকায় দেখলে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু বারবার তা দেখা বেশ বিব্রতকর।

তাই এই অভিযোগের জবাব দিতে সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকি আমি। যখন আমি শহরে থাকি তখন চেষ্টা করি রাতের খাবারটি ঘরেই সারতে। চেষ্টা করি মালিয়া ও শাশার সাথে বসে গল্প করতে। তাদের সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি শুনি। তাদের গল্পের বই পড়ে শোনাই, বিছানায় গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসি। রোববার যেন কোনো কাজ না থাকে, সে চেষ্টা করি সব সময়। গ্রীষ্মকালে এই সময় মেয়েদের আমি চিড়িয়াখানা বা সুইমিং পুলে নিয়ে যাই। আর শীত হলে যাই কোনো জাদুঘর বা অ্যাকুয়ারিয়াম দেখতে। মেয়েরা কোনো অশোভন আচরণ করলে মৃদুস্বরে তাদের ধমকও দিই। চেষ্টা করি, যেন তারা টিভি কম দেখে বা জাঙ্ক ফুড কম খায়। এসব ব্যাপারে মিশেলের কাছ থেকে উৎসাহ পাই আমি। যদিও কখনো কখনো আমার মনে হয় মিশেলের ক্ষেত্রটিকে আমি দখল করে নিচ্ছি। তাই যখন বাড়ি থাকি না তখন, তার গড়ে তোলা ভুবনে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকি আমি।

আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মেয়েরা দিব্যি বেড়ে উঠছে। এটা প্রধানত হয়েছে সন্তান লালনে মিশেলের দক্ষতার কারণে। মালিয়া ও শাশার প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নিখুঁত। সন্তানদের দমিয়ে না রেখেই তাদের চার দিকে একটি দৃঢ় গণ্ডি সৃষ্টি করে রাখতে পারছে সে। আমার সিনেট নির্বাচন যেন মেয়েদের দৈনন্দিন রুটিনে খুব একটা ব্যত্যয় না ঘটায় সেটাও নিশ্চিত করে মিশেল। অথচ এখন আমেরিকার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরগুলোতে দেখি বাবা-মায়ের কাজের ধরনের সাথে সাথে সন্তানরাও বদলে যেতে শুরু করেছে। খাবারের সময়ের আগে চলে এসো– এ কথা বলে আগের দিনে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের ঘরের বাইরে অথবা কোনো পার্কে ঘুরতে পাঠিয়ে দিতেন। আর আজ তাদের খেলার জন্য আলাদা দিন থাকে। থাকে ব্যালে বা জিমন্যাস্টিকস ক্লাস, টেনিস খেলা বা পিয়ানো বাজানো শেখার ক্লাস, সকার লিগ ইত্যাদি। এসব যেন একেকটি সাপ্তাহিক 'বার্থ ডে পার্টি'। আমি মালিয়াকে একবার বলেছিলাম, ছোটবেলায় মাত্র দু'বার আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এগুলোতে উপস্থিত ছিল মাত্র পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে। কয়েকটি টুপি আর কেক ছাড়া কিছু ছিল না সেখানে। মালিয়া এমন

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে; আমি যেভাবে মহামন্দার গল্প শুনে তাকিয়ে থাকতাম নানুর মুখের দিকে ঠিক যেন সেরকম।

সন্তানদের সব কাজ সমন্বয় করার দায়িত্ব মিশেলের ওপর। একজন জেনারেলের দক্ষতায় কাজগুলো সামাল দিত সে। সুযোগ পেলে আমি তার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হতাম মাত্র। সে আমার প্রশংসা করলেও আমাকে যেন অতিরিক্ত কাজ করতে না হয় সে ব্যাপারেও সব সময় তার সতর্ক দৃষ্টি থাকে। এই জুনে শাশার জন্মদিনের আগের দিন আমাকে বলা হলো ২০টি শিশুর জন্য বিশটি বেলুন, পর্যাপ্ত চিজ পিজা ও আইসক্রিমের অর্ডার দেয়ার জন্য। কাজটি আমার কাছে তেমন কঠিন কিছু মনে হলো না। তাই এরপর মিশেল যখন বলল, অনুষ্ঠানের পর বিতরণের জন্য সে 'গুডি ব্যাগ' আনতে যাচ্ছে– তখন ওই কাজটিও করতে চাইলাম আমি। সে হাসল।

'তুমি গুডি ব্যাগ সামলাতে পারবে না', বলল সে। 'গুডি ব্যাগ কী তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে তোমাকে কোনো পার্টি স্টোরে গিয়ে ব্যাগগুলো পছন্দ করতে হবে। এরপর তোমাকে পছন্দ করতে হবে এগুলোর মধ্যে কী দেবে। ছেলেদের ব্যাগে কী দেবে, আর মেয়েদের ব্যাগে কী দেবে সেগুলোও বাছাই করতে হবে। তুমি সেখানে গিয়ে অসংখ্য জিনিসের মাঝে এক ঘন্টা ঘুরবে এবং এরপর তোমার মাথা ঘুরতে থাকবে।'

অনেকটা ইতস্তত মনোভাব নিয়ে আমি ইন্টারনেটে সার্চ করা শুরু করি। আমি জিমন্যাস্টিকস স্টুডিওর কাছেই বেলুন বিক্রি হয় এমন একটি স্থান খুঁজে পাই। একটি পিজার দোকান আমাকে বিকেল পৌনে ৪টার মধ্যে পিজা সরবরাহ করতে পারবে বলে জানাল। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল বেলুনগুলো জায়গামতো রাখা হয়েছে। জুসবক্স শোভা পাচ্ছে বরফের ওপর। অন্য বাবা-মায়ের সাথে আমি বসে দেখছিলাম ২০-২৫টি শিশুর উচ্ছলতা। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ লাফাচ্ছে এসব। কিন্তু ৩টা ৫০ মিনিট বেজে যাওয়ার পরও পিজা না আসায় কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি আমি। শিশুদের খাবারের নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগে এসে পিজা পৌঁছে। আমার উদ্বেগ দেখে মিশেলের ভাই ক্রেইগ এসে আমাকে সান্ত্বনা দেয়। মিশেল নিজেই সবার প্লেটে পিজা তুলে দেয়।

খাওয়া-দাওয়া, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' গাওয়া ইত্যাদি সবকিছু শেষ হলো। এবার জিমন্যাস্টিকস ইনস্ট্রাক্টর সব বাচ্চাকে একটি পুরনো, বহুরঙা প্যারাসুটের চার পাশে জড়ো করে শাশাকে এর মাঝখানে দাঁড়ানোর জন্য বলে। এক দুই তিন বলার সাথে সাথে শাশা লাফিয়ে ওপর দিকে উঠছে, আবার নামছে। এভাবে একবার, দু'বার, তিনবার। প্রতিবারই লাফিয়ে ওঠার সাথে সাথে তার চোখ-মুখ থেকে যেন ঠিকরে বেরোচ্ছিল এক অনাবিল আনন্দ।

আমি ভাবতে থাকি শাশা যখন বড় হবে, তার কী মনে থাকবে আজকের এই আনন্দঘন মুহূর্তের কথা। সম্ভবত না। কারণ, আমার নিজেরই পাঁচ বছর বয়সকালের

www.pathagar.com

কোনো স্মৃতি মনে নেই। কিন্তু, প্যারাসুট জাম্পে যে আনন্দ সে পাচ্ছে তা চিরকাল গেঁথে থাকবে তার অন্তরে। এ ধরনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো একত্রে জড়ো হয়ে একসময় তাদের হৃদয়ের একটি অংশ হয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে আমি যখন মিশেলকে তার বাবার গল্প বলতে শুনি, তার মধ্যেও আমি একই আনন্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। বাবার প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান তা ফ্রাসিয়ার রবিনসনের খ্যাতি বা অসাধারণ কোনো কাজের জন্য নয়; প্রতিদিন ছোট ছোট ও সাধারণ কাজগুলোর মধ্য দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে এ ভালোবাসা সঞ্চিত হয়েছে সন্তানের মনে। আমার সন্তানরাও আমার কথা এভাবে বলবে কি না, সেকথা ভাবতে থাকি আমি। তবে, এ রকম স্মৃতি তৈরির ক্ষেত্রটি মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। মালিয়া জীবনের আরেক ধাপে পা দিতে শুরু করেছে। ছেলেদের প্রতি এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছে সে। কী গায়ে দিচ্ছে, সে ব্যাপারেও অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠছে। এমনিতেই বয়সের চেয়ে অনেক বেশি পরিণত মনে হয় তাকে। বিচক্ষণও বেশ। যখন তার ছয়, তখন আমরা একবার লেকের পাড়ে হাঁটছিলাম। হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমাদের পরিবার ধনী কি না। আমি বলি, সত্যিকার অর্থে আমরা ধনী নই। কিন্তু, বেশির ভাগ মানুষের যা আছে তাদের থেকে কিছুটা বেশিই আছে আমাদের। কেন সে এ কথা জানতে চায়, সে কথা জিজ্ঞেস করি আমি।

'আসলে... আমি এটা নিয়ে ভাবছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি কখনোই অনেক অনেক ধনী হবো না। আমি একটি সাধারণ জীবন চাই।'

তার কথাগুলো আমার কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হলেও আমি হেসে ফেলি। সেও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। তার চোখ কিন্তু বলছিল, মুখে যা বলেছে মনেও সে তা বিশ্বাস করে।

আমাদের এই কথোপকথন নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আমার কোন জিনিসটি দেখে মালিয়ার মনে হয়েছে যে আমরা সাধারণ জীবনযাপন করছি না? নিশ্চয়ই সে দেখেছে তার সকার খেলা দেখতে অন্য সহপাঠীদের বাবারা যেভাবে যায়, আমি সেভাবে যাই না। এটা যদি তাকে হতাশ করে, তবে সে কিন্তু তা স্পষ্ট করে বলেনি। এই ভেবে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম, আমার আট বছরের মেয়েটি আমাকে অনেক ভালোবাসে। তাই আমার ব্যর্থতাগুলো সে উপেক্ষা করে গেছে।

সম্প্রতি সিনেটের সাপ্তাহিক অধিবেশন আগেভাগে শেষ হওয়ায় আমি মালিয়ার একটি খেলা দেখতে যাওয়ার সুযোগ পাই। সেটি ছিল গ্রীষ্মকালের এক চমৎকার বিকেল। আমি পৌঁছার আগেই বেশ কয়েকটি মাঠ দর্শকে পূর্ণ হয়ে যায়। পরিবারের সবাই মিলে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে এসেছে। গোটা শহর থেকে কালো ও সাদা, ল্যাটিনো ও এশিয়ান পরিবারগুলো এসে ভিড় জমিয়েছে এখানে। লন চেয়ারে বসে গল্প করছেন মহিলারা। বাবারা ছেলেদের সাথে বল খেলছেন। নানী-দাদীরা তাদের ছোট্ট নাতি-নাতনীটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। আমি আর মিশেল ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। শাশা এসে বসল আমার কোলে। মালিয়া আগেই বল নিয়ে ছুট

www.pathagar.com

দিয়েছে মাঠের মধ্যে। সে এখন মাঠের মধ্যে বলের পেছনে ছুটতে থাকা একঝাঁক ছেলেমেয়ের একজন। যদিও সকার ওর জন্য স্বাভাবিক খেলা নয়। লম্বায় ইতোমধ্যে সে সমবয়সী বন্ধুদের ছাড়িয়ে গেছে। তার পদক্ষেপগুলোও দৈহিক বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে দৃঢ় নয়। এর পরও প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সে খেলছে এবং আমরাও চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছি তাকে। খেলার বিরতির সময় মালিয়া আমাদের কাছে আসে।

'খেলা কেমন লাগল তোমার?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

'খুবই ভালো!' সে কয়েক ঢোক পানি খেলো। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বাবা।' 'বলো।' 'আমরা কি একটি কুকুর পুষব?' 'তোমার মা কী বলে?' 'সে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে। তার মত পাওয়া যাবে।' আমি মিশেলের দিকে তাকাই। সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মিটিমিটি হাসছে।

'ঠিক আছে।' মালিয়া আরেক ঢোক পানি খেলো। আমার গালে চুমু দিয়ে সে বলল, 'তুমি বাড়ি থাকায় আমি খুবই খুশি।'

আমি কোনো উত্তর দেয়ার আগেই ঘুরে মাঠের পথ ধরেছে সে। সেই মুহূর্তে তার ওপর ঠিকরে পড়ছিল গোধূলির রক্তিম আভা। আমার বড় মেয়েটি কিভাবে একজন নারীতে পরিণত হচ্ছে, সেই দৃশ্য ভেসে ওঠে আমার চোখে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে পরিণত বয়সের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তার দীর্ঘ পদযুগল তাকে নিয়ে যাচ্ছে নিজস্ব একটি জীবনের পথে।

আমি ছোট মেয়ে শাশাকে আরো শক্ত করে কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরি। আমার মনের কথাটি হয়তো মিশেল পড়ে ফেলতে পেরেছিল। সে আমার হাতটি তুলে নেয়। মিশেলের একটি কথা এ সময় মনে পড়ে যায় আমার। আমার নির্বাচনী প্রচারকালে এক রিপোর্টার তার কাছে জানতে চেয়েছিল, একজন রাজনীতিকের সহধর্মিণী হওয়া কেমন। এর জবাবে সে বলেছিল, 'খুবই কঠিন'। এরপর রিপোর্টারের মতে, সে নাকি চোরা হাসি দিয়ে আরো বলেছিল, 'আর তাই বারাক, ওরকম একজন কৃতজ্ঞ মানুষ।'

আসলেই, ঠিক কথা বলেছে সে।

www.pathagar.com

উপসংহার

www.amarboi.org

২০০৫ সালের জানুয়ারিতে আমেরিকান সিনেটের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করি। এর মধ্য দিয়ে, তারও দুই বছর আগে সিনেটে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে যে প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলাম তার অবসান ঘটে। সেই সাথে শুরু হয় আমার তুলনামূলক অখ্যাত জীবন থেকে একজন গণমানুষের জীবন।

সত্যিকার অর্থে এর পরও অনেক কিছুই অপরিবর্তিত থেকে যায় আমার। আমার পরিবার তখন বাস করতো শিকাগোতে। চুল কাটার জন্য আমি হাইডপার্কের সেই নাপিতের দোকানে যাই। নির্বাচনের আগে আমার ও মিশেলের যেসব বন্ধু ছিল তারা এখনো আছে। আর আমার মেয়েরা সেই একই মাঠে দৌড়ঝাঁপ ও খেলাধুলা করে।

সন্দেহ নেই, পৃথিবীটা আমার জন্য এমন গভীরভাবে বদলে গেছে যা কখনোই আমি চাইনি। আমার কথা, আমার কাজ, আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা, আমার কর বিবরণী– সবই যেন সকালের সংবাদপত্র অথবা রাতের খবরে সম্প্রচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মেয়েরা বাবার সাথে চিড়িয়াখানায় গেলে লোকজন তাদের আটকে নানা কিছু জিজ্ঞেস করে। এমনকি শিকাগোর বাইরে অন্য কোথাও কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে যাওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যিকার অর্থে, এসব দিকে গভীর মনোযোগ দেয়াটা আমার জন্য বেশ কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। তবে, এখনো এমন দিনও হয় যখন আমি প্যান্টের সাথে বেমানান স্যুট জ্যাকেট পরে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। আমার সম্পর্কে বাইরে যে ধারণা রয়েছে অথবা আমাকে যেভাবে তুলে ধরা হয় তার তুলনায় আমার চিন্তা বেশ খানিকটা অগোছালো। আমার দিনগুলো অতটা শৃঙ্খলার মধ্যে কাটে না। এ নিয়ে মাঝে মধ্যে বেশ হাস্যরসেরও সৃষ্টি হয়। আমার মনে পড়ে, শপথ গ্রহণের আগের দিন আমার স্টাফ এবং আমি আমাদের অফিসে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিই। জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে তখন ১০০ জন সিনেটরের মধ্যে আমার অবস্থান ৯৯তম স্থানে। সিনেট সাপ্লাই স্টোরের হলঘরের বিপরীতে ডিবকেন অফিস ভবনের বেজমেন্টের অফিসটি

www.pathagar.com

রিপোর্টারদের দিয়ে একেবারে ভর্তি হয়ে যায়। এই ভবনে তখন প্রথমবারের মতো আসি আমি। এখানে আমি কোনো ভোটও দিইনি অথবা কোনো বিলও নিইনি। এমনকি প্রথম রিপোর্টার প্রশ্ন করেন–'সিনেটর ওবামা ইতিহাসে আপনার স্থানটা ঠিক কোথায়'– তখন পর্যন্ত আমার ডেস্কে বসতেও পারিনি।

সেদিনের সংবাদ সম্মেলনে কিছু কিছু রিপোর্টারকে হাসতেও দেখা যায়।

বোস্টনে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনে আমার বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো কোনো অতিশয়োক্তিতে কেউ হয়তোবা পুরনো উৎস খুঁজতে পারেন। বোস্টন কনভেনশনের তখনকার বক্তব্যের মাধ্যমে আমি প্রথম জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বস্তুত যে প্রক্রিয়ায় আমি মুখ্য বক্তা হিসেবে কনভেনশনে নির্বাচিত হয়েছিলাম তা আমার কাছেও বেশ বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। ইলিনয় প্রাইমারির পর আমি প্রথমবারের মতো উইলিয়াম কেরির সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি তখন কেরির জন্য তহবিল সংগ্রহের এক সভায় বক্তব্য রাখি। আর চাকরির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে অংশ নিই। এর কয়েক সপ্তাহ পর জানানো হয়, কেরির লোকজন আমাকে ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনে বক্তা হিসেবে পেতে চাচ্ছেন। যদিও কোন যোগ্যতা বলে আমি সেখানে বক্তব্য রাখব, তখন পর্যন্ত আমার কাছে তা পরিষ্কার নয়। একদিন বিকেলে প্রচারাভিযানে অংশ নেয়ার জন্য স্প্রিংফিল্ড থেকে শিকাগো ফিরছিলাম। উইলিয়াম কেরির প্রচারণা ম্যানেজার ম্যারি বেথ ক্যাটিল আমাকে টেলিফোন করে খবরটি জানান। ফোন শেষ করার পর আমি ড্রাইভার মাইক সিগনেটরের কাছে এলাম।

আমি বললাম, 'আমার ধারণা, এটি অনেক বড় বিষয়।'

মাইক জবাব দেয়, 'আপনি সেটি অবশ্যই বলতে পারেন।'

এর আগে মাত্র একটি ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। সেটি হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলসে ২০০০ সালে। আমার সেই কনভেনশনে যোগদানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। ইলিনয়ের প্রথম কনগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট সিটের জন্য ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে হেরে গিয়ে সবেমাত্র আমি ফিরেছি। আর তখন আমি আমার ল ফার্মে গ্রীষ্মকালীন কাজের জন্য কিছু সময় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। প্রচারকাজের জন্য আমি ল ফার্মে কোনো সময় দিতে পারিনি বললেই চলে। একই সাথে আমার স্ত্রী ও মেয়েদের গত ছয় মাসে যে একেবারেই কম সময় দিয়েছি তা পুষিয়ে দেয়ার চিন্তা করি।

একেবারে শেষ সময়ে আমার কিছু বন্ধু ও সমর্থক কনভেনশনে যোগ দেয়ার জন্য আমাকে জোরাজুরি করে। তারা বলে যে, জাতীয় পর্যায়ের কিছু যোগাযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে আমার। তারা বলে, আমি অন্য কোথায়ও প্রার্থী হলে তখন এ সম্পর্ক কাজে লাগবে। হয়তোবা তাদের বক্তব্য কিছুটা হাসির বিষয়ও হতে পারে। আমার ধারণা খোলামেলা না বললেও তারা মনে করেছে কনভেনশনে যাওয়ার সফরটি আমার জন্য মঙ্গলজনক থেরাপি হবে। একটি তত্ত্ব আছে– ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ার পর উত্তম কাজ হয় আবার ঘোড়াটির পিঠে উঠে তা ভালোভাবে চালানো।

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত আমি লস অ্যাঞ্জেলসের বিমানে টিকিট বুকিং দিই। বিমান থেকে নামার পর হের্টজ রেন্ট-এ-কারের একটি গাড়ি নিতে যাই। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে আমার আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডটি দিই এবং একটি সস্তা দরের হোটেল পেতে নির্দেশিকা ম্যাপটির প্রতি চোখ রাখি। ভেনিস বিচের পাশে একটি হোটেল পেয়েও যাই। কয়েক মিনিট পর হের্টজের মেয়েটি ফিরে আসে এবং আমার প্রতি কিছুটা বিব্রতকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'দুঃখিত ওবামা আপনার কার্ড ফেরত চলে এসেছে।'

আমি বলি, 'এটা তো হওয়ার কথা নয়, আপনি আবার চেষ্টা করে দেখুন।'

'আমি দু'বার চেষ্টা করেছি স্যার, প্রয়োজন বোধে আমেরিকান এক্সপ্রেসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।'

আমি ফোন করার আধ ঘণ্টা পর আমেরিকান এক্সপ্রেসের এক দয়ালু সুপারভাইজার আমার কার ভাড়াটি অনুমোদন করেন। তবে আসল দৃশ্যপট হাজির হয় একটু পরে– যাতে কী হতে যাচ্ছে তার আভাস আমি পাই। বলা হয়, ডেলিগেট না হওয়ায়, আমাকে ফ্লোরপাস দেয়া হলো না। ইলিনয়ের পার্টির চেয়ারম্যানের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমাকে কেবল কনভেনশনস্থলে যাওয়ার একটি অনুমতিপত্র দেয়া হলো। স্টেপলাস সেন্টারের বিভিন্ন স্থানে থাকা টেলিভিশন স্ক্রিনে আমি কনভেনশনের অধিকাংশ বক্তব্য শুনতে ও দেখতে পারব। মাঝে মধ্যে স্কাইবক্সে বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত অন্যদের সাথে দেখা করতে পারব। তার মানে হলো, আমি সেখানে থাকতে পারব না। মঙ্গলবার রাতেই আমি বুঝতে পারি এখানে উপস্থিতি আমার নিজের অথবা ডেমোক্র্যাট কনভেনশনের কোনো কাজেই আসছে না। এরপর বুধবার সকালে প্রথম ফ্লাইটে আমি শিকাগো ফিরে আসি।

আগেরবারের ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন গেটে এক অনাহূত ব্যক্তি আর কনভেনশনের মুখ্য বক্তা দুই ভূমিকার বিরাট ব্যবধানে বোস্টনে আমার ভূমিকা কেমন হবে ভেবেও কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলাম। তবে এর মধ্যে প্রচারাভিযানে ভূমিকার কারণে আমি বেশখানিকটা আলোচনায় চলে এসেছি। আমি কোনো ধরনের স্নায়ুচাপে ভুগিনি। মিজ ক্যাহিলের ফোনকল পাওয়ার কয়েক দিন পর স্প্রিংফিল্ডে আমি আমার হোটেল রুমে ফিরি। একটি বাস্কেটবল খেলা দেখতে দেখতে আমি বক্তব্যের একটি খসড়া তৈরি করে ফেলি। আমি প্রচারাভিযানের সময় যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছিলাম সেগুলোই মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে চিন্তা করি। আমি বলেছিলাম, আমেরিকার জনগণকে সুযোগ দেয়া হলে তারা কঠিন কাজ করতেও প্রস্তুত। এ জন্য সরকারকে সুযোগের ভিতটা তৈরি করে দিতে হবে। আমেরিকানরা একজন অন্যজনের প্রতি পারস্পরিক দায়বোধ করে বলে আমার বিশ্বাস। আমি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ইরাক যুদ্ধসহ যেসব বিষয়ে কথা বলব তার একটি তালিকা তৈরি করি।

তবে প্রচারাভিযানের সময় যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের সবার কথা আমি চিন্তা করি। আমি গ্যালেসবার্গের টিম হুইলার ও তার স্ত্রী কথা ভাবি। কিভাবে তারা

www.pathagar.com

নিজেদের তরুণ পুত্রের লিভার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেছেন। আমি ইস্ট মলাইনের সেই সিমাস আহেরন নামের তরুণের কথাও ভাবি। দেশের সেবা করার জন্য ইরাকের পথে ছিলেন সিমাস। তার পিতার চেহারায় গর্ব এবং আতঙ্ক দু'টোই ছিল। ইস্ট সেন্ট লুইসে দেখা সেই কালো মেয়েটির কথা আমি ভাবি। তার নামটি আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। মেয়েটি আমাকে বলেছিল কিভাবে সে কলেজের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও তার পরিবারের কারো পক্ষেই স্কুল পর্ব পার হওয়া সম্ভব হয়নি।

এটি শুধু সেসব লোকেরই সংগ্রাম নয়, যাদের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। অধিকন্তু এটি হলো তাদের দৃঢ়সঙ্কল্প, তাদের আত্মনির্ভর হওয়ার চেষ্টা, তাদের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রচণ্ড আশাবাদ। এটি আমার মনে আমার যাজক রেভ জেবেমিয়াহ রাইট জুনিয়রের একটি উদ্ধৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। ধর্মীয় অভিভাষণে তিনি এর উল্লেখ করেছিলেন।

সেটি ছিল, দি অডাসিটি অব হোপ– প্রত্যাশার স্পর্ধা।

এটিই ছিল সর্বোত্তম আমেরিকান উদ্দীপক চেতনা। আমি ভাবি সব ধরনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও বিশ্বাসের স্পর্ধা থাকতে হবে যাতে আমরা নানা সত্তাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জাতিকে একটি ইতিবাচক বোধ বা চেতনার ধারায় নিয়ে আসতে পারি। চাকরি হারানো, পরিবারের অসুস্থতা, শৈশবে দারিদ্র্যের কশাঘাত– এ ধরনের ব্যক্তিগত দুঃখদুর্দশা সত্ত্বেও বিশ্বাসের তিক্ত অনুভূতির ওপর আমাদের কিছু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর আছে আমাদের নিজস্ব নিয়তির পরও কিছু দায়িত্ববোধ।

আমি মনে করি, সেটিই ছিল স্পর্ধা যা আমাদের একক সত্তায় পরিণত করে। এটি ছিল সেই প্রত্যাশার ব্যাপকভিত্তিক দুর্বিনীত চেতনা যা আমার নিজের পরিবারের কাহিনীকে বৃহত্তর আমেরিকান কাহিনীর সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। আর আমার নিজের কাহিনীকে সেসব ভোটারের সাথে যাদের আমি প্রতিনিধিত্ব করি।

আমি বাস্কেটবল খেলা দেখা বন্ধ করে মন দেই লেখায়।

কয়েক সপ্তাহ পর আমি বোস্টন পৌঁছাই। তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে হোটেল থেকে ফ্লিট সেন্টারে এসে আমি প্রথম গণমাধ্যমের মুখোমুখি হই। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বের আগে টিম রুজার্ট ১৯৯৬ সালে ক্লেভেল্যান্ড প্লেইন ডিলারের সংবাদ সম্মেলনে আমার বক্তব্যের একটি অংশবিশেষ স্ক্রিনে দেখান। এর পুরো বিষয়টি আমি একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিলাম– যেখানে কেউ একজন আমাকে প্রশ্ন করে ইলিনয়ের রাজ্য সিনেটের একজন প্রার্থী হয়ে সবে রাজনীতি শুরু করা ব্যক্তি হিসেবে আমি শিকাগোর ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশন সম্পর্কে কী ভাবছি।

'কনভেনশন বিক্রির জন্য, ঠিক... আপনি এখানে ১০ হাজার ডলারের বিনিময়ে

www.pathagar.com

গোল্ডেন সার্কেল ক্লাবে এক প্লেট ডিনার পাবেন।' আমি ভাবি যখন সাধারণ ভোটাররা এটি দেখবে তারা যথার্থই অনুভব করবে যে এ প্রক্রিয়ায় তাদের স্থান নেই। তারা ১০ হাজার ডলার দিয়ে ডিনারে অংশ নিতে পারবে না। কারা এ ধরনের প্রবেশাধিকার নিতে যাচ্ছেন তা তারা কল্পনাই করতে পারে না। স্ক্রিন থেকে এ উদ্ধৃতি মুছে যাওয়ার পর টিম রুজার্ট আমার কাছে আসেন এবং বলেন, '১৫০ জন দাতা এই কনভেনশনের জন্য ৪ কোটি ডলার দান করেছেন। আপনারও মনে হবে শিকাগোর চেয়েও খারাপ অবস্থা এখানে। এইটি কি আপনার মন খারাপ করছে? আর আপনি সাধারণ ভোটারদের কাছে কী বার্তা পৌঁছাবেন।

আমি বলি, রাজনীতি আর অর্থ এটি দু'দলের জন্যই একটি সমস্যা। তবে জন কেরির ভোটের রেকর্ড অনুসারে এবং আমার নিজের রেকর্ড অনুযায়ী আমরা ভোট পাই দেশের জন্য সর্বোত্তম কিছু করতে। একটি কনভেনশন এটি পরিবর্তন করতে পারবে না। যদিও এই সকল প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এমন মানুষের মধ্য থেকে অধিক ডেমোক্র্যাটের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেই আমি। অধিক ব্যক্তি তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের সাথে থাকার পাশাপাশি আমরা সাধারণের আস্থাভাজন থাকলে দলকে শক্তিশালী করতে পারব।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আমার ১৯৯৬ সালের উদ্ধৃতিটি ছিল উত্তম। এমন এক সময় ছিল যখন রাজনৈতিক কনভেনশন জরুরি বিষয়-আশয় আর রাজনীতির নাটকীয়তায় ভরপুর ছিল। তখন মনোনয়ন নির্ধারণ করতেন ফ্লোর ম্যানেজাররা এবং মাথা গুণে, পক্ষ দেখে আর হস্ত উত্তোলনে জয় কার হলো তা দেখা হতো। তখন আপত্তি উঠলে অথবা ভোট গণনায় ভুলভ্রান্তি হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হলে দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থবার পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হতো। তবে সে সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। প্রাইমারির বর্তমান ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর দলের কর্মকর্তাদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে আর অন্তরালের নানা বোঝাপড়া শেষ হয়ে যায়। এখনকার কনভেনশনে কোনো আকস্মিকতা থাকে না। এর পরিবর্তে এতে দল এবং দলের মনোনীত প্রার্থীর জয়ের জন্য সপ্তাহব্যাপী নানা কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। আর একই সাথে চার দিনের খাদ্য, পানীয়, বিনোদন এবং অন্যান্য কাজে সহায়তাকারী প্রধান প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও দলের বিশ্বস্তদের জন্য কী করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়।

আমি কনভেনশনের প্রথম তিন দিন আমার ভূমিকা পালনের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করি। প্রধান প্রধান ডেমোক্র্যাট পৃষ্ঠপোষক দাতার সাথে আমি কথা বলি এবং ৫০টি রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিদের সাথে প্রাতঃরাশ করি। আমি ভিডিও মনিটরের সামনে আমার ভাষণ নিয়ে চর্চা করি। সেটি কিভাবে অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করতে হবে তা দেখি। কোথায় আমাকে থামতে হবে, কোথায় আন্দোলিত হতে হবে এবং কিভাবে মাইক্রোফোনের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করি। আমার কমিউনিকেশন ডিরেক্টর রবার্ট গিবস এবং আমাকে ফ্লিটিং সেন্টারে বেশ ক'বার ওঠা-নামা করতে হয়েছে, কখনো মাত্র দুমিনিটের ব্যবধানে। এবিসি, এনবিসি, সিবিএস,

www.pathagar.com

সিএনএন, ফক্স নিউজ ও এনপিআর–সবাই কেরি-এরওয়ার্ড টিমের সরবরাহ করা আলোচ্য পয়েন্টের ওপর গুরুত্ব দেয়া। যার প্রতিটি শব্দ নানা জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ যাচাই বাছাই করে ঠিক করে দেয়।

দিনটি যেভাবে আমার ব্যস্ততার মধ্যে পার হয় তাতে আমার ভাষণ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো সময়ই পাইনি। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত এভাবেই চলে। একবার আমার স্টাফ আর মিশেল কোন্ টাইটি আমি পরব তা নিয়ে বিতর্ক করে আধ ঘণ্টার বেশি সময় পার কওে (অবশেষে এ বিতর্কের ফয়সালা হয় রবার্ট গিবস যেরকম টাই পরেছিলেন, সেরকম একটি টাই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে)। 'গুডলাক।' আর 'তাদেরকে নরকে পাঠাও, ওবামা।' অবাক করা শব্দগুলো শুনি যখন আমরা টেরেসা হেইন্জ কেরির সদয় সাক্ষাতের জন্য তার হোটেল রুমে যাই। পরে মিশেল ও আমি আমার বক্তৃতা বসে সম্প্রচার প্রত্যক্ষ করি। এ সময় আমি বেশ স্নায়ুচাপে ভুগছিলাম। আমি মিশেলকে বলি আমার পেটে চাপ অনুভব করছি। সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে, চোখ পাকিয়ে বলে 'পাগলামি কোরো না, প্রিয়তম।'

আমরা দু'জনই হাসি। একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার হোল্ড রুমে আসে এবং বলে আমার মঞ্চের পেছনে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কালো পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে শুনি ডিক ডারবেইন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এ সময় মনে পড়ে আমার মা, বাবা ও নানার কথা– তারা আজ দর্শকসারিতে থাকলে কতটা না ভালো হতো। হাওয়াইয়ে আমার নানীর কথা ভাবি। তিনি টিভি স্ক্রিনেই অনুষ্ঠান দেখছেন। পিঠের ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় তার পক্ষে ভ্রমণ সম্ভব হয়নি। আমি আমার সব স্বেচ্ছাসেবী সমর্থকের কথা মনে করি, যারা আমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন।

প্রভু, আমাকে তাদের জন্য কথা বলার শক্তি দাও– আমি নিজে নিজে বলি। এরপর আমি মঞ্চের দিকে হেঁটে যাই।

সত্যি বলতে কি আমি যদি উল্লেখ করি বোস্টন কনভেনশনে আমার বক্তব্যের ইতিবাচক সাড়া আমাকে ব্যক্তিগতভাবে উৎফুল্ল করেনি, তাহলে আমি মিথ্যা বলব। আমি অনেক চিঠি পেয়েছি। আমি ইলিনয়ে ফিরে আসার পর অনেক মানুষ আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। যত কিছুই হোক, গণবিতর্কে প্রভাব ফেলার মতো কিছু রাজনৈতিক অবদান আমি রাখতে পেরেছি। আমি ভাবি, আমার এমন কিছু বলার আছে যা জাতিকে দিকনির্দেশনা দানের জন্য প্রয়োজন।

আমার সেই ভাষণের পর প্রচারের যে প্রবল ধারা চলতে থাকে তা আমার জন্য তাৎক্ষণিক সুনাম বয়ে নিয়ে আসে। এটি ছিল পরিবর্তনের হাজারো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ঘটনাজাত একটি বিষয়। ঘটনাটি গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে তা নয়, তবে রাস্তাটি উন্মুক্ত করে দেয়। আমি জানি, ছয় বছর আগের মতো ততটা চৌকস আমি এখন নই। আমি তখন ল্যাক্সে কিছু সময়ের জন্য আটকা পড়েছিলাম। স্বাস্থ্যসেবা অথবা শিক্ষা

www.pathagar.com

অথবা পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আমার তখনকার বক্তব্য অতটা পরিশোধিত নয়, যখন কাজ করছিলাম আমি কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে। আমার জ্ঞান কিছু বেড়ে থাকলে ত হয়ে থাকবে, আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় আর যে পথে নেমেছি সে কারণে সেই পথটি হলো রাজনীতির পথ। এখানে আমি এমন এক দৃষ্টির অধিকারী হয়েছি, যা আমাকে ভালোর জন্য, দুর্বলের জন্য এগিয়ে নেয়।

আমার মনে পড়ে ২০ বছর আগে আমার সিনিয়র এক বন্ধুর সাথে আলোচনার কথা। তিনি ষাটের দশকে শিকাগোতে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং এরপর নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে নগর অধ্যয়ন বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন। আমি তিন বছর সংগঠকের কাজ করার পর আইনের স্কুলে পড়াশোনার সিদ্ধান্ত নিই। তিনি ছিলেন আমার চেনা কয়েকজন একাডেমিক ব্যক্তিত্বের একজন। তার কাছে ওই কারণে একটা সুপারিশ পত্র চাই।

তিনি আমাকে সুপারিশ পত্র দিয়ে নিজেকে সুখি মনে করবেন। তবে তিনি জানতে চান কেন আমি আইনের ডিগ্রিটি নিতে চাই। আমি উল্লেখ করি নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার। আর এক পর্যায়ে আমি নিজে এ-সংক্রান্ত একটি অফিস চালানোর চেষ্টা করব। তিনি জানতে চান, আমি যে পথ বেছে নিতে চাচ্ছি তাতে কী ধরনের ঝক্কিঝামেলা আসতে পারে সেগুলো আমি ভেবেছি কি না। আমি একটি ল রিভিউ প্রতিষ্ঠান করতে চাই কি না, এতে কাউকে পার্টনার নেবো কি না, এ জন্য প্রথম অফিস নির্বাচন করেছি কি না যার পর সেই র‍্যাংকটির জন্য চেষ্টা করব। তিনি বলেন, বিধিগতভাবে আইন পেশা ও রাজনীতি দুটোর জন্যই প্রয়োজন হয় আপস-সমঝোতার। এই সমঝোতা শুধু ইস্যুর ক্ষেত্রেই নয় বরং অধিকতর মৌলিক বিষয়– মূল্যবোধ ও আদর্শ নিয়েও আপস করতে হয়। তিনি আমাকে আমার ইচ্ছার বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকতে বলেননি– শুধু বাস্তবতাটি তুলে ধরেন। তার আপসহীন মনোভাবের কারণে তার যৌবনকালে রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য বহুবার অনুরোধ আসার পরও তা তিনি গ্রহণ করেননি।

তিনি আমাকে বলেন, 'সমঝোতা সব সময় যে ভুল হয় এমনটা নয়। এর মধ্যে নিজের কাছে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছু আমি দেখিনি। একটি বিষয় আমি বয়স বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, সেটি হলো– যে বিষয়টি তোমাকে সন্তুষ্ট করবে সে ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারো। আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থে বৃদ্ধ বয়সের একটি সুবিধা হচ্ছে, যে বিষয়টি আমার সামনে আসছে তা থেকে আমি শিখতে পারি। ২৬ বছর বয়সে সে সম্পর্কে জানা খুব সহজ নয়। আর সমস্যা হলো কোনো ব্যক্তি তোমার জন্য সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। কেবল তুমি নিজের মতো করে সিদ্ধান্তটি নিতে পারো।'

২০ বছর পর আমি সে আলোচনার কথা ভাবছি আর আমার সেই বন্ধুর কথাগুলোর প্রশংসা করছি। সে সময়ে তা আমার কাছে যতটা ভালো লেগেছিল, তার চেয়ে বেশি স্মরণ হচ্ছে এখন। আমি এমন এক বয়সে এসেছি কোনটি আমাকে সন্তুষ্ট করছে তা

www.pathagar.com

আমি এখন বুঝতে পারি। আর যদিও আমার বন্ধু সমঝোতার ব্যাপারে যতটা সহিষ্ণু ছিলেন তার চেয়ে আমি এখন অনেক বেশি সহিষ্ণু। তবু আমি জানি যে, টেলিভিশন ক্যামেরার আলোর ঝলকানি অথবা জনতার সমুদ্র আমাকে সন্তুষ্ট করে না। তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ ও সন্তুষ্ট হতে পারি যদি জানি যে আমি জনগণকে তাদের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করতে পেরেছি। আমি ভাবি বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন তার মাকে যেটি লিখেছিলেন সে সম্পর্কে। এতে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি জনসেবায় এত বেশি সময় খরচ করছেন; আমি এটি বলতে চাই যে, 'তিনি ধনী হিসেবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে, তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন মানুষের কল্যাণ করে।'

এটি আমাকে তৃপ্তি দেয়– আমি নিজের পরিবারের প্রতি উপকারী হওয়ার সাথে সাথে যারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন তাদের জন্যও যদি আমি উপকারী হতে পারি। আমরা এমন উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারি যাতে আমরা নিজেরা যতটা না আশাবাদী তার চেয়ে আমাদের শিশুরা অনেক বেশি আশাবাদী হতে পারে।

ওয়াশিংটনে কাজ করতে গিয়ে কখনো কখনো আমার মনে হয়, আমি সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারছি আর আমার সব কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্যের প্রতি আমি নিবেদিত থেকেছি। অনেক সময় আবার আমার মনে হয় এ লক্ষ্য যেন আমার কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমি যেসব কর্মকাণ্ডে জড়িত তার সব কিছু– শুনানি, বক্তৃতা, সংবাদ সম্মেলন ও পজিশন পেপার– ইত্যাদি, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এতে কারো উপকার প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে না।

এ ধরনের চিন্তাই যখন যখন ভারাক্রান্ত হই তখন কোনো সবুজ চত্বর বা মলে আমি ছুটে যাই। সাধারণভাবে আমি সন্ধ্যার পরপরই বের হই। বিশেষত গ্রীষ্ম ও শরতে। তখন ওয়াশিংটনের আবহাওয়া উষ্ণ থাকে আর তখনো গাছগাছালিতে পাতাগুলো সতেজ থাকে। সন্ধ্যা নেমে আসার পর অনেকলোক আর হাঁটাহাঁটিতে থাকে না। তখন রাস্তায় স্বল্পসংখ্যক দম্পতি হাঁটাহাঁটি করে আর আশ্রয়হীন মানুষগুলো বেঞ্চে স্থান করে নেয়। অধিকাংশ সময়ে আমি ওয়াশিংটন মনুমেন্টের সামনে থামি। কখনো আরো সামনে এগিয়ে যাই। জাতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ স্মারকের রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে থাকি। এরপর ভিয়েতনাম যুদ্ধবীরদের স্মারক পেরিয়ে লিংকন মেমোরিয়ালে পা বাড়াই।

রাতে স্মৃতিসমাধিটি তার দ্যুতি ছড়ায়, কিন্তু কেউ তখন আর থাকে না। মার্বেল স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি গেটিসবার্গের বক্তৃতা পাঠ করি। এরপর পড়ি দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ। আমি রিফ্লেক্টিং পুলের দিকে তাকাই আর কল্পনা করি ড. কিংয়ের পরাক্রমে জনতার সমুদ্র কিভাবে স্থির-নিশ্চল হয়ে আছে। এরপর বেরিয়ে যাই ফ্লাডলিট সীমানা খুঁটি আর ক্যাপিটল ডোমের উজ্জ্বলতার দিকে।

আর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আমেরিকার কথা ভাবি। ভাবি তাদের কথা যারা আমেরিকাকে নির্মাণ করেছিলেন। জাতির স্থপতিরা– যারা নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা না ভেবে, সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে একটি মহাদেশকে বিকশিত করেছিলেন। ভাবি লিংকন

www.pathagar.com

ও কিংয়ের মতো সেসব মানুষের কথা, যারা নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছেন একটি অসম্পূর্ণ ইউনিয়নকে পূর্ণতা দিতে; আর অগণিত সেসব নারী ও পুরুষ, দাস ও সৈনিক এবং দর্জি ও কসাই যারা নিজেদের জীবনকে পার করেছেন তাদের সন্তানদের এবং ছেলেমেয়েদের সন্তানদের জন্য। ইটের পর ইট সাজিয়ে, রেলের পর রেল দিয়ে, হাতের পর হাত দিয়ে আমরা আমাদের এ জন্মভূমিকে, এই উপত্যকাকে সবার স্বপ্নপূরণের স্থানে পরিণত করার জন্য। এই প্রক্রিয়ার আমি অংশ হতে চাই। আমার হৃদয় পূর্ণ থাকবে এই দেশ, এ মাটির ভালোবাসায়।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

www.amarboi.org

অনেক ব্যক্তি তাদের বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিলে এই বইটি হয়তো আলোর মুখ দেখত না ।

স্ত্রী মিশেলকে দিয়েই আমাকে শুরু করতে হবে। একজন সিনেটরকে বিয়ে করাই দুর্দশা ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। আবার সেই সিনেটর একটি বই লেখায় হাত দেন তবে সেজন্য প্রয়োজন বাড়তি ধৈর্যের। মিশেল পুরো লেখার প্রক্রিয়ায় আমাকে শুধু অবেগময় সহায়তাই দেয়নি সে অনেক চিন্তার খোরাক পেতেও সহযোগিতা করেছে আমাকে। এসব ধারণা প্রকাশ পেয়েছে এ বইতে। আমি এখন প্রতিটি দিন পার করে বুঝতে পারি আমার জীবনে মিশেলকে পাওয়াটা কতটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। তার প্রতি অন্তহীন ভালোবাসাই আমার অব্যাহত ব্যস্ততা তার ক্ষতিকে হয়তো কিছুটা পুষিয়ে দেবে।

একইসাথে আমি আমার সম্পাদক মিজ রাসেল ক্লেম্যানের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমি সিনেটের প্রাইমারিতে জয় লাভ করারও আগে রাসেলই আমার প্রথম বই 'ড্রিম ফ্রম মাই ফাদার' বাজার থেকে বিক্রি নিঃশেষ হওয়ার দীর্ঘ সময় পর ক্রাউন পাবলিকেশন্সের দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন এই বইয়ের বিষয়টি। এই রাসেলই বর্তমান বইটি লেখার ব্যাপারে আমার প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে গেছেন। বইটি শেষ করার জটিল কাজে রাসেল সব সময় আমার অংশীদার ছিলেন এবং এ কাজটি তিনি করেছেন উৎফুল্লচিত্তে। এর সম্পাদনা প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে রাসেল ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিময়ী, যত্নশীল এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎসাহী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমি যে সময়ে কাজটি শেষ করেছি তার আগেই তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলাম। যেখানেই আমি বিচ্যুত হতে চলেছি সেখানে তিনি আমার বক্তব্যকে ঠিকভাবে নিয়ে এসেছেন ধীরে কিন্তু সঙ্কল্পবদ্ধভাবে। আর আমার জটিল শব্দ ও কথার ফুলঝুড়ি অথবা ভুল বিবৃতি থেকে তিনি ঠিক পথে তুলে এনেছেন আমাকে। অধিকন্তু তিনি আমার সিনেটসূচির জটিলতা এবং রাইটার্স ব্লকের ক্রমাগত আক্রমণের মধ্যেও অবিশ্বাস্য ধৈর্য

www.pathagar.com

বজায় রেখেছেন। এমনকি তিনি নিজের ঘুম, সপ্তাহান্তের ছুটি অথবা পরিবারের সাথে অবকাশকেও বিসর্জন দিয়েছেন ঠিকঠাক মতো এ কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য।

মোদ্দাকথায় তিনি হলেন একজন আদর্শ সম্পাদক– আর তিনি পরিণত হয়েছেন আমার একজন মূল্যবান সুহৃদে।

অবশ্য রাসেল যে কাজটি করেছেন তা সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না যদি আমার প্রকাশক ক্রাউন পাবলিশিং গ্রুপের জেনি ফ্রস্ট ও স্টিভ বস তাকে পুরোপুরি সহযোগিতা না দিতেন। শিল্প ও বাণিজ্যের আন্তঃসংযোগ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। জেনি ও স্টিভ অব্যাহতভাবে চেষ্টা করেছেন এ দুটির সমন্বয়ে এটিকে সর্বোত্তম প্রকাশনায় রূপ দিতে। এই বইয়ের প্রতি তাদের বিশেষ আস্থা থাকায় বারবার অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছেন এতে। এজন্য আমি তাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই বইয়ের সাথে যুক্ত ক্রাউনের অন্য সবাইও বিশেষ যত্নের সাথে কাজ করেছেন। প্রকাশনার জন্য খুব কম সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও অ্যামি বোর্সটেইন বইটির প্রকাশন প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে এগিয়ে নিতে বিরামহীন শ্রম দিয়েছেন।

টিনা কনস্ট্যাবল ও ক্রিস্টিনা অ্যারোসন এই বইয়ের জন্য ব্যাপক প্রচার কাজ করেছেন এবং সিনেটে আমার কাজের ব্যস্ততার সাথে সমন্বয় করে দ্রুত সূচি (এবং পুনঃসূচি) নির্ধারণ করেছেন। পাঠকরা যাতে সহজেই বইটি তাদের হাতে পেতে পারেন সেজন্য র‍্যানডম হাউসের বিপণন কর্মী এবং বই বিক্রেতাদের সাথে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করেছেন জিল ফ্ল্যাক্সম্যান। জ্যাকব ব্রনস্ট্যাইন দ্বিতীয়বারের মতো বইটির একটি চমৎকার অডিও সংস্করণ বের করেছেন। অনেকটা বিরূপ পরিবেশেই তাকে করতে হয়েছে এ কাজ। তাদের সবার প্রতি আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ক্রাউনের অন্য কর্মীদের প্রতিও আমার একই ধরনের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুলিন্ডা বাটলে, উইটনি কুকম্যান, লরেন ডং, লাউরা ডাফি, স্কিপ ডাই, লেটা ইভানথেস, ক্রিস্টিন কাইজার, ডোনা প্যাসানেইট, ফিলিপ প্যাট্রিক, স্ট্যান রেডফার্ন, বারবারা স্টারম্যান, ডন উয়েজবার্গ এবং আরো অনেকে।

ডেভিড এক্সেলরাড, ক্যাসান্ড্রা বাটস, ফরেস্ট ক্ল্যাপোল, জুলিয়াস জেনাকসকি, স্টট গ্রাশন, রবার্ট ফিশার, মিশেল ফ্রম্যান, ডোনাল্ড গিপস, জন কুপার, এন্থনি ল্যাক, সুসান রাইস, জেনে স্পারলিং, ক্যাস সানটেইন ও জিম ওয়ালিসসহ আমার অনেক বন্ধু বইটির পাণ্ডুলিপি পড়তে সময় এবং আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। সামান্থা পাওয়ারের মহত্ত্বের জন্য তার নামটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তার নিজের বই রচনার মাঝপথে আমার বইটির সব পরিচ্ছেদ এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন যেন বইটি একান্তভাবে তার লেখা। তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন আর যেখানেই আমার উৎসাহ বা শক্তিতে ব্যত্যয় ঘটছিল তখনই প্রেরণা জুগিয়ে উৎফুল্ল করেছেন।

পিটে রাউজ, কারেন কর্নব্লাহ, মাইক স্ট্রাউটম্যানিস, জন ফ্যাভরাউ, মার্ক লিপার্ট,

www.pathagar.com

জশোয়া ডুবইস আর বিশেষভাবে রবার্ট গিবস ও ক্রিস লুসহ আমার সিনেট স্টাফদের মধ্যে অনেকে তাদের নিজস্ব সময় ব্যয় করে পাণ্ডুলিপিটি পড়েছেন এবং সম্পাদনা-পরামর্শ, নীতি-সুপারিশ, সংশোধন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। নির্ধারিত কর্তব্যের বাইরে গিয়ে তাদের এ কাজ করার জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমার সাবেক স্টাফ মাধুরি কুমারেড্ডি ইয়ালে ল স্কুলে যাওয়ার আগের গ্রীষ্মের পুরো সময় পাণ্ডুলিপির তথ্য যাচাইয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। তার মেধা ও শক্তি আমাকে বিস্মিত করেছে। একই সাথে হিলারি স্ক্রানালের জন্যও ধন্যবাদ যিনি বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের বেশ কিছু গবেষণা ও অনুসন্ধানে মাধুরিকে সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে আমি আমার এজেন্ট উইলিয়াম অ্যান্ড কনোলির বব বার্নেটকে তার বন্ধুত্ব, দক্ষতা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি আমাকে এক ভিন্ন পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়েছে।

www.pathagar.com

বারাক ওবামা ও দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ

www.amarboi.org

আব্রাহাম লিংকনের পর আমেরিকান রাজনীতিতে যে মানুষটি নতুন দিকনির্দেশনা নিয়ে হাজির হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে তিনি হলেন কেনীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান বারাক ওবামা। অসাধারণ বাগ্মী ওবামা সাদা-কালো নির্বিশেষে আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন জোয়ার।

১৯৬১ সালের ৪ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে ওবামার জন্ম। আফ্রিকার কেনিয়ায় এক অজপাড়াগাঁয়ে তার বাবা সিনিয়র বারাক হোসেন ওবামার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। কেনিয়া তখন ছিল ব্রিটিশ কলোনি। এক ইংরেজ পরিবারে কাজ করতেন ওবামার দাদা।

ওবামার মা ছিলেন আমেরিকার ছোট্ট শহর কানসাসের অধিবাসী। তার বাবা সে সময় কাজ করতেন এক তেল কোম্পানিতে। পার্ল হারবারের ঘটনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেন তিনি। যুদ্ধ শেষে ওবামার বাবা হাওয়াইয়ের পশ্চিমে বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন। ওবামার বাবা-মায়ের প্রথম দেখা হয় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওবামার বাবা বৃত্তি নিয়ে সেখানে পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাবা কেনিয়া ফিরে গেলে ওবামা হাওয়াইয়ে থেকে যান তার শ্বেতাঙ্গ মায়ের সাথে। শৈশবে কয়েক বছর ইন্দোনেশিয়াতে তার মা ও সৎপিতার সাথে কাটিয়েছেন ওবামা। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে হার্ভার্ড থেকে আইনে ডিগ্রি নেন ওবামা। তিনি ছিলেন হার্ভার্ড রিভিউ পত্রিকার প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান সভাপতি।

এরপর শিকাগো গিয়ে আইন চর্চা ও সংবিধানের ওপর শিক্ষাদান শুরু করেন ওবামা। পাশাপাশি সেখানকার গরিব ও বেকারদের সহায়তা দিতে একটি সংগঠনও গড়ে তোলেন তিনি। এই সংগঠনে কাজ করতে গিয়ে ওবামা অনুভব করেন সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য কিছু করতে চাইলে স্থানীয় পর্যায়ে নয়, পরিবর্তন আনতে হবে আইনে এবং জাতীয় রাজনীতিতে। এ সময় তিনি ইলিনয় রাজ্যের সিনেটর নির্বাচিত হন এবং পরপর দুই মেয়াদে আট বছর রাজ্য সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় আফ্রিকান-

www.pathagar.com

আমেরিকান সিনেটর হিসাবে ইলিনয় থেকে ২০০৪ সালে জাতীয় সিনেটে নির্বাচিত হন ওবামা।

বিচিত্র জনগোষ্ঠী ও মতের মানুষের সাথে মেশার অভিজ্ঞতা আছে ওবামার। তার পারিবারিক আত্মীয়তার পরিমন্ডল বিশ্বব্যাপি। তার চাচাত ভাইবোন খালা ভাতিজা ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মিলন অনুষ্ঠানটা অনেকটাই জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনের মত বৈচিত্রপূর্ণ হবে বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তার পারিবারিক জীবনের এই পটভূমি ওবামার রাজনৈতিক জীবনকেও করেছে সমৃদ্ধ। ব্যক্তিজীবনে তিনি মালিয়া ও সাশা নামে দুই কন্যাসন্তানের জনক। স্ত্রী মিশেল একজন আইনজীবী। শিকাগোতেই স্থায়ী বসবাস ওবামা পরিবারের।

অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আমেরিকাকে আরো শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে ওবামার পরিকল্পনা সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মধ্যবিত্তদের জন্য কর কমানোর পরিকল্পনা আছে তার। তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য জোরদারের মাধ্যমে মার্কিন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে চান। তিনি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে আমেরিকান পরিবারগুলোতে স্বচ্ছলতা ও স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে চান। তিনি চান স্বাস্থ্যসেবার খরচ ও জ্বালানি সঙ্কট নিরসনের জন্য সর্বাধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরিকে উৎসাহিত করতে। তিনি শ্রমিক সংগঠনগুলোকেও শক্তিশালী করার পক্ষে। তবে তিনি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কাজে লাগাতে চান এ শক্তিকে।

শুরু থেকেই ইরাক যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন ওবামা। এখনো মনে করেন ইরাক থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিৎ। ইরানের ক্ষেত্রেও বুশ এবং প্রতিপক্ষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ম্যাককেইনের তুলনায় তার নীতি অনেকটা নমনীয়। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চালানোর নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। তবে তিনি আফগানিস্তানে 'সন্ত্রাসী শক্তি' সম্পূর্ণ পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার পক্ষে। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এসব করতে চান যথাসম্ভব মিত্র দেশগুলোকে সাথে নিয়ে। এশিয়ার সাথে সরাসরি ও প্রাণবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন ওবামা। পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্বের পক্ষে তার দৃঢ় অবস্থানের কথাও উচ্চারণ করেছেন তিনি।

শুধু বাগ্মিতা নয়, ওবামার লেখার হাতও অসাধারণ। 'দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ' বা প্রত্যাশার স্পর্ধা তার লেখা দ্বিতীয় বই। প্রথম বই 'ড্রিম ফ্রম মাই ফাদার' তিনি লিখেছিলেন রাজনীতিতে আসার আগে। ২০০৪ সালে ডেমোক্র্যাট দলের জাতীয় কনভেনশনে পাঠ করা মূল প্রবন্ধে প্রথম 'অ্যাডাসিটি অব হোপ' বাক্যটি ব্যবহার করেছিলেন ওবামা। মূলত কনভেনশনের সেই বক্তৃতার পর থেকে দলের 'উদীয়মান তরুণ আকাঙ্ক্ষা' হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে ওবামার নাম। এই বইয়ে ওবামা তার স্বপ্নের আমেরিকা কেমন হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ কিংবা ইরাক যুদ্ধ এবং জেরুজালেম প্রসঙ্গও বাদ যায়নি তার

www.pathagar.com

লেখা থেকে। বিভেদ ভুলে অভিন্ন লক্ষ্যের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। ওবামার মতে, 'কালো বা সাদা আমেরিকান কিংবা ল্যাটিনো বা এশিয়ান-আমেরিকান বলতে কিছু নেই– আছে কেবল ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা'। 'দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ' বইয়ে এমন এক নতুন ধারার রাজনীতির ডাক দেয়া হয়েছে, যেখানে রাজনীতি গড়ে উঠবে সমঝোতার ভিত্তিতে। তাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন আমেরিকানরাও। ডেমোক্র্যাট দল থেকে আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। জনমত জরীপে প্রতিপক্ষের তুলনায় যথেষ্ট এগিয়েও আছেন তিনি।

প্রকাশের পর থেকেই 'দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ' বেস্ট সেলার তালিকায়। বইটির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন অঙ্কুর প্রকাশনীর মেসবাহউদ্দীন আহমেদ। বাংলাদেশে একজন ব্যতিক্রমী প্রকাশক তিনি। মূল গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক লাইসেন্স নিয়েই তিনি কোন অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বারাক ওবামার 'দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ' বইটি তিনি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিয়েই প্রকাশ করছেন।

যে কোন ভাষার শক্তি ও সীমাবদ্ধতা দুটোই রয়েছে। ফলে ভাষান্তরের কাজটি শতভাগ ত্রুটিমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এ বইয়ের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। মূল গ্রন্থের মত বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে 'দ্য অ্যাডাসিটি অব হোপ' এর বাংলা সংস্করণ সমাদৃত হলে এর অনুবাদ সার্থক হবে।

মাসুমুর রহমান খলিলী
মাসুম বিল্লাহ
২২ আগস্ট ২০০৮
ঢাকা

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের দুশো বত্রিশ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এক কৃষ্ণাঙ্গ– প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে এলেন। দাঁড়ালেন দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর সামনে। ব্যক্ত করলেন তুমুল নতুন সব স্বপ্ন, পরিকল্পনা ও পরিবর্তনের কথা। নতুন পথের নিশানা জানা আছে তাঁর। জানা আছে বর্ণবিদ্বেষের দংশনজ্বালা আর সমাজের অতিসাধারণের বেদনা, স্বপ্ন ও সাধের কথা। যে বোধসকল তাঁর অন্তরে, তা প্রকাশের পরম শৈলী তাঁর আয়ত্তে আছে। তাই তাঁর বক্তৃতা হয়ে ওঠে প্রাণমুগ্ধকর, সে কারণেই তাঁর লেখারা পায় অতি হৃদয়সংবেদী রূপ। এই বইয়ে বারাক ওবামা তুলনাহীন প্রাঞ্জলতায় প্রকাশ করেছেন তাঁর নবরাষ্ট্র ভাবনা, তাঁর স্বপ্ন-পরিকল্পনা; ও রচনা করেছেন কাম্য পরিবর্তনের রূপরেখা। ওবামার ওই স্বপ্ন ও ভাবনায় দুলে উঠবে এ বইয়ের প্রতিটি পাঠক।

"বারাক ওবামা সেই দুর্লভ রাজনীতিকদের একজন যিনি সত্যিকার অর্থে লিখতে পারেন এবং বিশ্বস্ততার সাথে নিজেকে প্রকাশ করেন; এবং যাঁর লেখায় গতি আছে... এই বইয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও দিক নির্দেশনা ব্যক্ত হয়েছে খুব সহজ ভাষায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোরও অবতারণা করেছেন তিনি সহজ গদ্যে মোহনীয়ভাবে; দলীয় ভাবাদর্শে আচ্ছন্ন না হয়ে।"

–মিশিকো কাকুতানি, নিউ ইয়র্ক টাইমস

"এমনকী যাঁরা দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'হোপ' শব্দটি বিশ্লেষণ করতে চান, তাঁদেরও বলতে হবে যে, ওবামা সততার সাথে তাঁর কথা বলেছেন। তিনি রাজনৈতিক ভাবালু কথামালার বিস্তার না ঘটিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেছেন, ও তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন।"

–জন বালজার, লস এ্যাঞ্জেলস টাইমস

"আমাদের এই হতাশা ও উদ্যোগহীনতার কালে ওবামা তার মেধা দিয়ে উন্নয়ন ও সমস্যা উত্তরণের কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যা-ভাষ্য সংবলিত এই গদ্য সত্যিই আমাদের ভেতরে 'হোপ' জাগিয়ে তোলে।"

–মিখায়েল কাজিন, ওয়াশিংটন পোস্ট

"দেশের প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী রাজনৈতিক জীবনী, সিনেটরের (বারাক ওবামার) মূল্যবোধ ব্যক্ত হয়েছে।"

–মাইক ডোরিং, শিকাগো ট্রিবিউন

ISBN : 984 464 223 X

www.pathagar.com